ভ্রমণ অমনিবাস

প্রথম খণ্ড

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—চল্লিশ টাকা—

প্রচ্ছদপট

শ্রী পূর্ণেন্দু রায়

ত্রিবর্ণচিত্র

নন্দন কানন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

ভ্রমণ-অমনিবাস প্রথম খণ্ড

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্তমান কালের বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে প্রবাদপুরুষ বললে অত্যুক্তি হবে না। ভ্রমণকাহিনীকে রোমান্স-এর আবহাওয়ামুক্ত করে তাকে বাস্তব ভিত্তিতে যাঁরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, উমাপ্রসাদবাবু তাঁদের পুরোধা। প্রকৃতি দেবী হিমালয়ের বিভিন্ন রাজ্যে, অরণ্যে, জনপদে যে রত্ন ভাণ্ডার অকৃপণ হাতে সাজিয়ে রেখেছেন, তিনি সেগুলি চয়ন করে তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের সামনে ধরে দিয়েছেন। এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এত আপন করে পাওয়া—এই সবই সম্ভব হয়েছে তাঁর রচনাশৈলীর বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্যে। ভ্রমণ-অমনিবাসের বর্তমান খণ্ডে—গঙ্গাবতরণ, হিমালয়ের পথে পথে, সেই-যে আমার নানারঙের দিনগুলি এবং আফ্রিদী মুলুকে—এই চারটি রচনা সংকলিত হয়েছে। গঙ্গাবতরণ,—গঙ্গোত্রী, গোমুখ এবং কালিন্দী খালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। 'হিমালয়ের পথে পথে' অংশে আছে—বিরেহী, লোকপাল-নন্দনকানন, এবং স্বর্গারোহণী-ভ্রমণের বিবরণ। 'সেই-যে আমার নানারঙের দিনগুলি' গুপ্তেশ্বর গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এতে আছে হৃষিকেশের বিভিন্ন আশ্রমের বর্ণনা, বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের কাহিনী এবং গঙ্গা-পথে জল-ভ্রমণের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। 'আফ্রিদী মুলুকে' উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, খাইবার পাস, চণ্ডীগড় প্রভৃতি স্থানের বিচিত্র রসের কৌতূহলোদ্দীপক ভ্রমণ-কাহিনী। বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠক-পাঠিকা উমাপ্রসাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্য বারংবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের সন্তোষ-বিধানের জন্যই প্রধানত আমাদের এই প্রয়াস।

বিনত প্রকাশক

সূচীপত্র

গঙ্গাবতরণ	১—৮৭
হিমালয়ের পথে পথে	১—২০৯
সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি	২১১—২২৬
আফ্রিদী মুলুকে	২২৭—২৮৫

গঙ্গাবতরণ

উ. প্র. মঃ—১

১৯৫২ সাল। মে মাস।

আবার কেদার-বদরী যাত্রার উদ্যোগ করছি।

কিছুদিন আগে ভাইপো বিলেত থেকে ফিরেছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণা করছে। সব কিছু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে, যার প্রমাণ পায় না তা মানতে চায় না।

আমার যাওয়ার খবর শুনে বলে, আবার কেদার-বদরী চললে কেন? একবার ত ঘুরে এসেছ। যাও না, ইউরোপ দেখে এস। ও-দিকে ত কখনো যাও-ই নি। অনেক কিছু নতুন দেখবে। আর যদি পাহাড়েই বেড়াতে চাও—চলে যাও সুইজারল্যাণ্ডে। কী অপূর্ব দেশ! পাহাড় পাবে, স্নো পাবে, লেক পাবে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তেমনি টুরিস্টদের থাকবার সুবন্দোবস্ত। পায়ে হাঁটার কষ্ট নেই, চটিতে থাকার অসুবিধে নেই। সব কিছুই হাতের কাছে পাবে, এমন কি পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়ায় পর্যন্ত ট্রেনে করে পৌঁছে দেবে!

চুপ করে শুনি, আর হাসি।

তারপরে বলি, হ্যাঁ—তাই ত গল্প শুনি, বই-এ পড়ি, ছবিও দেখি। পাসপোর্ট'ও ত করা আছে। কিন্তু তবুও যাওয়া হচ্ছে কই? যখনি সুযোগ আসে তখনি হিমালয়ের দিকেই মন ছোটে, বার হয়ে পড়ি। যেতেই হয়।

ভাইপোও হাসে। বলে, আশ্চর্য! তোমাদের এ-সব বুঝি না কিছু। বুঝেও কাজ নেই আমার!

তারপর, একাই যাত্রা করি। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি—পরিপূর্ণ পরি-তৃপ্তি নিয়ে।

॥ ২ ॥

বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাস আসে।

হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘর-ছাড়া মনকে আবার পথে টানে। যাত্রার আয়োজন করি।

ভাইপো খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, পাগল হলে নাকি? আবার চলেছ কেদার-বদরী? এই ত সেদিন ঘুরে এলে?

তারপর, আবার পশ্চিম-যাত্রার পরামর্শ দেয়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রোজ্জ্বল প্রগতির পরিচয় দেয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা—সত্যি বলো ত ওখানে বার বার গিয়ে কি কোন আনন্দ পাও?

উত্তর দিই, পাই বই কি। নিশ্চয় পাই এবং আশাতীত পাই। নইলে যাবোই বা কেন? কেউ ত এখান থেকে জোর করে পাঠায় না। তবে, কেন যে যাই, কি যে পাই—বোঝাতে পারি না।

ভাইপো গম্ভীর হয়েই বলে, চলো এবার আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। একবার দেখে আসি, কি আছে ওখানে। পারবো না যেতে?—শুনেছি নাকি খুব

কষ্টকর পথ ?

যে-কেউ আসে কেদার-বদরী যাত্রার পরামর্শ নিতে, নিঃসঙ্কোচে যেতে উৎসাহ দিই। বলি, দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও ভয় নেই। সুবিধে-অসুবিধের, বাধা-বিপত্তির হিসেব-নিকেশ করতে যাবেন না, করলেই হিসেবে মিলবে না, যোগ ভুল হবে—যাওয়ায় বাধা ঘটাবে। বা'র হয়ে পড়লেই দেখবেন, ঠিক ঘুরে এসেছেন।

ভাইপোর বেলায় কিন্তু বলতে দ্বিধা জাগে। ভাবি, সত্যিই ত পথের অত অসুবিধা, গৃহ-সুখের সন্ধান নেই—যদি কোন ক্লেশ বোধ করে!

তবুও বলি, বেশ ত চলো না, হাজার হাজার লোক চলেছে, আর তুমি পারবে না ? নিশ্চয় পারবে। তবে, পথের কষ্টটুকু স্বীকার করে নিও। চোখ ও মন সম্পূর্ণ উম্মুক্ত রেখো—অপার আনন্দ পাবে।

দু'জনে বেরিয়ে পড়ি।

হিমালয়ে পথ-চলার অভিনব জীবন তার শুরু হয়। চারিদিকের বিচিত্র আবেষ্টনীর সঙ্গে সে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নেয়। দুর্গম পথের দুরূহতাও হাসিমুখে বরণ করে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সামনের চড়াইটা ওঠবার জন্যে একটা ডাণ্ডী বা ঘোড়া করবো নাকি ?

সে তখনি প্রতিবাদ জানায়। বলে, না, নাঃ—চমৎকার চলেছি। ধীরে ধীরে ঠিক উ ঠ যাবো। বেশ লাগছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষক মন তার সজাগ আছে। অনুসন্ধিৎসার অণুবীক্ষণে সব কিছু দেখবার জানবার চেষ্টা করে।

কেদারনাথে এসে পৌঁছুলাম। সাগরবক্ষ থেকে ১১,৭৫০ ফুট। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিছুকাল আগেও বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারিদিকে তুষার-গলা জলের ধারা নেমেছে—অদূরবর্তিনী মন্দাকিনীর সঙ্গে কলোচ্ছ্বাসে মিলতে ছুটেছে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম বরফের রাজত্বে। সামনেই নগাধিরাজের তুষার-শুভ্র বিরাট রূপ। দুজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

অস্ফুটস্বরে ভাইপো বলে, নাঃ—আবার এখানে আসতেই হবে।

আমি হাসি। ভাবি, তার বৈজ্ঞানিক মন কি দেখল, কি পেলো —কে জানে ?

তবে এটুকু জানি,—আবার আসতেই হবে।

॥ ৩ ॥

আবার বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাসও আসে।

আবার হিমালয়-যাত্রার প্রস্তুতি করি।

এবার আর ভাইপো প্রশ্ন করে না। দুঃখ জানায়, নতুন কাজে যোগ দিয়েছি ; কোনমতে বার হবার উপায় নেই। কিন্তু দেখে নিও আসছে বছর যাবোই—গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে আসতে হবে।

জানি, সে যাবেও।

এমনি করে আমারও বার বার হিমালয়-যাত্রা। কি যে পাই, কত যে পাই—ভাষায় প্রকাশ হয় না, শুধু বুঝি, মন ভরে উঠে—প্রশান্তির প্রদীপ্তিতে পরিতৃপ্তি আনে।

॥ ৪ ॥

এবার কিন্তু কেদার-বদরীর পথেই শুধু যাবো না। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখও দেখে আসার আকাঙ্ক্ষা। কেদার-বদরীর বিবরণীর অভাব নেই। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রা-পথের কাহিনীও পড়ি। এর পূর্বেও ও-পথে গিয়েছি। সানন্দে ঘুরে এসেছি। সবারই অভিজ্ঞতা যে একই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। না-হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, শরতের আকাশে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘখানি বিভিন্ন জলাধারের জলের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছায়া ফেলেছে। অথচ, কোন কোন লেখায় পথের দুর্গমতার যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে তা দেখে মনে সন্দেহ জাগে—আমি কি তবে অন্য কোথাও গেছি—ও-পথেই যাই নি।

পথের কষ্ট আছে, ঠিকই। হিমালয়ের পাহাড়-পথে দুর্গমতাও বিচিত্র নয়। কিন্তু, সেটা বড় কথাও নয়, ভয়েরও নয়। কেদার-বদরীর যাত্রা-পথ এখন ত বাস চলাচলের ফলে সহজ ও সুগম হয়েছে। গেলেই হোল। যাত্রীর স্রোতও অবিরত বয়ে চলেছে—পাহাড়ে ঝরণার মত।

তাই, সে-পথের পরিচয় দেবার জন্যে এ-লেখার অবতারণা নয়। গঙ্গোত্রী যাত্রা-পথেরও নয়। গোমুখে যাত্রী যায় অল্প। সেই পথেরই কাহিনী বলা এর উদ্দেশ্য।

॥ ৫ ॥

কলিকাতা থেকে হরিদ্বার রেল-পথ। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ষোলো মাইল,—রেলের শাখা-লাইনও আছে, বাসও চলে। হৃষীকেশের পরই পাহাড় শুরু। স্তরে স্তরে গিরিশ্রেণী আকাশ স্পর্শ করতে চলেছে। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গোত্রী-পথেও ১৯৪৯ সাল হতে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। কেদার-বদরীর বাস একদিকে চলে গেল, গঙ্গোত্রী-পথের বাস ভিন্ন পথে নরেন্দ্রনগরের দিকে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নরেন্দ্রনগর পার হয়ে, টেহেরী ছেড়ে এসে হরিদ্বার থেকে ৮২ মাইল দূরে ধরাসু। বাস-এর পথ আপাততঃ এইখানেই শেষ। আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন চলেছে।

ধরাসু গঙ্গার উপর। এখান থেকে গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে গঙ্গোত্রী। ৭৫ মাইল দূর। আর একটি পথ বামদিকের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে নেমেছে যমুনার উপত্যকায় এবং যমুনার কূল ধরে চলে গেছে যমুনোত্রী। ধরাসু থেকে যমুনোত্রী ৪৮ মাইল। পাঁচ বছর আগে যমুনোত্রী দেখে এসেছি। এবার ওপথে যাবার কথা নয়। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ যাওয়াই উদ্দেশ্য।

ধরাসু থেকে পায়ে চলার পথ শুরু। হাঁটা পথ হলেও প্রশস্ত পথ—ভয়ের কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে পথ চলা যায়। কদাচিৎ কোথাও পাথর বেশী হলে পথ অপ্রশস্ত হয়, কিন্তু সেখানেও চলাচলে কোন আশঙ্কা নেই। একমাত্র, পাহাড় ধ্বসে গিয়ে পথ যদি নিশ্চিহ্ন হয়—তখন সাময়িক চলাচলের অস্থায়ী পথটুকু সংকীর্ণ হয়, মনে হয়ত ভয়ও জাগায়। কিন্তু, বর্ষার আগে খুবই কম পাহাড় ধ্বসে, তাছাড়া অসমর্থ বৃদ্ধ যাত্রীদের স্বচ্ছন্দে সে-সব পথ অতিক্রম করতে দেখে মনে সাহস জাগে। আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদও ত কখনো শোনা যায় না। বড় শহরের প্রশস্ত রাজ-পথেও চলাচলের বিপদ কি কম!

ধরাসু থেকে গঙ্গোত্রী পাঁচ-ছয় দিনের পথ। নয় মাইল অন্তর ধর্মশালা। কেদার-বদরীর পথের মত অত ঘন ঘন চটি বা গ্রাম পাওয়া যায় না। তাই, এ-পথে নয় মাইলের কম পড়াও নেই, অর্থাৎ সারাদিনে নয় মাইল অথবা আঠারো মাইল যেতেই হয়।

উত্তরকাশী, ভাটোয়ারী, গাঙনানী, হরশীল, ধরালী—ছাড়িয়ে এসে গঙ্গোত্রী। সাগরবক্ষ থেকে ৯৯৫০ ফুট উঁচু।

সবগুলিই গঙ্গার উপর মনোরম স্থান।

মাঝে দুইটি বড় চড়াই আছে। প্রথমটি 'সুখী'র চড়াই,—চড়াই উঠার সুখ নেই, তবে চড়াই-শেষে বিশ্রামে সুখ আছে। দ্বিতীয়টি, গঙ্গোত্রীর আগেই 'ভৈরব-ঘাটি'র চড়াই। চড়াই হিসাবে এর খ্যাতি আছে, তবে খ্যাতির তুলনায় ভীতিকর নয়।

॥ ৬ ॥

গঙ্গোত্রী ছোট জায়গা।

বিরাট গিরিশ্রেণীর মাঝে একটি মন্দির ও কয়েকখানি ঘর,—যেন প্রকাণ্ড এক বটগাছের শাখায় ছোট্ট একটি পাখীর বাসা।

মন্দিরের পাশেই গঙ্গা।

সেই জাহাজ-ভেসে যাওয়া সুবিস্তীর্ণ সুগভীর ভাগীরথী নয়,—উপলবহুল ক্ষীণকায়া পার্বত্য নির্ঝরিণী। হিমশীতল জল। গৈরিকবসনা। কলস্বরে বয়ে চলছেন। উচ্ছল উদ্বেল।

গঙ্গার উপর কাঠের ছোট পুল। অপর পারে সাধু-সন্তদের আশ্রম। ছোট ছোট এক-একটা ঘর। চারিদিকে দেবদারুর গহন বন। সেই বনের ধারে গঙ্গার তীরে একান্তে সাধন-ভজনের নিভৃত স্থান।

এ-পার থেকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠি। কই, পাঁচ বছর আগে অমন ঘর-বাড়ী ত ওপারে দেখি নি। এক জায়গায় কয়েকটি অতি-মনোরম বাংলো-প্যাটার্নের ঘর। যেন একটা নতুন শৌখীন কলোনী। শুনি, এক স্বামীজী তাঁর আশ্রমের সংস্কার করেছেন। ঝক্‌ঝকে বাড়ীগুলি সূর্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করতে থাকে। কিন্তু, সেই প্রশান্ত আবেষ্টনীর মাঝে সে উজ্জ্বলতা উদ্ধত মনে হয়,—যেন পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মাঝে প্রখর বৈদ্যুতিক আলো। চোখে ও মনে আঘাত হানে।

॥ ৭ ॥

তীর্থ-ভ্রমণের এক প্রধান অঙ্গ সাধু-সঙ্গ। তাই, পুণ্যকামী তীর্থসেবীদের তীর্থক্ষেত্রে এলেই সাধু-সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে।

জানতাম, সকাল দশটায় ধর্মশালায় সাধুদের ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। দিনের মধ্যে একবারই। অনেক সাধু আসেন,—একসঙ্গে দর্শনও মেলে।

সঙ্গীদের উৎসাহে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম।

দুটি পাশাপাশি ঘর—বারান্দার উপর দুটি জানালা। জানালায় ফোকর-কাটা,—যেন স্টেশনের টিকিট-ঘর।

ঘরের ভিতর কালী-কমলী-ক্ষেত্রের লোক, খাবার নিয়ে বসে আছেন। বাইরে বারান্দায় ও চত্বরে সাধুরা এসে জমায়েত হচ্ছেন। কাঠের বেঞ্চও দুই-তিনটি পাতা আছে। কেউ কেউ তাতে বসেছেন। অনেকেরই রুক্ষ রূপ—কোমল কান্তি নয়,—কঠিন, কঠোর। কারো কারো চোখে-মুখে মধুর হাসি,—শিশুর সরলতায় সুস্নিগ্ধ। সবারই নগ্ন পদ। অল্প কয়েকজনের অঙ্গে আচ্ছাদন আছে —মোটা কম্বল বা চাদর। অনেকেই নগ্ন দেহ—কৌপীনমাত্র সার। কারো কারো তাও নেই—সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। সবাই জটাজুটধারী। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি মহাত্মা এসেছেন। দুই-একজন পরস্পর কথা বলছেন। নইলে, প্রায় সকলেই নির্বাক। অনেক মৌনীও আছেন। সকলেরই হাতে একটি বা দুইটি পাত্র—কোনটি তামার, কোনটি পিতলের, কোনটি বা লাউ-এর তৈরি।

এখানেও 'কিউ'।

একে একে সার বেঁধে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিতর থেকে খানছয়েক রুটি, ভাত ও ডাল বা তরকারি দেওয়া হচ্ছে।

কেউ বারান্দায় বসে খাচ্ছেন, কেউ বা গঙ্গার ধারে পাথরের উপর গিয়ে বসেছেন, কেউ কেউ বা নিজ আশ্রমে অপর পারে চলেছেন।

একজন নাগা সাধু দাঁড়িয়েই খাচ্ছেন; শুনলাম, তিনি কখনও বসেন না, শোনও না।

সবাই অপর-পারের আশ্রমবাসী। কিন্তু, মহাত্মারা সকলেই ভাণ্ডারা নিতে আসেন না। আশ্রমে পৌঁছে দিলে তাঁদের কেউ কেউ গ্রহণ করেন। আবার, এমনও কয়েকজন আছেন যাঁরা এ-সব অগ্নি-পক্ব কোন কিছু ভোজন করেন না। দর্শনার্থীরা কিস্‌মিস্‌, বাদাম ইত্যাদি দিয়ে প্রণাম করে আসে, শুধু তাই খান।

ছোট একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সঙ্গীদের সঙ্গে একপাশে দাঁড়িয়ে এ-সব দেখছিলাম। ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের একজন কাজকর্মের তদারক করছিলেন। এগিয়ে এসে আমাদের একটা বেঞ্চে বসতে অনুরোধ করলেন। বেঞ্চটির একধারে বসে দুটি সাধু খাবার নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। খালি অংশটুকুতে তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করলাম। ক্ষেত্রের লোকটি জানালেন, তাতে কিছু দোষ নেই। কিন্তু, আমরা বসা-মাত্রেই সাধু দুটির মধ্যে একজন বিশেষ বিরক্ত হলেন। তাঁর চোখে-মুখে উগ্রভাবে রুষ্ট-ভাব আত্মপ্রকাশ করলো। অপর সাধুটি সেখানে নিঃসঙ্কোচে বসে রইলেন এবং তাঁর মৃদু নিষেধ সত্ত্বেও এ-সাধুটি অবোধ্য ভাষায় কি বলতে বলতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেলেন।

লজ্জায় আমাদের মন সংকুচিত হয়ে উঠল।

আমরাও তখনি বেঞ্চ ছেড়ে একপাশে এসে দাঁড়ালাম।

সাধুটি আমাদের দিকে তখনও রোষ-নেত্রে তাকিয়ে আছেন। দুর্বাসামুনির কথা মনে হোল। শকুন্তলার প্রতি সেই অকরুণ অভিশাপ—'যার কথা এমনি একান্ত মনে চিন্তা করছিস্‌—সে-ই তোকে দেখে চিনতে পারবে না!'

ভাবি, কলির এই নব-দুর্বাসাও হয়ত অভিশাপ দিচ্ছেন,—'তোরা যেমন আমার পাশে এসে বসলি, তেমনি তোদের পাশেও একাসনে এসে বসবে—অচ্ছুত-অস্পৃশ্যেরা।'

মনে মনে বলি. ঠাকুর, অনেক দিন বনে চলে এসেছ। খবর রাখো না। তারা শুধু একাসনে বসবারই অধিকার পায় নি, এখন দেবতাদের হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার লোভে মন্দিরে এগিয়ে চলেছে। তা চলুক,—ভেদাভেদ যত ঘোচে, ঘুচুক। কিন্তু. হিমালয়ে এসে তুমি পেলে কি? অঙ্গের বসন-ভূষণ বহিরাবরণ সব কিছুই ছেড়েছ, অথচ মনের কোণে মান-অভিমানের মানুষ-স্বভাবটি এখনও তেমনি আঁকড়ে আছ, ক্রোধের ফণা এখনও তেমনি দুলছে! হিমালয়ের শান্তির মাঝে এখনও সেই অ-শান্তি!

॥ ৮ ॥

বিকালে ওপারে চললাম সাধু-সন্দর্শনে।

এ-পারে মানুষের বাসা, ও-পারে সাধুর বাস। এ-পারে পাথরের বাড়ী, কয়েকটি দোকান-ঘর, জানকীবাঈ-এর তৈরি গঙ্গামায়ীর মন্দির। ও-পারে শান্ত তপোবন, সাধুদের ছোট ছোট কুটি, তাঁদের মনোমন্দিরে আরাধ্য দেবতা। এ-

পারে যাত্রী-জীবনের উচ্ছল চঞ্চলতার স্রোত, ও-পারে ধ্যান-গম্ভীর নিস্তরঙ্গ জীবন-জলধি।

মাঝখানে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। তারই উপর পারাপারের সেতু। এ-পারের মানুষের সঙ্গে ও-পারের সাধুর যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে।

এ-পারের মানুষ যায় সাধু-সন্দর্শনে, ও-পারের সাধুরা আসেন ভাণ্ডারার সন্ধানে। এ-পারের সংসার-সন্তপ্ত মন সাধু-সন্তদের কাছে ছোটে শান্তির আশায়, ও-পারের আকাশ-মার্গীরা গৃহীর দুয়ারে এসে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে। যেন জননী জাহ্নবী তাঁর দুই কোলে ভিন্নপ্রকৃতি দুই সন্তান নিয়ে মাতৃ-গৌরবে চলেছেন।

পুলের উপরে এসে দাঁড়ালাম।

পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে হয়। মার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। সেবারও এমনি সাধু-দর্শনে বার হয়েছিলাম। ধর্মশালা থেকে বার হবার আগেই হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছিল। শীতও তেমনি দশগুণ হয়ে দেখা দিল।

মাকে বললাম, এত ঠাণ্ডায় বা'র হবে? মন্দিরে ত দেবতাই দর্শন হয়েছে—আবার সন্ধ্যায় আরতি দেখবে,—সাধু-দর্শন না হয় থাক্-ই।

মা বলেন, সে কি বাবা! তা কি হয়! তীর্থে এসে সাধু-দর্শন করব না? মহাত্মাদের দর্শনে কতো পুণ্যি, কতো তৃপ্তি! বৃষ্টি ত কমে এল, চলো যাওয়া যাক্।

অতএব, যাওয়াই হয়। একে গঙ্গোত্রীর ঠাণ্ডা, তায় বৃষ্টিবাদল। গায়ে বেশ কিছু গরম জামা-কাপড় চাপালাম।

মার ডাণ্ডীওয়ালাগুলি পাহাড়ী হলেও মুড়িসুড়ি দিয়ে ডাণ্ডী নিয়ে চলেছে।

পাণ্ডাজী শ্রীভূমানন্দ বললেন, প্রথমে চলুন এখানকার এক মস্ত সাধুকে দেখাব।

পুল পার হয়ে বাঁদিকে একটু উঠেই তাঁর কুটি।

পাথরের ছোট পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা জমি। তার মাঝখানে একটি ছোট্ট ঘর। পাঁচিলের এক কোণে আরও একটি ছোট ঘর আছে। মাঝখানের ঘরখানির কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে খোলা রোয়াক। একটিমাত্র ছোট দরজা—গঙ্গার দিকে মুখ করা। জানালা নেই।

দরজার সামনে এসে ভিতরে তাকালাম।

যোগাসনে বসে এক অপূর্ব মূর্তি। জটাধারী। স্থূলকায়। তাম্রকান্তি। সারা অঙ্গে কোথাও কোন আবরণ নেই। জ্যোতির্ময় মূর্তি—নিশ্চল নিস্পন্দ। নিষ্পলক নেত্রে যেন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ দেখে মনে হয়, এ যেন জীবন্ত মানুষ নয়,—পাষাণ-মূর্তি। কাশীতে দেখা তৈলঙ্গস্বামীর প্রতি-মূর্তিটি চোখের উপর ভেসে উঠল।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। পাণ্ডাজীর ডাকে চমক ভাঙল। বললেন, মাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলুন।

মাথা অনেকখানি হেঁট করে দরজায় ঢুকতে হয়; কিন্তু, এখানে আপনা হতেই ত মাথা নত হয়ে আসে।

মার সঙ্গে প্রণাম করে মূর্তির পাশে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে পাথরমূর্তি স্পন্দন পেলো। আঁখির তারা ঘুরিয়ে একবার আমাদের তাকিয়ে দেখলেন। প্রশান্ত বদনে মধুর হাসির অস্ফুট-রেখা ফুটে উঠল। ঈষৎ ইঙ্গিত করে আমাদের বসতে বললেন,—হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

মা যুক্তকরে তাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে নিবিষ্টচিত্তে বসে আছেন। দু-নয়নে আনন্দাশ্রুর ধারা। প্রসন্ন পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্তি!

এদিকে সাধুর চোখের দৃষ্টি আবার গঙ্গার ধারার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষণিকের সজ্ঞাগতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আবার, নিষ্পলক আঁখি, নিস্পন্দ দেহ। মনে হয় প্রাণহীন। অথচ, তারি সান্নিধ্য মনে এক অপূর্ব অনুভূতি আনে। বুদ্ধির সীমা-বন্ধ, পরিচিত দেশ-কাল অতিক্রম করে মন কোন্ অসীমতার মাঝে ভেসে যায়। অনাদিকাল যেন একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাঝে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতিস্থ হতে চেষ্টা করি।

মনে পড়ে, পল্ ব্রাণটনের কথা। অরুণাচলের ঋষি মহর্ষি রমণ-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ। দেশ-কাল-পাত্র-পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী—সব কিছুরই প্রয়োজনীয়তা কি করে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল! অথচ, বিদ্বান বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিধর্মী বিদেশী!

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর আর একটি ব্রহ্মচারীও এসে দাঁড়িয়েছেন। গেরুয়া আলখাল্লা পরা। জটাভার চূড়া করে মাথার উপর বাঁধা। মুখে কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয়, অথচ কোমলতাও আছে। প্রৌঢ় হলেও শ্মশ্রু গুম্ফের রেখা নেই।

সাধুটি সম্পূর্ণ মৌনী। ব্রহ্মচারীজী তাই তাঁর কথা ধীরে ধীরে বলছিলেন, একশো বছরের উপর বয়স; সাধারণতঃ এমনি ধ্যানরতই থাকেন। আমি সেবা করি।

প্রণামী দেওয়ার প্রশ্নে ব্রহ্মচারীজী জবাব দিলেন, কিছুকাল আগে এক যাত্রী কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, তা এখনও রয়েছে; তাই নেওয়ার প্রয়োজনও নেই, রীতিও নেই।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে, আবার প্রণাম করে আমরা চলে এলাম। তখনও তিনি তেমনি নিশ্চল, নিস্পন্দ। এমনি করেই তাঁর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বছরের পর বছরও ঘোরে। কি করে থাকেন, কেন থাকেন,—কি ভাবেন, কেনই বা ভাবেন এবং কি-ই বা পেয়েছেন—এসব সমস্যার মীমাংসা হয় না।

মাকে নিয়ে আরও সাধু-দর্শন করে ধর্মশালায় ফিরলাম। স্থানীয় লোকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। সেই সাধুজীটির কথা উঠল।

একজন বললেন, একসময়ে ওঁর মত বড় সাধু দেখা যেতো না। সাধু-সমাজে ও'র শীর্ষস্থান ছিল।

"ছিল" শুনেই মনে চমক লাগল।

বললাম, কেন, উনি কি এখনও বড় একজন মহাত্মা নন্? না, আরও বড় একজন এসেছেন?

উত্তর শুনি, সে-সব অনেক কথা। ঐ বিরাট পুরুষের কাছে ওটা হয়ত একটা ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু সেইটিই এখন মস্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উত্তরদাতাও একজন গেরুয়াধারী হিমালয়বাসী ব্রহ্মচারী। তিনি বলতে থাকেন, উনি একজন মহাপুরুষ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিতিক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধুরা সকলেই এঁকে খুব উঁচু বলেই মানেন। শাস্ত্র-জ্ঞানও গভীর। নিজের চোখেই ত এ'র কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও কিরকম বসে রয়েছেন। এ শীত তো ও'র কাছে কিছুই নয়। আগে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন গোমুখে—বরফের মধ্যে। সেখানেও ঠিক ঐ ভাবে সারা বছর থাকতেন, গায়ে কোনও আবরণ নেই, ধুনির আগুনও নেই। অথচ, বয়সও হয়ে গেছে একশোর উপর। ইদানীং কয়েক বছর আর গোমুখে যান্ না—এখানেই থাকেন। সত্যিই আশ্চর্য ক্ষমতা। একবার পণ্ডিত মালব্যজী ওঁকে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একটা উদ্বোধন ব্যাপারে। কাগজেও সে কথা তখন বার হয়েছিল।

বললাম, হাঁ—এখন মনে পড়ছে বটে,—পড়েছিলাম, হিমালয় থেকে কোন্ এক বড় সাধুকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন, ইনিই তিনি। তারপর শুনুন ব্যাপার। ওঁর জীবনের রাহু হয়েছে ও'র ঐ সেবক-সাধুটি।

আশ্চর্য হলাম। বললাম, কুটির ভিতর আলখাল্লা-পরা যে সন্ন্যাসীটি দাঁড়িয়েছিলেন? কেন, বেশ সুন্দর ত কথা বলছিলেন—শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে দেখলাম। ভালই ত লাগল।

মুচকে হেসে ব্রহ্মচারী বললেন, ঐ ত ব্যাপার! ওটি সন্ন্যাসী নয়,—সন্ন্যাসিনী। এখন ঘটনাটা শুনুন। সাধুজী কয়েক বছর হিমালয় থেকে নেমে নীচে হরিদ্বারের দিকে যেতেন। সেদিকে কিছুকাল কাটিয়ে আবার উপরে চলে আসতেন। এ-পথে মাঝে পাণ্ডাদের একটা গ্রাম আছে, দেখেছেন নিশ্চয়—ধরালীর অপর পারে,—মুখওয়া। প্রতি বছর আসা-যাওয়ার সময় সেই গ্রামের কাছে তিনি রাত কাটাতেন। তখন এই মেয়েটি ছিল খুব ছোট। সাধুকে দেখতে পেলেই তাঁর কাছে ছুটে আসত, সারাক্ষণ তাঁর কাছে কাছে থাকত, ইনি খুব স্নেহ করতেন তাকে। এমনি করে বছরের পর বছর যায়, মেয়েটিও বড় হয়ে ওঠে। তারপর,

তার বিয়েও হোল ; কিন্তু স্বামীর ঘর করা তার ভাগ্যে ছিল না। শেষে গেরুয়া পরল, এই সাধুজীর কাছে সন্ন্যাস নিল, এঁরই কাছে এসে রইল। এঁর কাছে শাস্ত্র-শিক্ষাও করেছে—তখন ইনি মৌনী ছিলেন না, কথা বলতেন। কঠিন সন্ন্যাস-ব্রতও পালন করেছে। কিন্তু, এ-সব হলে হবে কি! এঁর কাছে এসে থাকার পর থেকেই—সাধুজীর সম্পর্কে লোকমহলে কথা উঠল—তাদের মুখ ত কেউ চাপা দিতে পারে না! ফলে, আগে ওখানে যাত্রীর যত ভিড় হোত এখন আর তত হয় না।

গল্প শেষ করে ব্রহ্মচারীজী চুপ করলেন, তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমিও বলি, মশাই, কাজটা ঠিক হয় নি। অত বড় সাধু—অত বিরাট শক্তিশালী পুরুষ ; চিরকাল একা ছিলেন, একাই থাকলে হোত! কি প্রয়োজন ছিল একজন সন্ন্যাসিনীকে কাছে থাকতে দেবার ? আর নিজে থাকেন ত ঐরকম ভাবে! নিজে মহাপুরুষ হতে পারেন, একশো বছরের উপর বয়সও হতে পারে—কিন্তু মেয়েটা ত আর সে ঐশীশক্তি পায় নি!

নির্বাক হয়ে শুনি। মন্তব্য শুনে স্তব্ধ হই। ভাবি, এই দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সাধু-জীবনের ভালমন্দের বিচার-কাঠিও কি একই ? এখানেও মানুষের মনে সেই চির-জাগরূক সন্দেহের কীট, কুৎসা-রটনার অদম্য স্পৃহা!

অতি-বিচিত্র এ বিশাল জগতে এ-ও এক চিরন্তন করুণ সত্য।

হাসি পেলো। বললাম, ব্রহ্মচারীজী, সাধুজীকে অতই শক্তিশালী বিরাট পুরুষ বলে যখন মানলেনই তখন সামান্য একটি মেয়েকে উন্নত করার ক্ষমতাটুকুও তিনি রাখেন, এটুকু স্বীকার করতে ক্ষতি কি ?

ক্ষতি কিছুই নয়। কিন্তু, মানুষ-স্বভাব যাবে কোথায় ?

॥ ৯ ॥

সেদিন সন্ধ্যায় শোনা সে-কাহিনী আজও বেশ মনে আছে। পুলের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচ বছর আগেকার সে-সব কথা ভাবছিলাম।

সামনেই সাধুজীর সেই আশ্রম। প্রায় তেমনি আছে। প্রথমে সেই দিকেই গেলাম। চীরগাছের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে কুটির উপর। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ।

কুটি-র সামনে এসে দাঁড়ালাম।

সেই ঘর, সেই দুয়ার সেই রোয়াক সবই তেমনি আছে। এবার সাধুজী ঘরের মধ্যে নয়, রোয়াকে বসে আছেন। চেহারা প্রায় তেমনি আছে—একটু শীর্ণ। লোলচর্ম বার্ধক্য ঘোষণা করছে। বয়স যে বহু বছর—সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ, তবে কতো তা দেখে বলা সম্ভব নয়। তেমনি গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে আছেন। গঙ্গাই দেখেন, না আর কিছু ?

ভাবি, পাঁচ বছর আগেকার সেই দেখা কি এখনও চলছে ?

এবার, কিন্তু, সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা প্রণাম করতেই আশীর্বাদ করলেন; হাত নেড়ে বসতে ইশারা করলেন।

সেই ব্রহ্মচারিণীও এলেন। হাঁ, মেয়েই বটে। তবে ধরা কঠিন। চেহারার মাঝে, গলার স্বরে অতি সামান্যই ইঙ্গিত আছে।

স্বামীজীর সঙ্গে এবার কথা হতে লাগল। তিনি এখনও মৌনী। তবুও হাত নেড়ে মুখের ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশ করছিলেন। কখনো কখনো ব্রহ্মচারিণীকে ইঙ্গিত করছিলেন, তিনি ওঁর হয়ে বলছিলেন।

আমার সঙ্গীর ও আমার এই দ্বিতীয়বার গঙ্গোত্রী আসা শুনে খুশী হলেন। ঈষৎ হেসে ইশারা করে বললেন, আবার আসতে হবে।

গোমুখ যাবার ইচ্ছা আছে শুনে আরও আনন্দ প্রকাশ করলেন। হাত দিয়ে বোঝালেন, রাস্তা নেই, কঠিন পথ। তবে কোন ভয় নেই; সব সময়েই যেন মনে বিশ্বাস রাখি, ঠিক দর্শন মিলবে। অতি অপরূপ স্থান।

আকাশের দিকে হাত তুলে বোঝালেন, সবই তাঁর রূপ, তাঁরই অপরূপ লীলা।

স্বামীজীর ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন —পুরাণ-কথিত ভাগীরথীর বত পুণ্য-কাহিনী।

স্বামীজীর আশীর্বাদ নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে চলে এলাম। গোমুখ-যাত্রার সংকল্পও সুদৃঢ় হোল।

এরপর সেই স্বামীজীকে আর একবার দেখেছিলাম। সেদিন গোমুখ-অভিমুখে যাত্রা করছি। সকালে। ওপার থেকে রওনা হয়েছি। হঠাৎ দেখলাম, এ-পারে গঙ্গায় স্নান সেরে উলঙ্গ মূর্তি আশ্রম পানে উঠে চলেছেন। তাঁর দুই হাতে দুইটি বাল্‌তি। নিশ্চয় গঙ্গার জল ভরা। বাল্‌তি দুটি অক্লেশে দুই হাতে নিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে চড়াইপথে চলেছেন। সুদীর্ঘ, সরল, সবল দেহ। কে বলবে, একশো বছরের উপর বয়স?

চোখের উপর একটা ছবি ভেসে উঠল।

পুরীর সুনীল সফেন সমুদ্র। তারই বালুকা তীরে একটি নগ্ন শিশু দুই হাতে দুটি খেলার ছোট বাল্‌তি নিয়ে ছুটে চলেছে!

শিশুরই মত সরল, নিষ্পাপ।

সত্য-শিব-সুন্দরের সহজ সোপানই বুঝি বা শিশু মন।

॥ ১০ ॥

সাধুজীর আশ্রম থেকে গেলাম আর এক সাধুর কুটিতে।

তিনি বাইরে পাথরের উপর বসে বই পড়ছিলেন। ইনিও বিবস্ত্র। তবে মৌনী নন্। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ জটাজুট।

সাদরে আমাদের বসতে বললেন।

একটা চীরগাছের গঁুড়ি পড়ে ছিল—সাধুকে প্রণাম করে তারই উপর সকলে বসলাম।

সাধুটি বড় স্নিগ্ধ হাসেন, সুমিষ্ট কথা বলেন।

কুটির দিকে তাকিয়ে দেখেই চিনতে পারলাম! গতবার এখানেও এসেছিলাম। তখন অপর আর একজন সাধু ছিলেন। তিনিও নাগা, তবে মৌনী ছিলেন।

বেশ মনে পড়ে, ঘরের ভিতর মাটির মেঝেতে ধুনি ছিল, তার থেকে এক টুকরো পোড়া কাঠ নিয়ে মাটির উপর লিখে লিখে আলাপ করেছিলেন।

কলিকাতায় ভবানীপুরে থাকি শুনে লিখেছিলেন, সে ত কালীঘাটের খুব কাছে। কালী-মা বড় জাগ্রতা দেবী—বলে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেছিলেন।

অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল। মা সঙ্গে ছিলেন,—তাঁকে দেখিয়ে ইশারায় বলেছিলেন—ইনি আমারও মা।

শুনে মার চোখে জল এসেছিল।

কোন সেবায় আসতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে ঘাড় নেড়ে 'না' বলেছিলেন। তারপরে, অতি সংকোচে একটি ধূপকাঠি বার করে দেখিয়েছিলেন,—ইচ্ছা হয় ত এই দিতে পার।

ধর্মশালায় ফিরে এসে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম।

তাঁর কাছ থেকে চলে আসার আগে মা বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন,—আর কোন কিছু চাই কিনা বলুন, হেসে আরও বলেছিলেন—আমি ত মা আছি।

সাধুটিও হেসেছিলেন—বড় ম্লান হাসি। তারপর, হাত তুলে সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে লিখলেন, যদি ইচ্ছা হয় এবং কোনও রকম অসুবিধা না থাকে তো আসামী এণ্ডির চাদর একটা পাঠাতে পার।

চাওয়া শুনে মার সে কী অপরিসীম আনন্দ।

কলিকাতায় ফিরেই পাঠানো হয়েছিল।

ধর্মশালায় এসে তাঁর চাদর চাওয়ার কারণও বুঝেছিলাম। কয়েক বছর তিনি গোমুখে ছিলেন। শীতকালেও থাকতেন সেই বরফের মাঝে। কিছুকাল আগে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে তাঁকে আনা হয়। শরীর এখনও সুস্থ হয়ে উঠে নি।

কাঠের উপর বসে ঘরের দিকে তাকিয়ে কয় বছর আগেকার সে-সব কথা আজ মনে হচ্ছে।

তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরের বছরই দেহ-রক্ষা করেছেন।

হঠাৎ ঘরটা যেন খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হোল।

ক্ষণিকের পরিচিত, সংসার-ত্যাগী, হিমালয়-বাসী এক নাগা সন্ন্যাসীর মৃত্যু-সংবাদ। তবুও কিসের বেদনায় মন যেন ভারী হয়ে উঠল।

জরা-মৃত্যু তার বিশাল জাল এখানেও বিস্তার করেছে—কোথাও নিস্তার নেই। যেখানেই জীবন—সেখানেই মরণ।

পাথরের উপর বসে স্বামীজী বলছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এই কয় বছর আমি এসেছি। বড় শান্তিময় স্থান। তবে, আমার আসন গঙ্গামায়ীর কিনারায় ঐ পাথরটি।

তাকিয়ে দেখলাম, একটি মসৃণ, সমতল পাথর,—ঠিক ধারার ধারেই।

বললেন, ঐখানে বসি। আপনা হতেই ধ্যান আসে। ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস—সেই তো ভগবদ্ সঙ্গীত। গঙ্গাতীরে বাস—এই তো স্বর্গবাস। গঙ্গার জলে স্নান, গঙ্গাকে অবলোকন, গঙ্গার নাম স্মরণ, গঙ্গার মাহাত্ম্য সংলাপন—অমৃতময় এ জীবন।

হঠাৎ, কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন। ঘর থেকে মুঠো ভরে কি নিয়ে এলেন। গেলেন, এলেন—এও যেন উলঙ্গ শিশুর ঘোরাফেরা।

কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, নাও, প্রসাদ নাও।

চেয়ে দেখি, মুঠো ভরা কিশমিশ বাদাম। একটিমাত্র কিশমিশ তুলে নিলাম, মাথায় ঠেকালাম, মুখে দিলাম।

বললাম, এই যথেষ্ট।

আরও নিতে বলেন। তবুও নিই না। জানি, এই তাঁর একমাত্র আহার্য!

সেবার কথা উল্লেখ করি। গ্রহণ করেন না। হাসেন। বড় স্নেহভরা ব্যবহার।

গোমুখ যাওয়ার কথা তুলি। শুনে খুশি হন। উৎসাহ দেন। বলেন, লোকে ভয় দেখাবে,—কিন্তু মনে বিশ্বাস রেখো—কোন ভয় নেই।

সেই একই অভয় বাণী!

পরম-আত্মীয়ের মত বিদায় দেন, আশীষ জানান।

কঠোর সন্ন্যাসী, অথচ অন্তরে স্নেহের ধারা। যেন, পাষাণ-কারা হিমালয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

॥ ১১ ॥

সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলাম।

একটি নতুন কুটি। ছোট। সাধুও নতুন এসেছেন। ঘরের সামনে বারান্দায় বসে আছেন। ইনি ঠিক নাগা নন্—সামান্য একটা কৌপীন আছে। তবে, মৌনী। যুবা পুরুষ,—মাংস-পেশীগুলী সবল সুন্দর স্বাস্থ্য ঘোষণা করছে। মুখ-চোখের হাবভাব, বসার ভঙ্গী—অনেক কিছুই শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্করের কথা স্মরণ করায়।

আশ্চর্য হলাম যখন তিনি আঙুল দিয়ে ঘরের ভিতর তাঁর আরাধ্য দেবতার মূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন,—সত্যই তো রঘুনাথজীর

মূর্তি। সুন্দর সাদা ধব্‌ধবে পাথরের। দেখেই বললাম, এ তো জয়পুরের।

তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, হাঁ।

এঁর কাছে শ্লেট, পেনসিল আছে। তাতে লিখে তাঁর বক্তব্য জানাচ্ছিলেন।

সারাক্ষণই রঘুনাথজীর সেবায় আছেন। প্রবল বাসনা, তাঁর একটা আলাদা ছোট মন্দির করেন। কাজও শুরু করেছেন—প্রাঙ্গণের একপাশে দেখালেন।

গোমুখ যাওয়ার কথা আবার উঠল। এঁর কাছেও সেই একই উৎসাহের বাণী,—কঠিন পথ, তবুও ভয় নেই, অন্তরে স্থির বিশ্বাস নিয়ে চলে যাও।

সবাই অটল বিশ্বাসের বাঁধ বেঁধে জীবনধারা বহিয়ে চলেছেন।

এঁকে আবাব দেখেছিলাম পরদিন—গোমুখ যাওয়ার পথে।

একমনে মন্দিরেব প্রাচীর তৈরি করছেন। সন্তান-সন্ততির আবাসগৃহ নয়, আরাধ্য-দেবতার মন্দির।

একাই দুই হাতে প্রকান্ড প্রকান্ড পাথব তুলে আনছেন। সর্বাঙ্গের পেশী-গুলি পাথবের ভারে ফুলে উঠেছে। শবীরে যৌবনের দীপ্তি। মুখে কিন্তু শিশুব সরল হাসি। পাথরের উপব পাথর সাজিয়ে একটা দড়িব সাহায্যে দেখছেন, ঠিক সোজা রাখা হোল কিনা। নিপুণ হাতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন।

ভাবি রাজমিস্ত্রী বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন নাকি।

ঢেঁকি স্বর্গে এসেও সত্যিই ধান ভানে।

॥ ১২ ॥

অস্তমুখী সূর্য পশ্চিমদিকের পাহাড়ের অন্তবালে আত্মগোপন করেন। তাঁর বিদায়-বেলার শেষ আশীর্বাদ পাহাড়ের মাথায় সাদা বরফের উপর রক্তচন্দনের তিলক আঁকে।

সঙ্গীরা বলেন, চলুন, এতক্ষণ তো গঙ্গার উপর-দিকে আসা গেল। এবার ফেরা যাক,—গঙ্গার নীচেব দিকে সেই এক সাধুর নতুন আশ্রমের সব বাড়ী দেখা গিয়েছিল ও-পার থেকে—সেখানেও তো যাবো।

অতএব সেখানেও যাই।

পথে এক পাহাড়ী নদীর উপরে ছোট পুল। কেদারশৃঙ্গ হতে কেদার-গঙ্গা নেমে এসেছেন,—বরফ-গলা ঘোলা জল। সগর্জনে পুলের কিছু নীচেই ভাগীরথী গঙ্গায় আত্ম-সমর্পণ করছেন।

পথের বাঁদিকেব পাহাড়গুলির পিছনেই কেদার-শিখর। এই কেদার-গঙ্গা ধরে যেতে পারলে দুই-তিন দিনেই এখান থেকে কেদারনাথে পেঁছানো যায়। যায় বটে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্গম গিরিপথ,—চিরতুষারে

আচ্ছন্ন। বিপদসঙ্কুল হওয়া তো স্বাভাবিকই। কখন কখন সাধু-সন্তরা এ-পথে যাতায়াত করেন,—সেই নগ্ন-পায়ে, নগ্ন-গায়ে।

অত্যাশ্চর্য বোধ হয়।

১৯৪৭ সালে একটি সুইস দলের কয়েকজন গিয়েছিলেন,—অবশ্য অনেক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। একেবারে কেদার-শিখরে উঠেছিলেন—এইদিক দিয়েই। কেদারনাথ থেকে কেদার-শিখরে এখনও কেউ উঠতে পারেন নি।

মাথা উঁচু করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। মাত্র দুদিনের পথ। অথচ, আমাদের সেই কেদারনাথেই যেতে হবে একশো মাইলেরও উপর ঘুরে,—যাত্রী-পথ ধরে! প্রায় দিন দশেক লাগবে।

ভাবি, একবার এসে এ-পথে যাওয়ার চেষ্টা করলে হয়। কেদার-গঙ্গা যেন আকর্ষণ করতে থাকেন।

পুল পার হয়ে একটু এসেই সেই স্বামীজীর নবীন আশ্রম।

একটা বেড়া-ঘেরা এলাকায় কতকগুলি সুন্দর বাড়ী। গেট্ দিয়ে ঢুকতে হয়। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাকচিক্যের ঔজ্জ্বল্য। একটি ঘরের সামনের বারান্দায় অনেকগুলি তামার বাসন সাজানো। কি উজ্জ্বল সেগুলির দীপ্তি! চারিদিকেই গৃহ-শ্রী। লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন। আশ্রমের শান্ত আবহাওয়া নয়, কর্মব্যস্ততার সজীবতা। কয়েকজন লোকজনও ঘুরছে।

স্বামীজী কি কাজের তদারক করছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও হাত তুলে নমস্কার করলাম।

প্রৌঢ় বয়স। সুন্দর স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ-মাথা সবই কামানো। পরনে গেরুয়া লম্বা-আলখাল্লা। দামী ভাল কাপড়ে তৈরি। শুধু বেশভূষাতেই ভদ্র নন, কথাবার্তা, ব্যবহারেও সামাজিক ভদ্রতার পরিচয় দেন। বসবার জন্যে কম্বল পাততে হুকুম করলেন, বললেন, এখানে তো চেয়ার দিতে পারবো না, শুধু কম্বলই আছে। তবে এ আনিয়েছিলাম অনেক দূর দেশ থেকে—কেমন জিনিস দেখুন না'

সত্যই, বেশ ভাল কম্বল—দামী, রঙ্-বেরঙের।

কিন্তু, বসতে ইচ্ছা করে না।

বাইরে আঙিনার দিকে তাকাতেই মনে পড়ল, গতবার মাকে নিয়ে এখানেও এসেছিলাম। ঐ পাথর-বাঁধানো জায়গাটায় ইনি বসেছিলেন। সামনে কতকগুলি যাত্রী। তাদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। নানান্ কথা,—ধর্মের তো বটেই, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গেরই বাদ ছিল না। মাঝে মাঝে ইংরাজী শব্দেরও প্রয়োগ ছিল। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেবারও বসতে বলেছিলেন—বসা হয় নি।

এবার বাড়ীঘর অনেক বেড়েছে। স্বামীজী চা খেতেও অনুরোধ করলেন। বললেন, চা, খাবার, কিছু খান। সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। চা তো হরদমই

চলছে—তৈরি রয়েছে। যাত্রীরা আসে অনেকে। আমার নিজের লোকজনও রয়েছে।

কিন্তু, চা খেতেও মন সরে না। বলি, না, থাক। একটু আগেই খেয়ে বেরিয়েছি। এখন বেলা বেশী নেই—আমরা আরও একটু ঘুরতে চাই। তা ছাড়া, কাল গোমুখ যাবো, ধর্মশালায় ফিরে তারও ব্যবস্থা সব দেখে নিতে হবে।

গোমুখের কথা শুনেই স্বামীজী গম্ভীর হন, বলেন, ও বড় কঠিন পথ। আপনারা যেতে পারবেন না—বৃথা চেষ্টাও করবেন না। তার চেয়ে বরং কাল চলে আসুন এখানে—চা-টা খাবেন। দেশের সব খবর-টবর শোনা যাবে—অনেক গল্প হবে।

ভাবি, তোমারি মুখে এ-কথা সাজে বটে!

মুখে বলি, আচ্ছা—চললাম।

হাত তুলে বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। তিনিও গেট্ পর্যন্ত এগিয়ে দেন। বলেন, আবার আসবেন।

ভদ্রতার প্রতিমূর্তি।

হঠাৎ মনে পড়ে শহরের পাকা ব্যবসায়ীদের কথা,—কি অমায়িক কথার আড়ম্বর!

এতক্ষণ আশ্রমে আশ্রমে ঘোরাব পর এখানে এসে মনের প্রশান্ত-প্রবাহে বাধা পেলো।

গঙ্গোত্রী-বাসী একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম, স্বামীজীর বহু ধনী শিষ্য আছেন বুঝি?

তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, নাঃ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শিষ্য কিছু আছে বটে, কিন্তু অর্থ উনি নিজেই উপার্জন করেন। আজ ক-বছর কাঠের বেশ বড় ব্যবসা করছেন।

ব্যবসা!—শুনে চমকে উঠি। উঠবারই কথা। গঙ্গোত্রীতে ব্যবসায়ী সাধু! ভাবলাম, কোন্‌দিন হয়ত দেখব, বড়বাজারে গেরুয়াধারী জটাজুট সন্ন্যাসী দোকান খুলে বসেছে!

উত্তরদাতা পাশের জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ সব জঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ওঁর জমা নেওয়া। ঐ দেখছেন না, মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে—ও-সব জায়গায় গাছ কাটা হয়েছে। দেওদার, চীর্, পাইন গাছ,—সব দামী কাঠ। তাছাড়া, একচেটিয়া ব্যবসা। এ-সব অঞ্চলে বা গঙ্গোত্রীর পথে যত ঘর-বাড়ী তৈরি হয়—সব কাঠ সাপ্লাই করেন ইনি। এখানে আসার পথে ভৈরব-ঘাটিতে কালীকমলীর ধর্মশালাটি গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়েছিল—এ বছর নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে, দেখেছেন নিশ্চয়,—কাঠ যোগান দিচ্ছেন ইনি। বহু টাকা করেছেন।

মনে পড়ে বটে, আসার পথে ভৈরবঘাটিতে বহু কাঠ সংগ্রহ করা আছে

দেখেছিলাম। তারি উপর বসে দুরন্ত চড়াই উঠার শ্রান্তি দূর করেছিলাম, দ্বিপ্রহরের আহারও করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, জঙ্গল থেকে বিনামূল্যে সব কেটে-আনা কাঠ,—সার্থক জন্ম এ গাছগুলির।

এখন জানি, সে-সবই এঁর ব্যবসার সম্পত্তি!

সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু মন ঘোলাটে হয়ে উঠল।

ঘন-সবুজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি। চারিদিকে বিশাল বনস্পতি। তারি মাঝে মাঝে কাটা-গাছে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

শ্যাম-বনানীর শ্যামল অঙ্গে নখরাঘাতের ক্ষতচিহ্ন।

॥ ১৩ ॥

গঙ্গা-স্নান সেরে তৃপ্ত মনে ফিরছি, হঠাৎ এমন সময় কোথায় যেন পা দিয়ে ফেলেছি,—ব্যবসায়ী সাধুর আশ্রম থেকে বেরিয়ে মনের এমনি সংকুচিত ভাব। এ-মনোভাব কাটাবার উদ্দেশ্যে নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম।

একটি যুবকও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। সারাক্ষণে খুব অল্পই কথা কয়েছেন। এঁকে সকালেও একবার দেখেছিলাম ভাণ্ডারার সময়। সব সাধুদের নেওয়া শেষ হলে সসংকোচে সেই ফোকরের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের আহার্য নিয়েছিলেন। তারপর নদীর ধারে একান্তে গিয়ে বসেছিলেন।

বছর কুড়ির উপর বয়স। সুশ্রী দেখতে। লম্বা দোহারা চেহারা। দাঁড়ি-গোঁফ আছে, কিন্তু এখনও বেশী বড় হবার সময় হয় নি। লুঙ্গির মত একটা ছোট সাদা মোটা কাপড় পরেন—হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে। শুধু পা, খালি গা—তারি উপর একটা সুতির মোটা চাদর জড়ানো। কাঁধের উপর একটা তোয়ালে —মাদ্রাজীদের যেমন প্রায়ই থাকে—সেইটিই শুধু গেরুয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, এইখানেই থাকেন, না, যাত্রায় এসেছেন?

যুবকটি মিষ্টি হেসে ধীরভাবে বললেন, দুটোর কোনটাই নয়—আবার দুটোই খানিকটা ঠিক। এসেছি মাত্র দুদিন। এখানে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে। কালীকমলীক্ষেত্রের একটা কুটি এ-পারে খালি পড়ে আছে সাধুদের থাকবার জন্যে। সেইটে এখন দেখতে এসেছিলাম, দেখেও গেলাম—এখন অনুমতি পেলে সেখানেই থেকে যাব।

কেদার-গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের খুব সন্নিকটেই কুটিটি। আমরাও দূর থেকে দেখেছিলাম। সাধনার অনুকূল স্থান।

তারপর, অতি সংকোচে বললেন, আপনারা কাল সকালেই গোমুখ রওনা হচ্ছেন?

বললাম, হাঁ, কেন—আপনিও যাবেন নাকি? বেশ তো চলুন না একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বললেন, গোমুখ-দর্শনের ইচ্ছা তো আছে,—যেতেও নিশ্চয় হবে। তবে

কালই আপনাদের সঙ্গে যাবো কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শুনেছিলাম, গোমুখের যাত্রী-সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ দল বেঁধে যাত্রীরা এখান থেকে যান। বহু স্থানে পথ নেই, পথ-চিহ্নও নেই। তাই পথ-প্রদর্শকের একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গোত্রীর মত ছোট জায়গায় তারও সংখ্যা খুব কম। সাধু-সন্ন্যাসীরা সেই কারণে যাত্রীদলে যোগ দেন। দেবার আরও একটা কারণ আছে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ দেখে ফিরে আসতে অন্ততঃ তিন দিন লাগে। পথে কোথাও গ্রাম নেই—লোকের বসতিও নেই। তাই আহারাদিও মেলে না। যাত্রীদের প্রয়োজন মত নিজ নিজ আহার্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। দলে থাকলে সাধু-সন্ন্যাসীদেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের কাছেও দুই-একজন যাত্রী সাধু খবর নিয়ে গেছেন, আমরা যাচ্ছি কিনা।

এ-সব জানি বলেই এঁকেও উৎসাহ দিলাম, আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ছেলেটিরও যাবার প্রবল আগ্রহ আছে, অথচ সংকোচও আছে।

কথা বলার মধ্যে সঙ্গীটি মাঝে মাঝে ইংরাজি কথাও বলছিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণ—ভাষাও শুদ্ধ। কৌতূহল হোল।

বললাম, কয়েকটা প্রশ্ন করব—কিছু মনে কোরো না। যদি বাধা থাকে উত্তর দিও না—আমিও কিছু মনে করব না।

হাসিমুখে বললে, বলুন না, সব কিছুরই জবাব দেবো। আপনি বুঝি এই দু'বার এলেন এখানে? আমার কিন্তু এই প্রথম,—হিমালয় দেখাও প্রথম। বলুন, কি বলছেন।

আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলি, সে-ও নিঃসংকোচে উত্তর দেয়।

রাজপুত। রাজপুত্রের মত চেহারাও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ছিল—পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ। আইন-কলেজে আইনও পড়ছিল। সে-কলেজে আমিও কিছুকাল পড়িয়েছি। তবে এ আমার ছাত্র নয়,—হতে পারত। স্নেহ-সূত্র যেন দৃঢ় হয়ে উঠে।

কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কয়েকজনের নাম করল,—সবাইকে চিনি।

কথা বলতে বলতে ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ফেলে-আসা জীবনের কয়েকটি স্মৃতি-রেখা,—যেন পুরানো চিঠি পড়ার আস্বাদ।

বাড়ীর কথাও বললে। স্বচ্ছল সংসার। কিন্তু সংসার তাকে কোনদিন বাঁধতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ ছিল,—কিন্তু সে আকর্ষণও তাকে টেনে রাখতে পারে নি।

বলতে বলতে তার কণ্ঠ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল,—বললে, আজ এক বছর আগে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ঘুরেছি অনেক, শাস্ত্রগুলি পড়ছি, এখন হিমালয়ে এসেছি—নিভৃতে একান্তে বসব।
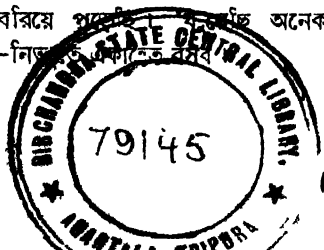
মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, ওষ্ঠাধরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অন্তরে অটল বিশ্বাস।

সন্ন্যাসী রাজপুত্র! মনে মনে প্রণাম করলাম।

ধর্মশালার কাছে চলে এসেছি। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, কালকের যাত্রার কথা। ভাবলাম অপরিচয়ের বাঁধন টুটল। কাল পথে যেতে যেতে দেখব তার মনের গোপন গতি। কেন সে এতো পেয়েও সব ছেড়ে এল? কি সে চায়?

কিন্তু তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। গোমুখ-যাত্রার সময় তার খোঁজ করেছিলাম, শুনলাম, আমাদের কিছু আগেই দুজন সাধু গেছেন—হয়ত তাঁদের সঙ্গে গেছে, পথেই দেখা হবে। কিন্তু, পরে জানলাম, তাঁদের সঙ্গেও সে যায় নি।

না যাওয়ার কারণও অনুমান করলাম। এ যাত্রা-পথে অপরের কাছে কোন কিছু সাহায্য নেওয়ার সঙ্কোচ বোধ করি সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

আরও এক কারণ হয়ত আছে। সেদিনের সেই স্বল্প-আলাপনের অন্তরে প্রীতির সৌরভ ছিল।

তাই, সম্ভবতঃ তার সন্ন্যাসী-মন স্নেহের সামান্য স্পর্শে মায়া-ভ্রমে ভীরু বিহঙ্গমের মত পালিয়েছে।

অথচ, প্রেম মাত্রেই তো মায়া নয়।

তার ক্ষণিকের পরিচয় আমার মনে আনন্দের দীপ জ্বেলে দিল। সেই ব্যাপারী সাধুর অসাধু-সঙ্গের আঁধার ঘোচাল।

॥ ১৪ ॥

আমাদের গোমুখ-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত।

বিরাট কিছুই নয়;—যা কিছুর একান্ত প্রয়োজন, তারই আয়োজন। শুধু, খাওয়া-পরা-শোওয়ার ব্যবস্থা—কিন্তু, তাই কি কম?

সঙ্গের কুলি দুটি নেপালী। হৃষীকেশ থেকেই সঙ্গে আছে। তাদের সঙ্গে এবার আমার অদ্ভুত ব্যবস্থা। চল্লিশ দিন হিমালয়ে কাটাবো। যেখানে খুশী যাবো, যতদিন খুশী থাকবো। হৃষীকেশ থেকে দু'মাইল গিয়েও থেকে যেতে পারি, আবার হিমালয়ের কোন অজানা হিমশিখরেও এক মাস কাটাতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, সব ভেবেচিন্তে বলো—এই চল্লিশ দিনের জন্যে কত নেবে,—খাওয়া-দাওয়া সব তোমাদের, সে-সব ঝঞ্ঝাট আমি বইতে পারবো না।

তারা অনেক ভেবে বলে, বাবুজি, তাহলে এক-একজনকে একশ' কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। দেখুন, জিনিসপত্রের দাম—

আমি কথার মাঝে ছেদ টানি। বলি, কারণ দেখানোর দরকার নেই। বেশ, ঐ টাকাই পাবে। ভালভাবে কাজ করো ত বখশিশও পাবে।

তারা খুশী হয়ে কাজে লাগে।

কাজ শুধু মোট বওয়া। কিন্তু, সব সময়ে সব কিছু কাজে এগিয়ে আসে

সাহায্য করতে—স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে।

আশ্চর্য তাদের শারীরিক শক্তি। এক মণ ভারী বোঝা পিঠের উপর নিয়ে স্বচ্ছন্দে চড়াই উঠে এসেছে।

তাদের পথ-চলার একটা ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। দেখতেও আনন্দ।

সেবা তাদের শুধু কর্তব্যই নয়—ধর্ম। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরকে পরম সেবা করার এরা জীবন্ত উদাহরণ।

এদের বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হয় নি। কেউ ঠকেছে বলে শুনিও নি। মানুষ যে অবিশ্বাসী হতে পারে—এইটেই এদের কাছে অবিশ্বাস্য।

এরা অতি দীন-দরিদ্র। তবুও আত্মমর্যাদার মান জানে। তাই, দারিদ্র্যও এদের গৌরব—দীন হলেও হীন নয়। নদীর জলে স্নানের কালে, ঝরণার ধারে বা গাছের ছায়ায় রাঁধার সময় এদের সাজ দেখেছি। উলঙ্গই বললে চলে, একটি কৌপীনমাত্র সার। এরাও হিমালয়ের এক শ্রেণীর যথার্থ সাধু।

হাত জোড় করে পায়ের কাছে দুজনে এসে বসল। কি যেন বলতে চায়, অথচ এদের সংকোচ জাগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে ?

আস্তে আস্তে বলে, বাবুজি, এ তিন দিন আমাদেব খাওয়া-দাওয়া কি হবে ? গোমুখ তো আমরা কখনও যাই নি। শুনছি—ওদিকে গ্রাম বা দোকান নেই - কোন খাবার মেলে না।

বললাম, এই ব্যাপার! এর জন্যে ভাবনা ? এ কদিন গঙ্গোত্রী এসেও তো তোদের খাওয়ার কথা ভাবতে হয় নি—যদিও খাবার ব্যবস্থা তোদের নিজেদেরই করার কথা,—মনে আছে তো ?

দুজনেই হাসে, কপালে হাত ঠেকায়। বলে, জি বাবুজি।

বললাম, তবে ও-কথা ভাবছিস কেন ? যদি আমাদের খাবার মেলে, তোদেরও নিশ্চয় মিলবে। আর যদি আমরা খেতে না পাই, তোরাও পাবি না।

ওরা আবার হাত তুলে নমস্কার করতে থাকে। বলে, এ ঠিক আছে, বাবুজি।

কিন্তু, এদিকে মালের বোঝা ভারী হয়ে গেছে—যে কজন দলে আছে, সবারই খাবার নিতে। উপায়ই বা কি ?

ভরসা এইটুকু, ফেরবার পথে এ-সব আহার্যের বোঝার ভার লাঘব হয়ে অন্যত্র ভার বাড়াবে!

কুলিদের গোমুখের শীতে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই ধর্মশালা থেকে কয়খানা কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিড়িও নেওয়া হয়েছে তাদের জন্যে। শীতের মধ্যে একটু মৌতাত পায়, পথ-চলার ক্লান্তিও হরণ করে, শুনি। হবেও বা।

শুধু বলি, বাপু, রাত্রে যদি একঘরে শুয়ে থাকিস—ওটা খাস নে। ওর গন্ধ সইতে পারি না—ভাল সিগারেটের গন্ধে কষ্ট কম। কিন্তু, তা পাচ্ছিস কোথায়!

সব কথা বোঝে কিনা বুঝি না।

শুধু দেখি, গভীর কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়, জোড়হাতে নমস্কার করতে থাকে।

সকালে সকলে একসঙ্গে রওনা হলাম।

বহুদিন ধরে শুনে এসেছি,—গোমুখের পথ—দারুণ দুর্গম। সাধু-সন্ন্যাসীরা যায়,—নইলে যাত্রীদের মধ্যে খুব কমই যেতে সাহস পায়। আমরা সাধুও নই, সন্ন্যাসীও নই; অসীম সাহসের অধিকারীও নই। তবুও যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। দুর্গমতার কাহিনী, কেন জানি না, মনে ভয় জাগায় না, আকর্ষণই করে।

মনে পড়ে, যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ—

কিন্তু তখনি মনে হয়, ঠিক তাই বা কই? এ-তো বিনাশের কথা নয়। যেন ঈপ্সিত-প্রাপ্তির আশার আলো,—প্রিয়-মিলনের মধুর অভিসার।

তাই, মনে ভয়ের ছায়া নেই, আশা-আনন্দের দীপ্তি রয়েছে।

কিন্তু ফুলেব কাঁটার মত এই আনন্দেও ব্যথা অনুভব করি।

মা-র বড় ইচ্ছা ছিল আসবার। আনি নি,—কেন না, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙেছে। এ-পথে ডান্ডী চলে না, তাই তাঁর পক্ষে সব পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব।

তিনি এলে খুশী হতেন, তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন,—জানি বলেই মনে ব্যথা জাগে।

তাই, যাত্রা-মুখে তাঁকে স্মরণ করি, প্রণাম করি আর বলি, আমার এ-চোখ দুটি তোমারি দেওয়া, এ-চোখে তুমি দেখো। আমার দেখার সব আনন্দ, সব তৃপ্তি, সব পুণ্য তোমারি হোক। তোমারি তৃপ্তিতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি।

মনে মনে মাকে প্রণাম করি, মন্দিরে গঙ্গাদেবীর মূর্তি মায়েরই মূর্তিকে স্মরণ করায়।

হঠাৎ, তাকিয়ে দেখি, ওপারে সেই মহাত্মা সাধু গঙ্গাস্নান সেরে চলেছেন।

আশার আলো আরও প্রোজ্জ্বল হয়। মনে হয়, প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ হেরিনু দিন যাবে মোর ভালো।

পুল পার হয়ে গঙ্গার অপর পারে এলাম।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথ নেই। যতদূর সম্ভব, গঙ্গার ধারা ধরে যেতে হবে। সাধারণতঃ গঙ্গোত্রীর অপর পার দিয়েই যেতে হয়। যদি কোন বছর সে-পার দিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠে, তখন এ-পার দিয়ে যাতায়াতের চেষ্টা হয়। কিন্তু, এ-পারের পাহাড়গুলি অনেক জায়গায় একেবারে জলের ভেতর থেকে উঠেছে—তাই চলাচল আরও কঠিন।

এ বছর আমাদের আগে আরও একটি দল অপর পার ধরেই গিয়েছিলেন, তাই আমরাও সেই পথই ধরেছি।

সাধুদের আশ্রমগুলি ছাড়িয়ে এলাম। এ-টুকু জানা পথ, পথও আছে।

গঙ্গার অপর পারে কিছু দূরে গঙ্গোত্রীর মন্দির, ঘরবাড়ী—এমন কি লোক-

চলাচলও দেখা যাচ্ছে।

এইবার দাঁড়িয়ে দলের হিসাব নেওয়া গেল।

॥ ১৫ ॥

কলিকাতা থেকে এসেছি আমরা তিনজন।

হৃষীকেশ থেকে পেলাম দুই কুলি।

রান্নার ও কাজকর্ম দেখার জন্যে সঙ্গে এসেছে উত্তরকাশীর একটি ছেলে। ভরত সিং—ওরফে ভর্তু। কর্মিৎ-কর্মা, চালাক-চতুর; সম্পূর্ণ বিশ্বাসী—সেটা এই হিমালয়েরই অবদান। আমাদের খুচরা জিনিসপত্রের থলিটি সে পিঠে বয়—ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, বাইনোকুলারও। ধর্মশালায় পৌঁছুবার দুই-এক মাইল আগে ত্বরিত-গতিতে চলে যায়, জায়গা দেখে ঘর বেছে পরিষ্কার করে রাখে; কখনো কখনো রান্নাও চাঁড়িয়ে দেয়। মনে স্ফূর্তি রাখে, কাজে আনন্দ পায়। চমৎকার ছেলে।

পাণ্ডার ছেলেও চলেছে। সে-ও ছোকরা, তবে যাত্রীর কাছে পাণ্ডার যে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে—সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। কেবল এসে খোঁজ নেয়, আর কি সেবায় লাগতে পারি, বাবুজি? বেশ ভাল করে আর একবার চা তৈরি করিয়ে আনি?

চা তো নয়। তার এক অপরূপ স্বাদ। অনেকখানি দুধ, অনেকখানি চিনি—তবেই হোল ভাল চা। আর 'বেশ ভাল' অর্থে হোল—তাতে লবঙ্গ-দারুচিনি সিদ্ধ, এলাচের গুঁড়ো দেওয়া। হাসিমুখে বলে, বাবুজি, এ 'এস্পেসাল্' চা আছে—'বহুৎ বড়িয়া'!

অদ্ভুত লাগলেও, খারাপ নয়। খেয়ে শরীর গরম বোধ হয়।

সে-ও চলেছে সঙ্গে। গোমুখ-পথে তারও এই প্রথম যাত্রা।

গঙ্গোত্রী-বাসী এক সাধুও চলেছেন। নাগাও নন, মৌনীও নন। গেরুয়া বাস; একটা মোটা কম্বলও নিয়েছেন। কথাবার্তায় ভালই বোধ হয়।

শুনলাম, আরও দুজন সাধু এগিয়ে গেছেন। পথে দেখা হবে।

সকলেই এ-পথের নবীন যাত্রী। শুধু পথ-প্রদর্শকটিরই পরিচিত পথ। গঙ্গোত্রীর লোক। চেহারা দেখেই চমকে উঠলাম। বেঁটে-খাটো ছোট্ট মানুষ। রোগা লিকলিক করছে। পরনে জুতো, পায়জামা, গায়ে ওভার-কোটের তলায় ওয়েস্ট-কোট। প্রৌঢ় বয়স। মুখে হাসি নেই—স্ফূর্তিরও কোন লক্ষণ নেই। অথচ, নাম শুনলাম শ্যামসুন্দর। তার চেহারা দেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাপু, পারবে তো যেতে?

শুনে বোধ করি অপমান বোধ করলে। বললে, বহুবার গেছি ওখানে। এ-বছরেও তো এই কদিন আগে যে-দল গেল—তার সঙ্গে ছিলাম। শরীরে আমি কম তাগদ রাখি! আপনাদের ঐ লম্বাচওড়া কুলিদের চেয়ে ঢের বেশী।

তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে। নিজের পিঠের উপর তার নিজেরই কম্বলের ছোট্ট বোঝাটি সোজা করে নেয়।

তারপর গম্ভীর মুখে বলে, চলুন বাবু, দেরি করবেন না। সামনে অনেক পথ, ভারি চড়াই—সন্ধ্যার আগে ডেরায় পৌঁছুতে হবে।

উত্তরে বলি, বাপু, তোমার সঙ্গে তো আমরা তাল রেখে চলতে পারব না। তুমি জোয়ান আদমী। আমরা ধীরে ধীরে চলব—যেমন যাচ্ছি। পৌঁছুতে না পারি—পথের ধারেই পড়ে থাকব। যদি বাঘ-ভালুক আসে, খেয়েই ফেলবে। যাত্রীকে সেবা করা যদি পুণ্য হয়, যাত্রীকে উদরে পুরে সেবা করলে নিশ্চয় আরও পুণ্য হবে।

নিজের প্রশংসাটুকু বুঝে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে।

এরই আর এক রূপ দেখেছি তার কিছু পরেই।

একটা বড় চড়াই ওঠা হয়েছে। সবাই ক্লান্ত, সে-ও শ্রান্ত। হবারই কথা।

দেখি, কুলিদের বোঝার উপর তার নিজের কম্বলের ছোট্ট বোঝাটিও চাপিয়ে দিচ্ছে। কুলীরা আপত্তি করছে, করার যথেষ্ট কারণও আছে। তাদের নিজেদের বোঝা বেশ ভারী, তবুও তাই নিয়ে তারা ধীরে ধীরে চলেছে। তার উপর আরও ভার চাপলে—তা সে যত সামান্যই হোক—তাদের বিরক্ত হবারই কথা।

তারা রুষ্ট হয়ে আপত্তি জানায়, বলে, বাবুজিদের কাজ করতে এসেছি—তোমার মোট বইব কেন?

লোকটি বাস্তবিকই ক্লান্ত হয়েছে। অনুনয়ের সুরে কুলিদের বলে, ছোট্ট বোঝা, এইটুকু নিয়ে নাও ভাই।

কুলিরা ছাড়ে না, ছোট্ট বোঝা তা তুমি নিজেই বও না!

আমি তার অসহায় অবস্থা দেখে কুলিদের নিতে বলি। তারা নেয়ও। নেবার সময় হাসতে হাসতে তাকে বলে, এবার চলে এসো, তুমি নিজেও এসে পিঠে বসে পড়ো! শরীরে খুব তাগদ্ রাখো, নয়!

তার শক্তিমত্তার দম্ভকে ব্যঙ্গ করে।

॥ ১৬ ॥

পথেরও স্রষ্টা আছে। তা সে মানুষই হোক্, কি পশুই হোক্। বার বার একই স্থান দিয়ে চলাচলের ফলে পায়ের তলায় পথ জেগে ওঠে। আর মানুষ যদি হাতে তৈরি করে তো কথাই নেই।

এখানে দুটোর কোনটাই খাটে না। রাস্তা-তৈরির প্রশ্ন ওঠে না, কেন না, সারা বছরে এত কম লোকই যায় যে সেই কয়জনের সুবিধার জন্যে এত অর্থব্যয় করবে কে ও কেন?

তাছাড়া, অর্থ-ব্যয়ও যদি হয়, প্রকৃতির প্রকোপে পথ থাকতে পারে না। পাহাড় ধ্বসে পড়ে, জলের ধারা নামে, বরফে ঢাকা পড়ে, বরফ গললে পাহাড়ের

আকৃতিরও পরিবর্তন হয়। মানব-সৃষ্ট ভঙ্গুর পথের এত আঘাত সইবার শক্তি নেই।

লোক-চলাচলেও পথ-সৃষ্টির আশা নেই। সামান্য কয়েকজনের চকিত চরণ-পাতে পথের চিহ্ন জাগে না। আর, সে চিহ্ন পড়বেই বা কোথায়? নদীর ধারে বালির উপর, অথবা মনের ভিতর মাটির ওপরে চরণ-রেখা আঁকা সম্ভব বটে, কিন্তু এখানে যে প্রায়ই পাথর। মানুষ তো দেবতা নয় যে পাষাণের বুকেও চরণ-চিহ্ন ফুটে উঠবে।

অনেকদিন আগেকার কথা মনে জাগে।

চিত্রকূট বেড়াতে গেছি। রামায়ণের সেই স্মৃতি-ভরা চিত্রকূট। বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যে সব ঘুরে ফিরে দেখছি। রামায়ণের কত কাহিনী আবার নতুন করে শুনছি। এখানে এই হয়েছিল, ওখানে ঐ ঘটেছিল। এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটি সমতল পাথর;—কে যেন ধরণীর দেহ পাথরে বেঁধে দিয়েছে। তারই উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের কাহিনী শুনছি।

এইখানেই 'ভরত-মিলাপ' হয়েছিল—রামচন্দ্রজির সঙ্গে ভরতের মিলন। সীতাদেবী ছিলেন, লক্ষ্মণ ছিলেন, আরও সব কে কে। বনের পশু-পক্ষীরাও এই মধুর মিলন দেখতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিরহবিধুর দুই ভাই-এর মিলন—উভয়ে আলিঙ্গন করে স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন;—'ভেটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো।' এই করুণ দৃশ্য দেখে সবারই চোখে ধারা বয়েছিল। পাষাণও দ্রবীভূত হয়েছিল। তাই পাষাণের বুকেও সবারই পদচিহ্ন পড়েছিল।

চিত্রকূটবাসী একজন দেখাচ্ছিলেন,—এই দেখুন, এইটে রামচন্দ্রজির, এইটে ভরতের,—এই এদিকে সীতাদেবীর; এই দেখুন সব পাখীর পায়ের ছাপ, এই এখানে সব বনের পশুর।

শুনছি আর দেখছি। আশ্চর্য লাগে, পাথরের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নগুলি। মানুষের তৈরি নয়, দেখলেই বোঝা যায়। কোন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণে পাথরের উপর বিচিত্র এই সব রেখা। কোন-কোনটি মানুষের পায়ের ছাপের মতই লাগে, কোনটি বা পশু-পক্ষীর মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞের মত নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত এর কোন কারণ নির্দেশ করবেন। তা করুন, বাধা নেই।

তবে, সেই অপূর্ব আবেষ্টনীর মাঝে এই বিচিত্র রেখাগুলির সাহায্যে কারও কল্পনা-বিলাসী বিশ্বাসী মন যদি রামায়ণের সেই করুণ কাহিনীর আলেখ্য এঁকে ক্ষণিক তৃপ্তি পায়, তাতেই বা ক্ষতি কি!

সেই এক দেখেছিলাম, পাথরের বুকে সব পদ-চিহ্ন!

এখানে গোমুখের পথে সেই দেবতাদের চরণ-চিহ্নও নেই, মানুষের পায়ের ছাপও নেই।

তবে, পায়ের চিহ্ন না থাকলেও হাতের চিহ্ন রেখে যাবার প্রয়াস আছে। মাঝে

মাঝে পূর্বগামী যাত্রীরা পাথরের উপর ছোট ছোট কয়েকটি পাথর বসিয়ে বা সাজিয়ে রেখে যান্—দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাতের স্পর্শ। পরের যাত্রীরা তাই দেখে অনেক সময় চলেন।

এ যাত্রা-পথে এই একমাত্র সামান্য পথ-নির্দেশ।

॥ ১৭ ॥

সেই পথেই চলেছি আমরা।

কখন গঙ্গার ধারার খুব কাছ দিয়ে, কখন বা পাড়ের কিছু উপর দিয়ে। দুই কূলেই গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণী। ও-পারের পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। যেন তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণ। তাম্র-কান্তি দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে তুষার-শুভ্র উত্তরীয়। তুষার-নিঃসৃত নির্ঝরিণীগুলি যেন বুকের উপর যজ্ঞোপবীত।

এ-পারের পাহাড়ের চূড়া মাথা তুলেও দেখা যায় না।

হঠাৎ সামনে দেখি বিশাল পাথরের স্তূপ গতি-পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জলের ভিতর থেকে সোজা উঠেছে পাহাড়ের মাথার দিকে। সে-সব পাথর বেয়ে ওঠার ক্ষমতা আমাদের নেই। গাইড্-এর শরণাপন্ন হই। দিক্-ভ্রম হয়নি তো?

জিজ্ঞাসা করি, যাবো কোন্ দিক দিয়ে?

ইতিমধ্যে সে একটা পাথরের একটু উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা পা বেঁকিয়ে পাথরের উপর রেখেছে, কোমরে একটা হাত, অপর হাত দিয়ে দেখাচ্ছে—ঐ। ঐ ধার দিয়ে যেতে হবে, উঠে আসুন এই পাথরটার পাশ দিয়ে সাবধানে।

কলোম্বাসের আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস!

পাথরের পাশ দিয়ে গিয়ে একটু উঠেই দেখলাম—প্রকৃতির অনিভব পথ-সৃষ্টি। দুইটি বিশাল পাথর, মাঝখানে সামান্য ফাঁক আছে, একটু উপরে মাথায় মাথায় স্পর্শ করেছে। এইভাবে একটি সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। সুড়ঙ্গটি ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে গেছে। এদিক থেকে তাকালে উপরে অপর দিকে সুড়ঙ্গের আর একটি মুখ দেখা যায়। ভিতরে নানান্ আকারের ছোট-বড় পাথর—তার উপর চীর্‌গাছের কয়েকটি শুক্‌নো গুঁড়ি পড়ে আছে। সেই পাথর ও গাছের উপর দিয়ে যেতে হবে। এ-মুখে যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছি তার চার-পাঁচ হাত দূরেই গঙ্গার প্রবল প্রবাহ। পাথরে গতিরোধ হওয়ায় উচ্ছলিত তরঙ্গে জলকণার ফোয়ারা সৃষ্টি করছে। আমাদের মুখে চোখে তার সজল স্পর্শ সানন্দে অনুভব করছি। মকর-বাহিনী যেন তাঁর বাহনের পুচ্ছ-তাড়নায় হিমালয়কে সরিয়েই দিতে চান।

তবুও, এই উগ্রমূর্তির পাশে সুড়ঙ্গের পথটুকু বিচিত্র হলেও ভয়াবহ নয়। পদস্খলনের আশঙ্কা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে গঙ্গাপ্রাপ্তির পুণ্যলাভের আশা নেই। পড়লে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যেই তিন-চার হাত নীচে পড়তে হবে,—তাতে

হাত-পা ভাঙার হয়ত সম্ভাবনা—তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাও হয় না।

এক সঙ্গীর ডাকে তাকিয়ে দেখি, সুড়ঙ্গের ঠিক পাশেই একটি প্রকাণ্ড গুহা। গুহার ভিতর শেষ দিকে পাহাড়ের গায়ে বেদীর মত একটি উঁচু পাথর। তারই উপর পা ঝুলিয়ে সঙ্গীটি বসেছেন—যেন অজন্তার গুহার মাঝে বুদ্ধ-মূর্তি। সেখান থেকে গঙ্গার ধারা অতি সুন্দর দেখায়। গুহার ভিতরটিও পরিস্কার। মনে হয়, কোন সাধুর সাধনার স্থান ছিল।

সুড়ঙ্গ-পথ পার হয়ে আবার পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। গঙ্গার ধারেই একটি ছোট জঙ্গল। সবই দেওদার গাছ—মাঝে মাঝে ভূর্জপত্র। নানান্ রঙের পাখী ঘুরছে।

জঙ্গল পার হয়েই এক বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পৌঁছুলাম। চারিদিকে কেবলি নানান্ আকারের গোলাকৃতি পাথর। যেন পাহাড়ের মাথার উপর থেকে শুধু গোল পাথরের এক বিপুল স্রোত নেমে এসে গঙ্গায় গিয়ে পড়ছিল, এমনি সময়ে কার যেন শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পাথরগুলির অপূর্ব বর্ণ-বিন্যাস। সাদা গোলাপী অথবা হলুদ রঙের বড় বড় গোল পাথর—সারা অঙ্গে কালো কালো বিন্দু। কে যেন কলমের কালি ছিটিয়ে দিয়েছে।

একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হচ্ছে। এমনি করেই এই প্রস্তর-প্রান্তর উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল হয়ত মসৃণ পাথরের উপর পা পড়লেই পিছলিয়ে যাবে,—কিন্তু, তা কোথাও যায় নি। দ্বিতীয় আশংকা, দেহের ভার পেলেই নিশ্চল পাথর হয়ত সজাগ হয়ে হেসে উঠবে—গতির বেগে হয়ত পদচ্যুতি ঘটবে। সে-রকম দুরন্ত পাথরের সঙ্গে মাঝে মাঝে পরিচয় ঘটছে, তাই স্বচ্ছন্দে চলার ছন্দঃপতনও হচ্ছে। সতর্ক গতিতে পাথরের ভারসাম্য বিচার করে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু, অল্প সময়েই দেখি, পাথরগুলির সঙ্গেও যেন নিবিড় পরিচয় হয়ে যায়, দেখলেই চেনা যায়—কার উপর নির্ভয়ে দেহ-ভার দিয়ে বিশ্বাস করতে পারব।

গাইড্ বলে, বাবুজি, গোমুখের পথের প্রধান বৈচিত্র্য হোল এই সব পাথর. কেদার-বদরীর পথে এমন নেই—কেবলি লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে যেতে হবে। এরকম অনেক জায়গাতেই পাবেন।

সঙ্গী একজন বলেন, তাতে ক্ষতিও নেই, ভয়ও নেই। বরং, বেশ ভালই তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছে—লাফিয়ে চলায় স্পীড্ বাড়ছে।

হেসে বলি, লাফিয়ে চলার অভ্যাসটি যাবে কোথায় ?

সবাই সানন্দে এগিয়ে চলি। কিন্তু, কোন্ দিকে যাচ্ছি বা যেতে হবে বুঝি না। কিছু নীচেই গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে। শুধু বুঝি, ঐ গঙ্গারই উৎস-মুখে চলেছি। কিন্তু নদীর গতি-পথ সরল রেখায় তো চলে না। উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর প্রাচীর ভেদ করে পথ খুঁজে-খুঁজে পার্বত্য নদী উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। চলেছি হয়ত উত্তর মুখে, গাইড দেখায় পূর্বদিকে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া,

বলে, বাবুজি, ঐ ! ঐ পাহাড়ের পিছন দিয়ে আমরা যাবো।

মনে পড়ে, গঙ্গাসাগর যাবার কথা। স্টীমারে গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছি হয়ত দক্ষিণ মুখে। সারেঙ্ দেখায় পশ্চিম দিকের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বলে, ও-ধার দিয়ে স্টীমার আসছে—নদী গেছে ঐ দিক্ দিয়ে ঘুরে।

আবার মনে পড়ে, উড়ে চলেছি প্লেনে আকাশ-পথে। নীচে তাকিয়ে দেখতে থাকি, বড় বড় নদীর গতি-পথ—সবুজ পৃথিবীর বুকে বালুকাময় স্বর্ণ-রেখা—সর্পিল ভঙ্গীতে এঁকেবেঁকে চলেছে।

নদীর বিচিত্র গতি।

চারিদিকে অচল হিমাচলের ধ্যান-স্তিমিত মূর্তি, তারি মাঝে সচল নদীর উচ্ছল জলোচ্ছ্বাস।

দেবাদিদেব মহাদেবের শিরশীর্ষের জটাজালে এই-ই বুঝি বা গঙ্গাবতরণ !

গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি পড়ে। ধারার কিছু উপরেই সামান্য সমতলক্ষেত্র। তারি একধারে ছোট একটি গুহা। গুহার বাইরে ছোট ছোট কয়েকটি সাজানো পাথর মানুষের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

গাইড বলে, এক বড় সাধুর আশ্রম ছিল। একাই সাধনা করতেন ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে কদাচিৎ কখনো কেউ কেউ এসে দর্শন করতেন। মহাপুরুষ ছিলেন। আজ কিছুকাল হোল দেহরক্ষা করেছেন।

এখন, শূন্য আশ্রম ভাঙা মন্দিরের মত পড়ে আছে।

এই নিভৃত-বাসের মধ্যে তিনি কি পেয়েছিলেন, কি দিয়ে গেছেন, তার সন্ধান কে দেবে, তাই ভাবি।

॥ ১৮ ॥

ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে চলেছি। পূর্বগামী যাত্রীদের রেখে-যাওয়া সাজানো ছোট ছোট পাথরগুলির উপর দৃষ্টি আছে। গাইডের ডাকে চমক লাগে। তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের উপর দিকে সে উঠে গেছে অনেকখানি।

আমরা গঙ্গার তীরের দিকে নেমে চলেছি। দুদিকেই সাজানো পাথরের পথ-নির্দেশ।

গাইড্ বলে, উপর দিক দিয়েই যেতে হবে—নীচের পথে পুরানো চিহ্ন—ওদিকে এখন পথ নেই।

অতএব, উপর দিকেই উঠতে হয়।

পাহাড়ে ওঠার স্বাভাবিক কষ্ট তো আছেই। ক্লান্তি বোধ হয় আরো এই ভেবে যে শেষ পর্যন্ত গঙ্গার ধারে তো নামতেই হবে, তবে কেন এই অকারণ আরোহণ। কিন্তু, পাহাড়-পথে চলার এই-ই তো রীতি। তাই সন্তর্পণে অতি ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। উপর থেকে নদীর ধারা-পথ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর দেখাতে থাকে।

সঙ্গের কুলি দু'টি দলের সঙ্গে নেই দেখে চিন্তিত হই। কোন সময়ে যূথভ্রষ্ট হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। শিস্ দিয়ে গাইড ইশারা করে—পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি ওঠে—তবুও তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সবঙ্মালপত্র তাদের কাছে। সে-সব হারাবার কিছুমাত্র আশংকা নেই। কিন্তু, তারা পথ হারালে তাদের বিপদ আছে, ভাবি। বিরাট পাহাড়গুলির মাঝে নগণ্য দু'টি মানব-শিশু। খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, তাই চেষ্টাও বৃথা। অগত্যা, তাদের পথ-চেনার সহজ বিচার-বুদ্ধির উপব ভরসা রেখে আমরা এগিয়ে চলি।

পাথর ডিঙিয়ে চলা আপাততঃ শেষ হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে চলেছি। সামনেই বিরাট ধ্বস নেমে গেছে বহু নীচে নদী পর্যন্ত। পাহাড়েব গায়ে পা রাখার মত স্থানও নেই, তাই এগোবারও উপায় নেই। গাইড্ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারি ভুল পথে চলে এসেছি। নদীর দিকেই নেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, এখন এখান থেকে বহু নীচে নদীর দিকে তাকাতে মাথা ঘোরে. সোজা নামতে পারব কিনা সন্দেহ জাগে।

অথথা এতখানি পাহাড়ে ওঠাব সময়ও লেগেছে, শ্রান্তিও হয়েছে। গাইড্-এর উপর রাগ ও বিরক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, আশ্চর্য, সে মনোভাব আসে না। সকলেই সানন্দে সব কিছু মেনে নিই। কারো উপব দোষারোপ করি না। ভাবি, এ-যেন স্ব-কৃতকর্মের ফল। এই পথিক-জীবনে এমনি বিপর্যয় যেন স্বাভাবিক পর্যায়। এতে চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ হলে এখানকার শান্তিময় জীবনধারায় অশান্তির সৃষ্টি করবে। অন্তরে বিশ্বাস রাখি, যে মহান্ আকর্ষণ এখানে এনেছে, সে-ই ঠিক গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সকলেই হাসিমুখে প্রকৃতির বিরাট শক্তিকে উপলব্ধি করি, তারি মাঝে পথের কাণ্ডারীর সন্ধান করি।

বহু নীচে গঙ্গাব কিনাবায় বিক্ষিপ্ত নিশ্চল পাথরগুলির মধ্যে ছোট্ট দু'টি সচল জীবের ইঙ্গিত পাই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখি। আমাদের কুলি দু'টি! এ-পথে নতুন হলেও তারা ঠিকই গেছে। এখন আমরা ভুল-পথে আট্‌কে গেছি দেখে তারা বোঝা ফেলে ছুটে এগিয়ে আসছে আমাদের সাহায্য করতে।

কি করে যে তারা পাহাড়ে উঠে আমাদের কাছে চলে এল বিস্ময় লাগে। উঠবার পথ নেই, পা রাখবার স্থান নেই। হাতে ভর দিযে কোথায় পা রেখে দেখতে দেখতে উঠে এল। মুখে অভয় বাণী। বলে, বাবুজি, হাত ধরুন, নেমে আসুন, কোন ভয় নেই।

সত্যিই মনে কোনও ভয় রাখি না। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে তাদের হাত ধরি। দেখতে দেখতে নীচে নেমেও আসি।

গঙ্গার ধারে পাথরের উপর ক্ষণিক বিশ্রাম করে আবার পথচলা শুরু হয়।

নদীর তীরে বড় বড় পাথর। তারই উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এসে ক্লান্ত হলেও আবার পাশের পাহাড়ে ওঠা আরম্ভ হোল।

একটু উঠেই জঙ্গল। চারিদিকে শুধু ভূর্জপত্রের গাছ। বার্চ ট্রি (Birch Tree) মাটি থেকে একটু উঠেই ডালপালা বিস্তার করেছে। আঁকাবাঁকা শাখা। সবুজপাতার মাঝে সাদা সাদা ডালগুলি, গাছের গুঁড়িগুলিও সাদা। চারিদিকে সাদা রঙের দীপ্তি ছড়িয়েছে। গাছের ছাল টেনে তুললেই পাক খেয়ে খুলে আসে। মসৃণ কাগজের মত। যত টেনে তোলা যায় পাকের পর পাক খোলে। ডালের ক্ষত অঙ্গ রক্তাভ হয়ে উঠে। টেনে তোলা ছালের রঙ্ও রাঙা হয়ে আসে। গাছের একটা নিচু ডালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে একজন সাথী সেই ভূর্জপত্রের উপর ফাউন্টেন-পেন্ দিয়ে চিঠি লেখেন।

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর দিকে ভূর্জপত্রে লেখার প্রচলন এখনও কিছু কিছু আছে। জিনিসপত্র জড়িয়ে নেবার কাজেও এর ব্যবহার প্রচুর। আমাদের দেশে যেমন কলা বা শাল পাতায় খাওয়ার প্রথা আছে, এখানে ভূর্জপত্রেরও তেমনি ব্যবহার হয়।

ভূর্জপত্র! নাম শুনেই যেন কোন্ প্রাচীন যুগে মন চলে যায়।

তারই বিচিত্র বনানীর প্রান্তে বসে আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার।

গঙ্গার তীর থেকে অনেকখানি উঠে এসেছি। তাই জলের অভাব। গাইড বলে, কোন ভাবনা নেই, কাছেই ঝরণা আছে, পাত্র দিন—জল আনছি।

পাত্র নিয়ে একটা কুলির সঙ্গে গেল, কিন্তু ফিরতে আধ ঘণ্টার উপর দেরি হোল। বলে, ঝরণায় জল নেই, সব বরফ হয়ে আছে, বরফ ভেঙে গলিয়ে আনতে দেরি হোল।

আহার্য,—সঙ্গে-আনা রুটি, আলুসিদ্ধ ও চুরমা। চুরমা—ঝর্ঝরে মোহন-ভোগের মত, সুজির বদলে আটার তৈরি। একবার তৈরি করলে তিন চার দিন রেখে খাওয়া যায়—নষ্ট হয় না।

যা কিছু খাবার ছিল সকলে একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হোল। কুলিদের বেশী করে দিই, বলি, তোমরা ভার বইছ তাই ভাগ বেশী পাবে।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। বিশ্রামে সুখ থাকলেও, সামনে পথ পড়ে থাকলে সে বিশ্রামে স্বস্তি নেই। তাই, আবার যাত্রা শুরু করি। খাওয়ার পর পথ-চলায় শরীর ভারী বোধ হয়। কিন্তু একটু চলার পর গতির ছন্দ আবার ফিরে আসে। দুপুরের রৌদ্রের উত্তাপ তেমন বোধ হয় না। হিম-শীতল বাতাসে বরং শীতই লাগে। বিকালে রাত্রিবাসের আবাসে এলাম।

ধর্মশালা। পাথরের একতলা বাড়ী। খানচারেক ছোট ছোট ঘর। মেঝেতেও পাথর বসানো—অসমতল। শুধু কম্বল বিছিয়ে শোওয়া বিশেষ কষ্টকর। নীচে থেকে ঠাণ্ডা তো ওঠেই, পাথরও বিঁধতে থাকে— শরশয্যার কথা স্মরণ করায়।

কুলিরা পাশের একটা ঘর থেকে লম্বা কয়টা তক্তা নিয়ে আসে, সারি সারি পেতে দেয়। বলে, এর উপর কম্বল বিছিয়ে শুলে কষ্ট নেই।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়। কাল গোমুখ দর্শন করে এখানে ফিরে আবার রাত্রিবাস হবে। তাই মালপত্র এখানেই সব পড়ে থাকবে।

লোকজন এখানে কেউ থাকে না, চৌকিদারও নয়।

জায়গার নাম চীরবাসা (১১,৮৩০ ফুট)। মানে হয়ত চীরবনের মধ্যে বাস। কিন্তু বনও প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন চারিদিকেই কঠিন কঠোর পাহাড়, মাথায় সব বরফের চূড়া, তার থেকে এক একটা বরফের ধারা নেমে গঙ্গার কাছে চলে এসেছে। খানিকটা বরফের উপর হেঁটে ধর্মশালায় পৌঁছুতে হয়।

ধর্মশালার সামনেই গঙ্গা। ক্ষীণকায়া, কলোচ্ছলা। তুষার-শীতল জলধারা।

গঙ্গার পরপারে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তারই তুষারশীর্ষ থেকে বিপুল এক জলধারা সহস্র ধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চারিদিকে যত নির্ঝরিণী সবই জাহ্নবী-জলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ছুটেছে।

রাত্রে গায়ের জামা কাপড় মোজা পরেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড শীত।

সঙ্গী সাধুটি মৃদুকণ্ঠে গঙ্গা-স্তব গান করছেন।

'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারি চরণ-চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥'

সেই মধুর সুরের মূর্ছনায় চোখে ঘুমের আবেশ আসে। সারারাত আধ-ঘুমঘোরে কেটে যায়।

॥ ১৯ ॥

অতি ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে সবাই তৈরি হয়েছি। রাত্রের রাখা রুটি একটা করে চায়ের সঙ্গে খাওয়া হোল।

গতকাল গঙ্গোত্রী থেকে মাইল বারো এসেছি, শুনলাম। মাপা মাইল নয়। অনুমান মাত্র। সরল পথের মাপে হয়ত বারো মাইল হতে পারে, কিন্তু এখানে যেন মনে হয় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেও পথ শেষ হতে চায় না। আজও তেমুনি মাপে ছয় মাইল মাত্র পথ; যেতে আসতে বারো মাইল। কিন্তু সারাদিন লাগবে এ পথ অতিক্রম করে ঘুরে আসতে।

এই চীরবাসায় ফিরে এসে আবার রাত্রিবাস। কাল এখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যেই গঙ্গোত্রী পৌঁছানো যাবে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ আসা-যাওয়ার পথে এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থল। সঙ্গে তাঁবু আনলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'গঙ্গামায়ি কি জয়'—ধ্বনি তুলে যাত্রা শুরু হোল।

কখনও গঙ্গার ধারার পাশ দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের কিছু উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। পথ নেই। পা রাখার স্থানও কোথাও বা অতি সংকীর্ণ। কুলিদের বা পাণ্ডার ছেলের হাত ধরে সে-সব স্থান অতিক্রম করি। বিপদ ঘটলে তারা যে হাতটুকু ধরে আটকে রাখতে পারবে এমন নয়। তবুও হাতের এই

সামান্য ভরটুকু দিয়ে সাহসের সেতু বাঁধা হয়। শরীরও ভারসাম্য ফিরে পায়। কিন্তু, ভয় যে সম্পূর্ণ মনের বিকার তা বুঝতে পারি চলার সঙ্গে। চলতে চলতে মনে সাহস জাগে, আত্মনির্ভরতা আসে, হাসিমুখে নির্ভয়ে সংকটময় পথও একাই ক্রমে পার হয়ে এগিয়ে যাই।

গঙ্গার ধারে বালির উপর সব পায়ের চিহ্ন। গাইড্ ও কুলিরা দেখেই বলে—ভালুকের পায়ের ছাপ। শুনি, এ অঞ্চলে বড় বড় ভালুক আছে। সামনাসামনি দেখাও যায়। ভাবি, দেখা হলে মন্দ নয়। কিন্তু দেখা পাই না।

ফেরার পথে, গঙ্গার অপর পারে বড় একদল হরিণ দেখা গিয়েছিল। ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড। একটার মাথায় বিরাট্ শিঙ। দল বেঁধে চরছিল। আমরা এ-পারে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরাও অপর পারে দাঁড়িয়ে মুখে তুলে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। আমরাও চলি, তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। তারপর, হঠাৎ থেমে গিয়ে যেন বিদায় জানিয়ে, পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ধীরে ধীরে গঙ্গার উৎসমুখে সবাই এগিয়ে চলেছি।

মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিগত-বিষয়-তৃষ্ণ।

জগৎ সংসার সব ছেড়ে কোথায় যেন আর এক রাজ্যে চলে এসেছি। স্নেহ-মায়া, ভয়-ভাবনা—কোথায় যেন বিলীন হয়েছে। চারিদিকে প্রকৃতির অপার শান্তির মাঝে নিজেকে যেন নিঃশেষ করে দিয়েছি।

পাহাড়ের মাথায় সব বরফ। বরফ গলে কেবলি ঝরণা নেমে এসেছে। কিছু নীচেই গঙ্গার ধারার সঙ্গে মিশছে। ঝরণার বুকে বড় বড় পাথর। সেই সব পাথরের উপর পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে জলের ধারা পার হচ্ছি। ক্ষীণকায়া ধারাগুলি পার হতে অসুবিধা নেই।

গাইড জানায়, বাবুজি, ফেরবার পথে এইসব জায়গাতেই বিপদ। এখন সকালে বরফ গলতে শুরু করে নি। রৌদ্রের তেজ বাড়লেই দ্রুত গলতে থাকবে, ঝরণার জল বাড়বে, ধারা দশগুণ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে নামবে। তখন পার হওয়াই দুষ্কর। জলের ভিতর বড় বড় গোল পাথর গড়িয়ে ফেলে, তারি উপর পা রেখে কোনও রকমে পার হওয়া যায় তো ফেরা—নয়ত, এই সব ঝরণারই ধারে রাত কাটিয়ে আবার ভোরে ফিরতে হয়। দিনের শেষভাগে এসব নদী পার হওয়া অসম্ভব।

ভাবি, মিথ্যা এখন ওসব চিন্তা। অসম্ভব হয়-ই যদি, রাত্রিবাসও করা যাবে! এখন শুধু অভিমন্যুর ব্যূহভেদ হলেও ক্ষতি কি?

হঠাৎ সামনে পড়ে অপরূপ রূপ!

ঝরণার আশপাশে জল জমে আছে। তারই উপর কাঁচের মত পাতলা বরফ জমেছে। সামান্য স্পর্শেই ভেঙ্গে যায়, জল টলমল করে ওঠে। তার কাছেই পাথরগুলির উপর বরফের আচ্ছাদন। পাথরের নীচে বরফ গলে ধারা বয়ে

চলেছে ; উপরের পাথর থেকে বরফের সরু সরু ফালি বটগাছের ঝুরির মত নেমেছে। টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা জল মুক্তার মত তা থেকে পড়ছে। আর, সেই বরফের ঝুরিগুলির উপর সকালের রৌদ্র পড়ে রামধনুর সাতরঙা ছটা ছড়িয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। কি বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস!

চীর্‌বাসা থেকে মাইল তিনেক এসে ভূর্জবৃক্ষও শেষ হয়ে আসে। জায়গার নাম ভূজবাসা (১২,৪৪০ ফুট)। শুনি, নিকটে এক গুহা আছে। প্রয়োজনে আশ্রয় মেলে।

সকাল থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা চলেছি। এখনও ছয় মাইল পথের শেষ হয় নি। অথচ, পথে বিশ্রামও বিশেষ করি নি, ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছি।

গাইড্‌ বলে, এইবার পৌঁছে গেছি, পাহাড়ের ঐ বাঁকটা ঘুরলেই দর্শন মিলবে।

গঙ্গার দুই কূলের গিরিশ্রেণী কিছু দূরে সরে গেছে। নদীর উপত্যকা প্রসারিত হয়েছে। এ-পারের পাহাড় থেকে ও-পারের পাহাড় প্রায় মাইলখানেক দূর হবে। তারি মধ্যে সাগর-সৈকতের মত বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর দিয়ে গঙ্গার ধারা নেমে আসছে। সুমুখে উপত্যকার গতিপথ রোধ করে এক বিরাট গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। তারই দুইটি বরফ-ঢাকা চূড়া সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। 'ভাগীরথী' শিখর। উপত্যকাও তুষারাবৃত। পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট 'গ্লেসিয়ার' নেমে এসেছে। সেই হিম-প্রবাহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাইড্‌ জানালো, ওরই কাছে গঙ্গার উৎস-মুখ—গোমুখ। বরফের মধ্যে প্রকাণ্ড বরফেরই কয়েকটি গুহা। তারই ভিতর থেকে বরফ গলে গঙ্গা নদীর রূপ ধরে বা'র হয়ে আসছেন—'হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল তরঙ্গে'।

জলের কিনারা দিয়ে পাথর ধরে ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর সেই বরফের গুহার মুখে পৌঁছুলাম। সাগরবক্ষ হতে ১৩৭৭০ ফুট। এর পর সবই তুষার-আচ্ছন্ন। এইখানেই প্রথম নদীআকারে ভাগীরথীর আবির্ভাব।

ম্যাপ খুলে চারিদিকের তুষার-শিখরগুলির নামের সঙ্গে পরিচয় করি।

ভৃগুপন্থ, মেরুপর্বত, শিবলিঙ্গ, কীর্তিস্তম্ভ, ভাগীরথী পর্বত, শতপন্থ, কালিন্দী, চতুরঙ্গী, বাসুকিপর্বত, নীলাম্বর, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, সুদর্শন,—অপূর্ব সব নামকরণ। কে করে এসব নাম দিল, তাই ভাবি।

শুভ্র জটাজুট যোগমগ্ন সব যোগীশ্বর। দেবতাত্মা হিমালয়ে যুগ-যুগান্তরের শাশ্বতবাণীর নির্বাক প্রতিমূর্তি।

গোমুখ !

নামকরণের কারণ খুঁজি। গাভীর মুখ,— হয়ত কবি-চিত্তের কল্পনার কথা। তবু মনে হয়, সামনের দুইটি বরফের চূড়ার সঙ্গে গরুর শিঙ-এর সাদৃশ্য এবং বরফের বিরাট গুহাটি মুখ-বিবর মাত্র। আবার মনে হয়, গো অর্থে পৃথিবীও তো হয়। পৃথিবীর এই তুষার-বিবরই তো এ নদীর উৎস-মুখ—তা-ই বুঝি বা গো-মুখ।

বরফের প্রকাণ্ড গুহা। তিন-চারশ ফুট উঁচু, শতখানেক ফুট চওড়া। ভিতরে অন্ধকার। সেই গোপন অন্ধকারের ভিতর থেকে তরল-তরঙ্গে জল বয়ে আসছে। গুহার মুখে বরফের চাঙর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, জলের স্রোতে বরফ ভেসে ভেসে চলেছে। বরফ-গলা জল,—নিদারুণ শীতল। জলের রঙ ঘোলাটে। গঙ্গার গৈরিকবাসের পূর্বাভাস।

গঙ্গার জলে স্নান করলাম।

সঙ্গে আনা মেজদাদার অস্থি বিসর্জন দিলাম।

জাহ্নবীধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে থাকি। স্রোতের আবর্তে চিতা-ভস্ম ও অস্থি-খণ্ড নিমেষে কোথায় অন্তর্ধান করে।

ঠিক এক বছর আগেকার কথা। সেদিন এমনি হিমালয়-পথে ঘুরতে ঘুরতে বদরীনারায়ণে এসে পেঁাচেছি। পেঁাছানোমাত্র পাণ্ডাজি এসে ডাকের চিঠি হাতে দিলেন।

মেজদাদার লেখা। কাশ্মীরে তখন তিনি বন্দী।

লিখেছেন, এ চিঠি যখন তোমার কাছে পেঁাছুবে ততদিন তুমি হয়ত বদরি-কাশ্রমে পেঁাচেছ। হিমালয়ের বিরাট ও অপরূপ সৌন্দর্য তুমি নিশ্চয় উপভোগ করছ। এখানে আমিও ঐ মহান হিমালয়েরই আর এক অংশে আছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও আছে। শুধু প্রভেদ এই, তুমি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর আমার ঘোরাফেরার হুকুম নেই, স্থানও নেই,—চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, এবার তোমাদের সঙ্গে কেদার-বদরী ঘুরে আসি। কিন্তু, তা ভাগ্যে ছিল না। আগামী বছর ভাগ্য আরও প্রসন্ন হবেন, আশা করি।

এ চিঠি পাবার দশ দিন পরে কলিকাতায় ফিরে আসি। তার দুই সপ্তাহ পরেই তিনিও ফিরলেন—চির-মুক্তি পেয়ে। কাশ্মীর সরকার কাশ্মীরী শালে আচ্ছাদন করে তাঁর মরদেহ ফেরত পাঠালেন!

সেদিনই শ্মশানে তাঁর চিতার পাশে বসে সংকল্প করলাম, তাঁর চিতা-ভস্ম ও অস্থি-চূর্ণ নিয়ে আগামী বছর গোমুখে ও বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মকপালে বিসর্জন দিয়ে আসব।

আজ বৎসরান্তে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হোল।

তাকিয়ে দেখি, গঙ্গার প্রবল প্রবাহে যেন সেই প্রদীপ্ত চিতাবহ্নিরই লেলিহান্ শিখা। আজ বুঝি বা জননী জাহ্নবীর শান্ত-স্নিগ্ধ স্পর্শে নির্বাপিত হোল।

'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।'

*   *   *

জলধারার ধারেই এক শীতল শিলাখণ্ডের উপর আসন নিয়েছি। সামনে গোমুখ-গুহা।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিশ্চল। যোগমগ্ন হিমাচল। তুষারকান্তি জ্যোতির্ময়।

তারি মাঝে জাহ্নবীর জন্ম-কাকলী। সুরধুনীর সুরধ্বনি।

ভাগীরথীর মর্ত্যে অবতরণ।

স্থির হয়ে বসি। 'দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে' অমর মাহাত্ম্য হৃদয়ে উপলব্ধি করি।

চোখের উপর ভেসে ওঠে এই শীর্ণকায়া পর্বত-নির্ঝরিণীর মহীয়সী মহিমা—বিশাল বিস্তৃতি। অঙ্কুরের মাঝে মহীরুহের ইঙ্গিত।

গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে মন ভেসে চলে। ছল্‌ছল্ কল্‌কল্। পাহাড়-পর্বত ভেদ করে ছুটে চলে। যত বাধা, তত বেগ উচ্ছল উদ্দাম। চারিদিকের গিরি-দেবতা ঝরণার জলের অঞ্জলি দেয়।

জল বাড়ে, স্রোত বয়। পারাবার-বিহারিণী জাহ্নবী ছুটে চলে।

দেবাদিদেব মহাদেবের জটা বেয়ে স্বর্গের নির্ঝরিণী সব কলোচ্ছ্বাসে নেমে আসে। মন্দাকিনী, সরস্বতী, গৌরী, নন্দা, অলকানন্দার সহিত মিলিত হয়ে ছুটে আসে, ভাগীরথীতে নিঃশেষে বিলীন হয়।

মিলনের পুণ্যতীর্থে সঙ্গমে সঙ্গমে প্রয়াগের প্রতিষ্ঠা। পাহাড়ের মাঝেও গঙ্গার উভয়তীরে মানুষের বসতি জাগে। মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার রোল ওঠে। গঙ্গার আবাহন জানায়,—পতিতপাবনি সুরধুনী গঙ্গে!

জাহ্নবী ছুটে চলে। পর্বত-কারায় অবরুদ্ধা প্রমত্তা নদী মুক্তির সন্ধানে বেগে ধেয়ে চলে। গিরিদ্বার ভেদ করে হরিদ্বারে কল্যাণী জননী নেমে আসেন। শ্রান্তি-হরা, শান্তি-ভরা, ভীষ্ম-জননী।

ভরা নদী বয়ে চলে। তীরে তীরে কত নগরী, কত তীর্থ গড়ে ওঠে। দুকূলের ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে।

অন্ন-দায়িনী শান্তি-প্রদায়িনী ভাগীরথী।

কলকল্লোলিনী জাহ্নবী তবু ছুটে চলে। বিশাল বিস্তৃতি—সুগভীর জলরাশি। নৌকা চলে, জাহাজ ভাসে। সভ্যতার পণ্য আসে। যন্ত্র-দানবের বিরাট সৌধ জাগে।

সুধাপ্লাবিতা মকরবাহিনী তবুও ছুটে চলে।

জলস্রোতে বিগত বছরের কয়দিনের কাহিনী স্মৃতি-পথে ভেসে আসে।

গঙ্গাসাগর অভিমুখে চলেছি। এই ভাগীরথীরই আর এক রূপ। উচ্ছলা চঞ্চলা পার্বত্য নির্ঝরিণী নয়—সুবিস্তীর্ণ বারিরাশি। প্রশান্ত বিস্তার। দুই তীরে অভ্রভেদী গিরি-প্রহরী নয়,—সুদূরে দিকচক্রবালে তরুরাজির ঘনসবুজ রেখা। দিগন্ত-প্রসারিণী প্রবাহিনী! সাগর-সঙ্গমে ছুটে চলেছে।

সঙ্গমে মন্দির। তীর্থযাত্রার সমারোহ। লোকমুখে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন। ভগীরথের কীর্তি, জহ্নুমুনির উপাখ্যান, সাগর-রাজের কাহিনী—কত পুণ্যস্মৃতি-ভরা জাহ্নবী!

মহাসমুদ্র ঊর্মিমালার মুকুট মাথায় হিমালয়ের দুহিতাকে সাদর আহ্বান জানায়। সহস্র তরঙ্গে আলিঙ্গন করে। ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ সাগর-জলে বিলীন হয়। মিলনের কল্লোল-কলরব শব্দব্রহ্মের ধ্বনি তোলে।

মহাদ্রি-শিখর হতে মহাসাগর,—বিরাট হতে বিশাল। ধ্যানমগ্ন স্তব্ধ হিমাচলে উৎপত্তি, চিরজাগ্রত উদ্বেল মহাসমুদ্রে বিলুপ্তি।

বিপুল বিস্ময়ে দেখি, সাগরের বারিকণা মেঘাকারে আকাশপথে আবার ছুটে আসে। হিমগিরির হিমশিখরে তুষার জমে। গিরি-কন্দরে প্রাণের স্পন্দন জাগে, শিবসুন্দর জটা-শীর্ষে গঙ্গার প্রচণ্ড ধারা বহন করেন, ভগীরথ শঙ্খনাদে আবাহন জানান। গঙ্গার চিরন্তন মঙ্গলময় যাত্রা আবার চক্রবৎ শুরু হয়।

গোমুখ-বিবর-নিঃসৃতা জাহ্নবীর ছলছল উচ্ছল বাণী ওঠে; নির্ঝরিণীর সেই কলধ্বনির মাঝে মহাসাগরের মহাকল্লোল প্রতিধ্বনিত হয়।

গোমুখ-কল্লোল মাঝে শুনি আমি সাগর-সঙ্গীত।

কালিন্দী খাল

॥ ১ ॥

গঙ্গার চিরন্তনী যাত্রার মঙ্গল কল্লোলধ্বনি অবিরল কানে বাজে। চঞ্চল চরণ আবার টেনে আনে জননী জাহ্নবীর উৎস-পথে। প্রবাসী পুত্র যেন মায়ের ঘরে ফেরে।

১৯৬৩ সাল। জুলাই মাস। চার বছর আগেও ঘুরে গেছি উত্তরকাশী থেকে। গিয়েছিলাম ডোরিতালে। দেখি, মাত্র এই কয় বছরের ব্যবধানে হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলেও কালের প্রভাবে কতো বিপুল পরিবর্তন। ঘটনাচক্রের আবর্তনে শান্ত উত্তরকাশীর জীবন অস্থির। যেন, নিরালা গ্রামের স্তব্ধ জলাশয়ে দুরন্ত ছেলেদের উদ্দাম আলোড়ন। উত্তরকাশী এখন নতুন এক সীমান্ত জেলার প্রধান শহর। কর্মমুখর। সাধু-সন্ন্যাসীর নিভৃত সাধনক্ষেত্র লুপ্তপ্রায়। দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের মধ্যেও বিদেশী শত্রু হানা দেয়। তাই, সেনাবাসেরও আয়োজন চলে। বাস, ট্রাক, জীপ-এর রাজপথ হিমালয়ের গোপন অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। যেমন, বদরীনাথের পথে যোশীমঠেও।

এখন গঙ্গোত্রী যাওয়ার অনুমতিপত্র চাই। পারমিটের প্রত্যাশায় পুলিসের দপ্তরে দরখাস্ত পেশ করি। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সার বেঁধে দাঁড়াই। বিধি-নিষেধের ব্যূহ ভেদ করে হিমালয়ের পথে আবার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিচরণের আগ্রহে মন উদ্‌গ্রীব হয়।

উত্তরকাশী ছাড়িয়ে বাস চলে আসে ভাটোয়াবী পর্যন্ত। সেখানেও ভাগ্যক্রমে জীপ মেলে। আরও এগিয়ে গাংনানী পৌঁছে যাই। গঙ্গোত্রী আর মাত্র দু দিনের হাঁটাপথ। ধীরে-সুস্থে আসি তিন দিনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

॥ ২ ॥

আশ্চর্য মানুষের মন! আশা মিটলেও মন ভরে না। আবার নতুন আশা অন্তরে বাসা বাঁধে। হিমাচলের নিভৃততর অদেখা অঞ্চল হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। উৎসাহের মুখে গোমুখের দুর্গমতা—সহজ সরল মনে হয়। যেমন, ভেসে চলে যায় পাহাড়ী নদীর উদ্দাম স্রোতে বিরাট শিলারাশিও। কৌতূহলী মন আবার নিয়ে আসে গোমুখের পথে। এবারের গন্তব্য, গোমুখও ছাড়িয়ে। হিমগিরির আরও সুদুর্গম গোপনপুরে। তুষার রাজ্যে। হিমবাহের উপর পথশূন্য পথ ধরে। গোমুখের গুহা থেকে তুষার-বিগলিত গঙ্গার নদীরূপে প্রথম প্রকাশ। কিন্তু তারও ঊর্ধ্বে তুষারশিখরাবলীর হিমপ্রদেশে নদীর প্রস্রবণ। জননীর বাল্যলীলাভূমি। সে রাজ্যই বা কেমন? শুধুই কি চিরতুষার ক্ষেত্র? জননীর করুণধারার ক্ষীণ জলরেখাও কি নেই? দেবাদিদেবের শুভ্র জটাজালের অন্তরালে ভাগীরথী সেখানে কি প্রকৃতই অবলুপ্ত?

গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরীর প্রসিদ্ধ মন্দির। গাড়োয়ালের তিন বিভিন্ন অঞ্চলে। মন্দিরগুলির উত্তরে কিন্তু একই বিশাল তুষার-রাজ্য। সেখানে

আকাশচুম্বী শিখরশ্রেণীর বিরাট সমাবেশ। যেন, ধ্যান-গম্ভীর অতিপ্রাচীন মহাযোগীগণের জ্যোতির্ময় মহামণ্ডল। আঠারো হাজার থেকে তেইশ-চব্বিশ হাজার ফুট উঁচু গিরিশিখর,—সংখ্যায় একশতেরও অধিক। দিকে দিকে নেমে আসে হিমবাহের ধারা। তুষার-প্রদেশ ছেড়ে এসে নদীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। নদীতে নদীতে মিলন ঘটে। বেগময়ী পার্বত্যধারা দীর্ঘপথের যাত্রা শুরু করে সাগর উদ্দেশে।

চৌখাম্বা বা বদরীনাথ শিখরের পশ্চিম ঢাল বেয়ে নামে প্রধান হিমবাহ—গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার। তারই সঙ্গে মেশে অন্যান্য শাখা হিমবাহ। গোমুখে গঙ্গোত্রী হিমবাহের পরিশেষ। তুষারগলা নদীরূপে ভাগীরথীর প্রকাশ। এই ভাগীরথী-তীরে গঙ্গোত্রীর মন্দির।

তুষারময় সেই রাজ্যের ও চৌখাম্বার অপর দিকে—অর্থাৎ পূর্বভাগেও তেমনি সারি সারি হিমবাহ। সেদিকেও বরফ গলে ধারা নামে। নদীর জন্ম হয়,—
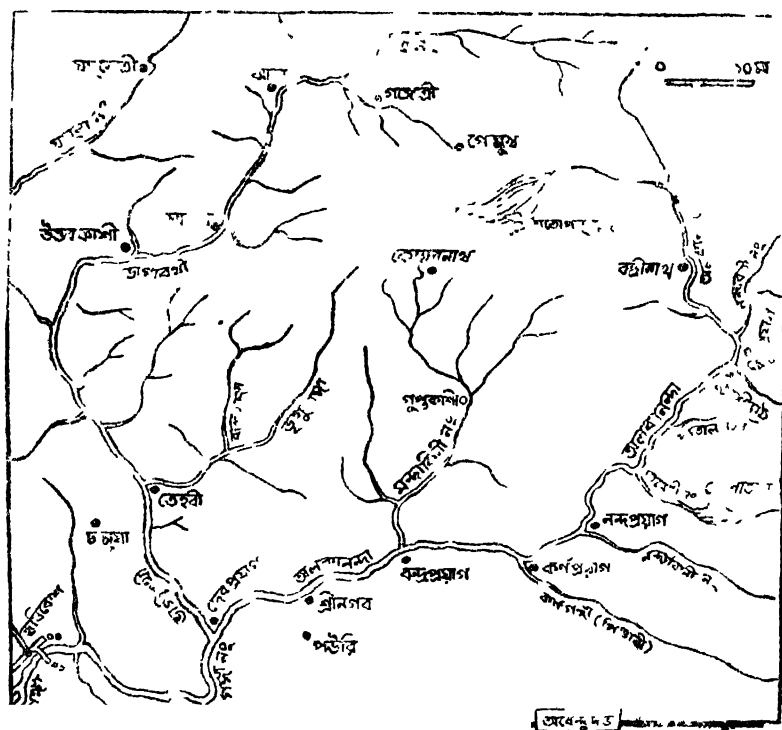
সরস্বতী, অর্বা, বিষ্ণুগঙ্গা প্রভৃতি। এদেরই জলভার নিয়ে বইতে থাকেন-অলকানন্দা। তারই কূলে বদরীনাথ মন্দির।

আবার এই পর্বতশ্রেণীর আর এক তুষার-ক্ষেত্র থেকে নামেন মন্দাকিনী। তারই তটে কেদারনাথ মন্দির। গঙ্গার এই তিন ধারা দেখেই বুঝি বা মহাভারতকার বর্ণনা করেন, হিমালয়-কন্যা পুণ্যতোয়া গঙ্গা মহাদেবের ললাটে পতিত হয়ে ত্রিধা বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকেন।

যোগবাশিষ্ঠে লেখেন, গঙ্গা স্বর্ণদী—স্বর্গনদী। গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গে ও পাতালে থেকে দ্বিধারায় দ্বিগুণাত্মক ছিলেন। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে এনে ত্রিধারায় ত্রিগুণাত্মক করেছিলেন। জগতের যজ্ঞোপবীতের মতন।

মন্দাকিনীর জলধারা মেশে অলকানন্দায়। রুদ্রপ্রয়াগে। হিমালয়ের আরও নিম্নপ্রদেশে ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম দেবপ্রয়াগে। সেই মিলিত প্রবাহিনীর নামকরণ হয়—গঙ্গা। দুইটি মাত্র অক্ষর। কিন্তু, কি প্রচণ্ড শক্তির ও অপার করুণার প্রতীক। ভারতের প্রাণ-স্বরূপা। ভগবতী গঙ্গা।

হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন প্রদেশে ও নেপালে যত নদীর ধারা নামে সবারই শেষ পরিণতি এই গঙ্গার প্রবাহে। এই কারণে গাড়োয়াল, কুমায়ুন, এমন কি নেপালেও নদীগুলির নিজস্ব নাম থাকলেও অনেক নদীর নামের সঙ্গে গঙ্গার নাম যুক্ত। যেমন, ঋষিগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা, দুধগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, ভীলগঙ্গা, রামগঙ্গা, লক্ষ্মণগঙ্গা, গৌরীগঙ্গা, ধৌলীগঙ্গা, কালীগঙ্গা, গণ্ডকীগঙ্গা ইত্যাদি।

আমার এবারের যাত্রাপথ,—গঙ্গোত্রী-গোমুখ থেকে তুষার-পথে বদরীনাথে নামা। ভাগীরথী ও অলকানন্দা—দুই নদীর মধ্যবর্তী গিরিপ্রাচীর। দুই নদীর জলবিভাজিকা—Watershed। গোমুখ থেকে হিমবাহের পথে সেই গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে অপর দিকে বদরিকাশ্রম। মাঝখানে গিরিবর্ত্ম—pass—কালিন্দী খাল,—১৯,৫১০ ফুট।

এ যেন, আকাশ-পথে মেঘলোকে এগিয়ে যাওয়া—দেবী ভাগীরথীকে আবাহন জানাতে।

রাজা রবি বর্মার আঁকা এককালে বহুপ্রচলিত গঙ্গাবতরণের ছবি মনে পড়ে।

হিমালয়ের শিখর। মহাদেবের জটা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দুই কোমরে দুই হাত রেখে, বুক ফুলিয়ে। আকাশপানে চোখ তুলে। একপাশে স্বামীর বাহনের পিঠে ভর রেখে হেলান দিয়ে পার্বতী একমনে দেখেন। আর একদিকে শাঁখ বাজান ভগীরথ। ভাগীরথীর মর্ত্যে আগমন। গঙ্গাবতরণ। আকাশ থেকে গঙ্গা নামেন,—জলের ধারার স্বচ্ছ যবনিকার অন্তরালে। শিবের জটা-জালের গুপ্তপথে গঙ্গা লুপ্ত হন। আবার আত্মপ্রকাশ করেন সহস্র ধারায় শিবের দেহের চারিপাশ বেয়ে।

শিবশিরোবিহারিণী। নির্মলতরঙ্গভঙ্গী শোভিনী। ত্রিমার্গবাহিনী সুরধুনী গঙ্গা।

ত্রিধারা সেই গঙ্গার একধারা বেয়ে আমাদের গিরিশিখরে ওঠা, আবার আর এক ধারা ধরে অপরদিকে নামা।

॥ ৩ ॥

গঙ্গোত্রীতে এবার পাঁচ রাত্রি থাকতে হয়। যাত্রাপথের গাইড্ ও পোর্টারের ব্যবস্থা, কয়দিনের আহার্য সংগ্রহ—এইসবের আয়োজন।

আমার কিন্তু দুর্ভাবনা নেই। ভাগ্যবানের বোঝা, শুনি, ভগবান বহন করেন। কিন্তু, জগন্নাথ হস্তপদবিহীন। তাই, তিনিও বোধ করি করান মানুষেরই হাত দিয়ে। সঙ্গীরাই সব ব্যবস্থা করেন। আমি নিশ্চিন্ত। ধর্মশালার দোতলার বারান্দায় কম্বল-শয্যায় বসি। সুদূর গিরিশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থাকি। অদূরে গঙ্গার উচ্ছল প্রবাহ দেখি! আর একপাশে পোর্টারদের সঙ্গে সঙ্গী ডাঃ বিশ্বাসের দর-কষাকষি চলে, সে আলোচনাও কানে আসে।

দিলীপ সিং গাইড্। পোর্টারদের দলপতিও। গঙ্গোত্রী অঞ্চলে যাত্রাপথ ছেড়ে যাঁরা দুর্গম স্থানে যান—এমন কি গোমুখেও—অনেকেই দিলীপের নাম জানেন। বিদেশী অভিযাত্রীদের সঙ্গেও আগে গিয়েছে। ১৯৪৫ সালে ছয়জন সাধু—স্বামী প্রবোধানন্দের দল—কালিন্দী খালের তুষারপথে বদরীনাথ যান। দিলীপ তখনও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল—একমাত্র পোর্টার ও গাইড্ হিসাবে। স্বামী প্রবোধানন্দ ও স্বামী আনন্দের লিখিত Across Gangotri Glaciers বইখানিতে সেই যাত্রার বিবরণী পাওয়া যায়। অতি বিচিত্র সেই কাহিনী। দলের মোট খরচ হয় মাত্র ৩৯-০০ টাকা। সাধুদের অকিঞ্চন আয়োজন। কিন্তু অন্তরে অটুট বিশ্বাসের অমূল্য সম্পদ। যাত্রামুখে দৃঢ় সংকল্প নেন, দুর্গম পথে সঙ্গীদের কেউ অসমর্থ হলে, এমন কি কারো মৃত্যু ঘটলেও, অপর যাত্রীরা তবু এগিয়ে যাবেন, করুণাময়ের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁদের নির্ভীক যাত্রা সফল হয়ও।

কিন্তু সে তো সাধুসন্তের কথা। আমাদের প্রয়োজনও বহু, আয়োজনও প্রচুর। চারজনের দল। তবু অন্ততঃ সাতজন পোর্টারের মাল। অথচ, মনে হয়, এমন অতিরিক্তই বা কী। বিছানাপত্র—অর্থাৎ sleeping bag, air mattress, air pillow, গরম বেশভূষা; চা বিস্কুট ও আহারের সরঞ্জাম; তিনটে ছোট high altitude তাঁবু।

পোর্টারদের মজুরী ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাবদ যা চায়, যোগ করলে দেখা যায় হাজার তিনেক টাকা। ডাঃ বিশ্বাস চমকে উঠে বলেন, বলো কি! এই সেবার আমাদেরই আর এক দলের কাছে কতো নিয়েছিলে?

তারা গোপন রাখে না। অম্লান বদনে স্বীকার করে, আগে তো অনেক কমই নিতাম। কিন্তু, এই তো কিছুদিন আগে গুজরাট থেকে বড় দল এসেছিল, এখানকার একটা শিখরে উঠতে। তারা তো বহু টাকা—জিনিসপত্রও কতো দিয়ে গেছে।

বিচক্ষণ ডাক্তার তখনি রোগ ধরেন। হেসে বলেন, ওঃ! তাঁদের নজির দেখাচ্ছ?

তাঁরা তো আর নিজের পকেট থেকে খরচা দেন নি। ধনীদের কাছে ও গভর্নমেন্ট থেকে হয়ত প্রচুর টাকা তুলে খরচ করে গেছেন। আর আমাদের তো দেখছ, এই ছোট দল; নিজেদের রোজগার করা টাকা খরচ করে তোমাদের দেশে এসেছি—হিমালয়কে ভালবাসি বলে। কোথায় পাব আমরা অতো টাকা? বরং রোজগার ও কাজ ফেলে এখানে আমাদের পালিয়ে আসা। কি নেবে ঠিক্‌ঠাক বলো।

লোকগুলি বোঝে। হাসে। পরস্পর জল্পনা করে। অবশেষে যা জানায়, তাই ঠিক হয়।

দিলীপ পাবে গাইড্ হিসাবে মোট মজুরী—দুই শত টাকা। প্রতি পোর্টার পাবে,—যাবার পথে দৈনিক দশ টাকা করে—যে কয়দিন লাগুক। সাধারণতঃ তুষার-রাজ্যের আবহাওয়া অনুকূল থাকলে সমর্থ যাত্রী ছয়-সাত দিনেই গঙ্গোত্রী থেকে বদরীনাথ এ-পথে যেতে পারেন। তবে আমরা যাবো ধীরে-সুস্থে, নিজেদের অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী। পোর্টাররা আবার এই একই পথে গঙ্গোত্রী ফিরবে। ফেরবার সময় তাদের তিন দিন মাত্র লাগে। পিঠে বোঝা থাকে না, অভ্যস্ত পদে চলেও দ্রুত। এই তিন দিনের জন্যে তারা প্রত্যেকে মোট ১৫-০০ টাকা পাবে। মজুরী ছাড়া দিতে হবে প্রত্যেকের রেশনের ও চা-জলখাবারের ব্যবস্থার খরচা, রঙীন্ চশমা (ডাক্তার বুদ্ধিমানের মত কলকাতা থেকেই এনেছিলেন), বুট জুতো (দিলীপ হারশীলে গিয়ে হান্টিং সু কিনে আনে)। তাদের সকলের জন্য স্বতন্ত্র একটা তাঁবুও গঙ্গোত্রী থেকে নেয়। ভাড়া মাত্র পাঁচ টাকা।

মাল বহার ব্যবস্থা মেটে, সঙ্গীদেরও মনের বোঝার মস্ত ভার নামে।

কলকাতা থেকে এসেছি আমরা চারজন। সস্ত্রীক ডাক্তার বিশ্বাস ও মেজর বসু। স্থানীয় লোকেরা বলেন, কালিন্দী খালের পথে এই প্রথম ভারতীয় মহিলা যাত্রী। এর পূর্বে এক নেপালী মহিলা গিয়েছিলেন।

বিশ্বাস-দম্পতির আত্মবিশ্বাস ও অসীম সাহসের মূল কারণ স্বামী সুন্দরানন্দজী। পুণ্যস্মৃতি তপোবন স্বামীজীর অন্তেবাসী ও পরিচারক। স্বামীজীর দেহান্তের পর তাঁরই কুটিয়ায় গঙ্গোত্রীতে থাকেন। এই অঞ্চলে বহু দুর্গম পাহাড়-পর্বতে ঘুরেছেন। আমাদের গন্তব্যপথে কয়েকবারই গিয়েছেন, ঐ একই পথে বদরীনাথ থেকে গঙ্গোত্রীতে ফিরেছেনও। ডাক্তার ও শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস পূর্বে গোমুখ-যাত্রায় আসেন। সেই সময়ে সুন্দরানন্দজীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। পরে পত্রযোগেও পরামর্শ চলে। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ও তাঁর সাহস শক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই এই যাত্রার পরিকল্পনা। তিনিও সঙ্গে যাবেন। যাত্রার দিন স্থির করেন—১৭ই জুলাই।

॥ ৪ ॥

গঙ্গোত্রীর পূর্ব-পরিচিত সাধুদের সন্দর্শনে আবার চলি।

গঙ্গার অপর পার। সেই প্রাচীন মৌনী নাগা মহাত্মার কুটিয়া। সাধুজী

রোয়াকে স্থির হয়ে বসে। ঠিক তেমনি ভাবে। গঙ্গার দিকে চেয়ে। নয় বছর আগের সেই দৃশ্য,—মনে হয়, যেন গতকালের কথা। এখানে কি শুধু গঙ্গার ধারাই অবিরল বহে চলে ? সময়—গতিহীন, চিরস্থির ? যেন, নদীর নিস্পন্দ তীর।

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি। চোখ ফিরিয়ে তাকান। সেই ব্রহ্মচারিণীও এসে দাঁড়ান। সাধুজী বাম করতলে ডান হাতের আঙুল দিয়ে দেবনাগরী হরফে লেখেন, —মুখার্জি! হেসে আমার মুখের দিকে আবার তাকান। 'সুখস্বপ্ন হাস্যমুখ শিশুর মতন'। অল্প মাথা নাড়েন। যেন, গাছের ডালে ফোটা ফুল মৃদু হাওয়ায় অল্প দোলে। দেখে অসীম আনন্দে মন ভরে ওঠে। প্রশান্ত স্নিগ্ধ ভাবের অনুভূতি জাগে। স্থির হয়ে বসি।

তুষারপথে যাত্রার কথা জানাই। তিনি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন। হাত তুলে আঙুল দিয়ে দেখান—বিশাল পাহাড়—তুষারপথ—পার হয়ে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভয় নেই—তিনি আছেন।—আশীর্বাদ জানান। মনে আরও সাহস আনে, যাবার উৎসাহ জাগায়।

ইঙ্গিতে জানান, সেবার বলেছিলাম না, আবার আসতে হবে। এলে তো!—শিশুর মতো হাসতে থাকেন। মনে পড়ে যায়, সত্যিই তো গতবার বলেছিলেন বটে। ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। জানতেন নাকি তখনি ? কে জানে ?

যাত্রার আগের দিনও আবার যাই। বিদায়-আশিস নিতে। ব্রহ্মচারিণীর দিকে তাকিয়ে কি ইশারা করেন। তিনি কয়টা লাড্ডু এনে দেন। বলেন, প্রসাদী নাও। সঙ্গে রেখো,—অল্প একটু করে খেলেও সেই কঠিন পথে ক্ষুধা মিটবে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, এসব এলো কোথা থেকে ?

শুনি, গুরুপূর্ণিমায় কে পাঠিয়েছেন।

দুটো মাত্র নিই। বলি, এই যথেষ্ট। আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছি—আমার আবার ভাবনা কিসের।

নিকটে আর এক কুটিয়ায় সেই অপর নাগাসাধুজীরও দর্শন পাই। কুটিয়ার মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখি না। সাধুজীরও সেই স্নেহময় আচরণ। সদানন্দ মূর্তি। অথচ, বাহ্যিক জগতের সঙ্গে যেন যোগশূন্য। জলে থেকেও গায়ে জল লাগে না। দেহধারী হয়েও দেহের সুখ-দুঃখ বোধ নেই। অত শীতেও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। কাঁধের পাশ থেকে বিরাট জটাভার সরিয়ে উঠে দাঁড়ান। কুলুঙ্গি থেকে একমুঠো কিস্‌মিস্‌ বাদাম এনে প্রসাদ দিতে চান। গতবারের মত একটিমাত্র হাতে নিই। প্রণাম করি। টানা-টানা চোখ মেলে তাকান। মুখে সরলস্নিগ্ধ হাসির রেখা। যাত্রার কথা শুনে মঙ্গল কামনা করেন। বলেন, সূর্যের তাপে বরফ কেমন গলে দেখেছ ? তেমনি এ পথের দুর্গমতাও দূর হয় তাঁরই করুণায়। মানুষের দেহের বল নয়, অন্তরের প্রগাঢ় বিশ্বাস, অচলা ভক্তি-ই এ পথের পাথেয়। পথ চলো,—প্রাণ-ভয়শূন্য মনে। জীবন-মোহমুক্ত হয়ে। যাত্রা সার্থক হবে। পরম আনন্দ মিলবে।

মনে শিহরণ জাগে। যাত্রা-সফলতার আনন্দ অনুভব করি। ভাবি, সাধুর আশীর্বাদ,—এই তো ভগবদ্‌-করুণা।

কুটিয়া থেকে বার হয়েই মনে পড়ে, একটু এগিয়েই তো সেই শ্রীরামভক্ত মৌনীবাবা মন্দির তৈরি করছিলেন। আছেন নাকি এখনও? নদীর ধার দিয়ে আপনি পা এগিয়ে চলে। সম্মুখে প্রকান্ড এক প্রাচীর পথ রোধ করে। গেট্‌-এর মত প্রবেশদ্বার। বিনা অনুমতিতে যেতে সংকোচ হয়। কাছাকাছি কাউকে দেখি না। ভাবি, সাধুর মন্দিরে যাব,—দ্বিধা কিসের? গেট পার হয়ে ভেতরে যাই। বিরাট এলাকা। সেই ছোট আশ্রম বড় হয়েছে। আশপাশে কয়েকটি ঘরবাড়ি উঠেছে। বারান্দায় বহু বাসনপত্র রাখা। যজ্ঞিবাড়ির রান্নার সেই প্রকান্ড বড় হাঁড়ি, কড়া ইত্যাদি। সন্দেহ হয়, কোন ধনীর অন্দরমহলে অনধিকার প্রবেশ করলাম নাকি? কুণ্ঠিত চরণে এগিয়ে চলি। মন্দিরের দিকে। নাঃ, বিগ্রহের পরিবর্তন হয় নি। সেই রঘুনাথজী তেমনি আছেন। সুন্দর সাদা ধবধবে পাথরের। কিঙ্করটি কোথায়? ঐ যে,—একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এইদিকেই আসেন। তেমনি কৌপীন পরা। তবে দেহ চিক্কণ হয়েছে। মাংসপেশীগুলি আরও সুস্পষ্ট ও সবল দেখায়। বুক চিতিয়ে হাত দুলিয়ে কাছ দিয়ে চলে যান। গম্ভীর মুখে। ভ্রুক্ষেপ না করে। আমিও চলে আসি। হাঁপ ছাড়ি।

পরে স্থানীয় লোকের কাছে খবর জানি। সাধুজীর কয়েকটি ধনী শিষ্য বা ভক্ত হয়েছে। তাই অতো ঘরবাড়ি উঠেছে। অতিথিশালাও হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রায়ই ভান্ডারা দেন। কম্বল বিতরণ করেন। তীর্থযাত্রীদেরও ভোজ দেন। জমিও অনেকখানি ঘিরে ফেলেছেন। তবে দেখি, এখন আর নিজে পাঁচিল গাঁথেন না, লোক লাগিয়ে কাজ করান।

সন্ন্যাসী ধনবান!

॥ ৫ ॥

কেদারগঙ্গার পুল পার হয়ে অন্য কুটিয়াগুলির দিকে চলি। এইখানেই সেবার আলাপ হয়েছিল তরুণ ব্রহ্মচারীটির সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তার কথা মনে পড়ে। যেন, বহু বছর পরে গ্রামে ফিরে পুরানো বন্ধুবান্ধবের কথা স্মরণ। ভাবি, এখন কোথায় আছে, কে জানে?

তখন জানতাম না, কিন্তু তার পরের বছরেই হঠাৎ তার খবর পাই। সেও এক অদ্ভুত যোগাযোগ। বিচিত্র আর এক কাহিনী। তবে, তার সম্বন্ধে নয়, অপর আর এক সাধুর।

সে বছর হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার তীরে সাধুদের এক শান্ত আশ্রমে দিন কাটাই। কিছু দূর থেকে এক মূর্তিকে দেখে সন্দেহ হয়,—গঙ্গোত্রীর সেই যুবক ব্রহ্মচারী না? তেমনি দীর্ঘ দেহ, সুশ্রী আকৃতি, পরনে লুঙ্গির মত

ছোট সাদা কাপড়, খালি গা, শুধু পাতলা সাদা চাদর জড়ানো। মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ অনেক বড় হয়েছে,—এতদিনে হবারই তো কথা।

সামনাসামনি দেখা হওয়ারও সুযোগ মেলে। সম্ভাষণ জানাই। পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রশ্ন করি। বলেন, হাঁ, ১৯৫৪ সালে গঙ্গোত্রীতে ছিলাম। দেখা হয়ে থাকতে পারে। ঠিক মনে পড়ছে না।

তাঁর ছাত্রকালের গল্পের কথা স্মরণ করাই। তিনি হেসে ওঠেন, ওঃ! ঠিক হয়েছে। আমার সঙ্গে এক ব্রহ্মচারী তখন ছিল, তারই সঙ্গে তাহলে আলাপ হয়ে থাকবে। সে এখন আসামে আছে। চেহারার অনেকটা মিল ছিল বটে। তবে বয়সে অনেক ছোট।

এই comedy of errors-এর মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে। প্রসঙ্গক্রমে উভয়ের পরিচিত এক ভদ্রলোকের উল্লেখ করেন। জানতে চান, তাঁর স্ত্রী এখন কেমন আছেন? কয়বছর আগে তাঁর কঠিন রোগের মধ্যে ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য হয়ে সাধুর মুখের পানে তাকাই। বলে ফেলি, শুধু তাই নয়। তখন তাঁদের এ কথাও বলেছিলেন, তিন বছরের মধ্যে আর কোন বিপদ নেই, ছেলেমেয়ের বিয়েও যেন এরি মধ্যে দিয়ে দেন।

এবার সাধুজী আশ্চর্য হন, আপনি জানলেন কি করে?

আমি বলি, তার আগে বলুন, 'অমুক' বাবা কার নাম?

তিনি হেসে ওঠেন, ওঃ! আমারই। সে নামেও আমি পরিচিত।

কৌতূহল বাধা মানে না। আবার প্রশ্ন করে ফেলি, তাহলে পশ্চিমের সেই শহরে আপনার কাজকর্ম এখন কি অবস্থায়?

এইবার প্রাণ খুলে তিনি হাসেন। বলেন, আচ্ছা। আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন দেখছি! ওসব সাময়িক ব্যাপার। চলল কিছুদিন। এখন আবার সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।

আমার পানে তাকান। বলেন, চলুন তাহলে গঙ্গার ধারে, ঐখানে ঘাসের উপর বসে ভাল করে আলাপ করা যাক্।

সাধুজীর সঙ্গে সেই আলাপ-আলোচনার বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁর অদ্ভুত জীবনী ও ক্ষমতা যা শুনেছি তাই গল্প করি। গল্পের মতই শোনায় বটে।

সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। উচ্চশিক্ষিত। বিভিন্ন বিষয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডক্টরেট্ ডিগ্রীও আছে। বিদেশেও শিক্ষাপ্রাপ্ত। সুশ্রী, সুপুরুষ। কথাবার্তায় অতি মার্জিত। ভদ্র ব্যবহার। সহাস্য বদন। বুদ্ধিদীপ্ত প্রখর চোখের দৃষ্টি। সুস্পষ্ট মতামত। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।—এতগুলি গুণের সমন্বয়,—বাইরের মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করা অতি স্বাভাবিক। তার উপর সাধু-বেশ। সব পেয়েও সব ছেড়ে দেওয়া। এ কি কম কথা!

গল্প শুনি এক বন্ধুর কাছে। পশ্চিমের এক বড় স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসে দেখেন প্ল্যাটফর্মে তাঁর পাশের কামরার সামনে লোকের ভিড়। অতো রাত্রেও শহরের বহু সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা। ব্যাপার কি? শোনেন, 'বাবা' চলেছেন —চেনেন না ওকে?—ওঃ! আপনিও যাচ্ছেন এই ট্রেনে? সেই নাসিক পর্যন্তই? ভালই হয়েছে। পথে বাবার কোন অসুবিধে হয় কিনা একটু খবর রাখবেন যেন।

বন্ধুর কৌতূহল জাগে। উঁকি মেরে দেখেন, বাঃ? কী মনোহর মূর্তি! গৌর বর্ণ! চিকন কালো কোঁকড়ানো চুল, ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। কালো দাড়িগোঁফ। প্রসন্ন বদন। গেরুয়া বাস। ফুলের মালায় গলা-বুক ঢাকা পড়েছে। সবারই সঙ্গে হেসে কথা বলেন। পায়ের ধুলোর লোভে সকলে ব্যাকুল।

সকালে এত বড় স্টেশনে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। মহারাজ প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করেন। বন্ধুও নামেন। এগিয়ে গিয়ে সম্ভাষণ জানান। জিজ্ঞাসা করেন, কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ট্রেনে?

দু-এক কথায় আলাপ-পরিচয় জমে। বন্ধু সাধু-সন্ন্যাসীর ভক্ত নন। তবুও, এঁর কথাবার্তা ভাল লাগে। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ভদ্রমনের পরিচয়ে আনন্দ পান। সহজ সাধারণ ব্যবহার ও রসবোধ আছে দেখে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসেন, দেখুন, একটা বড় কৌতূহল হচ্ছে। প্রশ্নটা করেই ফেলি যখন মনে উঠছে। আপনিও জার্মানীতে ছিলেন, আমিও সেখানে ছিলাম কয়েক বছর। যা হোক্ কিছু শিখেও ছিলাম, তারই জোরে জীবনটা একরকম কাটিয়েও দিলাম। রিটায়ার করার বয়স হয়ে এলো। কিছুকাল থেকে এখন ভাবনা হয়েছে,—একটি মাত্র ছেলে, এখনও পড়াশুনা করছে, কোন্ 'কেরিয়ার্' তার নেওয়া ঠিক হবে—এখনও বুঝতে পারছি না। বাপ-মা মাত্রেই অবশ্য চান,—ছেলে তাদের বড় হোক্—অর্থাৎ বিপুল যশ, অর্থবল, পদমর্যাদা হোক্, বহুলোকের সমাদর পাক। কাল থেকে আপনাকে দেখছি, জীবনে এ সব কিছুই আপনি পেয়েছেন—অর্থাৎ a very successful man. এখন বলুন তো, কোন্ ইউনিভার্সিটিতে, কী পড়ে আপনার এই 'সাকসেস্' হল? ছেলেকে সেইখানেই দেব, যে করেই হোক।

মহারাজ হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, বেশ বলেছেন। দেখুন, আসল কথাটা কি জানেন? এ সবই হল পোশাকী,—মানুষগুলো বোকা—তাদের চালিয়ে নিয়ে যাবার বুদ্ধি থাকলেই হল।

বন্ধু গল্প করে বলেন, মানুষটিকে কিন্তু লেগেছিল ভালো। গেরুয়া পরলে ও জটা রাখলে কি হবে,—বেশ sense of humour আছে—কথাবার্তাতেও brilliant! এমন একটা সাধুকে তুমি হিমালয়ে meet করো নি?

তখনও করি নি, ঠিকই। তবে তাঁর কথা কানে আসে আরও অনেকেরই মুখে। বিলাত-ফেরত খ্যাতিবান বয়স্ক এক ডাক্তারবাবুর কাছেও শুনি। মহারাজের

অশেষ কৃপা পেয়েছিলেন। যখনি কোন বিপদে পড়েন, মহারাজকে স্মরণ করেন। কোথা থেকে আকস্মিক আবির্ভাব হয়। বিপদ্‌মুক্ত হন।

একবার মহারাজ চলেছেন ট্রেনে। স্টেশনে অনেকে এসেছেন। ডাক্তারবাবুও আছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল চাপল, মহারাজকে একান্তে পাওয়া যাবে ট্রেনের মধ্যে, তাঁর সঙ্গে যাওয়া যাক্‌। এক বন্ধুকে বাড়িতে খবর দেবার জন্যে বলে ট্রেন চলতে শুরু করতেই উঠে পড়েন। মহারাজের আপত্তি হয়। পরের একটা ছোট স্টেশনে তাঁকে নেমে যেতে বাধ্য করেন। ইনি অজুহাত তোলেন, রাত হয়েছে, মাঠের মধ্যে ছোট গ্রামের স্টেশন, শহর থেকে দূরে,—বাড়ি পেঁাছব কি করে? মহারাজ আশ্বাস দেন, কোন ভয় নেই,—পেঁাছে যাবে,—নেমে যাও।—

তিনি নামেনও। একটু পরে দেখেন, অজানিত ভাবে কি করে বাড়িতে পেঁাছে গেছেন। তাঁর বন্ধু তখন সবে স্টেশন থেকে সেখানে এসেছেন, তাঁর চলে যাওয়ার খবর দিতে। তাঁকে দেখে সবাই বিস্মিত।

ডাক্তারবাবু চুপিচুপি গল্প করেন। বলেন, সবাইকে তো এ কথা বলা যায় না। লোকে বিশ্বাস করবে না। অথচ আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা। মহাপুরুষ উনি। কী বিরাট্‌ শক্তিসম্পন্ন।

এই ধরণের আরও গল্প বিভিন্ন লোকমুখে শুনি।

এদিকে মহারাজ থাকেন হিমালয়ে সাধুদের এক মহাতীর্থে। সেখানেও যোগীপুরুষ বলে বিপুল খ্যাতি। মার্গসঙ্গীতেও পারদর্শী। সুমধুর ভজন করেন। প্রাঞ্জল ভাষায় শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনান। ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর ভিড় জমে। পাহাড়ী এক শিষ্যাও আসেন।

তারপরই বিচিত্র পরিবর্তন। তাঁকেও পাওয়া যায় না। শিষ্যাকেও নয়।

কয়েক বছর পরে আবার খবর মেলে। বিবাহিত সংসারী জীবন। সন্তানের পিতা। বড় শহরে বাস করেন।

অর্থকরী ব্যবসা চালান। পুরোদস্তুর সাহেবী পোশাকে ঘোরাফেরা করেন। সভ্যসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রতিপত্তিশালী। সকলেই খাতিরসম্ভ্রম করে। কে বলবে হিমালয়ের এক বিশিষ্ট তপস্বী;—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী?

হঠাৎ সেই মহাত্মারই যে এমনভাবে দর্শন ঘটবে, তা কখনো ভাবি নি। দেখে আশ্চর্য হই, আবার এখন ব্রহ্মচারীর বেশ! জটাজুটধারী। ক্ষণিকের সংসার-জীবন ত্যাগ করে আবার বৈরাগ্য-জীবন। কোন গোপনতা নেই। কথা-বার্তায় বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। আত্মগ্লানির কোন কুণ্ঠাও প্রকাশ পায় না। হাসতে হাসতে নিজে থেকেই সব কিছু স্বীকার করেন। বলেন, আবার সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।

এর পরেও আবার হঠাৎ দেখা হয়। ১৯৬৬ সালে, প্রয়াগ কুম্ভে। মেলাক্ষেত্রে একটা বড় মোটরে ঘোরেন। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে। পিছনের সীট্‌-এ জনতিনেক ভক্ত। আমাকে দেখে মোটর থামান। আন্তরিক সম্ভাষণ করেন।

পিছনে হাত বাড়িয়ে এক কপি বই নিয়ে আমার হাতে দেন। হেসে মোটর হাঁকিয়ে আবার তখনি চলে যান। অল্প দূরে এক ধর্মসংঘের দপ্তরের সামনে আবার দেখি গাড়ি দাঁড়ায়। লোকজন ছুটে আসে তাঁর নিকটে। খানকয়েক বই আবার বিতরণ করেন দেখি। সকলেই ভক্তি-গদ্‌গদ ভাবে শ্রদ্ধা জানায়।

বইখানি হিন্দী ধর্মপুস্তক। লেখক পরলোকগত গঙ্গোত্রীবাসী আর এক স্বামীজী। এঁরই গুরুভাই। বই-এ মহারাজের লেখা ভূমিকা। দুইজনেরই ফটো আছে।

দু'দিন পরে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু শহর থেকে মেলা দেখতে আসেন। সুশিক্ষিত, তীক্ষ্নবুদ্ধি ব্যক্তি। বড় অফিসার ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। কুম্ভের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীর কথা ওঠাই স্বাভাবিক। ওঠেও তাই। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, কদিন আগে এক মহাত্মার হঠাৎ দর্শনলাভ হল। আপনি কখনো তাঁকে দেখেছেন কিনা জানি না। সুদর্শন সৌম্য মূর্তি। চোখ দুটো যেন জ্বলছে,— কী উজ্জ্বল জ্যোতি! আধ ঘণ্টার ওপর কথা বললেন। মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। মনে বড় তৃপ্তি পেয়েছি। আবার যাবো ভেবেছি। যাবেন নাকি দর্শন করতে?

বইখানা খুলে তাঁর ফটো দেখাই। দেখেই চিনতে পারেন। সোৎসাহে বলেন, তাঁকে জানেন দেখছি!

ভাবি, সত্যই কি তাঁকে চিনি? যথার্থ পরিচয়-ই বা কী? পাওয়াও কি যায় কখনো?

॥ ৬ ॥

স্বামী সুন্দরানন্দজীর কুটিয়াতেও চলি।

দুর্গম তুষারপথে তাঁর সঙ্গে যাব। আমাদের এ পথের কাণ্ডারী তিনি। অথচ, আমার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। কদিন রোজই ধর্মশালায় আসেন। ব্যবস্থাদির যথেষ্ট সাহায্যও করেন।

কিন্তু, শুধু কি সেইজন্যই তাঁর কুটিয়ায় যাওয়া? ভাবি, সাধুদের সঙ্গেও আচার-ব্যবহারে এই সব সামাজিক প্রথা মেনে চলার কোন সার্থকতা আছে? থাক্ বা না-থাক্, চলি তাঁরই আকর্ষণে। চমৎকার মানুষ। ত্রিশের কোঠায় বয়স মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের শরীর। শ্যামবর্ণ। একরাশ দাড়িগোঁফ। ঢেউখেলানো কালো চুল। পিঠ ছুঁয়েছে। লম্বা গড়ন। কঠোর যোগাভ্যাসে দেহের দৃঢ় বাঁধন। 'অ্যাথ্‌লেট্'-এর মত। কর্মঠ, সজীব, প্রাণবন্ত। মনের উৎসাহ চোখে মুখে, সারা অঙ্গে, চালচলনে যেন ঠিক্‌রে পড়ে। সঙ্গে থাকলে শান্ত ধীর ভাবে স্থির হয়ে বসার কথা মনেই হয় না। যেন, ঝড়ের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে চলে। মনে হয়, ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের গহন বনে, উঠে চলি ঐ উত্তুঙ্গ হিমশিখরে।

তাঁরও অন্তরের বাসনা তাই। গাড়োয়ালে—বিশেষতঃ গঙ্গোত্রী গোমুখ

অঞ্চলে বহু অজানা দুর্গম স্থানে ঘুরেছেন, হিমবাহের উপরও ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। প্রকৃতই হিমালয়-প্রেমিক।

তপোবন স্বামীজীর কুটিয়ায় আসি। ঘরখানির সংস্কার হয়েছে। এখন সুন্দর সুশ্রী কুটির। অতি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। প্রাঙ্গণে ছোট একটা তাঁবু খাটানো। রোদে দেওয়া রঙীন স্লিপিং ব্যাগ। সুন্দরানন্দজীর পার্বত্য অভিযানের নিজস্ব সরঞ্জাম। বারান্দায় দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি বাঁধানো ফটো। যাওয়া মাত্র দুটো এলবাম নিয়ে এসে দেখান। সরল উৎসাহী বালকের মতন। পিলানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রতি বছর যোগাসন শেখাতে যান তারই নানান রকম ফটো। পর্বত-অভিযানেরও। নিজের ক্যামেরা আছে, ছবিও ভাল তুলতে জানেন। প্রসিদ্ধ পত্রিকাদিতে প্রকাশও হয়। বেশ লাগে তাঁর মনখোলা প্রাণময় আচরণ।

সৌম্যদর্শন আর এক সাধুর সঙ্গে সেইখানে পরিচয় হয়। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি পৌরাণিক মুনিদের ফটো নেই। কিন্তু তাঁদের নাম মনে হলেই তাঁদের সুস্পষ্ট মূর্তিগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দীর্ঘ দেহ। সোনার মত রঙ্। সাদা ধব্‌ধবে লম্বা দাড়ি। একরাশ পাকা চুল—মাথার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁধে রাখা। এই সাধুজীর চেহারাও সেই প্রাচীন মুনি-ঋষির কথাই মনে আনে। গঙ্গোত্রীতে কি সুন্দরই না মানায়! কিন্তু, চমকে উঠি পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রশ্ন শুনে। জিজ্ঞাসা করেন, একটা আইনের পরামর্শ দিতে পারেন? গঙ্গোত্রী তীর্থক্ষেত্র। সাধুর আশ্রম। এমন ঋষিপ্রতিম সুদর্শন সাধুজী। তাঁরই মুখে এ কী প্রশ্ন। বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তবু সবিনয়ে জানাই, আইন-আদালত অনেককাল ছেড়েছি, যেটুকু হয়ত জানতাম তাও ভুলেছি। আর—এইখানে ওসবের আলোচনা,—থাক্।

তিনি পীড়াপীড়ি করেন। অগত্যা সমস্যাও শুনতে হয়।

ঘটনা যা বলেন, সংক্ষেপে এই: কিছুকাল আগে সরকারী এক বড় অফিসার গঙ্গোত্রীতে আসেন। চারিপাশ পরিদর্শন করে ফিরে যান। তারপরেই স্থানীয় সাধুরা এক নোটিশ পেয়েছেন এই মর্মে,—সরকারের বিনা অনুমতিতে সাধুরা ঐখানে অনেকে জমি দখল করে কুটিয়া তুলেছেন। তাঁরা যদি ঐভাবে থাকতে চান, তাহলে কে কতোখানি কোন্‌খানে জমি দখল করেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গভর্নমেণ্টের কাছে যেন লিখিত আবেদন করেন, সেই সব জমি আইনত বন্দোবস্ত নেবার জন্যে। গভর্নমেণ্ট তখন লীজ্ দেবার কথা বিচার করবেন।

সাধুজী বলেন, এখন কি করা উচিত? এই নিয়ে সাধুদের মধ্যে দুই ভিন্ন মত হয়েছে। একদল বলেন, আবার এখানেও জমিজমা, টাকাকড়ি! এ শরীর যখন প্রথম আসে এখানে,—গভীর জঙ্গল ছিল, ভালুক ঘুরতো কতো, লোকজন যাত্রীও আসত কম। গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি ছিল না এদিকে। জমি তো তাদের বটেই। তাঁরা যদি চান, বিবাদের কোন প্রশ্ন ওঠে না, তাঁরা নিয়ে নিন। শরীর

আবার যাবে আরও বিজন বনে। হিমালয় তো এখানেই শেষ নয়!—আর এক-দল বলেন, তা কেন? জমি যখন দখল করে আছি, স্বত্বটা পাকা করে নেওয়াই ভাল। খাজনা যা চাইবে, তা দিতেও হবে,—টাকাকড়ি যোগাড়ের একটা ব্যবস্থাও করতে হবে।—আমারও তো তাই মত। উপায় কি?

ভাবি, উপায় আর কি? এখানে এসেও আবার সেই চিরন্তন সংসারধর্ম। সম্পত্তি পত্তন। অর্থের প্রয়োজন।

॥ ৭ ॥

ধর্মশালার পাথর-বাঁধানো অঙ্গন। একা বসে আছি। বেশ লাগে। অল্প নীচেই মন্দির। যাত্রীর ভিড় নেই। দু-একজন রোদে বসে আরাম উপভোগ করেন। আরও একটু নেমেই ভাগীরথীর ধারা। ওপারে সাধুদের কুটির। তারও পিছনে ঘন পাইন বন। আকাশভরা আলো। গাছের নীচে ছায়া। নদীর দুই তীরে পাহাড়ের শ্রেণী। দূরে তুষারশিখর। স্তব্ধ চরাচর। বিশাল শান্তি।

সামান্য কিসের শব্দে চমক ভাঙে।

দেখি, খুট্‌খুট্‌ করে এক বুড়ী এগিয়ে আসে আমারই দিকে। ছিন্ন মলিন বেশ। মাথায় একরাশ সাদা চুল—যেন, শণের পরচুলা। দেখেই বুঝতে পারি, নিশ্চয় ভিক্ষার জন্যে আসে। এই অভাগা দেশে কোথায় ভিখারী নেই? তীর্থ-ক্ষেত্রের তো কথাই নেই। কিন্তু, এই গঙ্গোত্রীতেও মানুষের দুঃখদৈন্য অন্নাভাব দেখলে সত্যিই মর্মপীড়া বোধ করি। সাধ্যমত সাহায্যদানের চেষ্টাও করি। কিন্তু, কেন জানি না, ভিক্ষা-বৃত্তি দেখলেই সেই একই মন বিমুখ হয়ে ওঠে, কোন কিছু দিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুখ ঘুরিয়ে থাকি।

কতো ভুল বোঝাই না জীবনে ঘটে! এখানেও দেখি তাই।

বৃদ্ধা আসেন। মাটিতে কাছে উবু হয়ে বসেন। হাত পেতে ভিক্ষা চান না। বিনীতভাবে প্রশ্ন করেন, কবে গোমুখ-পথে যাত্রা করব?

ওঃ! তাই বুঝতে পারি, গোমুখ-যাত্রার জন্যে দল খুঁজছেন। একা যাতায়াত তো সম্ভব নয়।—সেখানেও আবার ভুল করি।

তাঁকে জানাই গোমুখ হয়ে যাব বটে, কিন্তু এখানে তো ফিরব না। বরফের ওপর দিয়ে চলে যাব বদরীনাথে। তাই, সঙ্গে গিয়ে লাভ নেই।

তিনি শান্তভাবে বলেন, তাই হোক্‌। অন্য দল তো এখন দেখছি না। দলের জন্যেও ভাবছি না। শুনেছি, ওদিকে পথ নেই। তাই যাবার সময় কাউকে দরকার, কোন্‌ দিকে যেতে হবে দেখাবার জন্যে। ফেরবার সময়ে নিজেই চিনে চলে আসতে পারব।

কথা শুনে চমকে উঠি। শ্রদ্ধাভরে তাকাই,—কে এই সাহসিনী রমণী।

যেন, মূর্তিময়ী ভারত-জননী। এককালের অপরূপ রূপশালিনী। এখন রুক্ষকেশ ভিখারিণী-বেশ। ম্লান মুখ। শীর্ণ শুষ্ক দেহ। তবু, বুকে

আগুনের তেজ,—অটল বিশ্বাস, অটুট সাহস। অথচ, চোখে স্নেহময়ী জননীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি। করুণ, কোমল। আবার, বৈরাগ্যময়।

মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছেন। এককালে সবই ছিল, এখন কিছুই নেই। শান্তভাবে বলেন, যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন। সব হারিয়েই তো তাঁকে পাওয়া। হারাবার আর কোন ধনও নেই, তাই ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই। একাই এসেছি, একাই যাবো। যিনি সঙ্গে থাকার সঙ্গে তো আছেনই।

মনে পড়ে আর এক মহিলার কথা। এই হিমালয়েই দেখেছিলাম। সেবার গঙ্গোত্রী-গোমুখ থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ-পথে কেদারনাথ চলেছি। সাধারণ যাত্রা-পথে। পাওয়ালির প্রসিদ্ধ চড়াই অতিক্রম করে। ও-পথে যাত্রী যায় কম। চড়াই-এর ভয়ে। ঘন ঘন চটি নেই। নয় মাইল অন্তর বনের মধ্যে বসতি, নয়ত ধর্মশালা। সারাদিনে নয় মাইল চলা—অল্প মনে হয়। তাই কোন কোন দিন আঠারো মাইল-ই চলে যাই। এই পথের শুরুতে প্রথম দিনই ছোট এক যাত্রীদল দেখি। তারই সকলের পিছনে এক বৃদ্ধা চলেন। এমনি শতচ্ছিন্ন জীর্ণ বেশ। শুভ্র কেশ। কুব্জ দেহ। বেঁকে চলার কারণ, বয়সের বোঝা তো বটেই, পিঠের এক ছোট বোঝাও। একটা ময়লা কাপড়ের বাঁধা পুঁটলি। দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর দুই হাতের দুই গাছি লাঠি। খুট্‌খুট্ করে চলেন যেন চার পায়ে। সন্দেহ হয়, চড়াই শেষ করে পেঁছুবেন তো?—সপ্তাহখানেকেরও পর। ওঁকে এর মধ্যে আর দেখি নি। সেদিন এ পথের শেষ চড়াই পার হচ্ছি। এগারো হাজার ফুট উঁচু শৃঙ্গ। পাহাড়ের মাথায় কোন গাছ নেই। সবুজ ঘাস। রঙীন্ ফুলে ভরা। হঠাৎ ঘনঘটা করে মেঘ দেখা দেয়। কোথাও আশ্রয় দেখি না। পরের আস্তানা তখনও মাইল পাঁচেক দূরে। সহযাত্রী একজন জানান, 'ছুটে চলুন, একটু এগিয়েই কালীকমলীর 'পানি পিউ'-এর ঝুপড়ি আছে।' তাই করি। ঠিক সময়ে পেঁছেও যাই। মুষলধারে বৃষ্টি নামে। বড় বড় শিলও পড়ে। চারিদিক অন্ধকার হয়। বিকালবেলা, তবু মনে হয় হঠাৎ রাত্রি নামে। লতাপাতার ছোট্ট কুঁড়েঘর। চড়াইশেষে ক্লান্ত যাত্রীদের সেবায় জলসত্র। একটি-মাত্র লোক থাকে। কোনমতে জনদশেক যাত্রী সেইখানে আশ্রয় নিই। উপরে ছাদ থেকে, দেয়ালের মধ্যে দিয়ে জলের ধারা ভিতরে আসতে থাকে। জামাকাপড় সব ভিজিয়ে দেয়। তবুও তো আশ্রয়। বাইরে যেন তাণ্ডব চলে। ঘণ্টাখানেক কাটে। থামার কোন লক্ষণই নেই। ঐভাবে জড় হয়ে বসে রাত কাটাতে সকলে প্রস্তুত হই। হঠাৎ মনে পড়ে, সেই বৃদ্ধার কথা। সঙ্গীকে বলি, আচ্ছা, সে মহিলা আজ কোথায়? এ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয় পড়েন নি! আমরা যেভাবে আঠারো মাইল করে কদিন এসেছি—তাঁর পক্ষে তা তো সম্ভব নয়। ভালই হয়েছে, নইলে এই ঝড়ের মধ্যে পড়লে বিপন্ন হতেন!

আলোচনা চলছে। এমন সময়ে ঝুপড়ির একমাত্র খোলা দরজার সামনে দেখি, —এ কী কাণ্ড! সেই মূর্তি। সারা দেহ বেয়ে ঝরনাধারার মত জল ঝরে।

পিঠের বোঝার ভার ভিজে দ্বিগুণ। বাইরের সেই দুর্যোগ ভেদ করে এসে দাঁড়ান,—মুখে তবু ভয়-ভাবনার লেশমাত্র রেখা নেই, সহাস্যবদনে বলেন, নমো নারায়ণ। বাবার কেমন খেলা চলছে দেখ সব।—হাতের লাঠি দুটি পাশে রাখেন। পিঠের বোঝা নামান। মাথা ও গায়ের জল ঝাড়েন। খানিকটা সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাসিমুখে সকলকে উৎসাহ দেন, ভয় কি? ভাবনা কিসের? আমার নারায়ণ কেমন আচ্ছা জায়গা মিলিয়ে দিলেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। মন ছুটে যায় তাঁর চরণধুলোর লোভে।

॥ ৮ ॥

১৭ই জুলাই, ১৯৬৩।

'আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার।'

গঙ্গামায়ির মন্দিরে প্রণাম করে পথে পা বাড়াই। যেন, মায়ের অনুমতি ভিক্ষা,—তাঁর শুচি-শুভ্র অভ্রভেদী গোপন তুষার-অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্বে।

শান্ত প্রফুল্ল চিত্ত। উদ্বেগবিহীন। ধীর চরণে চলি। দুর্গম পথের দুর্ভাবনা মনে ছায়াপাতও করে না। দৃঢ় বিশ্বাস, শুভযাত্রা সফল হবেই। মনে শুধু সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা,—'কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে?'

গোমুখের এবার ভিন্ন পথ। আগে গিয়েছি, গঙ্গোত্রীতে নদী পার হয়ে গঙ্গার বামকূল দিয়ে। এবার চলি যেদিকে মন্দির, সেই তীর ধরে, নদীর দক্ষিণকূলে। সেবার এপার-ওপারে কোনদিকেই পথ ছিল না। এই বছরই এপারে পথ হয়েছে। সম্পূর্ণ নয়। এখনও কাজ চলেছে। ভাগ্যক্রমে দুদিন আগেই এঞ্জিনীয়ার বড়কর্তারা গোমুখ পর্যন্ত পরিদর্শনে এসেছিলেন। অতএব, তার যা সুফল হবার তাই হয়েছে। কাজও এগিয়েছে, পথও যথাসম্ভব ঠিক আছে। মানুষের সৃষ্ট নির্দিষ্ট পথ। পাথর ও বোল্ডারস্ ডিঙিয়ে, লাফিয়ে আর চলতে হয় না। জুতা খুলে, হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট তুলে, তুষারশীতল ঝরণার ধারাগুলো পারাপারও নেই। প্রায় সব কয়টি ঝরনার উপর কাঠের পুল। হিমগিরির অনিশ্চিত প্রকোপে এ পথ ও পুল কদিন থাকবে, কে জানে। এখনও এক জায়গায় পথ-তৈরির কাজ আটকে আছে। সেখানে বিরাট কালো পাথরের গা পাহাড়ের মাথা থেকে খাড়া নেমে গেছে নদীর ধারে। যেন একশো-তলা উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে নীচে তাকিয়ে দেখা। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙে পথ তৈরির চেষ্টা চলেছে। আপাততঃ পাথরের গায়ে কোন রকমে পা ফেলার একটু জায়গা করা। কোথাও বা কাঠের মাচান পাতা। কোথাও বা পাহাড়ের গায়ে মোটা রশি বাঁধা, হাতে ধরে মনে সাহস পাওয়া যায়। দু-তিনশ হাত মাত্র—এইভাবে পথের দুদিকের মাঝে বিচ্ছেদ। কিন্তু, তাই কি কম! দেখেই মাথা ঘোরার কথা। পড়লে কি হবে, নীচে নদীর উদ্দাম স্রোতের ভীষণ গর্জন সেই শেষ সঙ্গীতই শোনায়। অবশ্য এমন পথ যে অন্যত্র আগে দেখিনি তা নয়। তবু থমকে দাঁড়াই,—সঙ্গীতের

কথা ভেবে। মজুররাও ছিল, দিলীপও সেখানে অপেক্ষা করে। প্রয়োজন মত হাত ধরে অতি সাবধানে একে একে সকলকে সেই বিপদসংকুল স্থানটুকু পার করায়। সেই বৃদ্ধা গোমুখযাত্রিণী দেখি নির্ভয়ে চলে আসেন।

তখনই নজর করি, গোমুখ দর্শনে আরও সাত-আটজন সাধারণ যাত্রীও চলেছেন।

আমাদের দলেব কথাও এবার লিখি।

আমরা চারজন। সুন্দরানন্দজী। ওঁর এক সঙ্গী। নাম, পট্টবর্ধন। পুণায় চাকরি করেন। পত্রযোগে স্বামীজীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছেন। স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী যুবাপুরুষ। শীতের মধ্যেও হাফ্‌প্যাণ্ট, শার্ট ও পুলওভার পরে যাত্রা শুরু করেন। পিঠে বোঝা বাঁধা! নিজের যা কিছু জিনিসপত্র, কাপড়-জামা, কম্বল। স্বামীজীর সঙ্গে একই তাঁবুতে থাকবেন। তাঁর পিঠের মাল তেমন ভারী না হলেও দুশ্চিন্তা হয়, এই দুর্গম পথে বরফের রাজ্যে বইতে পারবেন তো? স্বামীজী আশ্বাস দেন, বহুত ঘুরেছে। জোয়ান মরদ আছে। পারবে না কী?

গাইড দিলীপ সিং ছাড়া আমাদের মালবাহক চলেছে ছয়জন। তাদের মধ্যে তিনজন পূর্বেও এপথে এসেছে। স্বামীজীর স্বতন্ত্র মোটবাহক। ওঁর তাঁবু ইত্যাদি সে-ই বইছে। আমার কুয়ারি-যাত্রাপথের গাইড বীরসিংও হৃষীকেশ থেকে সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কুমায়ুনের লোক। অঞ্চল এ তার অপরিচিত। তবুও পাহাড়ের দুরূহ পথের অভিজ্ঞতা আছে। সাহসী, সাবধানী, আমার জানাশোনা, রান্নার কাজেও কারিৎ-কর্মা, তাই চিঠি দিয়েছিলাম আসবার জন্যে।—সবাই মিলে দলের সংখ্যা হয় পনেরো।

পনেরো জন,—অনেকের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। তবুও, সবাই যেন এক গ্রন্থিতে বাঁধা। অজানা পথের দুস্তরতা অগোচরে নিবিড় সম্বন্ধ ঘটায়। মনে হয়, পরস্পর পরম আত্মীয়। সবাই স্বতন্ত্র, অথচ সবাই মিলে এক। যেন, সৈনিক নিয়ে সেনাদল। দলের একমুখী লক্ষ্য। জীবনমৃত্যুর সহচর।

স্বামীজী জানান, পথে আর এক সাধুরও যোগ দেবার কথা। স্বামী সারদানন্দজী। হৃষীকেশের প্রসিদ্ধ শিবানন্দ স্বামীজীর শিষ্য।

শুনেই বলি, কিন্তু তাঁর কি যাওয়া সম্ভব হবে? এই তো গঙ্গোত্রীতে খবর পাওয়া গেল—তাঁর গুরুদেবের দেহান্ত হয়েছে। সুন্দরানন্দজী বলেন, তবুও তিনি যাবেন জানিয়েছেন।

সারদানন্দজী, শুনি, পূর্বাশ্রমে বড় এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ভালো ফটোগ্রাফার বলেও খ্যাতি ছিল। সাধুজীবনের প্রথমে ক্যামেরাগুলিও সঙ্গী ছিল। এখন সে সব কিছুই ত্যাগ করেছেন। গঙ্গার অপর পারে চীরবাসার সেই ধর্মশালার উল্টোদিকে এপারে কুটিয়া তুলে একা থাকেন। গোমুখের পথে সেইখানেই আমাদের রাত্রিবাস হবে। শুধু আমাদেরই নয়। নদীর এপার

দিয়ে যাবার পথে যাত্রীদল তাঁরই আশ্রমে রাত কাটায়। অন্য কোথাও কোন ধর্মশালাও নেই।

গঙ্গার নিকটে আশ্রম। পাশেই পাহাড়। আশেপাশে চীর ও ভূর্জগাছের বন। অতি শান্ত মনোরম পরিবেশ। দুইটি কুটিয়া। ভূর্জগাছের কাঠ-ডালপালা দিয়ে তৈরি। সাধুজী সাদরে অভ্যর্থনা করেন। নিজের ঘরখানি আমাদের জন্যে ছেড়ে দেন। সুন্দরানন্দজীর সঙ্গে তিনি রাত কাটাবেন অপর কুটিয়ায়। উঁকি মেরে দেখি সেটি পাকশালা। দিলীপ সিংরা ভূর্জগাছের তলায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে। সেই বৃদ্ধা গোমুখযাত্রিণী পাহাড়ের কিছু উপরে গিয়ে ওঠেন—এক গুম্ফায়। একাকিনী সেইখানে থাকবেন। সেই একই কথা,—আমার আবার ভয়ডর কিসের? খাসা থাকব ঐখানে।

সারদানন্দজী সাগ্রহে নিজের ভাণ্ডার খুলে দেন। বলেন, আজ আমার ভাণ্ডারা। তোমাদের জিনিসপত্র বন্ধ থাক। সব আমি দিচ্ছি।

নিষেধ সত্ত্বেও শোনেন না। এতগুলি লোকের আয়োজনের ভার তিনিই নেন। প্রাণখোলা আচরণ। দুই স্বামীজী মিলে পাকও করেন।

আশ্রমের প্রাঙ্গণে বড় বড় পাথর—বেদীর মত। বসবার সুন্দর স্থান। বিকালে তারই উপর বসে হিমালয়ের নিভৃত আশ্রমের শান্তি উপভোগ করি।

সারদানন্দজীও এসে কাছে বসেন। আলাপ করেন। ইংরেজীতে। ভদ্র শিক্ষিত মন। এখন একান্তে ধর্মচর্চায় জীবন কাটান। অনেকক্ষণ বসে সহৃদয় আলোচনা করেন। তাঁর ব্যবহারের আন্তরিকতায় আনন্দ পাই। তাঁর গুরুদেবের দেহাবসানের কথাও ওঠে। তবুও, কাল আমাদের সঙ্গে যাবেন, জানান।

রাত্রে আরামে শয্যাগ্রহণ করি। কিন্তু দেহের উপর দিয়ে সারারাত মূষিক-বাহিনীর যাতায়াত চলে। মনকে আশ্বাস দিই, হিমালয়ে যোগাসীন সাধুদের অঙ্গে, শুনেছি, সাপ ঘোরে, তবু তাঁদের ধ্যানের বিঘ্ন ঘটে না, সাধারণ যাত্রীর বুকে এ তো সামান্য মূষিক মাত্র!

সকালে সবাই প্রস্তুত। ভারবাহকরা মালপত্র নিয়ে এগিয়ে চলে। সুন্দরা-নন্দজী বলেন, চলুন, এবার আমরা রওনা হই।

খোঁজ নিই, সারদানন্দজী কই? আগে গেছেন বুঝি?

সুন্দরানন্দজী জানান, না, তিনি যাবেন না। হৃষীকেশে চলে গেলেন,—গুরুর আশ্রমে।

আশ্চর্য হই;—সে কি! কখন গেলেন? ভোরেও তো দেখলাম, মুখ হাত ধুচ্ছেন। সম্ভাষণ জানালাম। তিনি তো কোন কথাই বললেন না। সঙ্গে যাবেন না,—সে কথাও নয়। হৃষীকেশ চলে যাচ্ছেন—তাও না! যাবার আগে অন্ততঃ একবার বিদায়-সম্ভাষণও জানাতাম। অনেক আদর-যত্ন পেয়েছি।

সুন্দরানন্দজী বলেন, রাত্রে শুয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ তাঁর মত বদলে গেল, বললেন, হৃষীকেশেই চলে যাই।—এই একটু আগে গেলেনও তাই।

মনে মনে ভাবি, কালকের অতো আন্তরিক আলাপ-পরিচয়, আতিথেয়তা। এ সবের কি কোন অর্থই নেই এঁদের কাছে? বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র তার মন। কখন কোন্ পথে তার গতি,—কে জানে?

এই ধরণেরই পরিচয় পাই কয়েকদিন পরে এমন কি সুন্দরানন্দজীর আচরণেও।

দীর্ঘ দশ দিন একসঙ্গে এই দুর্গম পথে চলে বদরীনাথে পেঁছুই। এক রাত সেখানে কাটাই। পরের দিন আমরা চারজন বদরীনাথের সাধারণ যাত্রাপথ ধরে হরিদ্বারে ফিরে চলি। সুন্দরানন্দজী দু-এক দিন পরে বদরীনাথ থেকে আবার গঙ্গোত্রী ফেরেন এই হিমবাহের পথে। বদরীনাথ ছাড়ার আগে স্বভাবতই স্বামীজীর কাছে বিদায় নিতে চাই। পাশের ঘরেই তিনি আছেন। অথচ, সকাল থেকে দেখা নেই। স্নানঘরে ঢুকে সেই যে দরজা বন্ধ করেন আর খোলেনই না। সকলে বহুক্ষণ অপেক্ষা করি, ডাকাডাকিও করা হয়, তবুও বার হন না, সাড়াও দেন না। চলে আসার আগে দেখাও হয় না, বিদায় নেওয়ার পাটও সারা হয় না। তাঁর কাছে বিদায় চাওয়া,—সাধারণ কর্তব্যপালন করা তো নয়, কয়দিনের সুখ-দুঃখের হাসি আনন্দের অন্তরঙ্গ নিত্য সহচর তিনি।

মনে পড়ে, শিশুদের কথা। প্রিয়জন চলে যাবার সময় কিভাবে লুকিয়ে বেড়ায়। শিশুসুলভ নির্মল কোমল সাধুরও মন।

॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় রাত্রি কাটে গোমুখের কাছেই। ১৩,৭৭০ ফুট উঁচুতে।

তাঁবুতে বাস শুরু হয়। সেই বদরীনাথে আবার পাকাবাড়ির আশ্রয়। প্রকৃতির এই পরিবেশে—পরিব্রাজক জীবনে—তাঁবুর মধ্যে আপন গৃহসুখের অধিক আনন্দ পাওয়া যায়। যেমন, অজানা অচেনা পথিকবন্ধুদের ক্ষণিক সঙ্গও পরম আত্মীয়তার স্পর্শানুভূতি জাগায়। জগতে কে যে আপন, কে যে পর,—হিসাব মেলে না। কোথা যে ঘর, কোথা যে পথের শেষ,—তাও জানি না।

সঙ্গীরা যান গোমুখে স্নানের উদ্দেশে। আমি বসে থাকি, প্রকাণ্ড এক পাথরের উপর। উপরটা সম্পূর্ণ সমতল। যেন বিলিয়ার্ড টেবিল। হাতের পরে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি। পাষাণ-শয্যা,—কিন্তু কোথায় লাগে কোমল গদির বিছানা। যেন, হিমালয়ের বুকে আপনি-ফোটা ফুলের বাহার, আর শহরের ঘরে ফুলদানিতে সাজানো প্ল্যাস্টিকের ফুল। এই শীতের মধ্যে পাষাণ-পালঙ্কের রৌদ্র-তপ্ত স্নিগ্ধ স্পর্শ। মাথার উপর সুনীল আকাশ। সুমুখে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। তারই একপাশে দূরে ভাগীরথীর তিন তুষারশিখরের দুই-টিকে দেখি (২১,৩৬৪; ২২,৪৯৫ ফুট)। যেন, যমজ ভাই, আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে আছে। আর একদিকে আকাশে মাথা তুলে—শিবলিঙ্ শিখর (২১,৪৬৬)। অপরূপ আকৃতি। শিবলিঙ্গের কথাই স্মরণ করায়। বিদেশীরা প্রথম দেখে,

নাম না জানায়, বর্ণনা করেন Matterhorn Peak বলে। Alps-এর সেই প্রসিদ্ধ চূড়ার সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

Marco Pallis দেখে বলেন, "horrid-looking mountain with a striking resemblance to the Matterhorn, as it might appear in a nightmare"—অন্যত্র লেখেন, "the huge pinnacle that we called the Matterhorn, half spire, half tower red rock at the bottom, snow-powdered yellow at the top ; beautifully alluring, hideously inaccessible."

বিদেশী পর্বত-অভিযাত্রীর চোখে দেখা শিবলিঙ্গ-প্রতিম হিমশিখর।

আমার শয্যার অনতিদূরে ভাগীরথী বয়ে চলেন। উপলব্যথিত গতি। মধুর কল্লোলধ্বনি। রুদ্ধ তুষারগৃহের দুয়ার খুলে জননী বাইরে আসেন। শৈল-সোপান বেয়ে নামার পথে সন্তানদের ডাকতে থাকেন।

গোমুখের পুণ্যতীর্থ। মন্দির নেই। পাণ্ডা নেই। পূজারী নেই। যাত্রী সমাগমও নেই।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, গঙ্গোত্রীর ঐ হিমবাহ এককালে বিস্তীর্ণ ছিল গঙ্গোত্রীর তীর্থক্ষেত্র পর্যন্ত,—যেখানে এখন গঙ্গাদেবীর মন্দির। এখান থেকে আরো মাইল আঠারো নীচে। সেইখানেই তখন তুষারবিবর—Glacier-এর snout থেকে ভাগীরথীর প্রথম জলরূপে প্রকাশ দেখা যেতো। গঙ্গোত্রীতে নদীর বুকে ও আশপাশের পাথরের আকৃতি তারই সাক্ষ্য দেয়। কালক্রমে সেই হিমবাহ পেছিয়ে আসে। এখনও প্রতি বছর বরফ গলার পর এই গোমুখ-গুহা একই স্থানে থাকে না, আকারেরও হয়ত প্রভেদ হয়। শিল্পী যেন তুষার-স্তূপ দিয়ে মূর্তি গড়েন, ভাঙেন, আবার নতুন করে গড়েন। ভাঙা-গড়ার মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টার নিত্য খেলা চলে।

গঙ্গার উৎসমুখ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা লেখেন :

'The source of a mountain river is the place where the glacier melts into water ; it is the place where water issues. The Ganges has innumerable sources, of which all the most important have been known for centuries."

আবার,

"The lower end of a glacier is known as its snout, and at its snout there is an "ice-cave" from which water issues. The change from ice to water marks the "source" of a river ; every such ice-cave is a source of a river. The ancient Hindus gave the name Gau Mukh (the cow's mouth) to the ice-cave near Gangotri, which appeared to them to be the principal source

of the Bhagirathi branch of the ganges."

[Col. S. G. Burrard & H. H. Hayden : A sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet]

এই সেই ভাগীরথীর উৎসমুখ। কলুষনাশিনী গঙ্গা। অতি পবিত্র নির্মল বারিধারা। জলে কীট জন্মে না— শোনা কথা নয়, চোখে দেখাও।

১৯২১ সাল। বাবা লাহোরে চলেন পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে ভাষণ দিতে। সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ পাই। সেখানে থাকবার আয়োজন হয় ডাঃ বালকিষণ কাউলের বাড়িতে। বাংলাদেশের ডাক্তার তখন নীলরতন সরকার, পাঞ্জাবের ডাক্তার বালকিষণ। কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। সৌম্য গম্ভীর মূর্তি। বিরাট খ্যাতি। বিপুল প্রতিপত্তি। সাজানো-গোছানো বাড়ি। দামী আসবাবপত্র। ঘরের মেঝেতে রঙীন কার্পেট বিছানো। এক-একটার দাম শুনি দু হাজার, তিন হাজার টাকা। পা ফেলতে সঙ্কোচ জাগে, যেমন হিমালয়ের পথে ফুল মাড়িয়ে চলতে! বাইরে ও পোশাকে সাহেবী চাল-চলন। কিন্তু, অন্দরমহলে ভোজনগৃহে বিশুদ্ধ হিন্দু আচার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিকানো ঘরের মেঝে। মাটিতে বসে খাওয়াব প্রথা। বাবার কাছে গল্প করেন, বারো মাস জল খান গোমুখ-থেকে-আনা গঙ্গাজল। বরফের গুহার কাছে ধরা। পেতলের কয়েকটা ঘড়া করে আসে। জল ভরে সীল করে মুখ বন্ধ করা। কয়েক হাজার টাকা খরচা পড়ে প্রতি বছর লোক পাঠিয়ে আনাতে।—সারা বছরেও পোকা ধরে না।

গোমুখ! বরফের গুহা! হাজার হাজার টাকা খরচ করে জল আনা! সুদূর সভ্যজগতে ঘরে বসে সেই জল প্রত্যহ পান করা! পরম শ্রদ্ধা ও তৃপ্তিভরে।— যেন, ঠাকুরমার ঝুলির উপকথা! অবাক হয়ে তখন শুনি।

কিন্তু, পরের বছরেই বাবার কাছে কয় ঘড়া জল সেইভাবে আনিয়ে পাঠান। আসা মাত্রেই কলকাতায় বসে একটা ঘড়ার মুখ খুলে সকলে তৃপ্তিভরে গোমুখের সেই দুর্লভ চরণামৃত বারি পান করি। বিশেষ কাজেকর্মে অনুষ্ঠানে ব্যবহারও চলে।

কিন্তু, দু বছর পরে প্রবাসে বাবার অতি-আকস্মিক দেহান্তের সময় এই গোমুখ-বারি পাঠানো সম্ভব হয় নি। যদিও, তারও চৌত্রিশ বছর পরে মায়ের অন্তিমকালে এই সঞ্চিত বারিবিন্দুর সুব্যবহার হয়।

তখনও ঘড়ার সে-জল তেমনি—নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, কীটশূন্য।

পরের দিন। গোমুখ ছাড়িয়ে অজানা নতুন পথে যাত্রা। হিমবাহের উপর চলা শুরু, তারই উপর রাত-কাটানো। না আছে পথ, না আছে পূর্বগামী যাত্রীদের রেখে-যাওয়া পথ-নির্দেশ। চলতে হবে দিক্ দেখে, চারিপাশের তুষার-শিখরগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে। তারাই যেন আঙুল তুলে দেখায়, ও-পথে নয়, এদিকে এসো, এখানে কেন? ওপাশে যাও! যেমন, তেপান্তরের মাঠে এখানে-ওখানে দু-একটা গাছের সংকেত।

দূর থেকে হিমবাহগুলি দেখে ধারণাই হয় না, সেই তুষারজটাজালে প্রবেশ করে দিক্ ঠিক করে চলা কতো কঠিন, কী নিদারুণ শ্রমসাধ্য।

দূরে থেকে গ্লেসিয়ারগুলি দেখায়,—সরল সমতল তুষার-প্রান্তর। কাছে এলে প্রকাশ পায়, Boulders বা শিলারাশির স্তূপ; crevasse বা বরফের ফাটলগুলির মুখব্যাদান। গোলকধাঁধায় যেন পথ হারায়। বাইরে থেকে যেমন 'ভুলভুলিয়া' কুঠির মারপ্যাঁচ বোঝাই যায় না।

বোঝা যায় না বলেই হয়তো বুকে এতো সাহস নিয়ে এগিয়ে চলি। মনে দৃঢ় বিশ্বাস,—এ তুষার-সাগর শেষ হবেই।

হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার-এর রূপের অল্প পরিচয় দিই।

পাহাড়ের মাথা থেকে ঝরণা নামে। প্রাকৃতিক ধর্মে জলের ধারা নীচে আসে। এইসব ক্ষুদ্র ধারা উপত্যকায়—ভ্যালিতে নেমে নদীর রূপ নেয়। উপত্যকার ক্রমনিম্নভূমি ধরে বয়ে চলে—সাগর উদ্দেশে।

তুষার-শিখরগুলি থেকেও তেমনি নামে,—স্বভাব-ধর্মে ও প্রকৃতির দুর্যোগে—জল নয়, রাশি রাশি বরফের স্তূপ। সেসব তুষারধারা এসেও উপত্যকায় মেলে। নদীর আকৃতি নেয়। কিন্তু, জলের প্রবাহ নয়, তরঙ্গবেগ নয়;—হিমবাহ।—বরফের জমাট নদী। প্রতি বছর বরফ জমে, নতুন তুষারপাতও হয়, হিমবাহের আকার ও গভীরতাও বাড়ে। মনে হয়, নিশ্চল, গতিহীন। কিন্তু, প্রকৃত তা নয়। অতি ধীর মন্থর গতি। দেখে বোঝা যায় না, চোখে ধরা পড়ে না। উপর দিয়ে পায়ে হাঁটলেও নয়। যেমন, পৃথিবী মনে হয়,—অচল, স্থির; যেমন ঐ আকাশে তারার আলো!

গ্লেসিয়ারের রূপভেদে, স্থানভেদে গতিবেগের বিভিন্নতা আছে। সারা বছরে হয়ত মাত্র কয়েক শত ফুট এগিয়ে চলে। ভূতত্ত্ববিদ্ মাপজোপ করেন, রেকর্ড রাখেন। তাঁদের বিজ্ঞানে সময়ের মাপকাঠি অতি দীর্ঘ। বিশ-পঞ্চাশ হাজার বছর আমাদের যেন একটা দিন-রাত্রি। ব্রহ্মার ঘড়িতে সময় দেখা।

গ্লেসিয়ারের গতিবেগ নির্ধারণ করার নানান্ পদ্ধতি। সহজ উপায়,—কোন বছর গ্লেসিয়ারের উপর দিকে কারও কোন ভারী জিনিস হয়ত পড়ে গেছে,—কতো বছর লাগল সেটি নীচে আসতে,—তারই মাপ নেওয়া। কিন্তু, এখানেও

আবার হিসাব রাখতে হয়, —বরফের গতিশীলতার পরিপন্থী বা পৃষ্ঠপোষক আর কি ছিল!

ইংরেজিতে 'আইস্' ও 'স্নো'—দুটো ভিন্ন বস্তু। পাহাড়ের মাথায় বা শীতের দেশে বরফ পড়ে,—সেটা 'স্নো-ফল'। পেঁজা তুলার মত নিঃশব্দে আকাশ থেকে যেন ঝরে আসে। সেই স্নো বা তুষারকণাগুলি যখন শক্ত জমাট বেধে যায়, হাতের মুঠোয় গুঁড়া করা যায় না, সহজে ভাঙা চলে না, কাঁচের মত মসৃণ ও দৃঢ় হয়ে ওঠে,—তখন আর স্নো থাকে না, আইস্-এ পরিণত হয়। 'বরফ' বলতে আমরা এত তারতম্য বুঝি না। এখানে আপাতত (ice) বরফ ও (snow) তুষার দুই ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি।

বরফ—আইস্-ই…গ্লেসিয়ারের প্রধান অঙ্গ। অনেক সময়ে উপরে স্নো বা তুষার-আস্তরণ থাকে। গ্লেসিয়ারের অন্তর্দেশেও মাঝে মাঝে তুষার পাওয়া যায়। বছর বছর তুষার জমে, বরফ হয়ে গ্লেসিয়ারের জন্ম। গ্লেসিয়ারের বাইরের চেহারায় তুষার ও শক্ত বরফ, কিন্তু তারই বহু নীচে ভেতরের তাপমাত্রায় বরফ গলে, অলক্ষ্যে হয়ত অন্তঃসলিলা জলধারা বয়ে চলে। উপরের বরফও গতিশীল হয়। দুই পাশের পাহাড়ের গায়ে ঘর্ষণ লাগে। নিম্নগতিরও আকর্ষণ থাকে। ফলে, কোথাও বা সেই বরফের বিরাট স্তূপে ফাটল ধরে,—যেন মুখব্যাদান করে। ভেতরকার জলের ধারাও তখন প্রকাশ পায়। ছোটবড় জলাশয়েরও কোথাও সৃষ্টি হয়। গ্লেসিয়ারের গভীরতারও সেইখানে কিছু আভাস মেলে। গ্লেসিয়ারের উপর চলতে এই ধরণের ছোটবড় বিভিন্ন আকারের বহু ফাটল পড়ে, কখনো বা তার মধ্যে নীচে তাকিয়ে তল দেখা যায় না। এই ফাটলগুলির ইংরেজী নাম crevasse। যে পথে আমরা চলেছি সেখানে এই crevasse-এরই আতঙ্ক। তার মধ্যে পড়লে বেঁচে উপরে ফেরা দুর্লভ ভাগ্যের কথা।

গাইড্ দিলীপ সিং অতি শান্ত ধীর। এ পথের বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখে। যাত্রার আগে সে-ও গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করে—ওখানকার কথা কিছুই বলা যায় না, কেউ জানে না কোন্ বছর বরফের কিরকম চেহারা থাকবে, ফাটলগুলো কোথায় বা কী রকম। এতোবার গেলাম এলাম,—তবুও ঐ পথের কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে!

কথা শুনে মনে মনে ভাবি, ভাগ্যে আগে দেখি নি, তাই তো নির্ভয়ে চলি!

এই crevasse-এর ফাঁকে বরফের গা দেখে বিশেষজ্ঞরা গ্লেসিয়ারের বয়স বলে দেন। প্রকৃতির নিয়ম, প্রতি বছরের জমা বরফের পর একটা করে দেখা দেয়,—সোজা লাইন। যেন, বার্ধক্যের বলিরেখা। ইংরেজিতে veined stucture বলে। গাছ কাটলে গুঁড়ির মধ্যেও চক্ররেখা—rings দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক তাই দেখে গাছের বয়স বলেন।—এখানে বলা যায় veins দেখে।

নানান্ কারণে গ্লেসিয়ারের রূপভেদ আছে, বহিরাবরণেরও প্রভেদ হয়। যেমন থাকে, মানুষের আবার, প্রকৃতি ; আবার বেশভূষার পার্থক্য ও বৈচিত্র্য।

সাধারণতঃ গ্লেসিয়ারের মুখে অর্থাৎ প্রথম পেঁছেই পাওয়া যায় moraine,—পাহাড়ের যত ধ্বংসাবশেষ,—রাবিশ্। নীচে অদৃশ্য হিমবাহ, উপরে মাটি বালি শিলাস্তূপের আচ্ছাদন। নদীতে যেমন পলি পড়ে। আশপাশের পাহাড় থেকে বা পাহাড় ভেঙে—অথবা avalanche-(হিমসম্প্রপাত)-এর সঙ্গে নীচে পড়ে গ্লেসিয়ারকে ঢেকে ফেলে, গ্লেসিয়ারের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে এগিয়েও যায়। গ্লেসিয়ারের উপর এই ধরনের মাটি-পাথর-বালির স্তূপ ছোট বড় পাহাড়ের আকারও ধারণ করে। গ্লেসিয়ার পার হতে সেই সব পাহাড়ও অতিক্রম করতে হয়। বদরীনাথ ছাড়িয়ে শতোপন্থ-তালে যেতে একটানা পেয়েছিলাম।

গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের শেষপ্রান্ত—অর্থাৎ নীচে থেকে প্রথমেই গোমুখ। তাই গোমুখ ছেড়ে চলতেই moraine শুরু হয়। বরফের উপর চলা, অথচ বরফ দেখি না। শিলাস্তূপের পাশ দিয়ে বা পাথর থেকে পাথরে ডিঙিয়ে ভার সামলে চলা।

সেইমতই চলা আরম্ভ করি।

॥ ১১ ॥

সঙ্গীদের সকলেরই মনে বিপুল উৎসাহ। চেনা পথ ফেলে এবার অচেনা নতুন রাজ্য। বিপদের আশংকা—সে তো আছেই। দুর্গম পথের তাতেই মর্যাদা। বিপদ কাটাবার সাহস ও শক্তি মনে আপনা থেকেই জাগতে থাকে। আগুনের দিকে উড়ে চলাই পতঙ্গের খেলা।

মনে পড়ে, কবির ভাষা : কোমল-সুখ-শয়ন ?

"ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণ কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।"

সারাক্ষণই উৎসাহ দেন সুন্দরানন্দজী। শেষরাতে সবাই জেগেছি তাঁর সুমধুর কণ্ঠের শিবস্তোত্র শুনে। সকালের খাওয়া-দাওয়া, তাঁবু তোলা, মালপত্র বেঁধে যাত্রা শুরু করা—সবই হয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে। এই দেখি, এখানে কাকে কি নির্দেশ দেন, আবার পরক্ষণেই দেখি, ওই ওখানে একটা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ভারবাহকদের কার বোঝা ঠিক বাঁধা হয় নি দেখিয়ে দেন। তারই এক ফাঁকে একগাল দাড়িভরা হাসিমাখা মুখে কাছে এসে খবর নেন, কে কেমন আছি, চা-খাবার ঠিক পেয়েছি তো ?—চারিদিকেই তিনি যেন ছড়িয়ে থাকেন। সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। অফুরন্ত উদ্যম। স্নেহপরায়ণ।

দিলীপ কাজ করে শান্তভাবে। কোন উত্তেজনা নেই, চাঞ্চল্য নেই। ধীর, স্থির। বোঝাগুলি সমান ভারের হল কিনা হাতে তুলে পরীক্ষা করে, বুঝতেও

পারে। ওজন সম্বন্ধে মতভেদ হলে বলে, খুলে না হয় কিছু বার করে দাও, আমি বইব।

তার নিজের কাছে সামান্য মাল। স্বামীজী সঙ্গে থাকলেও দিলীপেরও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আছে। তা ছাড়া, কখন কাকে কিভাবে পথে সাহায্য করার প্রয়োজন হয়, বলা যায় না। বিপদ যেন পথের আনাচে-কানাচে উঁকি মেরে দাঁড়িয়ে আছে, বাঘের মতো কখন বুঝি বা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই সব সময় দিলীপ সঙ্গে চলবে, হাত ধরবে,—দরকার হলে কাঁধে বা পিঠে বইতেও তৈরি।

সকালে প্রাতঃরাশ সেরে যাত্রা। পকেটে শ্রীমতী ভক্তির দেওয়া চকোলেট, বাদাম, কিস্‌মিস্‌ ইত্যাদি। পথে আবার কোথাও চায়েরও একবার ব্যবস্থা হবে, সঙ্গে চীজ্‌ ও বিস্কুট। তারপর, আবার চলা। বিকেলে তাঁবু ফেলা। তখন দিনান্তে একবারই ভোজনের আয়োজন।

স্বামীজী জানান, স্ফূর্তি করে চলুন। আজ নন্দনবনে রাত কাটানো। দেখবেন, সত্যি স্বর্গবাস। এই তো,—মাইল তিনেকও হবে না—সারাদিনে এটুকু চলে যাবেন—ধীরে ধীরে অতি সহজেই।

উৎসাহ-বাণী। কিন্তু জানি, এ-সব রাজ্যে মাইলের দাম নেই। সারাদিনে তিন মাইল। শুনতে বেশ লাগে। অথচ, সারাদিন চলেও শোনা যেতে পারে হয়ত দু মাইলও আসি নি। ক্লান্তির পরিমাপে মনে হবে, দশ মাইল দূর। বিচিত্র রাজ্য।

তাই, চুপ করেই চলি। ধীর পদে। সবাই তো যাবেন, সেইমত যেতেও হবে। পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেন স্বামীজী। দরকার হলে ডাক্তার বিশ্বাসের হাত ধরেন। তাঁদের পিছনে শ্রীমতী ভক্তি। সঙ্গে দিলীপ। বীরসিংও কাছাকাছি থাকে। সবার পিছনে চলি আমি। ইচ্ছা করেই। মেজর বসুও অনেক সময় সঙ্গ রাখেন। আমার পিছিয়ে থাকার বিশেষ কারণ আছে। সঙ্গীরা কে কি রকম চলতে পারবেন, জানা নেই। সব চেয়ে লঘুগতি যিনি যাবেন, তাঁকেও পেঁছুতে হবে। সবার শেষে পিছিয়ে পড়লে তাঁর মনের সাহস ও বল হারানো সম্ভব। কিন্তু আরও কেউ আসছে জানলে চলার প্রেরণা থাকে। এতে আমার ব্যক্তিগত লাভও হয়। স্বাভাবিক গতির চেয়ে ধীরে চলায় দম থাকে, অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধও হয় না।

দলের সবাই আগে পিছে চলি বটে—যে যার মতন—, কিন্তু কেউ দৃষ্টির অন্তরালে থাকি না। বিচ্ছিন্ন হলেও দৃষ্টির গ্রন্থিতে বাঁধা। নইলে কোন্‌খান দিয়ে যেতে হবে জানা যাবে কি করে?

গন্তব্যের প্রতি এই স্থিরতা থাকলেও, কে কোথায় পা ফেলি তার কিন্তু মিল থাকে না। এ তো ধূ ধূ করছে মাঠ নয়, নদীবুকে বিস্তীর্ণ জলপথও নয়,—যে যেখান দিয়ে যাই না কেন, একই কথা!—এখানে চারিপাশে উপলরাশি,—ছোট বড় নানান্‌ আকার, বিভিন্ন বর্ণেরও। পাথর থেকে পাথরের উপর পা ফেলা। হঠাৎ দেহের ভার পেয়ে পাথর নড়ে ওঠে—যেন মাথা নেড়ে বারণ

করে, কখনো বা উল্টে ঘাড় থেকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে চায়। প্রতি পাথরে হয়ত দুই পা একসঙ্গে রাখবার স্থানও নেই। একটা পায়ে ভর দিয়ে অপর আর এক পাথরে আর এক পা এগিয়ে ফেলা। এদিকে দেহে চলার গতিবেগ থাকে, তারই প্রভাবে আপনা থেকেই পা এগিয়ে যায়, দেখেশুনে পাথর বাছবার আগেই পা পড়ে। ফলে, পা পড়ে যায় হয়ত কোন হেলানো পাথরের গায়ে, কখনো বা ছুঁচালো পাথরের মাথায়। সে অবস্থায় স্থির হয়ে সামলে নেবারও উপায় দেখি না। পাশে উঁচু পাথর থাকলে হাতের ভর দিয়ে কোন-রকমে সামলাবার চেষ্টা, নয়ত তড়িৎগতিতে অন্য আর এক পাথরে লাফিয়ে আশ্রয় নেওয়া। শিলাগুলির নীচে গহ্বর,—কালো কালো চোখ মেলে যেন পিট্‌পিট্‌ করে তাকায়। সে-সব গহ্বরের ভেতরে পড়ার ভয় নেই, আশংকা থাকে যে কোন মুহূর্তে পা মচ্‌কে অক্ষম হওয়া অতি স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবেই অক্ষত দেহে এগিয়ে চলি। এখন লিখতে বসে ভাবতে ভয় হয়, তখন চলতে ভয়ের লেশমাত্র জাগে না। কোথা থেকে আনন্দ নেমে অন্তর ভরে রাখে। শংকা-সংকুল শিলারাশি যেন সম্মুখে গোলকধাঁধার ছক্‌ পাতে। পথ, মন ও চরণ—তিন বন্ধু যেন খেলতে বসে। পাথরগুলিরও চালচলন ও স্বভাবেরও পরিচয় পেয়ে যাই। খেলার দুর্ধর্ষ সঙ্গী,—পথেরই সাথী হয়।

মনে প'ড়, গোমুখের শতোপন্থের পথেও এই ধরনের পথ-চলার সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন মনে হয় সে যেন এই শিক্ষার প্রথম পাঠ।

নিশ্চয় পাথরগুলিরও যেন প্রাণ আছে, মন আছে। অন্তরে যেন বন্ধুত্বের নিবিড় বাঁধনে বাঁধা যায়। মর্মে মর্মে এ সত্য অনুভব করি। শ্রীমতী ভক্তিও তার প্রমাণ দেন। বলেন, আশ্চর্য দিলীপের ক্ষমতা। হাত ধরে নিয়ে চলে পাথর থেকে পাথরে। অপর হাতে তার আইস্‌-অ্যাক্স। মুখে কোন কথা নেই। শুধু অ্যাক্স-এর ডগা সামনে এগিয়ে দিয়ে অল্প ইঙ্গিত করে দেখায়, কোন্‌ পাথরে পরের পা রাখতে হবে। সব পাথরই যেন তার জানাশোনা—এমনি নিঃসংশয়। আমিও চলেছি নির্ভয়ে, তারই উপর নির্ভর করে। হঠাৎ আনমনে অন্য ভুল পাথরে পা ফেলতে গেলেই, হাতের অল্প টানে সাবধান করায়। তবুও কথা বলে না। মুখে বিরক্তিও ফোটে না। একই সতর্ক গম্ভীর ভাব। অথচ, প্রসন্ন। অদ্ভুত মানুষ।

॥ ১২ ॥

চলতে থাকি। বিশ্রামও করি। আবার চলি।

মাইলখানেক এগিয়ে এসে দেখি, উত্তর দিক থেকে আমাদের বাঁয়ে আর এক হিমবাহ নেমে আসে। গঙ্গোত্রী-গ্লেসিয়ারের সঙ্গে মেশে। জলের সঙ্গে জলের নয়, তুষার-ক্ষেত্রের সঙ্গে তুষার-ক্ষেত্রের সঙ্গম। অলক্ষ্যে বহু নীচে তুষারের অন্তরালে বিগলিত জলধারারও হয়ত স্রোতে স্রোতে মিলন ঘটে। এই হিমবাহের

নামও শুনি, ম্যাপ-এও দেখি। নাম না থাকলে, এই নামই দিতাম। রক্তবরণ গ্লেসিয়ার। অন্ধ সন্তানের পদ্মলোচন নাম রাখার রেওয়াজ মানুষের মধ্যেই আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নামকরণ মানুষ সঙ্গতি রাখে। বহুস্থানে তার প্রমাণ দেখি। এখানেও তাই। দুই দিকে পাহাড়ের অবরোধ, মধ্যে হিমবাহের আপাত-নিশ্চল প্রবাহ। তারই উপর কে যেন তুলি দিয়ে রক্তবর্ণের প্রলেপ দিয়েছে। গাঢ় লাল নয়,—ফিকে। রক্তাভ। দেখতে বেশ লাগে। চারিদিকে পাহাড়ের রুক্ষ রূপ। কালো পাথরের স্তূপ। সাদা বরফের স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা। তা'ই মধ্যে আচম্বিতে রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ লেপন। যেন, তাম্বুল-চর্চিত অধরের ঈষৎ লোহিত আভা। প্রকৃতির খেলা। বৈজ্ঞানিক কারণও নিশ্চয় আছে। বিশেষ কোন ধাতু বা অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাচুর্য হয়ত হবে।

রক্তবরণ হিমবাহ পাশে পড়ে থাকে। গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে এখনও চলা। শিলাস্তূপের মাঝে মাঝে জলের ক্ষুদ্র ধারা। কোথাও বা মাটির ফাঁকে গুপ্ত তুষার আত্মপ্রকাশ করে। কখনো বা ছোট হ্রদ, জল টলমল করে।

ছোট এক ঝরণার নিকটে মধ্যাহ্নের বিশ্রাম হয়। আধঝোলা বড় পাথরের নীচে আশ্রয় নিই। ক্লান্ত দেহ শান্তি পায়। এখানে ওখানে জমা তুষার। শীতল বায়ু। রোদের আমেজ উপভোগ করি। অল্প পরেই মনে হয়, অসহ্য তেজ। মাথায় যেন আগুন জ্বালায়। পাথরের ফাঁকা ছায়া খুঁজি।

আবার চলা। আবার পাথর লাফানোর কসরৎ দেখানো। বিশ্রামের ক্ষণিক সুখ নিমেষে হারিয়ে যায়। পথের যেন শেষ নেই। পাহাড় রাজ্য, ছোট বড় চড়াই-উৎরাই-এরও সীমা নেই।

দূরে বাঁ দিকে দুই পাহাড়ের ফাঁকে আর এক হিমবাহ জিহ্বা বার করে অস্তিত্ব জানায়। যেন তিব্বতী অভিবাদন। জিভ বার করে, দু হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুঠো করে হাত নাচানো। কৈলাস-মানস সরোবরের পথে দেখেছি।

ইনিই চতুরঙ্গী গ্লেসিয়ার। উত্তর দিক থেকে এসে গঙ্গোত্রী-হিমবাহে মেশে। সঙ্গমে মিলনের বিশাল আয়োজন। বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র। ভাঙাচোরা বিভিন্ন আকারের বরফের স্তূপ। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রাশীকৃত শিলাখণ্ড। মাঝে মাঝে ধারা। ছোট ছোট জলাশয়। যেন ভূকম্পনের ধ্বংসলীলা। এরই মধ্যে দিয়ে কোনক্রমে চলা। সারাদিনের পর মনে হয়, চলা তো নয়, দেহটাকে কোনক্রমে বয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই কি সহজ কথা! প্রথম দিনের অনভ্যাস ও হিমাঞ্চলের সূক্ষ্ম বাতাস শরীর আরও অবসন্ন করে। চরণ বিদ্রোহ জানায়। সঙ্গীদের দু-একজন স্বামীজীকে অনুনয় করেন, আজ তো আর পারা যায় না। এইখানেই কোথাও তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা করুন স্বামীজী!

সুন্দরানন্দজী প্রথমে মিষ্ট কথায় উৎসাহ দেন, এই তো চলে এলাম বলে, আজকের ডেরায়। চতুরঙ্গীটুকু পার হয়ে উপরে উঠব,—ঐ যে উঁচু জায়গাটা দেখছেন—ঐখানে। ঐ তো নন্দনবন। এখনি পৌঁছে যাব। গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার

এবার পড়ে থাকবে ডানদিকে। চতুরঙ্গী ধরে আমাদের চলা শুরু হবে।—দেখুন—একবার চতুরঙ্গীর পানে তাকিয়ে।

তাকিয়ে সত্যিই অবাক হই। মনে হয়, কে সে কবি, কবে কোন্ কালে নামকরণের মধ্যে এমন নিখুঁত রূপবর্ণনা করে গেছেন ?

নামকরণের আধুনিক ইতিহাস এই : Major Gordon Osmaston ১৯৩৬ সালে গঙ্গোত্রী triangulation বা জরিপ করেন। সেই সময়ে এই নামের প্রস্তাব হয়। ১৯৩৭ সালে J. A. K. Martyn ঐ পথে ঘুরতে বেরোন। তাঁর লেখা প্রবন্ধে (Himalayan Journal Vol. X, pp. 82-83) দেখা যায়, "The name suggested, but not yet officially accepted is the Chaturangi Bamak—because it has moraines of four colours down it." তখনও শিবলিঙ্ শিখরের নাম "Matterhorn Peak" বলেই লেখা হচ্ছে। ইংরেজ রাজত্বকালে জরিপের সময় শিখর, হ্রদ ও পাহাড়ের যে সব নাম সাধারণতঃ স্থানীয় লোকমুখে প্রচলিত, অথবা প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত ছিল, সেই নামই অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়ার রীতি ছিল।

Col. S. G. Burrard & H. H. Hayden তাঁদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—A Sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet-এ লেখেন :

"Ancient monuments are preserved by Archaeological Survey. They tell us of the history and arts and thoughts of peoples who lived and died in bye-gone epochs. Survey of India has in its keeping similar monuments of the past in the shape of geographical names. Ancient monument and coins appeal to us through our sight and our touch, ancient names impress us by their sound and harmony with their surroundings.'

গঙ্গার basin-অববাহিকা ক্ষেত্রের নামকরণ সম্বন্ধে বলেন :

"In no other region of the Himalaya have the mountain features been given so poetic a nomenclature as in the basin of the Ganges ; in no other region has such a valuable legacy of geographical names been handed down from so distant a past. These names furnish on unique example of ancient geographical art, an example that modern geography has admired and perhaps even envied."

চতুরঙ্গী। সাদা, লাল, নীল ও পীত—চার রঙের বিচিত্র সংমিশ্রণ। বিধাতার অপূর্ব সৃজন। প্রকৃতির প্রকৃত লীলানিকেতন। দেখে চোখ জুড়ায়।

আনন্দে মন ভরে।

কিন্তু, সুখ-দুঃখ নিত্যসাথী। যেমন, আলোয় ফেলে ছায়া। দিনের পর রাত্রি। পথ চলতে আবার বিপুল ক্লান্তি জাগে। দেহের বোঝা দুর্বহ বোধ হয়। দুস্তর পাহাড় যেন শরীরের সব শক্তি নিঙড়ে বার করে নেয়।

সঙ্গীরা স্বামীজীকে কাতরভাবে জানান, আর একটুও আজ চলা সম্ভব নয়। কাছেই কোথাও রাত কাটাবার ঠিক করুন।

কিন্তু সেনানায়ক অটল, কঠোর। নির্মমভাবে জানান, প্রথম থেকেই এইভাবে চললে এ পথ পার হওয়া সম্ভব হবে না। প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলতেই হবে। আজ ঐ নন্দনবনেই তাঁবু পড়বে।—বাক্যবাণ ছেড়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে তিনি এগিয়ে চলেন। ফিরেও তাকান না।

দেখান তো তিনি—ঐখানে! কিন্তু ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত চরণে 'ঐখানে'ও সে স্বপ্নলোকের মত বহু দূর হয়ে থাকে। দিলীপ কিন্তু তেমনি শান্ত। উদ্বেগ-বিহীন। প্রসন্ন বদন। সাহস, সামর্থ্য ও সহানুভূতির প্রতিমূর্তি। দেখলেই মনে বল ও ভরসা আনে। স্বামীজী এগিয়ে গেলে কথা বলে। অবিচলিত শান্ত কণ্ঠ। মৃদু হেসে শ্রীমতী ভক্তিকে বলে, মাঈজী, ভাববেন না স্বামীজীর কথায়। কেউ তো 'জান' দিতে এখানে আসে নি। সবাই যাবে। যে যার মতন। সবারই ক্ষমতা এক নয়। তাদেরও 'তাগদ' বুঝে নিয়ে যেতে হবে। ওখান পর্যন্ত না-ই যদি যেতে পারেন আজ, আগেই কোথাও তাঁবু লাগাতে হবে। তবে, জায়গাটা দেখে বাছতে হবে, ওপর থেকে পাথর পড়ার ভয় না থাকে। চলুন আপনারা—যতোখানি পারেন, আমরা তো সঙ্গেই চলেছি। দরকার হয় তো কাঁধেই তুলে নিয়ে যাব।—বলে মুখ ফিরিয়ে দেখে হাসে। গম্ভীর মুখের সেই প্রসন্ন অভয়-হাস্য পথ-চলার আনন্দ আনে, শক্তিও জাগায়।

সেদিন কিন্তু নন্দনবন পেঁছানো সামর্থ্যে কুলায় না। চতুরঙ্গীর অপর পাড়ে সঙ্গীরা কোনক্রমে পেঁছন। মাথা তুলে নন্দনবনের আবার চড়াই দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। চতুরঙ্গীর ধারে তাঁবু ফেলা হয়। দিলীপরা সবাই সব কিছুর ব্যবস্থা করে। শুনি, স্বামীজী ওপরে যথাস্থানে তাঁর প্রোগ্রাম-মত নিজের তাঁবু খাটিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর নিজের কুলি, সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গী পট্ট-বর্ধনও। তা থাকুন তিনি সেখানে। আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গীদের মধ্যে জল্পনা শুনি, দুইটা স্টোভের মধ্যে একটা এরি মধ্যে অকর্মণ্য হয়েছে। অপরটি স্বামীজীর কাছে। গাছপালা বহু পূর্বেই শেষ হয়েছে। জ্বালানী কাঠ পাওয়া সম্ভব দেখি না। ভক্তি পাকা গৃহিণী। সব কিছুর ব্যবস্থা রাখেন। গঙ্গোত্রীতে অতি উপাদেয় ডালপুরি তৈরি করে দিগ্বেন্দী সঙ্গে এনেছেন। পথে যথেষ্ট কাজ দিয়েছে। এখনও সঙ্গে আছে। তা ছাড়া, solid fuel-এর ছোট্ট ল্যাম্প বার করেন। চায়েরও ব্যবস্থা হয়। দিনান্তে ভোজনেরও আয়োজন হয়ে যায়।

শ্রান্ত দেহের বিশ্রামে কতো সুখ! উপরে আকাশ-ভরা তারা, চারিদিকে

হিমালয়ের নিবিড় শান্তি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই:

"The silence that is in the starry sky,
The sleep that is among the lonely hills."

॥ ১৩ ॥

ভোরে ঘুম ভাঙে। বিগত দিনের দেহের গ্লানি, পথশ্রান্তি কোথায় মিলিয়ে যায়। স্বপ্নের মত লাগে। নবীন প্রভাত দেহে-মনে নব উৎসাহ জাগায়। আবার পথের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হই।

নন্দনবনের সেই চড়াই অনায়াসে উঠি। এখন ভাবি, এ তো সামান্য। কালও তো পারা যেত।

সহাস্য বদনে স্বামীজী স্বাগত জানান। সৌম্যমূর্তি স্বর্গদূত। বলেন, দেখুন চোখ মেলে কোথায় এলেন!

তাঁকে দেখে গতদিনের বিচিত্র আচরণের কথা মনেও জাগে না। রাগ, বিরাগ, অভিমান অভিযোগ,—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত এ জগতে অলীক মনে হয়। দেহের মিলিয়ে যাওয়া গ্লানির মত সেও অদৃশ্য হয়। যেমন, পাহাড়ের উপত্যকা থেকে হাল্‌কা ফগ্‌এর কুণ্ডলী,—গোল পাকিয়ে ওঠে, হাওয়ায় ছড়িয়ে চোখের পলকে কোথায় মিলায়।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখি।

স্বর্গ-রাজ্য,—সে তো কল্পনার তুলিতে আঁকা। এ যে বাস্তব সত্য। উদ্দাম কল্পনারও সাধ্য নেই,—এই রূপ-রাজ্য বিচরণ করে। নন্দনবন ইন্দ্রের উপবন। ইন্দ্রদেব সেই স্বর্গরাজ্যের রাজা। নেমে এসে তিনিও দেখে যেতে পারেন,—মর্ত্যে প্রকৃতির এই আনন্দ-নিকেতন। এই দেখে সাজাতে পারেন স্বর্গের নন্দন-কানন।

গতকাল দেখেছি, নীরস তুষার-রাজ্য। হঠাৎ হয়ত কোথাও একটু রঙের ছোঁওয়া। ছেদহীন অমলিন শুভ্রতায় মহান্‌ রূপ আছে, জ্যোতি আছে, জানি। কিন্তু, স্বাদ নেই। যেমন, অবিমিশ্র শুদ্ধ জল—aqua pura.

যেমন হয়ত নির্গুণ ব্রহ্ম। মায়াবদ্ধ মানুষের মনের নাগালের বাইরে।

কিন্তু আজ?

ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিয়ে সাগরের আভাস দেবার প্রয়াসের মত বলতে হয়,—হঠাৎ যেন রসশূন্য নিষ্প্রাণ শহরের বৃহৎ প্রাসাদের ছাদে এসে দেখি, ফোটা ফুলে আলো-করা সাজানো সুন্দর বাগান—terrace garden. কিন্তু সে তো মানুষের হাতে-গড়া, তাই সৌন্দর্যের সীমা আছে, সংকোচন আছে। এখানে যে প্রকৃতির আপন-হাতে সাজানো।

তুষার-শিখরগুলির কোলে স্নিগ্ধ সবুজ মালভূমি। সাগরবক্ষ থেকে ১৪, ২৩০ ফুট উঁচুতে। মাইল তিনেক লম্বা। আধ মাইলটাক চওড়া। কচি ঘাসে ছাওয়া। যেন, সবুজ ভেলভেট্‌ পাতা। তারি মধ্যে নানা রঙের ফুলের

বিচিত্র বিন্যাস। নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত হাতের সূচীকর্ম। সেই ফুলের রাজ্যে সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে ক্ষীণকায়া জলধারা। স্বচ্ছ নীল রঙ্। আকাশের নীল, ঘাসের সবুজ, ফুলের নানান্ রঙ্—যেন স্নেহভরে নেমে আসে জলের বুকে, সাজি হাতে সাজাতে। মাঝে মাঝে উপলরাশি। স্তব্ধ হয়ে তারাও জলে ছায়া ফেলে। রূপের অরূপ খেলা দেখে।

নির্বাক হয়ে আমিও দেখি।

'পথের দুধারে চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে বরণে বরণে।'

ভাবি, এও তো ভাগীরথীর উৎস-ধারা। তুষারের অন্তরালে নিভৃতে গোপনে এগিয়ে যায়। গঙ্গোত্রী হিমবাহে আত্মোৎসর্গ করে। এই তুষার-রাজ্যই তো গঙ্গার প্রস্রবণ-ক্ষেত্র। মায়ের জন্ম ও বাল্যভূমি। এখানে পরিণতা ভাগীরথীর চিরপরিচিত গৈরিক বসন নয়। দুকূলপ্লাবী বিশাল বিস্তৃতি নয়। করুণাঘন গম্ভীর মাতৃরূপ নয়। শীর্ণ চপল সুনীল ধারা। চঞ্চল চরণে ছুটে চলে বালিকা। মুখে শিশুর সরল হাসি। দু হাতে দুলিয়ে চলে ফুলের সাজি।

মায়েরও যে কখনো বালিকা বয়স থাকে, খেলাঘর থাকে—ভাবতে বেশ লাগে।

মনে পড়ে, চৌত্রিশ বছর আগেকার একটি দৃশ্য। ১৯২৮ সাল। সেই প্রথম কেদার-বদরী আসা। মায়ের সঙ্গে। হৃষীকেশ থেকে হাঁটা পথ। মায়ের জন্যে ডাণ্ডির ব্যবস্থা থাকে। তবু, ডাণ্ডী ছেড়ে প্রায়ই পায়ে হাঁটেন। নিষেধ করি, কষ্ট হবে, পারবে কেন?

হাসিমাখা মুখে মা বলেন, কষ্ট কোথায়? এই তো আনন্দ! খুব পারব। দেখ্ না। ভেবেছিস বুঝি চিরকাল এমনি-ই ছিলাম? গাঁয়ের মেয়ে—ছেলেবেলায় গাছে উঠতাম,—আম জাম পেয়ারা কতো পাড়তাম,—গাছ-কোমর করে কাপড় জড়িয়ে—এমনি করে,—বলে কোমরে আঁচল ঘুরিয়ে বেঁধে নেন; হনহন করে হাঁটতে থাকেন, লাঠি হাতে। মায়ের বালিকা-বয়সের ছবি চোখের সামনে দেখি। এ কী মায়ের মায়ার খেলা!

আজ এসে গেছি, গঙ্গামায়িরও সেই বাল্যভূমিতে।

বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। শুধু আমরাই নয়।

অদূরে শুভ্রকেশ গম্ভীরমূর্তি যোগীবৃন্দ। ভাগীরথী হিমশিখর। উন্নত শির। স্থির নয়ন। সুন্দরী বালিকার যেন খেলা দেখেন।

পিছন ফিরে দেখি, গঙ্গোত্রী হিমবাহের অপর পারে ধ্যানাসীন শিবলিঙ্ শিখর। তারও পিছনে সুমেরু পর্বত। শিবলিঙ্-এর সুপরিচিত আকৃতি। কিন্তু আজ হঠাৎ দেখে আশ্চর্য লাগে। শিখরের মধ্যে ধরা দেয়, মানুষের চোখ, মুখ, নাকের স্পষ্ট রেখা। কাব্যকথা নয়। উদ্দাম কল্পনাও নয়। পরিষ্কার ফুটে ওঠে। ক্যামেরাতেও ধরা পড়ে অদ্ভুত সেই চিত্র। দীর্ঘদেহ। দুটি সুগোল নয়ন। মধ্যে উন্নত নাসা। নীচেই ক্ষীণ অধর-রেখা। তুষার-জটার বাঁধন খুলে ছড়িয়ে থাকে—দু কাঁধ বেয়ে, সর্বাঙ্গ ছেয়ে। ওখানেও নিঃসন্দেহ জলের ধারা নামে,

এখানকার মতই গোপনে নিভৃতে তুষার-অন্তরালে, কখনো বা দৃষ্টির গোচরে,—লুকোচুরির খেলা করে। ওখানেও শিবজটাজালে গঙ্গার অবতরণ।

স্বামীজী দেখান, ঐ শিবলিঙ্-এর পায়ের তলায়—ওপারে—ঐ যে উঁচু জায়গাটা—এখান থেকে তেমন বোঝা যায় না—ওখানেও ঠিক এমনি মালভূমি—আরও একটু বড়ই হবে,—সেখানেও ঘাসে-ছাওয়া, ফুলের মেলা, ঝরনার নীলধারা। নামও তেমনি—তপোবন। এপারে নন্দনবন, ওপারে তপোবন। গঙ্গোত্রী থেকে নদীর বাঁ দিক ধরে এলে ঐখানে যেতে হত। আগে ঐভাবে এসেছি। এবার দূরত্ব কিছু কম বোধ হল। তপোবনও মনোরম। কিন্তু শিবলিঙ্-এর এমন সৌন্দর্য ওখানে উপভোগ করা যায় না,—ঠিক নীচেই বলে।

বিরাট-এর মহত্ত্ব দূর থেকেই সুস্পষ্ট।

॥ ১৪ ॥

এগিয়ে চলি। পড়ে থাকে নন্দনবন। চোখের আড়ালেই শুধু যায়। কবির ভাষায়, আজ নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

সামনে নতুন পথের নব নব বিস্ময়ের দান। পিছনে ফেলে-আসা পথের ক্ষয়। স্মৃতির সঞ্চয়।

আবার, সেই দুর্গম পথ। পথশূন্য তৃণশূন্য তুষারপ্রান্তর। রাশি রাশি শিলাস্তূপ। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলা। বরফের উপর অতি সাবধানে পা ফেলা। সমতলভূমিতে স্বল্প নরম বরফে চলা সহজ। পায়ের বুট্ মচ্ মচ্ শব্দ তুলে অগভীর চিহ্ন ফেলে এগিয়ে চলে। ভয় শুধু, হয়ত তুষার-আস্তরণের নীচেই অদৃশ্য গহ্বর আত্মগোপন করে আছে। দেহের ভার পড়লেই যেন সেই ফাঁদে পড়তে হবে। আবার, কোথাও বা নদীর চোরাবালির মত চোরা-বরফ। সারা দেহ ডুবে যাবার আশঙ্কা। অভিজ্ঞতা না থাকলে ওপর থেকে বোঝা যায় না। স্বামীজী ও দিলীপ দেখিয়ে দেন, নিষেধ করেন,—কোথা দিয়ে যাব, না যাব। মাঝে মাঝে হঠাৎ হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। কৌতুক বোধ হয়। লাঠিতে ভর দিয়ে পা তুলে ঝাড়লেই জুতো ও প্যান্টে-লাগা বরফের কণাগুলি ঝরে পড়ে। কোথাও বা শক্ত বরফ, পা পড়লেই পিছলে যায়। Ice axe দিয়ে স্বামীজীরা steps কেটে এগিয়ে চলেন, বরফের বুকে অসমতল স্বল্প গর্ত হয়, তারই উপর পা ফেলে চলা।

ভাগীরথী-শিখরগুলির উত্তর দিকে এগিয়ে চলি। দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। শিখর তিনটির অতি মনোহর আকার দেখায়। অচেনা নতুন তুষারশৃঙ্গও দেখি। নাম শুনি, বাসুকি পর্বত। সেই দিক থেকে আসে বাসুকি হিমবাহ—বাসুকি বামক্। চতুরঙ্গীর বাঁ দিকে—অর্থাৎ আমাদের দক্ষিণ থেকে এসে—চতুরঙ্গীতে মেশে। ১৬,০৭০ ফুট-এ এসেছি, শুনি। এই নতুন হিমবাহ পার হয়ে আবার চতুরঙ্গী ধরে চলতে হবে।

পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে বেশ খানিকটা নীচে নামতে হয় বাসুকি বামকে। স্বামীজী, দিলীপ, বীর সিং—সবারই সতর্ক দৃষ্টি; বালি পাথর সরিয়ে কোন-মতে পা ফেলে নামবার ব্যবস্থা করে দেন।

তুষার-বিগলিত ছোট-বড় ধারা। চারিপাশে উপলখণ্ড। বছরের অধিকাংশ সময় বরফে চাপা থাকে তাই শ্বেতাভ বর্ণ। মসৃণ উজ্জ্বল। চতুর্দিকে—উপবে নীচে আশেপাশে—সাদা বরফ। পাথরে ও বরফে রোদ পড়ে আলোর রশ্মি ঠিকরে আসে। যেন জ্বলন্ত তুষাররাশি সূচি বেঁধে চোখে। এতো প্রখর শুভ্র দীপ্তি চোখে সয় না। পকেটে রঙীন চশমা খুঁজি। ঐ যাঃ! সকালে যাত্রামুখে এ জামার পকেটে নিতে মনেই হয় নি। বোঝার মধ্যে কোথায় বাঁধা আছে। এখন সে-সব মোট খোলা সম্ভব নয়। দুপুরে ধারার পাশে স্টোভ্ জ্বালিয়ে চায়ের ব্যবস্থা চলে। পাথরের আড়ালে চোখ বুজে বসে থাকি। তাকালেই অসম্ভব জ্বলতে থাকে। আপনা থেকেই চোখের দুই পাতা বুজে যায়। মাথায় যন্ত্রণা বোধ হয়। নিজেরই বিস্মৃতির দুর্ভোগ। পরিত্রাণের উপায় ভাবি। চোখ বুজে কষ্ট ভুলতে ও সইতে চেষ্টা করি। কিন্তু, ভোলা কি যায়? অশান্ত মন, ভ্রমরের মতো, পীড়িত চোখের চারপাশেই শুধু ঘুরতে থাকে। মনে পড়ে, ছেলেবেলার দুরন্তপনা। আর্শির মধ্যে রোদ ফেলে একে ওকে বিরক্ত করা, কখনো বা কাগজের টুকরোয় আগুন ধরানো। তারই প্রতিফল পাই আজ হিমালয়ের কাছে। আবার ভাবি, তা কেন? এসেছি শিবক্ষেত্রে। যোগীশ্বের ত্রিনেত্রের জ্যোতিরও তো দর্শন চাই। শিবলিঙ্-এর দুই নয়নের শান্ত-মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি দেখেছি। আজ দেখি, রুদ্রের ক্রুদ্ধ তৃতীয় নয়নের অগ্নিময় শিখা। এতেই বুঝি মদন ভস্ম করেছিলেন এইখানে। মনে মনে বলি,

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস।

অতএব, হে দেব!

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

॥ ১৫ ॥

বাসুকি-হিমবাহ পার হয়ে এগিয়ে চলি। বেলাশেষে চতুরঙ্গীর উপর আবার তাঁবু পড়ে।

ছোট একটুকরো সমতলভূমি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া। রুক্ষ রুদ্র হিমালয়ের অকস্মাৎ স্নেহ-কোমল সাদর সম্ভাষণ। ধ্যান ভেঙে যেন বলে ওঠেন, ধরার মানুষ এলে আমার এই কঠোর-সন্ন্যাসের নীরস রাজ্যে? দুর্বল অনভ্যস্ত দেহ

ক্লান্ত হয়েছে ? এই নাও, বোসো, বিশ্রাম করো। শান্ত হও।—কঠিন পাথরের উপর রঙীন্ ছোট-ফুল-আঁকা সবুজ আসনখানি বিছিয়ে দেন।

চারিপাশে ছড়ানো পাথর। তারি মধ্যে সবুজ ঘাস, ছোট ছোট ফুল। কয়েকটা পাথর সরিয়ে এখানে ওখানে কোনমতে তাঁবু ফেলার স্থান করা। শুতে গিয়ে গায়ে পাথর বেশি না ফোটে, তারই চেষ্টা। কিন্তু, গাইডদের সবচেয়ে সতর্ক দৃষ্টি থাকে আর এক দিকে। একচক্ষু হরিণের দুর্দশা না ঘটে। ভয়,—ঐ আকাশ-ছোঁয়া গিরিচূড়াকে।

বাসুকি-শিখর (২২.২৮৫)। এখানেও সেই সুসঙ্গত নামকরণ। পাহাড়ের চূড়া একদিকে ধনুকের আকারে বেঁকে আছে, অপরদিকে সোজা নামে। দেখায় যেন সাপের বিরাট উদ্যত ফণা। আকাশে মাথা তুলে সদা-জাগ্রত নাগ-বাসুকি। বরফে রোদ পড়ে চিক্‌মিক্ করে,—মনে হয়, ফণার উপর মণি জ্বলে। কখনো বা মেঘ ওঠে। পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেয়। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ,—যেন পেঁজা তুলো। হাওয়ায় ভেসে চলে। বহু উপরে আকাশের গায়ে মেঘের ফাঁকে আচম্বিতে জানলা খোলে। পাহাড়ের চূড়াটুকু মেঘলোক থেকে উঁকি মারে। মনে হয়, বুঝি বা শূন্যে ঝোলে। সচল মেঘ ধীরে সরে চলে, দেখায় যেন শিখর দোলে। নাগরাজ ফণা দোলায়। বাতাসে নিঃশ্বাসের শব্দ ওঠে। পাহাড় নড়ে না, ঠিকই। কিন্তু, বিশাল পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে, কখনো বা সোজা উপর থেকে গড়িয়ে—লাফিয়ে—নীচে পড়ে। Rockfalls. সর্পরাজের বিষোদ্‌গিরণ। কোথাও আবার বরফের অতিকায় অংশ ভেঙে নীচে পড়ে বিচূর্ণ হয়—Avalanche—সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে,—যেন সারি সারি সাজানো কামান থেকে একই সঙ্গে গোলা ছোটে। প্রচণ্ড শব্দ। সহস্রফণা বাসুকির কুপিত হুঙ্কার! শব্দ উঠেই থামে না। চারপাশের পাহাড়ে সে শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে। পাহাড়ে পাহাড়ে খেলা শুরু হয়, শব্দ নিয়ে লোফালুফি। আবার, পাথর গড়িয়ে পড়ে, বরফও ভেঙে পড়ে, আবার প্রচণ্ড শব্দের স্রোত ছোটে!

তাঁবু ফেলতে হয়, এইসব দুর্ধর্ষ বিপদসংকুল এলাকা এড়িয়ে। তাই, গ্লেসিয়ারের উপর চলতে বা রাত কাটাতে হলে দুই পাশের পাহাড়ের স্বরূপ ঠিকভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। Avalanche বা Rockfall-এর আশংকা, এমন কি, কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলেও, যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে চলা ও থাকা দরকার। সাধারণতঃ ঐসব ক্ষেত্রে গ্লেসিয়ারের মাঝামাঝি পথ নিরাপদ। প্রকৃতির স্বর্গীয় শোভা, অথচ চারিপাশে বিপদের জাল পাতা। যেন, রূপকথার ঘুমন্ত রাজকুমারীর ভয়াবহ রাক্ষসপ্রহরী!

গ্লেসিয়ারের বরফের সঙ্গেও নিবিড় পরিচয় থাকা চাই। কোন্ বরফের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে নির্ভর করা চলে, আশ্রয় নেওয়া যায়, তাও জানা দরকার। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষায় জানাও যায়। দুঃসাহসিকতার সেইখানেই মর্যাদা, জ্ঞানের মাপকাঠিতে যেখানে নিরাপত্তার সীমানা নির্দেশ করতে পারে। বিপদের সম্মুখীন

হয়েও বিপদ কাটাবার সাহস, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মনের স্থিরতা থাকলেই তাকে প্রকৃত অসমসাহসী বলা চলে। সে শুধু সাহসী নয়, সাবধানীও। যোগ্য মানুষে ও বিশাল পাহাড়ে প্রাণময় খেলার আনন্দ তখনই সম্ভব হয়, প্রাণভয়ের কোন আতঙ্কই থাকে না।

পর্বতের কাছে অনভিজ্ঞ, জ্ঞানহীন, অসাবধানী অভিযাত্রীর ক্ষমা নেই।

নিরাপদ দূরত্ব রেখে নিশ্চিন্ত মনে পাথরের উপর বসে প্রকৃতির খেলা দেখি :

কে বলে হিমালয়,—চিরস্থির, অচঞ্চল, অক্ষয়, অচল ? ঐ তো চোখের সামনে দেখি, পর্বতেরও ক্ষয় আছে, ভেঙে পড়ার গতিবেগ আছে। শিখরদেশ থেকে ধ্বংস-স্তূপ নামে, আবার নীচে সেই স্তূপ জমে নতুন ছোট ছোট পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। একদিকে ধ্বংসের লীলা, অপরদিকে সৃষ্টির খেলা। আবার কোথাও বা সৌম্য শান্ত শুভ্র তুষার-শিখর। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের প্রতিচ্ছবি। ত্রিমূর্তি।

মনে পড়ে, এলিফ্যান্টা গুহার সুপ্রসিদ্ধ তথাকথিত ত্রিমূর্তির অপূর্ব ভাস্কর্য। একই শিলায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

মহেশ্বরের শিরোভূষণ নরকপাল, বিল্বপত্র। হাতে উদ্যত ফণা সর্প। যেন ঐ বাসুকি-শিখর। প্রলয়ের প্রতীক। মধ্যে গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি ব্রহ্মা। হাতে সন্ন্যাসীর পানপাত্র। বুকের উপর অলঙ্কারের শিল্পনৈপুণ্য। ধীর স্থির সৃষ্টি কর্তা। যেন, ঐ শিবলিঙ্গ শিখর।

আর একপাশে বিষ্ণু। হাতে পূর্ণ বিকশিত কমল। এখানে যেন নন্দনবনে বাসুকির ফণার ছায়ায় তাঁর অনন্ত শয্যা পাতেন।

একই স্থানে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অভিন্ন সমন্বয়।

সেই বিরাট বিশ্বপতির পদরেণুর উপর আশ্রয় খোঁজে ধরার কয়টি শিশু।

॥ ১৬ ॥

বিরাট প্রকৃতিরও পটপরিবর্তন ঘটে। বিশ্বজোড়া নাট্যমঞ্চ। গতদিনের রূপসজ্জা যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়।

সারারাত ঝিরঝিরে বৃষ্টি। প্রচণ্ড শীত। হাওয়ার শন্‌শন্ রব। সকালে উঠে দেখি, দিগন্ত-ঢাকা অতিঘন কুয়াশা।

তাঁবুর গায়ে হাত লাগতেই চমকে উঠি, -নাগবাসুকির হিমদেহের স্পর্শ বুঝিবা।

তবু, পথ চলা শুরু হয়। কিন্তু, কোন্ দিকে, কোথায় চলি,—কিছুই বুঝি না। 'ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী।' কয়েক হাত দূরের পাথরও দেখা যায় না পাহাড়-পর্বত তো নয়ই। ফগ্-এর মধ্যে চোখ বুজে যেন ডুব-সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়া। প্রবল শীতের হিমস্পর্শ জামা-কাপড় ভেদ করে গায়ে ফোটে। সূচের মতো। বাতাসের সঙ্গে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে তুষারকণা। হাতে মুখে মাথায় গায়ে—হালকা সাদা রেণুর মত পাউডার লাগায়। ঝেড়ে দিলে পড়ে যায়,

আবার তখনি সাদা ওড়নায় ঢেকে দেয়। সবাই ভুরু দেখায় যেন একশো বছরের বৃদ্ধ।

নবীন আনন্দে ও উৎসাহে অদৃশ্য পথে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলি।

বেলা বাড়ে। কুয়াশাও স্বচ্ছ হয়। পাহাড়, বরফ, নদী,—আবছায়া ফুটে ওঠে। সিল্কের উপর আঁকা জাপানী ল্যান্ডস্কেপ ছবি।

চতুরঙ্গী হিমবাহে আর এক হিমবাহ মেশে। ধবধবে বরফ। শুনি, ১৬,০০০ ফুটেরও উপর দিয়ে চলি। তাই, চির-তুষার-আচ্ছন্ন। তুষারও নিষ্কলঙ্ক বর্ণ। শক্তও। রোদের তেজ হলে হয়ত অল্প নরম হয়। এখন সদ্য-পালিশ-করা শ্বেতপাথরের মেঝের মত। পা ফেলে চলা কঠিন, পিছলে যায়। দরকার মত আবার steps কাটা। অজস্র ছোট বড় ফাটলও,—crevasse. সাবধানে এড়িয়ে চলা।

হিমস্রোত ছাড়িয়ে আবার চতুরঙ্গী। কখনো তুষারক্ষেত্র, কখনো বালি পাথর ভরা উঁচুনীচু পাহাড়,—গিরিশিরা। পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া শিলা-স্তূপ। পাহাড়ের গা বেয়ে কোনমতে পা রেখে উঠে আসা। অল্প চড়াই-এও হাঁফ লাগে। Altitude এর ফল। সকলেই ক্লান্তিবোধ করেন। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে তারই মধ্যে বিশ্রাম নিতে হয়। কিন্তু, সুস্থির হয়ে বসে বিশ্রামের স্থান নেই। এমনি এক জায়গায় ছোট্ট এক ঘটনা ঘটে।

পাহাড়ের ঢালু গা। তারই বুকে ছোট বড় পাথর গোঁজা। সঙ্গীরা তারই কয়েকটার উপর বসে পড়েন। সকলের শেষে এসে আমিও পাহাড়ের গায়ে অল্প হেলান দিয়ে দাঁড়াই। হাতের ice-axe হাতের পাশে ধরা থাকে। সামান্য উপরে একটা বড় পাথরে বীর সিং পা ঝুলিয়ে আগেই এসে বসেছে। পায়ের নীচে আমাকে দাঁড়াতে দেখে সসম্ভ্রমে নেমে পড়ে, নীচের দিকে আর একটা পাথরে বসতে যায়। নিমেষ মাত্র। তার হঠাৎ-নামার সামান্য স্পন্দনেই উপরের বড় পাথরটা স্থানচ্যুত হয়। দেখবার ও জানবার আগেই গড়িয়ে এসে আমারই গা ঘেঁষে নীচের দিকে সশব্দে অদৃশ্য হয়। সচকিতে সবাই ফিরে তাকান। সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, কী হল! কী হল!—মাথা বা দেহের উপর পড়লে কি হত তারই যেন সামান্য ইঙ্গিত দেয়, আমার হাতে ধরা শক্ত মজবুত ice-axe-এর ছিটকে পড়া টুকরাগুলি। হাতের মুঠো ঠিক সময়েই কীভাবে অজানিতে সরে এসেছিল।—আমাকে অক্ষত দেখে সকলে আশ্বস্ত হন। সকলেই ভাবেন, পাথরটা এমনিতেই গড়িয়ে এসেছিল। বীরসিং লজ্জা পাবে, তাই প্রকৃত ঘটনা জানাই না। কয়দিন পরে গল্প করি। বুঝতে পারি, Euripides-এর প্রবচনের যথার্থতা: "How pleasant it is for him who is saved to remember his danger."

ধীরপদে এগিয়ে চলি। চারদিকে তুষার-শিখর। পায়ের নীচেও হিম-শীতল বরফ। কখনও বা রুক্ষ কর্কশ কাঁকর। আবার কোথাও আচম্বিত ফুলেভরা স্নিগ্ধ কোমল তৃণের গুচ্ছ।

ডান দিক থেকে নেমে আসে আবার এক হিমবাহ। নাম শুনি সুরালয়। নিকটেই কি দেবতাদের বাসভবন? হবেও বা। কিন্তু, বরফের উপর অজস্র ফাটল। অতি সন্তর্পণে পার হতে হয়। ওপারে পৌঁছে পুনরায় চতুরঙ্গী। আবার আরম্ভ হয়, শিলাস্তূপের মধ্যে দিয়ে চড়াই উৎরাই। দেহ অবসন্ন বোধ হয়। কিন্তু, পথপাশের অপরূপ সৌন্দর্য নিমেষে সব ক্লান্তি হরণ করে। শুভ্র তুষার প্রান্তর। তারি উপর ছড়ানো নানান্ রঙের পাথর। ভুবন-জোড়া তাজমহলে মণিমাণিক্যের কাজ। মাঝখানে বিশাল জলাশয়। শান্ত স্নিগ্ধ রূপ। স্বচ্ছ সবুজ জল। সলিল-মুকুরে গিরিচূড়া প্রতিবিম্ব দেখে।

এবার বুঝতে পারি, সুরালয়ের অর্থ। দেবভূমি চোখের তৃষ্ণা মেটায়। মনে অসীম আনন্দ জাগায়।

আরও এগিয়ে চলি। ওপারে দূরে দেখা যায় চন্দ্রপর্বত (২২,০৭৩ ফুট)। চলা যেন শেষই হয় না। অবশেষে, তাঁবু পড়ে।

দিগন্ত-ব্যাপী তুষার-রাজ্যে অতিক্ষুদ্র তাঁবু। অকূল সমুদ্রে নগণ্য ভেলা। অসীম আকাশে সন্ধ্যাতারার দু-তিনটি বিন্দু।

তাঁবুর লাল, হলুদ, সবুজ রঙ্। তাই, ক্ষুদ্র হলেও তুষারের শুভ্রপটে, পাথরের ধূসর অঙ্গে, উজ্জ্বল দেখায়। হিমাঞ্চলের সূক্ষ্মবায়ুর প্রভাব সকলেই বেশ অনুভব করি! শ্বাসের কষ্ট। শুকনো গলা। ন্যক্কার ভাব। আহারে অরুচি। আবিল দৃষ্টি। মাথা ভার। শুনি ১৭,০০০ ফুটের উপর এসেছি। ভাবি, এখন আরও আড়াই হাজার ওঠা!

ভারবাহীদের নিদারুণ দুরবস্থা দেখে গভীর দুঃখ পাই। শারীরিক এইসব গ্লানি। তার উপর বোঝার ভার। প্রাণান্তকর শ্বাসের ক্লেশ। হাপরের মত শব্দ তোলে। এত প্রচণ্ড শীত, তবু ঘর্মাক্ত কলেবর।

মনে পড়ে, সভ্য শহর কলকাতার এক দৃশ্য। বৈশাখের দুপুরের জ্বলন্ত রোদ। পিচ্-গলা রাস্তা। বোঝাই-করা গাড়ি টেনে নিয়ে চলে—জোড়া মহিষ। গায়ের রক্ত যেন কালো জল হয়ে সর্বাঙ্গ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। রক্তাক্ত আঁখি। নাক দিয়ে সজোরে শ্বাস পড়ে,—প্রাণ বুঝি বা এখনি ফেটে বার হয়। তবু ঘাড় হেঁট করে টেনে চলে। চালক বসে চাবুক হাতে তাড়না করে।

নিষ্ঠুর দৃশ্য। মনে মর্মান্তিক পীড়া বোধ করি।

আজ ভাবি, আমি-ই বা দোষী কম কি? এমন করে মাল বহানো? নাই বা আর এলাম এমন পথে এমন ভাবে। চোখে জল আসে।

ভারবাহীরা কোনমতে পেঁছয়। নিষ্প্রাণ জড়ের মত পড়ে থাকে। অবসন্ন, আচ্ছন্ন ভাব। যেন, মুমূর্ষু রোগী। তৈলশূন্য নিভন্ত প্রদীপ।

কা কথা অন্যেষাম্? স্বামীজীও জানান, জ্বর এসেছে। অ্যাস্পিরিন্ বিতরণের ধুম লাগে। দিলীপও এসে চেয়ে নেয়। কারো কোন কাজেই আজ আর উৎসাহ নেই। নিঝুম নিস্তেজ। তবুও স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। নিজে রান্না করেন, খাওয়ান। তাঁর যত্ন ও স্নেহের সীমা পাই না। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। তাঁবুর মধ্যে শুয়ে সেই কথাই ভাবি।

ঘুমন্ত পুরী। প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ, সেই নিঃশব্দতা মানুষের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে। বিছানায় শুয়ে চমকে উঠি। তবুও, অসাড় হয়ে পড়ে থাকি। কারণ জানার কৌতূহল হয় না, আগ্রহও থাকে না। শুধু চিনতে পারি, স্বামীজীর কুপিত কণ্ঠ; জ্বলন্ত, তীক্ষ্ন বাক্যবাণ!

পরে জানি, পটুবর্ধনকে তিনি নিজের তাঁবু থেকে বার করে দেন। সে নাকি প্রতিদিন তাঁবুতে পেঁছে তাঁর কোন কাজেই সাহায্য করে না। তাই এই কঠোর ভর্ৎসনা, নির্মম বিচার!—পটুবর্ধন আকুলভাবে কাঁদতে থাকে। অকপটে স্বীকার করে, 'পারি না যে, করবো কি?'—নিজের মোট বয়ে এনে এত ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করে, আর সামান্য কোন কিছুও করার শক্তি থাকে না। এখন যদি ফিরেও তাকে যেতে হয়, তাতেও সে রাজী। দেহ আর তার বয় না।

বলবান্ সমর্থ পুরুষ। তবু আপন সামর্থ্যের সীমা বোঝে নি।

দিলীপ আশ্বাস দেয়, যাত্রায় ভয় নেই যখন এসেছে, তখন সবাই যাবে, তারও যাত্রা পূর্ণ হবে।—মনে সাহস দেয়, সহানুভূতি দেখায়। সাদরে হাত ধরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয়ে দেয় তাদেরই তাঁবুতে।

পাহাড়ের উচ্চস্তরের—high altitude-এর এমনি আশ্চর্যজনক প্রতিকূল প্রভাব। কেবল অপার্থিব আনন্দই দেয় না, সভ্য, সৎ ব্যক্তির মনে অকস্মাৎ বিকারও ঘটায়। যেন, আপাত-শান্ত আগ্নেয়গিরির আকস্মিক বিস্ফোরণ!

॥ ১৮ ॥

মাঝরাত। আবার ঘুম ভেঙে যায়। একটানা গভীর ঘুমের দেশ এ নয়। বুকের উপর কিসের ভার অনুভব করি। দম বন্ধ হয়ে আসে। স্বপ্ন নয়। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে থেকে হাত বার করতেই হয়। অনুভব করি, তাঁবুর ছাদ নেমে এসে বুক স্পর্শ করে। কিন্তু, এতো ভারী ঠেকে কেন? সঙ্গী মেজর বসুকে ডাকি। বাইরে শন্‌শন্ রবে হাওয়া ছোটে। তাঁবু খুলে পড়ে গেল নাকি? জীবন্ত কবরই বুঝি বা হয়! দুজনে টর্চ জ্বালি। বুঝতে পারি, বাইরে বরফ পড়ছে। তারই ভারে তাঁবুর মাথাও ঝুলেছে। শুয়ে শুয়ে হাত তুলে উঁচু করে

ঠেলে দিই। ঝুরঝুর করে পাশ দিয়ে বরফ গড়িয়ে পড়ে। ছাদ আবার উপর দিকে ওঠে। কিছু পরেই বরফের চাপে আবার নামে। আবার ঠেলে ফেলতে হয়। মেজর বলেন, টাইট্ করে না বাঁধার ফল হয়ত এটা।

ভোরে তাঁবুর বাইরে আসি। অসহ্য শীত। কিন্তু আকাশ মেঘমুক্ত। গাঢ় নীল। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে একটানা শুধু সাদা রঙ্ ধব্‌ধব্ করে। আকাশ-জোড়া দুধের পাত্র উল্‌টে পৃথিবীর বুকে পড়ে জমে আছে নাকি? তাঁবুর মাথাগুলিও বরফে ঢাকা। বাইরে পলিথিন্-সীট-চাপা মালপত্র, এখন ছোট ছোট সাদা স্তূপের আকার। বাল্‌তি ও ফ্ল্যাস্ক-এর জল বরফের চাই। এক ফোঁটা জলও কোথাও নেই। বরফ গলিয়ে জল ব্যবহার করা,—কিন্তু অতো আগুন কই? জ্বালালেও তেমন তেজ হয় না। অগত্যা অভ্যাস-দোষে জলের কাজ বরফের টুক্‌রো ব্যবহারে সারতে চেষ্টা করি। দুর্ভোগও হয়।

ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে সূর্যোদয়ের আভাস ফোটে। পূবদিকের নীল আকাশ ফিকে হয়। তারপর, অল্প লাল। দিগ্বধূরা হঠাৎ নীল অবগুণ্ঠন খুলে ফেলেন, শিখরগুলির শুভ্রশিরে রাঙা আবীর মাখিয়ে দেন। দিকে দিকে পিচ্‌কারিতে নানারঙের আলোর ধারা ছুটে চলে। দিগন্ত হেসে ওঠে। বিশ্বপ্রকৃতির দেব-দেবীগণ হোলিখেলার আনন্দে মেতে ওঠেন। তরুণ তপন দুই পাহাড়ের গোপন অন্তরাল থেকে উঁকি মারেন। তির্যক্ রেখায় উজ্জ্বল রশ্মি এসে পড়ে বিশাল তুষার-প্রান্তরে। আলোছায়ার খেলা শুরু হয়। পাহাড়ের খাঁজে, বড় বড় পাথরের পেছনে তখনও ঘন ছায়া। তুষারের উপর বিচ্ছুরিত হয়ে আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন ফোটে সেইখানে,—সেই সব গাঢ় গোপন অন্ধকারেও। সেখানেও আঁধার তরল হয়। ছোট বড় পাথরগুলির অস্তিত্বও একে একে প্রকাশ পায়, তরল ছায়ার মধ্যেও তারা আবার গাঢ় ছায়া ফেলে। আলোছায়ার জাল বোনা হয়।

এদিকে সূর্যদেবের রথ ছুটে ওঠে আকাশে। পাহাড়ের চূড়া থেকে আলোকের ঝরণাধারা গড়িয়ে নেমে আসে। ধীরে নিঃশব্দ পদে। পাহাড়ের চতুর্দিকে পাথরের উঁচু-নীচু অগণিত বিভিন্ন আকার আলোর স্পর্শে ফুটে ওঠে। দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট হয়। আলোর জয়যাত্রা পূর্ণ হয়।

গিরিশিরে এখন রূপার মুকুট। পদতলে তুষার-প্রান্তরে প্রখর আলোর দীপ্তি। নিকটে পাথরের ও তাঁবুর গায়ে বরফের লম্বা ঝুরি তখনো ঝোলে,—কাচের কাঠির মতো। তার উপর আলো পড়ে। সাতরঙা রামধনুর বিচিত্র খেলা চলে। বিন্দু বিন্দু গলে ঝরে পড়ে – মুক্তার মতো।—

"সমস্ত আকাশ ভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির-মাঝে খোঁজে নিজ সীমা।"

হিমরাজ্যে উজ্জ্বল আলোর স্নিগ্ধ হাসি। মানুষের মনেও আনন্দ-হিল্লোল তোলে। গতরাতের সেই হিমকাতর পরিশ্রান্ত মৃতকল্প ভারবাহক। আর রোদের স্পর্শ পেয়ে প্রাণমুখর। আনন্দের আতিশয্যে বরফের উপর দল বেঁধে নাচতে

থাকে, কেউ বা গান ধরে। জেগেছে ধরার মানুষ, পেয়েছে নূতন প্রাণ।
জীবনদাতা জ্যোতির্ময় সূর্যদেবতাকে প্রণাম জানাই।

আবার চতুরঙ্গী ধরে এগিয়ে চলা। যেদিকে তাকাই সাদা বরফ। তারই উপর মাঝে মাঝে নানারঙের পাথর। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর এক হিমবাহ-সঙ্গমে এসে পড়ি। সীতা হিমবাহ। (১৭,২০০ ফুট) সীতা, না সিত? কী উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ! বরফ গলে চারপাশে। রোদ্রের তীক্ষ্ন ফলক তুষারদেহে আঘাত হানে। বুক ফেটে রক্ত-ধারা ছোটে। রক্তের লাল বরণ নয়। নীল সবুজ জলের ধারা। বরফের ফাটলের মধ্যে দিয়ে বইতে থাকে। কোথাও বা তুষার-প্রান্তরের প্রান্তদেশ ধরে গড়িয়ে চলে। অস্ফুট করুণ কল্লোলধ্বনি তোলে।

আবার চতুরঙ্গী। আবার, বিস্তীর্ণ তুষার-প্রাঙ্গণ। পেছনে তাকাতেই দেখি, বরফের মধ্যে পাশাপাশি দুইটি বিরাট গুহা। Glacial caves. স্বামীজী হেসে বলেন, বরফের অজন্তা ইলোরা। সাদা বরফ মুখ হাঁ করে আছে। ভেতরে দেখা যায় শক্ত নীলাভ বরফ। কাঁচের মত মসৃণ, উজ্জ্বল। তারি মধ্যে থেকে জলের ধারা বার হয়ে আসে। যেন কাঁচ-ই তরল হয়। মৃদু-মন্দ প্রবাহ। বন্ধনমুক্তির আনন্দ।

কিছু দূরে দেখা যায় কালিন্দী হিমবাহের মুখ। সেই দিক থেকে নেমে আসে কালিন্দী নদীর ধারা। নীলবসনা। ক্ষীণকায়া। পাথর ও বরফের উপর দিয়ে বহে চলে। পাথরে পা রেখে নদীর ধারা পার হই। ওপারেও তুষার-ক্ষেত্র। মলিনতাশূন্য। কিন্তু বরফের বুক ফাটলে ভরা। দূর থেকে বোঝা যায় না। দূরে বাঁ দিকে দেখা যায়,—ধাপে ধাপে তুষার-সোপান ওঠে। নীল আকাশে যাবার যেন সিঁড়ি। Ice-fall. মনে পড়ে, শতোপন্থে স্বর্গারোহণীর দৃশ্য।

ধীরপদে এগিয়ে চলি। প্রকৃতির পবিত্র শুভ্র কান্তি। হৃদয়ে নিবিড় প্রশান্তি। পথশ্রমের ক্লান্তি মনের উপর কোন ছায়াই ফেলে না। দেহ থেকে মন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। মিশে যায় আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমায়, নিষ্কলঙ্ক তুষারের অনির্বাণ জ্যোতির মধ্যে।

মনে আসে কবির সেই অপরূপ বর্ণনা।

অন্ধকারে সিঁড়ির পাশে, নিবে-যাওয়া দীপ হাতে, ছোট্ট মেয়ের হঠাৎ রোদন—'হারিয়ে গেছি আমি!'

এখানেও আমার মনও আকাশভরে ওঠে কেঁদে—হারিয়ে গেছি আমি।

এ ক্রন্দন ভয়েরও নয়, সুখ-দুঃখেরও নয়,—নির্লিপ্ত সত্তা। ব্যথা-বেদনা-হীন। সুখাতীত।

প্রচণ্ড শব্দের আঘাতে মনের শান্তি ভাঙে। স্বামীজী দেখান, ঐ যে অন্যদিকে পাহাড় ভেঙে পাথর গড়িয়ে পড়ে। ও পাহাড়টাকে কখনো চুপ করে থাকতেই দেখা যায় না। তাই তো যতদূর পারি এড়িয়ে চলেছি, হিমবাহের মাঝখান দিয়ে।

তাকিয়ে দেখি। বড় বড় পাথর উপর থেকে ভেঙে এসে পড়ে নীচে,—প্রচণ্ড শব্দে। ধূলামাটি, টুক্‌রা পাথরের ধোঁয়া ওঠে। ভাঙা পাথর নীচে বরফের উপর পড়ে, কোথাও বা বরফে বসে যায়, কোথাও বা সেখানকার অন্য পাথরের সংঘর্ষে এসে সহস্রখণ্ডে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মনে পড়ে, বিদেশী পর্যটকের লেখা আল্‌প্‌সে পাহাড়পথের এক বর্ণনা। পাথর গড়িয়ে পড়ার ফলে অদ্ভুত দৃশ্য। দুদিকে পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল। মাঝখান দিয়ে পাহাড়ী নদীর অতি সংকীর্ণ গতিপথ। প্রতিপদে নীচের দিকে নেমে চলে। প্রবল বর্ষা। জলধারার প্রবল বেগে নদীর বুকে বড় বড় পাথরও গড়িয়ে পড়ে নীচে। প্রচণ্ড ঘর্ষণ লাগে পাথরে পাথরে,—আগুনের ফিন্‌কি ছোটে, নদীর মধ্যে চারদিকে। মনে হয়, জলে কি আগুন জ্বলে!—"The stream looks as if it were on fire!"

গিরিরাজের 'অন্তহীন রহস্যনিলয়'।

॥ ১৯ ॥

প্রায় ১৮,০০০ ফুটে উঠে আসি। কয়দিন ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে চড়াইপথে এগিয়ে এসেছি। চলার মধ্যে তা সারাক্ষণই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু সামনে মাথা তুলে প্রকাণ্ড চড়াই চোখ রাঙায় নি। এখন সম্মুখে দূরে দেখা যায়, আকাশে মাথা তুলে, দুই হাত ছড়িয়ে বিশাল পাহাড় পথ রোধ করতে এগিয়ে আসে। আমাদের দক্ষিণে পূর্বদিকে সেই পাহাড়ের বাঁধে অল্প খাঁজ। সেখান থেকে হিমবাহ গড়িয়ে নেমে আসে। কাঁধ থেকে যেন সাদা চাদর ঝোলে। কালিন্দী বামক্। তারই মাথায় কালিন্দী খাল বা কালিন্দী পাস্। ১৯, ৫১০ ফুট। ঐ পথ দিয়েই পার হতে হবে এই গিরিশ্রেণী।

বাঁদিকের সেই তুষার-সোপান—ice fall—নিকটে আসে। আবার পাহাড়ের আড়ালে ঢাকাও পড়ে। এখন সেই দিকে যাত্রাপথের পাশে ভাঙা-চোরা, আধ-গলা বরফের নানান্ অদ্ভুত আকৃতির বিচ্ছিন্ন সহস্র অংশ। বিচিত্র নানান্ আকার। Ice seracs কে যেন বরফের মন্দির, মসজিদ, গির্জা, দুর্গ, প্রাসাদ, মিনার তৈরি করে সাজিয়ে রেখেছে। যেন রথযাত্রা বা দোলযাত্রার সেই চিনি-দিয়ে-গড়া মন্দির আদি। ছোট বড়। উঁচুও একতলা দুতলা বাড়ির মতন। সাদা ধবধবে। রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করে। ছায়ার মধ্যে নীল আভা ছড়ায়।

এরই কাছে চতুরঙ্গীর দক্ষিণ দিকে এক ছোট শাখা-হিমবাহ। এক ম্যাপ-এ নাম দেখেছি মনে পড়ে, কালিপেট্। প্রথম দেখে ভেবেছিলাম, হিমালয়ের প্রায় সবখানেই যেমন সুন্দর নামকরণ, নামের মধ্যে দেবদেবীর বা স্বর্গরাজ্যের পবিত্র স্মৃতিসৌরভ, এও নিশ্চয় তাই হবে। কালিপেট্,—কালীপীঠেরই বিকৃতরূপ মাত্র। কিন্তু, নামকরণের প্রকৃত বৃত্তান্ত পড়ে চমক লাগে।

Major Osmaston গঙ্গোত্রী জরিপের সময় পুরানো সার্ভে-করা ম্যাপ-এর

অনেক ভুল-ভ্রান্তি দূরে করেন। সেই সময় এইখানে, এই হিমবাহে ও পাহাড়গুলির উপর, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে একদল খালাসীরা নীচের তাঁবু থেকে রওনা হয়। ওপরে পোঁছে, পরে, তিনি জানতে পারেন, লোকগুলি বোকামি করে কিছু না খেয়েই কাজে এসেছে। সারাদিন অনশনে বেচারীদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। তাই, সাহেব এই নামহীন বামকু-এর নতুন নাম দেন—খালিপেট। (Himalayan Journal—Vol. XI. p. 139)

নামের মাহাত্ম্য আছে।

আমাদেরও, দেখি, এই অঞ্চলে এসে প্রায় একই রকম অবস্থা।

আগের রাত কাটিয়েছি কালিন্দী খালের শেষ চড়াই-এর অল্প দূরে। সকালে যাতে যাত্রার প্রথম দিকেই পূর্ণ উদ্যম নিয়ে চড়াই ওঠা যায়। ১৯, ৫১০, ফুট। কম কথা নয়। এতো উঁচুতে আগে কখনো উঠি নি। কৈলাস পরিক্রমার সময় দোলমা-লা' (পাস্) ছিল,—১৮,৫০০ ফুট। তবুও মনে সাহস ধরি, দেহে শক্তির সঞ্চয় রাখি, পথ-চলার অপার আনন্দ অন্তর ছেয়ে রাখে! কিন্তু, সব চেয়ে বল দেয়, মনের অসীম বিশ্বাস,—নিত্য-মঙ্গলময় এক পরম শক্তির উপর।

যাত্রার আগে অল্প প্রাতরাশ হয়। যথারীতি পকেটে চকোলেট, কাজু ইত্যাদি থাকে। শেষ চড়াই শুরু হবার আগে গরম চা তৈরি পাবার আশাও পাওয়া যায়। কিন্তু, ১৮,০০০ ফুটের উপর তুষার-পথে অতি ধীরেও এগিয়ে যেতে অল্পেই দেহে ক্লান্তি নামে। বারংবার বিশ্রামও নিতে হয়। আবার খানিক এগোতেও হয়। তৃষ্ণায় তালু শুকায়। দেখতে দেখতে সময়ও কাটে। চারিদিকে প্রকৃতির অপরূপ শোভা;—শুভ্র তুষার ও মসৃণ শিলা। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখি।

হঠাৎ এক অতি-পরিচিত ক্ষুদ্র প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই তুষার-রাজ্যে এদের আবির্ভাব আশা করি নি। কয়েকটি সাধারণ মাছি। আকারে কিছু বড়। মনে মনে জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁরে, কোথা থেকে এলি এখানে? তোরাও কি যাত্রী? না, এখানকারই অধিবাসী? সর্বত্রই তোদের স্বাধীন গতি? কি খেয়ে বেঁচে আছিস? এই শীতেও থাকতে পারিস?

আশ্চর্য! কি করে এলো বা জন্মাল! এ পথে লোক চলাচল নেই। জীবজন্তুও দেখি নি। ক্বচিৎ দু-একটা পাখী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীও চোখে পড়ে নি। সামান্য মাছি হলে হয় কি? হঠাৎ সুদূর বাঙলা দেশের গরমকালের কথা মনে আনে, কেদার-বদরীর পায়ে-হাঁটা যাত্রাপথের সেই নিত্য-ভন্‌ভনে অস্বস্তিকর সঙ্গীদেরও।

পথের সামনে চড়াই নত নয়নে করুণাভরে আমাদের দেখে। আমরাও সম্ভ্রম করি। চায়ের প্রত্যাশায় পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করি। স্বামীজী বোঝেন। দূরে দিলীপদের দু-একজনকে দেখে, আশা দিয়ে, নিজেই এগিয়ে যান। ফিরে এসে হাসিমুখে সুসংবাদ জানান, মালের ভারে ও সূক্ষ্ম আবহাওয়ায় কাতর পরিশ্রান্ত পোর্টাররা যে যার ক্ষমতা মত আজ চলেছে, বিশ্রাম নিচ্ছে,—তাই সবাই

ছড়িয়ে আছে,—চায়ের আয়োজন সম্ভব নয়। আশ্বাস দেন, চড়াই শেষ করে আরামে খাওয়া যাবে। এখন এগিয়ে যাওয়া যাক্।

তথাস্তু। ঐ তো দেখা যায় পাহাড়ের মাথা। কিন্তু, দেখতে নিকটে হলে কি হয়! বরফের উপর চলা,—কোথাও পা পিছলায়, কোথাও বসে যায়। কেবলি ফাটল। লাফিয়ে বা এড়িয়ে চলা। ১৯,০০০ ফুটের কাছাকাছি। Altitude-এর প্রভাব,—শ্বাসের অস্বস্তি, মাথার মধ্যে ভার। পায়ে ভর রেখে দেহভার টেনে চড়াই-এ তোলা। ক্লান্তি তো স্বাভাবিকই। তবুও অজানা কিসের প্রবল আকর্ষণে সবাই এগিয়ে চলি। সকলেরই মন আনন্দে পরিপূর্ণ। বিকীর্ণ হয়ে সংক্রামক স্ফূর্তি ছড়িয়ে পড়ে। পরস্পরকে উৎসাহ যোগায়। যেন, কাঁচের উপর আলোর প্রতিফলন, নতুন করে আলো ছড়ায়।

বড় বড় ফাটল মুখ হাঁ করে সামনে চিৎ হয়ে যেন শুয়ে থাকে। লাফানো সম্ভব নয়। কাছে যাওয়াও বিপজ্জনক। অগত্যা, গ্লেসিয়ারের ডানপাশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে হয়। মাঝে মাঝে বরফ ছেড়ে পাশের পাথরস্তূপে উঠে দাঁড়াই। বরফগলা জলের ধারা ঝিরঝির করে পায়ের নীচে বয়ে চলে।

চলার ধর্ম,—পথ যতো দুর্গমই হোক্—ধীরে চলতে থাকলে এক সময়ে শেষ হয়ই। অবসন্ন দেহ পাহাড়ের মাথায় পেঁছয়। কিন্তু, শ্রান্ত তুচ্ছ জড়দেহ থেকে মন যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। অপার শান্তি ও গভীর আনন্দের স্নিগ্ধ-ধারায় হৃদয় আপ্লুত থাকে। গাছের ডালের ক্ষুদ্র নীড় ছেড়ে পাখী যেন ডানা মেলে উড়ে চলে অসীম নীল আকাশের বুকে।

॥ ২০ ॥

কালিন্দী খাল। ১৯,৫১০ ফুট। আমাদের যাত্রাপথের শীর্ষদেশ। চির-তুষারাচ্ছন্ন। তবুও, বরফের আশপাশে মাথা উঁচু করে থাকে কয়েকটা শিলা-খণ্ড। এরই মাঝখানে কোথাও তাঁবু খাটানো। কিন্তু, তাঁবু কোথায়? কোথায়ই বা মালপত্র? জন দুই তিন মাত্র পোর্টাররা পেঁচেছে। বাকি কারও দেখা নেই। শোনা যায়, ক্লান্ত নির্জীব হয়ে নীচে কোথায় এক গুহায় শুয়ে পড়ে আছে। উপরে আসার সামর্থ্য নেই। মাল বহে আনা তো দূরের কথা। নীচের সাদা বরফ যেন তাদের সকল শক্তি গ্রাস করে মৃত্যুশীতল বার্তা শোনায়। দিলীপ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এই বুঝি বা দেখা যায়,—প্রকাণ্ড পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট পিঁপড়ের মত ধীরে ধীরে ওঠে। কিন্তু, কে কোথায়? অগত্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজেই আবার নেমে চলে। আশ্চর্য মানুষ!

শৈলশিখর থেকে দেখতে থাকি।

সুন্দরানন্দজী কাছে এসে দাঁড়ান। মুখে কোথাও ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন নেই। প্রফুল্ল বদন। চোখের ও ঠোঁটের কোণে পরম তৃপ্তির সুমিষ্ট রেখা। প্রীতিভরে হাত বাড়িয়ে দেন। আন্তরিকতার সঙ্গে হাত ধরে বলেন, পেঁছে

গেলেন কালিন্দী খাল। দেখছেন, কি অপূর্ব দৃশ্য!

নির্বাক বিস্ময়ে তাই দেখি।

দুদিকেই নেমে গেছে পাহাড়ের ঢালু গা। সাদা বরফে ঢাকা। যেখানে সোজা খাড়া পাথর, অতি মসৃণ,—সেখানেই শুধু বরফ নেই। যেন, বিপুল-কলেবর কৃষ্ণকায় এক মানুষ ধবধবে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে বসে, ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে তার কালো দেহের অংশ।

পাহাড়ের মাথায় এক দিক দিয়ে উঠেছি। সেই দিকে ফেলে এলাম ভাগীরথীর প্রস্রবণ ক্ষেত্র। অপর দিকেও তেমনি তুষার দেশ। বহু নীচে পর্যন্ত দেখা যায়। তার পিছনে আবার তুষারমৌলী গিরিশ্রেণীর বিশাল বিস্তার। কামেট (২৫, ৪৪৭), মানা (২৩, ৮৬০) প্রভৃতি উত্তুঙ্গ শিখর। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এখন দিনশেষে মেঘপুঞ্জের অন্তরালে। চকিতে ক্ষণিক দেখা দেয়। ঐদিকের হিমবাহগুলি থেকেও তুষার-ধারা ও নদী নামে,—অর্বা, সরস্বতী আদি। তাদের সকলের জলভার বহন করে নীচে নেমে চলেন বিষ্ণুগঙ্গা—অলকানন্দা। সামনের সেই অলকানন্দা ও পিছনে ফেলে-আসা ভাগীরথীর সঙ্গমতীর্থ,—হিমালয়ের নিম্নদেশে, সুদূর দেবপ্রয়াগে। যেন, বৃদ্ধ-পিতা-হিমালয়ের কণ্ঠ বেষ্টন করে থাকে শিশুকন্যা গঙ্গার শুভ্র-কোমল দুটি বাহুলতা।

স্বামীজীও নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। দুজনেরই মুখে কথা নেই। তবু, বেশ অনুভব করি, অন্তরে অন্তরে যেন বাক্যহীন কত আলাপন চলে।

স্বামীজী হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। ফিরে তাকাই। ম্লান মুখে হেসে বলেন, আজ তো এখানেই রাত কাটানো। কাল সকাল থেকে নামা শুরু—অর্থাৎ ফেরবার পথ। ঐ দিকের ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে। কালিন্দী খাল ছাড়িয়ে বরফের ওপর অল্প দূর সোজা যাওয়া ;—তারপরই—নামা, আর নামা,—একটানা নেমেই চলা।

ধীরে ধীরে বলেন, প্রথমে বালি পাথর-ছড়ানো পাহাড়ের গা,—যেন হেলে-থাকা দেওয়াল। তাই বেয়ে নেমে আবার পাহাড়ের সোজা ঢালু গা,—কিন্তু বরফে ঢাকা। এমনি খাড়া নেমে গেছে, পায়ে হেঁটে দাঁড়িয়ে নামাই কঠিন।

ফিরে তাকান মুখের দিকে, বলেন, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হবে সেখানে দেখবেন। বরফের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে, বসে, গড়িয়ে নেমে যেতে হয় অনেকখানি নীচে। আপন টানে চোখের পলকে দেহ নীচে গড়িয়ে চলে।—ভয়? ভয় লাগার কথাই মনে পড়বে না,—আনন্দ ও কৌতুক বোধ হয় এত বেশি। অবশ্য খুব সতর্ক দৃষ্টিও রাখতে হবে, বরফের ফাটলে না গড়িয়ে যান। হাতে ice-axe বা লাঠি থাকবে—কোন সময়ে হঠাৎ যদি গতিবেগ সংযত করতে হয়। একেই বলে glissading—তারপর আবার পাহাড়ের গা বেয়ে হেঁটে নামা,—কখনো পাথর, কোথাও বা বরফ। আজ চড়াই-ওঠার কত কষ্ট, পাহাড়ের মাথায় এসে পেঁছুতে পথ যেন শেষই হয় না।—আর কাল দেখবেন, ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যেই

নীচে নেমে গেছেন কোথায় ? পেছন ফিরে মাথা তুলে দেখবেন,—এই জায়গা যেন কত ওপরে আকাশ ছুঁয়ে তখন দাঁড়িয়ে। জানেনই তো,—পাহাড়ে চড়াই উঠতে সময় ও দম লাগে বেশী, কিন্তু নামার পথে সময় নেয় কম, অথচ, পায়ে ব্যথা বোধ হয় আরো অনেক বেশি।—হাজার তিনেক ফুট-এরও ওপর নেমে পেঁছাব অর্বাতালে। ১৫,৭০০ ফুট্। বরফের ঢাকা হ্রদ। কৈলাসের কোলে যেমন গৌরীকুণ্ড। সেই তাল থেকে বার হয়েছে অর্বানদী—Arwa. তারপর সেই নদীর ধার ধরে চলা। যেমন এদিকে এসেছিলেন ভাগীরথী ও কালিন্দী ধরে।—নতুনত্ব সে-পথে আর কিছু নেই। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথাও হয়ত অল্প বরফ। আবার শুরু হবে শিলাস্তূপ—পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলা। বরফ-গলা ঝরণা ও নদীর অনেক ধারা,—পায়ে হেঁটে পার হওয়া। দু দিন লাগে পেঁছুতে অর্বা ও সরস্বতীর সঙ্গমে,—ঘাসতোলীতে। ছোট্ট বসতি,—কিন্তু এখন দেখবেন—মানা পাশ হয়ে তিব্বতে যাবার ঐ তো পথ,—তাই মিলিটারীর ছাউনি। সেখান থেকে সরস্বতীর ধার দিয়ে মাইল দশেক নেমে মানাগ্রাম। সরস্বতী ও বিষ্ণুগঙ্গা বা অলকানন্দার সঙ্গম,—কেশবপ্রয়াগ। আরও দু মাইল সোজা চলে বদরীনাথ!—শেষ হয়ে গেল এই কঠিন যাত্রাপথ। গঙ্গোত্রী থেকে বদরীনাথ পেঁছুতে আপনারা নিচ্ছেন দশ দিন। ছয়-সাত দিনেও আসা সম্ভব। মাইল পঞ্চাশ মাত্র হবে। আর, আগেকার সাধারণ যাত্রাপথে দূরত্ব হয় এই দুই মন্দিরের মধ্যে ২২২ মাইল। গঙ্গোত্রী থেকে মাল্লা-পাওয়ালি-ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে কেদারনাথ ১২১ মাইল; আবার কেদারনাথ থেকে উখীমঠ—তুঙ্গনাথ-চামোলী হয়ে বদরীনাথ ১০১ মাইল। প্রায় এক মাসের যাত্রা ছিল।—আর বছর দুই-এর মধ্যেই শুনেছি ওদিকে বাস চলে আসবে বদরীনাথে। মোটরের রাজপথ পায়ে-হাঁটা-পথের সব আনন্দ গ্রাস করবে।—আমাদেরও এবারের যাত্রার আনন্দ ফুরিয়ে এলো আর কি! আর মাত্র তিন দিন। চুপ করে স্বামীজীর কথা শুনি। চোখের উপরে নামার পথের ছবি সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। অচিরে পথ-চলার সমাপ্তির কথা মনে বেদনা জাগায়।

ভাবি, থাক্, পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার সেই কাহিনী। যেমন পথে উঠে আসা, তারই তো পুনরাবর্তন। নাই বা শুনলাম ফেরবার কথা। কালিন্দী খালের উপর কাটানো জীবনের এই কয়টি মুহূর্তই অক্ষয় হয়ে থাকুক।

দিলীপ সিংদের নীচে থেকে উঠতে দেখে স্বামীজী এগিয়ে যান। বলেন, ঐ যে ওরা এসে গেছে। দেখি, কে কেমন আছে। মালপত্র সব আনতে পারল কিনা।

সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে দিলীপ আবার চড়াই ভেঙে উঠে আসে। শ্বাসের কষ্টে ও মাথা ধরার নিদারুণ যন্ত্রণায় দু-তিনজন এত কাতর যে তাদের বোঝা অন্যেরা বয়ে আনে। সকলেরই শুষ্ক তালু। সকাতরে জল চায়। তৃষ্ণা! তৃষ্ণা! কিন্তু, কোথায় জল? কোনদিকে কোথাও একবিন্দু মাত্র নেই। মরুভূমি,—সে তো বালুকাময়, জলশূন্য। জলের সম্পূর্ণ অভাব, বিস্ময়ের

নয়। কিন্তু, এখানে? পূতধারা জননী জাহ্নবীর জন্মভূমিতে? জল-সৃষ্টির উপকরণ আছে, একবিন্দু জল নেই। তুষার-পাষাণ-প্রতিমা। কার চরণকমল স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠার নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রতীক্ষা। প্রাণদায়ী জ্যোতির্ময় তেজঃ-পুঞ্জের উত্তাপের অপেক্ষায় থাকে দৃঢ় পুঞ্জীভূত শুভ্র তুষার।

আকাশপথ বেয়ে স্বর্গের নদী ধারায় নামেন। তৃষিত ক্ষুধিত মুমূর্ষু ধরণী। সগররাজের ষাট হাজার অভিশপ্ত সন্তান। ধরণী ঊর্ধ্বমুখে সাগ্রহে আকুল আহ্বান জানায়। সহস্র বাহু তুলে জননীকে আকর্ষণ করে। স্বর্গের দেবীর হিমশীতল অন্তরে সন্তান-স্নেহের প্রথম কোমল উত্তাপ জাগে। তুষার গলে। পাষাণ ফাটে। দিকে দিকে বিগলিত করুণাধারা সহস্র পথে নেমে চলে শিব-জটাজাল ভেদ করে। ভূমণ্ডলে গঙ্গাবতরণ। নগণ্য জীবনের সাধ্য নেই মহা-করুণার বেগবতী সেই রসধারা ধারণ করে। জীবের পরমস্বরূপ স্বয়ং শিব-ই তাই এই করুণার ধারাকে বহন করেন। জ্ঞানীরা বলেন, যোগীদেহেও এমনি ভাবেই শৈবশক্তি বা মহাশক্তির অবতরণ ঘটে। শাস্ত্রীয় ভাষায়,—পরাবাক-এর অবতরণ। বিষ্ণুপদ থেকে যেমন গঙ্গা নামেন শিবের শিরোদেশে, তারপর প্রসারিত হয় তাঁর করুণাধারাগুলি, ঠিক তেমনি পরাবাক্-এরও দুইটা দিক থাকে। অন্তর্মুখে মহাপ্রজ্ঞারূপে পরমস্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে একদিকে নিত্যযুক্ত, অভিন্নস্বরূপ; আর একদিকে—বহির্মুখে—জীব ও জগতের অভিমুখে মহা-করুণারূপে ক্রমপ্রসরণশীল। মহা-জ্ঞানীর ভাষায়,—"যিনি প্রজ্ঞা তিনিই করুণা, সুতরাং করুণার স্রোতে প্রজ্ঞাই বহিতে থাকে,…বাহ্য গঙ্গারও যাহা, জ্ঞানগঙ্গার অবতরণও ঠিক তাহাই।"

* * *

কালিন্দী খাল।

শব্দহীন স্তব্ধতায় চারিদিক পরিব্যাপ্ত। দেবী গঙ্গার তুষার-শুভ্র বেশ। সাগর উদ্দেশে সুদীর্ঘ শুভযাত্রার প্রারম্ভে নীরব নিশ্চল ক্ষণিক প্রতীক্ষা। যেমন, প্রবল বর্ষণের পূর্বে আকাশজোড়া মেঘের ঘনঘটার স্তব্ধতা। কালিন্দীর শৈল-শৃঙ্গে তুষার-রাশির শান্ত অমল উজ্জ্বলতা। গঙ্গার স্বর্গীয় মহিমা নিবিড়ভাবে মিশে থাকে হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্যে, সুগভীর ধ্যান-মৌনতায়।

অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অপূর্ব অনুভূতি জাগে। পৃথিবীর সুখ-দুঃখের সব স্মৃতি কোথায় বিলীন হয়। দেহ মন পরম তৃপ্তি ও শান্তিতে ছেয়ে থাকে; মনে হয় হিমালয়-পথের এই তো পরম দান। সংসারের

"হাসি নয়, অশ্রু নয়, উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।"

তাই, আজ

"অস্তিত্বের পারে পারে এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে।"

হিমালয়ের পথে পথে

উ. প্র. ম—১

বিরেহী

॥ ১ ॥

কালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলে ঘড়ির কাঁটা ঘোরে।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের রঙীন পাতাগুলি একে একে ঝরে যায়। তাকিয়ে দেখি, আবার মে মাস আসে।

শহরের বাতাসে উদ্দীপ্ত উত্তাপ,—মনের অন্দরে হিমালয়ের হিমেল হাওয়া।

চরণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্তের দুর্নিবার আকর্ষণ পথে টানতে থাকে।

তবুও, আমার প্রবাস যাত্রার প্রস্তুতির লক্ষণ নেই।

বন্ধু-বান্ধব আসেন। প্রশ্ন করেন, একি! এবার এখনও এখানে? হিমালয়ে যাও নি?

আশ্চর্য হয়ে দেখি, এঁরা আশ্চর্য হন আমি গেলেও, আবার না-গেলেও!

উত্তর দিই, যাব বইকি। সময় হলেই যাব। এবার যাত্রা করব ভাদ্র-আশ্বিনে – আগস্ট-সেপ্টেম্বরে।

এর বিশেষ কারণ থাকে।

হিমালয়ে—উত্তরাপথে যতবার ঘুরেছি, তখন মে-জুন মাস সে-সময় কয়েকটি গন্তব্যস্থলে ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয় না। কেননা, সে সব দুর্গম স্থান বছরের সে-সময়ে তখনও তুষার-আবরণ মোচন করে না। গ্রীষ্মের খরতাপে বরফ ক্রমে গলে যায়, তারপর বর্ষাশেষে কিছুদিনের জন্যে সেখানে পথ-চলাচল খানিকটা সম্ভব হয়ে ওঠে।

যেন, সে-সব অঞ্চলে প্রকৃতিদেবীর মানব-লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সেইমাত্র স্বল্পপরিসর অবসর।

তাই, পাহাড়ী বন্ধুরা পরামর্শ দেন, চলে আসুন এবার 'ভাদর-আশ্বিনে,' তখন যাবেন ও-সব দিকে। আসমান্ বিল্‌কুল সাফ্ থাকবে, বরফও গলে যাবে, চারিদিকে সব ফুল ফুটে থাকবে—নানান্ কিসিম ফুল;—কমলফুলের বাহার দেখবেন—সূর্যকমল, রুদ্রকমল, ব্রহ্মকমল—দেবতার পূজার সেই-ই তো ফুল!

কথার উৎসাহের উৎস-পথে ফুলের সুবাস যেন ভেসে আসে, মন আগ্রহে আকুল হয়ে ওঠে।

বদরীনারায়ণের সাধারণ যাত্রাপথ ছাড়িয়ে হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সেইসব

নির্জন পথে যাওয়াই এবার উদ্দেশ্য।

তাই, যেখানে যাত্রীর যাত্রা সারা, আমার হবে সেখানে যাত্রা শুরু।

॥ ২ ॥

হরিদ্বার থেকে ১৬ মাইল দূরে হৃষীকেশ। বাসও চলে, ট্রেনও যায়। হৃষীকেশের পর হিমালয়ের পাহাড় শুরু। ১৩৫ মাইল দূরে পিপুলকুঠি। বদরীনারায়ণের পথে এই পর্যন্তই এখন বাস চলাচল। তারপরে হাঁটা-পথ।* বাস্ চলায় সুবিধা হয়েছে যাত্রীদের নানান্ বিষয়ে। এই সুদীর্ঘ পথ এখন বাস্-এ বসেই চলে যায়। দু'দিনেই পথ ফুরায়। পথ-চলার শারীরিক ক্লান্তি নেই। চটীতে অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রার পাটও সংক্ষিপ্ত হয়। এখন ইচ্ছা করলে কলকাতা থেকে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই কেদার-বদরীর যাত্রা সাঙ্গ করে ফেরাও সম্ভব হয়। তা-ছাড়া, এই বাস্-পথ-এর প্রায় সব স্থানেই বিশেষ গরম। অর্থাৎ মে-জুন মাসে। নদীর ধারে ধারে পথ। ছায়া-বিরল। দু'দিকে উঁচু পাহাড়। গ্রীষ্মের খরতাপে পাথর তাপে। বাতাসও তপ্ত বাণ হানে। হিমালয় যেন ধুনি জ্বালিয়ে তপস্যায় বসেন। এখন বাস্-এ বসে নিমেষে সে-পথ নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু, পরিপূর্ণ সুখ কোথাও সম্ভব নয়। যাত্রী-সংখ্যার অনুপাতে বাস্ কম। তাই স্থানাভাবে বাস্-এর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে হয়। কোথাও বা অতিরিক্ত রাত্রিবাসও। বিশেষ ব্যবস্থা করে টিকিট-কাটা-প্রথার প্রচলনও হয়। সভ্যতার যান চলাচলের অনুকম্পায় পাহাড়ীরা চতুর হতে শেখে। বাস্-এর ভিতর ঠেসাঠেসি ভিড়। তার মধ্যে অনেকেই পাহাড়-পথে মোটর চড়ায় অনভ্যস্ত। বিশেষতঃ পাহাড়ীরা। তাদের মাথা ঘোরে, গা ঘুলায়। তারপর যা হবার তাই হয়। সহযাত্রীর অভিযোগ করার উপায় নেই, করে লাভও নেই, শান্তিও নেই। অসুস্থ যাত্রীর তখন এমনি করুণ কাতর অসহায় ভাব।

ভাবি, পায়ে-হাঁটাই এ-পথের সত্যকার যাত্রা। ধরণীর ধূলি-ধূসরিত চরণে মনে অনন্ত আনন্দ আনে ঃ পথের সঙ্গে পথিকের প্রকৃত পরিচয় ঘটায়। তবুও বাস্-এর পথে হেঁটে বলার প্রেরণা পাই না। শুধু, অতি-দরিদ্র যাত্রী অথবা অতি-ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসী এখনও হৃষীকেশ থেকে হাঁটা-পথের পথিক হন।

পিপুলকুঠি থেকে হাঁটা-পথে বদরীনাথ মাত্র ৩৭ মাইল। বাস্ আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলেছে। পাহাড়ের বুক চিরে পথ আরও কয়েক মাইল তৈরিও হয়েছে ; বিরাট অজগর সাপের মত পাহাড়কে আঁকড়ে ধরার প্রচন্ড প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও ব্যর্থ সে উদ্যম। মানুষ পাহাড়ের পাথর কেটে সেই পাথর দিয়েই পাহাড়ের পথ তৈরি করে, প্রকৃতি অট্টহাস্যে এক মুহূর্তে সে-পথ ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ করে দেয়।

*এর কয়েক বছর পরে বদরীনাথ পর্যন্ত বাস্ চলাচল শুরু হয়।

গত বছর মে-জুন মাসে যে-পথ দেখে গিয়েছিলাম প্রশস্ত রাজপথ, সভ্যতার যান চলাচলের ভার নিতে প্রায় প্রস্তুত, বর্ষার পর এখন গিয়ে দেখি—জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষত-বিক্ষত তার দেহ, পাহাড়-ধসার ফলে বহু জায়গায় নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে।

পিপ্‌লকুঠি থেকে মাত্র আট মাইল দূরে পাতালগঙ্গা। কয় বছরের চেষ্টাতেও বাস্-এর পথ এখনও পাতালগঙ্গার পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করতে পারে নি—এমনি ভঙ্গুর ভয়ঙ্কর সে-পাহাড়।

তবুও, মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ডিনামাইটের প্রচণ্ড শব্দ ওঠে। প্রতিধ্বনিতে প্রকৃতির অট্টহাস্যও দ্বিগুণ হয়। পাহাড়ে মানুষে যেন যুদ্ধ চলে।

আগামী বছর যোশীমঠ পর্যন্ত নিশ্চয় বাস চলবে,—অনেকে আশা করেন।

কেউ বা আবার আশংকা করেন, বলেন, যতদিন না চলে ভালোই। বাস্ চলাচলের সুবিধা আছে ঠিক। কিন্তু, শুধু বাস্-ই তো আসবে না, আনবে ভবে অশান্তির ভার, সভ্যতার সহস্র সমস্যা—যেমন বন্যার স্রোতে ভেসে আসে অজস্র জাল-জঞ্জাল।

আশা-আশঙ্কায় পাহাড়ীদের উন্মুখ মন আলো-ছায়ার আলপনা আঁকে।

কয়বছর আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে।

তখনও কলকাতাতে। কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি। এক পরিচিত ভদ্রলোক এলেন। তাঁরও আসার বিশেষ ইচ্ছা। যথারীতি উৎসাহ দিই। তিনি প্রস্তুতও হন। প্রশ্ন করেন, কী কী জিনিস সঙ্গে নেব বলুন তো ?

ঠিক এমনি সময়ে পাণ্ডা শ্রীসূর্যপ্রসাদজি এসে হাজির। তাঁকে দেখেই বলি, এই যে আদত লোক এসে গেছেন, ইনিই সব পরামর্শ দেবেন।

পাণ্ডাজি নতুন যাত্রী পেয়ে খুশী। নতুন যাত্রীও পাণ্ডার আশ্বাসবাণী শুনে নিশ্চিন্ত। দুজনে পরামর্শ চলতে থাকে। পাণ্ডাজি গাড়োয়ালী হলেও বাঙালী। বাংলাদেশের সঙ্গে বহুদিনের সংস্রব। পরিষ্কার বাংলা বলেন।

নতুন যাত্রীটি স্টেনো-টাইপিস্ট। সঙ্গে নিয়ে যাবার জিনিসপত্রের নাম বলে যাচ্ছেন পাণ্ডাজি, আর তিনি শর্টহ্যাণ্ডে লিখে চলেছেন। অল্পেই তালিকা শেষ হয়। ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, এই তা'হলে ! বিশেষ কিছুই তো নয় দেখছি। বলে আবার তাঁর ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ বলেন, হ্যাঁ, ধরেছি। একটা জিনিস আপনি বাদ দিয়ে গেছেন। সেটা লিখে নিই।

বিচক্ষণ পাণ্ডাজি আশ্চর্য হন। জিজ্ঞাসা করেন, কি বাদ দিলাম ? সবই তো বলেছি মনে হচ্ছে।

তিনি উত্তর দেন, এক টিন ঘি। শুনেছি ওখানে ভাল ঘি পাওয়া যায় না।

শুনেই পাণ্ডাজি হাফ ছাড়েন। গম্ভীর হয়ে বলেন, ওঃ !—নাঃ, ঘি নিয়ে যাবার দরকার হবে না, ওটা আপনি ওখানে পাবেন। তবে, আপনি ঠিকই বলেছেন, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। সেটা হল—বনস্পতি-তেল। আপনারা

তো বনস্পতি খান, সেটা ওখানে পাবেন না। পাবেন ঘি, তা হয়ত অনভ্যাসে পেটে সইবে না। সঙ্গে এক টিন বনস্পতি নেবেন।

মাত্র বছর পাঁচেক আগেকার কথা। সেদিন পাণ্ডাজি বিদ্রূপছলে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু, কয় বছরের মধ্যেই চোখের উপর দেখলাম, এ যাত্রাপথে যতদূর বাস্ গেছে এখন সর্বত্রই বনস্পতির প্রচলন। ক্বচিৎ কখনো দু-একটা দোকানে 'বিশুদ্ধ ঘি'-এর তৈরি খাবারের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়—যেমন কলকাতা শহরেও। শহরবাসীদের মতন যাত্রীরাও অনেক সময়েই সেগুলি সন্দেহের চোখে দেখেন।

দুর্গম হিমগিরি বাস্-পথের অগ্রগতি অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু বনস্পতির গতিপথের এখন আর রোধ নেই। বাস্-পথ অতিক্রম করেও চলেছে।

বাস্-এর পথে পিপলুকুঠির দশ মাইল আগে চামোলী। চামোলীর অপর নাম লালসাঙা। এখানে অলকানন্দার উপর যে পুল আছে, এককালে তার রঙ ছিল লাল। তাই, চামোলী সেই লাল রঙের ছোপ নিয়ে নিজের নতুন রঙীন নাম নিল—লালসাঙা। চামোলী ও পিপলুকুঠির মাঝপথে অলকানন্দার সঙ্গে বিরহী গঙ্গার সঙ্গম। পাহাড়ীরা বলেন, 'বিরেহী'। ম্যাপ-এও সেই নাম দেখি। সঙ্গমের কিছু দূরে বাস্-এর পথে বিরহী-নদীর উপর পুল। পুল পার হয়ে আবার অলকানন্দার কূল ধরে বাস্ চলে যায় পিপলুকুঠি,—পাঁচ মাইল মাত্র দূরে।

পুলের কাছে আমরা বাস্ ছেড়েছি। গন্তব্য-স্থল বিরহী-তাল। সাহেবরা বলতেন, গোণা-লেক। এখান থেকে নয় মাইল পথ। বিরহী-নদীর উপত্যকা দিয়ে যেতে হবে। এ-পথে গ্রীষ্মকালেও যাবার কোন বাধা নেই।

হিমালয়ের অন্দর, যেন, মানুষের অন্তর।

অন্তরে স্থান পেতে হলে প্রীতি-ভক্তি-প্রেমের ধারা ধরে চলতে হয়। হিমালয়ের অন্দরে পৌঁছুতে হলে তেমনি গিরি-নির্ঝরিণীর গতিপথ ধরে অগ্রসর হতে হয়। তুষার-শিখর থেকে পার্বত্য নদী আপন বেগে ধেয়ে নামে। নদীর প্রবল প্রবাহে পাথর কাটে, পাহাড় ধসে—নদী তার পথ খুঁজে নেয়। নদীর সেই প্রবাহ-পথ অনুসরণ করে পথিকেরও পথ চলা শুরু হয়।

বিরহী-নদীর ধারা ধরে আমরাও চলি।

॥ ৩ ॥

ক'দিন আগে হেমকুণ্ডের পথে পরিচয় হয়েছে বন-বিভাগের একজন অফিসারের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন একই সঙ্গে। ভালোই হয়েছে। এ-সব অঞ্চলে তাঁরাই রাজা। প্রবল প্রতিপত্তি। হবার কথাও। সঙ্গে দুজন চাপরাসী আছে। পুলের কাছে এ-অঞ্চলের রেঞ্জারবাবুও এসেছেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। যে ক'দিন তাঁর এলাকায় অফিসার থাকবেন, তিনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, চলবেনও।

অফিসারটির পদমর্যাদা আছে। তাই, সে-গৌরবের ভাবে ভারাক্রান্ত হবার কথা। কিন্তু,আগেই পরিচয় পেয়েছি তা তিনি নন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে এ পথে চলতে সম্মত হয়েছি। তাতে আমাদের সুবিধাও হয়েছে। এ পথে লোক চলাচল নেই, পথের নিশানাও নেই। মাঝখানে এক জায়গায় একটা গ্রাম আছে। তাও শোনা কথা। কেননা, সে গ্রাম পাহাড়ের উপরে, পথ থেকে দূরে। তাই, চোখে পড়ে না। গ্রামবাসীদেরও এ পথে যাতায়াত করার প্রয়োজন হয় না।

বিজন পথে একাকী পথ চলায় আমার ভয় নেই। গহন বনের মধ্যেও নয়। কেন জানি না, নিবিড় নির্জন অরণ্যে আলোছায়ায় আবছায়া পথে পথে একা ঘুরেছি, তবু মনে ছমছমে ভাব আসে নি। অপার আনন্দই পেয়েছি। বিরাট বনস্পতির শান্ত-ছায়ায় শ্রান্ত কায়া আশ্রয় পেয়েছে, তরু-লতার শ্যামল শোভা নয়নে স্নিগ্ধতা এনেছে। বনের পশুর হিংসার কথা মনে জাগে নি। কেননা, এত ঘুরেও তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার ভাগ্য কচিৎ-ই হয়েছে।

কিন্তু, এখানে পথের নির্দেশ না থাকায় পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। এঁরা থাকায় সে অভাব মিটেছে।

অফিসারটি নতুন। নতুন এসেছেনও এ-পথে।

লম্বা, দোহারা চেহারা। সাহেবী পোশাকে আরও লম্বা মনে হয়। ফরসা রঙ। বয়স অল্প।

নাম অমরনাথ।

বলে, গতবছর চাকরিতে যোগ দিয়েছি। প্রথমেই গাড়োয়াল পাঠিয়েছে। ভালোই হয়েছে। হিমালয় আমার ভালো লাগে।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে গাড়োয়ালী নয়!

আমার কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে বোঝে। নিজেই বলে, পাহাড়ে আমার বাড়ি নয়, তবে পাহাড়ই আমার এখন ঘর-বাড়ি। বনে জঙ্গলে ঘোরাই হল আমার কাজ। দেশ মথুরায়। পড়াশুনা করেছি আগ্রায়। এম. এস্‌সি পাস করে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিলাম, পাসও করলাম। গভর্ণমেন্ট থেকে জানতে চাইল, পুলিসে বা বন-বিভাগে কোথায় যোগ দিতে চাও? জানতাম, পুলিসের চাকরিতে পয়সা বেশী, প্রতিপত্তিও প্রচুর। তবুও বন-বিভাগই বেছে নিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? এখানে তো বনে জঙ্গলে বাস? সমাজ-সভ্যতা-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন তো এ জীবন?

শান্তস্বরে জবাব দেয়, তারি মধ্যে তো অপার আনন্দ! প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়—এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কোন্ চাকরিতে আছে বলুন?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। চারিদিকে সুস্নিগ্ধ-দৃষ্টির প্রলেপ বুলিয়ে নেয়। উচ্ছল নদীর চঞ্চল জলধারায়, উজ্জ্বল আকাশের নিবিড় নীলিমায়, গহন বনের ঘন-শ্যামলিমায় মগ্ন হয়। 'চক্ষুভিরিব পিবন্তি'—সত্যই চোখ দিয়ে

প্রকৃতির মনোলোভা শোভা যেন আকণ্ঠ পান করে নিতে চায়।

তারপর বলে, বদরীনারায়ণের পথে চাকরির প্রথমেই এসেছিলাম। কিন্তু বিরহী-তালের পথে আসা হয়নি। এখন ইন্‌স্‌পেক্‌শনে চলেছি। হ্রদের ধারে বোট্‌ হাউসটি এবার বর্ষায় প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। জিনিসপত্রও কিছু নষ্ট হয়েছে। সেই সব দেখতে যাওয়াই উদ্দেশ্য। পথটাও দেখে রিপোর্ট দিতে হবে। যে-পথে চলেছি আমরা, সেটা এ বছরই প্রথম তৈরী হয়েছে। নইলে, পথ বলতে কিছু ছিলই না। এ বছর এক মিনিস্টারের আসার কথা ছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা তৈরি হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আসা হল না—আপনারাই ভোগ করে গেলেন।

পথ তৈরির পরিচয় পথ-চলার মাঝে পাচ্ছি বটে। আবার অনেক সময় দেখছি, পথ নেই-ও। সে-সব স্থানে পাহাড় ধসে গেছে, পথও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানে, যদি সম্ভব হয়, নদীর মধ্যে নেমে জলের পাশে ছড়ানো পাথরগুলির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। যেখানে আবার নদীর দুরন্ত স্রোতের মধ্যে পাহাড়ের ধস্‌ খাড়া নেমে গেছে, নীচে নামা সম্ভব নয়, সেখানে পাহাড়ের কিছু উপরে উঠে সে-সব স্থান কোনরকমে অতিক্রম করছি।

অমরনাথ বলে, পাহাড়ে প্রথম বছরের নতুন পথই সবচেয়ে বেশী ভাঙে। যেমন মানুষ হাঁটতে শিখে বেশী পড়ে। এর বৈজ্ঞানিক কারণটিও সহজ। ভূতাত্ত্বিকের মতে হিমালয় এত বিরাট হলেও, সৃষ্টির জগতে ছেলেমানুষ। এখনও সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি। এ-সব পাহাড়ের পাথর ও মাটি সব জায়গায় শক্ত হয়ে দানা পাকায় নি। নতুন পথ তৈরির ফলে পাহাড়ের ভারসাম্যের হেরফের হয়, হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিরিরাজ ধস্‌ নামিয়ে দেন, পথরেখাও নিশ্চিহ্ন হয়। অথচ, এই পথ তৈরী করতে কম কাঠ-খড় আমাদের পোড়াতে হয়েছে? খরচ তো আছেই। তার কথা বলছি না। কিন্তু, গভর্ণমেণ্টের কোন্‌ বিভাগ থেকে সেই খরচা হবে তারই সমাধান হতে ক'বছর কেটে গেল।

তারপর আশপাশের জঙ্গলগুলি দেখিয়ে বলে, সাধারণের ধারণা চারিদিকের সব জঙ্গলই বন-বিভাগের অধীনে। কিন্তু আশ্চর্য হবেন শুনে যে, এর মধ্যে অনেক বড় বড় জঙ্গলই বন-বিভাগের অধীনে নয়।

প্রশ্ন করি, বন বন-বিভাগের নয়, সে কী ব্যাপার?

অমরনাথ দুঃখ করে বলে, কিন্তু তাই তো চলে আসছে। কবে কোন্‌ কারণে ইংরাজ-আমলে বড় বড় বনগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য-বিভাগের অধীনে রাখা হয়েছিল। এখন সেভাবে রাখার কোনও কারণই নেই, তবুও সেইভাবেই চলেছে। অনেক লেখালেখির পর এবার শুধু এই পথটুকু তৈরি করবার ভার বন-বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। মিনিস্টারের আসার সম্ভাবনায় তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়েছিল। এখন সব বন্ধ।

হঠাৎ সোৎসাহে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ভালো কথা। মাছ খান তো?

এই আকস্মিক অবান্তর প্রশ্নে আশ্চর্য হই।

বলি, হঠাৎ এ-কৌতূহলের কারণ কি? কথা হচ্ছিল তো পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, পথ-তৈরির ব্যাপার নিয়ে। মাছ এল কোথা থেকে?

হেসে উত্তর দেয়, বাঃ! চলেছেন গোণা-লেকে, আর ও-প্রশ্ন করব না? যারা ওখানে যায়, তারা সবাই তো মাছ ধরতে ও মাছ খেতেই যায়। ওখানকার ঐ তো মস্ত স্পোর্ট। তারই জন্যে ও-লেকের প্রসিদ্ধিও।

বললাম, তুমি খাও তো? খুব ধোরো খেয়ো।

সে বলে, মাছ আমিও খাই না। শুনেছি সাহেবরা ওখানে ট্রাউট্-মাছ ফেলেছিল। এখনও মাঝে মাঝে ফেলা হয়। বিলেতী মাছ, একটামাত্র কাঁটা, খেতে সুস্বাদু। টাটকা, চলন্ত জলে ওরা নাকি থাকে ভালো।

হেসে বললাম, ভালো মানে মৎস্যাশীর লোলুপ দৃষ্টিতে থাকে ভালো। যেমন কচি ঘাস খাইয়ে অতি-যত্নে পোষা কল্য-ভক্ষ্য ছাগ-শিশু।

মনে পড়ল, কয় বছর আগে পাঞ্জাবে কুলু-ভ্যালিতে ট্রাউট্-মাছের চাষ দেখেছিলাম। বিয়াস্-নদীর অর্থাৎ বিপাশার উপত্যকা। ঘননীল জল। স্ফটিকস্বচ্ছ। তরঙ্গোচ্ছল। পাথরে আঘাত পেয়ে জলস্রোত সাদা-সাদা ঢেউ-এর পাল তুলে চলেছে। কোথাও বা নদীর স্রোত বহু ধারায় বিভক্ত হয়েছে, ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। নদীর ধারেই পাইন ও চীর গাছের বন। জলের একটা ধারাকে সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই ধারার পথে মাঝে মাঝে বাঁধানো চৌবাচ্চা। সেখানে জল জমে, আবার বয়েও যায়। সে-সব জলাধারের দুই মুখে ছোট ছোট দুয়ার। প্রয়োজন মত সেগুলি খোলা বা বন্ধ করা যায়, জলের গতি-বেগ সংযত করা হয়। তারি মধ্যে বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন আকারের মাছ। কোন্‌টিতে কত ‌্রের বয়সের মাছ আছে, পাশেই সাইন-বোর্ডে লেখা।

শিখ-অফিসারটি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন, সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

মাছ বিক্রিও হয়। আমার সঙ্গীরা কিনতে উৎসুক হলেন।

সব চেয়ে বড় মাছগুলি যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে অফিসারটি বললেন, হাত দিয়ে আপনারা নিজেরাই ধরতে পারেন, কোন ভয় নেই।

যতীনবাবু মৎস্যাশী। তবুও মাছ ধরার উৎসাহ বা ধৈর্য তাঁর কোনকালে নেই। মাছ-ধরার এমন সহজ সুযোগ পেয়ে চৌবাচ্চার পাশে থপ করে বসে পড়ে তিনি জলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটি বিশেষ মাছের উপরই তাঁরা লোলুপ দৃষ্টি। অনেক করে সেটি ধরলেনও। হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরেছেন। ধরেই আমাদের দিকে উৎফুল্ল নয়নে তাকালেন। মুখে বিজয়ী বীরের জয়োল্লাস।

কিন্তু, নিমেষে মাছটা হাত থেকে সড়াৎ করে পিছ্‌লিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। 'এই পালালো'—বলে যতীনবাবু চিৎকার করে উঠলেন।

শিখ ভদ্রলোকটি কিন্তু দেখলাম খুব খুশী। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, ভালোই হয়েছে। অপর আর একটি ধরুন। আপনার উৎসাহ দেখে বাধা দিতে পারছিলাম না—ওটি মৎস্য নারী, ওগুলি ধরার এখানে নিয়ম নেই। অত মাছের মধ্যে ঠিক ঐটিই আপনি বেছে ধরেছিলেন।

সবাই আমরা হেসে উঠি। যতীনবাবুও। বলেন, আমার ভাগ্যই এইরকম।

সেই দেখেছিলাম ট্রাউট্ চাষ।

কিন্তু, গাড়োয়ালে—উত্তরাখণ্ডে—এ চাষ হল কি করে? এ যেন মন্দিরে মৎস্য ভোগ।

মায়ের মন্দিরে, মায়ের অনুচরদের জন্যে, হয়তো নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এ তো শিব-স্থান।

এরও কারণ আছে। বিরহী-তাল প্রাকৃতিক হ্রদ নয়। আবার মানুষের সৃষ্টিও নয়। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার মধ্যে এর জন্ম-কাহিনী।

বিরহী গঙ্গার পৌরাণিক প্রাচীনত্ব আছে। সতীর দেহাবসানের পর বিয়োগ-বিধুর শঙ্কর এই তরঙ্গিণীর তটে বসে নিদারুণ তপশ্চর্যা করেন। সেই তপস্যার তপোফলে দেবী চণ্ডিকা পার্বতীরূপে আবার অবতীর্ণা হন—এই পুরাণকাহিনী। বিশ্বের ঈশ্বর তিনিও বিরহ-কাতর। সেই বিরহী শিবের বিগলিত অশ্রুর পূতধারার সূত্র ধরেই নদীর নামকরণ হল বিরহী-গঙ্গা। পরম-পাবনী নদী। 'ব্রীহিকা নাম বিখ্যাতা'।

শুনেছি এ-অঞ্চলে কোথায় বিরহীশ্বর শিবের মন্দিরও আছে।

কিন্তু বিরহী-হ্রদের সে ঐতিহ্যময় গরিমা নেই, পুণ্যের মাহাত্ম্যও নেই। তবে প্রসিদ্ধির ভৌগোলিক কারণ আছে।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এক গভীর রাত্রে হঠাৎ গোণা-গ্রামের নিকটে এক বিরাট পাহাড়ের অর্ধাংশ ভেঙে পড়ে। সেই ধসে-পড়া পাহাড়ের বিপুল স্তূপ নদীর গতিপথ সম্পূর্ণ রোধ করে ফেলে। ফলে, নদীর জল ক্রমে জমতে থাকে এবং একটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। মাসের পর মাস নদীর জল সেখানে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে জমতে লাগল, অথচ সে-জল নিকাশের কোন পথ নেই। কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, জল নিকাশের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। অবশেষে, এগারো মাস পরে সেই ক্রম-প্রসারমাণ বিপুল বারিরাশি আত্মশক্তির প্রভাবে নিজেই এ সমস্যার সমাধান করে নিল,—প্রচণ্ড বেগে সেই ভগ্নস্তূপের বাঁধ ভেঙে এক ক্ষুরধারা নদী নেমে এল। সংহারিণী তার মূর্তি,

সর্বপ্লাবিনী তার শক্তি। দেবী চণ্ডিকা বুঝি আবার কলিযুগে প্রচণ্ড নদী রূপেই নেমে এলেন।

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা!'

প্রবল বন্যায় চারিদিক ভেসে গেল। অলকানন্দাও সে-জলভারে স্ফীত হল। গাড়োয়াল-রাজধানী শ্রীনগরের শ্রী লুপ্ত হল, নগর ধ্বংস পেল। হরিদ্বারের দ্বার-দেশেও সে-বন্যার নির্দয়, ক্রুদ্ধ আস্ফালন আঘাত হেনেছিল। এখনও সে সব দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী লোকমুখে শোনা যায়।

ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করে নদী শান্ত হল। অবরুদ্ধ নদী মুক্তিপথের সন্ধান ফিরে পেল।

তাই আজ দেখি তার উচ্ছল জলধারার সহজ সুন্দর গতিবেগ। নৃত্যভঙ্গে ছুটে চলেছে।

হ্রদের জল কিন্তু কমে গেলেও থেকে গেল।

হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে পাহাড়-ঘেরা হ্রদ, সাহেব কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সুইজারল্যান্ডের স্বপ্ন-বিলাসী সৌন্দর্য-পিয়াসী মন নিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে চলে এলেন এখানে। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। আনন্দ-ভোগের লিপ্সা জাগল। জলে মাছ ভাসল, নৌকা চলল, তীরে বোট-হাউস তৈরি হল।

স্বাধীনতার পর এখন সাহেবরা বিরল। তবুও যে-ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যেই জনকয়েকের এখনও গোণা-লেকে আনাগোনা। আর যান সরকারী কর্তৃ-পক্ষের কয়েকজন মাত্র।

কিন্তু, সে-মাছ ধরার মৎস্যগন্ধী গল্প ভালো লাগে না।

হিমালয়ের বিরাট সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে মন চায়।

অমরনাথের হালকা শরীর। যেন হাওয়ায় ভেসে-ভেসে সে চলে। অত দ্রুত চলা আমার স্বভাব নয়। তাকে বলি, তুমি এগিয়ে চলো। আমি ধীরে ধীরে যাব। ভয় নেই, পথ ভুলব না: পিছনে তো তোমার চাপরাসীরা আসছে।

সে এগিয়ে চলে তার রেঞ্জারের সঙ্গে কথা কইতে-কইতে। পথের দু-পাশের গাছের পাতা দেখে, ফুল দেখে টেনে ছেঁড়ে, গন্ধ নেয়—গাছের নাম বলে দেয়। রেঞ্জারকে কখনও বা প্রশ্ন করে, তোমাদের ভাষায় একে কি বলে?

আমার দিকে ফিরে বলে, এদেরও এক বছর এসব বিষয়ে পড়তে হয়েছে, ট্রেনিং নিতে হয়েছে।

গাছ, ফুল, পাতা—বন জঙ্গল—সবাই যেন জানতে পারে, এসেছে তাদের বন-কর্তা। তাদের জন্ম-পরিচয়, নাড়ী-নক্ষত্র তার নখ-দর্পণে।

আমার মন, কিন্তু আনমনা।

আমি পেছিয়ে পড়ি। ইচ্ছা করেই,—আরও। একা চলায় আনন্দ অনেক। একা তো নয়,—নিজেকেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া, চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, আবার নিজের মনমুকুরে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখা। এ যেন একান্ত অন্তরঙ্গের সঙ্গে এক অভিনব লুকোচুরি খেলা।

বন-পথ। বিশাল সব বনস্পতি। তারি ফাঁকে ফাঁকে পথের ধারে নদীর নীল ধারা চোখে পড়ে। উপরে সবুজ পাতার জালি-পথেও দেখা যায় ফালি ফালি নীল আকাশ। গায়ে লাগে হেমন্তের প্রশান্ত বাতাস। সকালের রোদে চারিদিক ঝলমল করে। বর্ষার পরে প্রকৃতির শুচিস্নিগ্ধ শ্যাম শোভা। যেন স্নান সেরে পুষ্পপাত্র হাতে জননী বসুন্ধরা স্মিত বদনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

বাড়িতে দুর্গাপুজো। মা নিজের হাতে সব ভোগ রাঁধেন। আর কেউ রাঁধলে চলবে না। বলেন, সাহায্য করতে হয়, তরি-তরকারি এগিয়ে দাও। ঐ পর্যন্ত।

ভোরে স্নান সেরে গরদের লালপেড়ে শাড়ি পরে রান্নাঘরে ঢোকেন।

মাথায় চূড়া করে চুল বাঁধা, খুলে গেলে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পড়ে। মুখের রক্তিম আভা আগুনের তাপে আরও রাঙা হয়ে ওঠে। উনুন তো একটা নয়, সারি সারি কয়টা জ্বলছে, সব-ক'টিতেই রান্না চড়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার মা তো নন—জগজ্জননী দশভুজা। হাতে দশ-প্রহরণ নয়, রন্ধনের দশ প্রকরণ। আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা যেন দশ-হাতে রন্ধন করছেন।

একটু দূরেই পুজোমন্ডপ। নিজেই ভোগ বয়ে নিয়ে যান। প্রকান্ড সব থালা। ভারে দেহ নত হয়েছে। মাথায় ঘোমটা। বাড়ির অন্দরমহল, তবুও লজ্জা। বলেন, পুরুতঠাকুর রয়েছেন যে!

নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁট চেপে ফুঁ দেন। হাওয়ায় ঘোমটার কাপড় অল্প ফাঁক হয়। তারি মধ্যে দিয়ে আড়চোখে দেখে পা ফেলে চলেন।

আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখি। শুচি-স্নিগ্ধ মায়ের রূপ। রূপের ছটা যেন ঠিকরে পড়ে। ভাইবোনে বলাবলি করি, দেখেছ,—মায়ের মুখখানি ঠিক প্রতিমার মুখ বসানো—একেবারে।

কথা শুনে মা রাঙা-মুখে চোখ রাঙান। ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধমধুর হাসি, - বলেন, ছিঃ! বলতে আছে! জ্বালাস্ নে কাজের সময়। ছুঁবি নাকি?

ছেলেবেলার সে ছবি ভোলবার নয়। আজ প্রকৃতির রূপের মাঝে সেই ছবিরই প্রতিচ্ছবি দেখি। চারিদিক সুরভিত সুন্দর।

অনাবিল আনন্দে মন ভ'রে ওঠে।

॥ ৪ ॥

পথ চলেছি। ধীরে ধীরে। চলার কষ্ট নেই। পথ-শ্রান্তিও নেই। কেননা, দুরারোহ চড়াই-এর অকস্মাৎ সাক্ষাৎ-ও নেই।

মাঝে মাঝে পাহাড়ে উপর থেকে নেমে-আসা ঝরনাধারা পথের স্বচ্ছন্দ গতি অবরোধ করে। পুল নেই। ছোট-বড় ঝরনা। ছোট ধারাগুলি পার হওয়ার অসুবিধা নেই। জলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত পাথর। সেই সব পাথর ঘিরে জলের ধারা ছুটেছে। মাথা-উঁচু-করা পাথরগুলির উপর পা রেখে ডিঙিয়ে জল পাব হই।

বড় ধারাগুলিরও জলেব ভিতর নানান্ আকারের পাথর। কিন্তু, পাথর থেকে আব এক পাথরে লাফিয়ে যাওয়া সব জাযগায় সম্ভব নয। কোথাও বা সম্ভব হলেও সাহস ও শক্তির প্রয়োজন। সাবধানী মন কখনও বা সে আত্মবিশ্বাসের অন্তরায় হ্য। মনে ভাবি, অযথা সাহস প্রকাশের প্রয়োজন কি ?

পায়ের জুতো মোজা খুলে ফেলি।

সঙ্গের পাহাড়ীরা বলে, কাঁধে উঠে পড়ুন, পার করে নিয়ে যাই।

হেসে বলি, কাঁধে চাপবার সময় যখন হবে নিশ্চয় উঠব। কিন্তু এ সময়ে নয়।

তারপব বলি, তোমরাও তো হেঁটেই পার হবে, তবে আমিই বা যাব না কেন ?

সাবধান করে দেয়। বলে, তবে দাঁড়ান। চট্ করে জলে নামবেন না। জলের মধ্যে বড় পাথরগুলির কাছে কতখানি জল জানা নেই। কোমর-জলও কোথাও হতে পারে। ওপর থেকে দেখে বোঝবার জো নেই। আগে আমরা পাব হযে দেখি কোনখানে জল কম।

হাঁটুর উপর পায়জামার কাপড় তুলে একজন লাঠি হাতে জলে নেমে পড়ে। ঘুরে-ফিরে দেখে বলে দেয় কোথা দিয়ে পার হব।

তারপর, আবার সতর্কবাণী। দাঁড়ান, জলের বড় টান। হাত ধবে চলুন।

সেইমত যাই-ও। পায়ের তলায় জলের ভিতর কোথাও বা পিছল পাথর, কোথাও বা পাথরে রুদ্ধগতি নদীর প্রবল প্রবাহ। হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে সহজেই পার হই। পাহাড়ী কর্কশ কঠিন মুষ্টি। বন্ধুর পথে প্রকৃত বন্ধুর স্পর্শানুভূতির তৃপ্তি আনে।

ছয় মাইল পথ চলে এসেছি। মাত্র তিন মাইল আর বাকি। বেলা এগারোটা বেজেছে।

অমরনাথ বলে, সামনে ঐ একটা নদী দেখছি, বিরহী-নদীতে এসে মিশেছে। ওরই কাছে বসে কিছু খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। তারপর একটু বিশ্রাম করে আবার চলা।

সঙ্গী শিশিরবাবু বলেন, বিশ্রামে প্রয়োজন কি ? মোটেই শ্রান্ত হই নি। ছ'মাইল পথ দু'ঘন্টায় চলে এসেছি—বাকি তিন মাইলও এক ঘণ্টায় যাব। একেবারে যাত্রাপথ সাঙ্গ করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

অমরনাথ হেসে বলে, অঙ্কর খাতার পাতায় হাতের হিসাবে ওটা মেলে বটে, হিমালয়ের পাহাড়-পথে পায়ে ও-আঁক মেলে না। শুনেছি সামনে কয়েক জায়গায় এখনও পথ তৈরি করা সম্ভব হয় নি, কয়েক জায়গায় পাহাড়ও ভেঙেছে। একটু পার হতে সময় নেবে, একটু ক্লান্তিও হবে। তাই এঞ্জিনে কিছু জল-কয়লা ভরে নেওয়া ভালো। আমি অবশ্য একটানা চলতে প্রস্তুত—চলার অভ্যাসও আছে।

কারণ শুনে অকারণ ক্লেশভোগে সকলেই নারাজ হই। নদীর ধারে বিশ্রামের আশ্রয় খুঁজি।

বিস্তীর্ণ বালি-ভরা নদী। স্বর্ণকান্তি বালুকারাশির উপর জলধারার সুনীল জাল বোনা। বড় ধারাটির হাত দুই-তিন উপরে দুখানা পাইনগাছের গুঁড়ি পুলের আকার ধরে শুয়ে আছে। তার উপর দিয়ে সাবধানে পার হলাম। পড়ার আশঙ্কা কম, ভয়ও করে না,—কেননা, পড়লে জামা-কাপড়ই ভিজবে, তার বেশী কিছু নয়।

জলের ধারে বালির উপর নানান আকারের পাথর। কালো বড় বড় পাথরগুলি দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন অনেকগুলি প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিশ্চল হয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

দুটি সমতল পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে আরামে বিশ্রাম করি। পাথরের পাশেই জলের ধারা।

কল্‌কল্‌ স্বরে বয়ে চলেছে। স্ফটিক-স্বচ্ছ জল। জলের ভিতর সোনালী বালি চিক্‌চিক করে। ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। এদিক থেকে ওদিকে যায়, আবার চকিতে এদিকে ঘুরে আসে। নদীর দুই তীরেই পাহাড়ের ঢালু গা। ধীরে ধীরে বহু উপরে উঠে গেছে। দুই দিকেই গভীর বন। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের মাঝে শ্যামলতার স্নিগ্ধ শোভা।

অমরনাথ তরুণ। পরিশ্রমের শ্রান্তি জানে না। বিশ্রামের শান্তি মানে না। এরি মধ্যে গাছের কয়েকটি বড় পাতা সংগ্রহ করেছে।

হেসে বলি, ওগুলি হবে কি ? বটানির স্পেসিমেন নাকি ?

সে-ও হেসে উত্তর দেয়, সায়েন্স-সৎকার নয়, অতিথি-সৎকারের আয়োজন হচ্ছে।

শিশিরবাবু নদীর জলে পাতাগুলি ধুয়ে নেন। পাথরের উপর বিছিয়ে দেন। অমরনাথের চাপরাসী খাবার ভরা টিফিন-কেরিয়ার আনে।

অমরনাথ বলে, পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল আমার ঘর বাড়ি। তাই এখানে আপনারা আমার অতিথি। আমার অকিঞ্চন আয়োজনে আপনাদের সাদর

অভ্যর্থনা করছি।

আলুর সবজি, রুটি ও মুগের ডালের নাড়ু। অমৃতভোগের আস্বাদন পাওয়া যায়।

আহারান্তে ক্ষণিক বিশ্রাম। নদীর ধারেই গাছের নীচে সামান্য একটু ছায়া। সেই ছায়ার স্নিগ্ধ প্রলেপ মেখে শ্রান্ত দেহখানি একটি পাথরের উপর এলিয়ে দিই। চোখে আলস্যের আবেশ আসে। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু জলধারার একটানা ছল্‌ছল্‌ শব্দ। সত্যই যেন 'রৌদ্রময়ী রাত্রি'।

মৃদু মধুর সুরধ্বনি তোলে জলতরঙ্গ।

প্রশান্ত প্রকৃতি মনে শান্তির পরিতৃপ্তি আনে।

কিন্তু পথের আহ্বান পথিক-চিত্তকে সজাগ করে তোলে। আবার পথচলা শুরু হয়।

মাঝে মাঝে জঙ্গল। মানুষ-উঁচু ঘাস, ছোট ছোট গাছ। লাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে চলেছি। কখনও বা উন্মুক্ত বনপ্রান্তর। তারি বুকে আঁকাবাঁকা পথরেখা।

হঠাৎ এক জায়গায় পথ-চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। পাহাড়ের মাথার উপর থেকে নেমে আসা প্রকান্ড একটা ধস পথের ক্ষীণ রেখাও গ্রাস করেছে। খাড়া পাহাড়ের গা সোজা নদীর কূলে নেমে গেছে। অগ্রসর হবার উপায় নেই।

পঁচিশ-ত্রিশ হাত নীচে নদীর ধারে নামতে পারলে, জলের ধারে ধারে বালি ও পাথরের উপর দিয়ে চলা যাবে বটে, কিন্তু নামা তো এখানে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

রেঞ্জারবাবু বলেন, ভুলই হয়েছে। আর একটু আগে পথ ছেড়ে নদীর বুকে নামা উচিত ছিল, নামবার মত পথও ছিল। সেইদিকে ফিরে যাওয়া যাক্‌।

অমরনাথ চাপরাসী ও কুলীদের বলে, আবার ফেরা কেন —দেখ না, এইখানেই কোথাও নামা সম্ভব কিনা।

আমরা অপেক্ষা করি। তারা গাছের ডালপাতার অন্তরালে অদৃশ্য হয়। কিছু পরে ফিরে এসে জানায়, নাঃ, নামার পথ নেই। সোজা পাহাড় ধসে গেছে —একেবারে গাছপালা সমেত। অবশ্য আমরা পাহাড়ী আদ্‌মীরা—কোন রকমে নেমে যেতে পারি, কিন্তু আপনারা পারবেন না।

পাহাড়ীরা যখন পথ খুঁজতে ব্যস্ত, তখন অমরনাথের সঙ্গে প্রায় ব্যবস্থাই করেছিলাম যে ফিরে গিয়ে সোজা পথে নদীতে নামা যাবে।

এখন, অক্ষমতার কটাক্ষপাতে তার আত্মসম্মান আহত হয়।

বলে, চলো দেখি—আমিও পারব,—এখানেই নামব।

আমি সাবধান করি, দরকার কি অযথা দুঃসাহস-প্রকাশে? চলো ঘুরেই যাওয়া যাক।

সে তখনি গম্ভীরভাবে আমাদের জানায়, আপনারা দাঁড়ান এখানে, আমি

দেখছি। পাহাড়ীদের ধারণা আমরা বুঝি ভীরু।

তারপর, গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়। আমরা অপেক্ষা করি।

কিছু পরেই দূর থেকে ডাক শুনি, চলে আসুন—সাবধান, কুলীদের হাত ধরে।

এলামও তাই। তাদের হাত ধরে, ভেঙে-পড়া গাছের ডালের উপর পা রেখে, আর একটা গাছের ডালে ঝুলে। কোথাও বা বসে বসে।

কেন জানি না, তবুও ভয় করে নি। উত্তেজনার মধ্যে আনন্দই পেয়েছিলাম। গাছের ডালের স্পর্শ তো নয়, যেন মনে হয় ধরিত্রীমাতার হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে নেমে এলাম।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, জন্মগত স্বভাব ভোলবার নয়।

সম্মুখে নদীর ওপারে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে অমরনাথ বলে, ঐ পাহাড়টিরই অর্ধেক অংশ ভেঙে গিয়েছিল দেখা যাচ্ছে,—ওতেই বোধ করি গোণা-লেকের উৎপত্তি।

রেঞ্জারবাবু বলেন, ঠিক তাই। ঐটিই সেই পাহাড়। ওর পরেই গোণা-লেক।

প্রকাণ্ড ভগ্নাঙ্গ এক পাহাড়। এক অর্ধাংশ তার মাথা থেকে ভেঙে ধসে গেছে। মনে হয় যেন কোন্ এক দৈত্য বিরাটাকার একটা ফলের মাঝখান দিয়ে ছুরি চালিয়ে আধখানা কেটে ফেলে দিয়েছে। এত বড় পাহাড়-ধসা হিমালয়েও ক্বচিৎ দেখা যায়।

প্রকৃতির চারিদিকের শ্যাম-স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে ধ্বংসলীলার এ এক বিকট নিষ্ঠুর রূপ।

মনে পড়ে কয়েক বছর আগেকার একটি ঘটনা।

হাজারিবাগ-রাঁচির পথে রামগড়। তারি কিছুদূরে মোটরের বড় রাস্তা ছাড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে। রাজরোপ্পা। ভেড়ানদী ও দামোদরের তীরে ছিন্নমস্তার মন্দির। চারিদিকে ছোট-বড় পাথর। তারি মাঝ দিয়ে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। বনের ধারে নদীর তীরে ছোট মন্দির। একে ছিন্নমস্তা, তায় জাগ্রতা দেবী। সবাই ভক্তি করে, ভয় করে। কিছুদূরে একটি গ্রাম। সেখান থেকে প্রতিদিন পূজারী এসে পূজা করে যায়। দিনের আলো হলে লোক আসে, সন্ধ্যার আগে ফিরে যায়। রাত্রিবাসের নিষেধ আছে। বলে, দেবীর মানা আছে।

মানা থাকার বিশেষ কারণও আছে। জীবন্ত প্রমাণের রূপ ধরে এক মানুষ-মূর্তি সম্মুখে দাঁড়ায়।

কী বিকট বিকলাঙ্গ! মাথা থেকে মুখ-বুক শুষ্ক ক্ষতচিহ্নে ভরা। মূর্তিময়ী

বিভীষিকা।

বলে, ভালুকের অত্যাচার। নখ দিয়ে চিরে এমনি করেছে।
বিকৃত ক্ষত-ভঙ্গ অঙ্গ নিয়ে তবুও সে প্রাণে বেঁচে আছে।
এখানেও প্রকৃতির অঙ্গে আঁকা এক নিষ্ঠুর করুণ কাহিনী।

॥ ৫ ॥

কিছুদূর গিয়েই নদী ছেড়ে আবার পাহাড়ের গায়ে পথ। বড় বড় গাছ। ছায়াশীতল। পথের মাঝে পার্বত্য নির্ঝরিণী। তুষার শীতল ধারা। আবার জুতো-মোজা খুলে পার হতে হয়। আরও খানিক এগিয়ে বিরহীনদীর পরপারে পথ চলে গেছে। পারাপারের সাময়িক ছোট পুল। পাইনগাছের গোটা দুই গুঁড়ি ফেলা। সাবধানে পার হই। বেশী বৃষ্টি হলেই নদীর স্রোত বাড়ে, পুলের কাঠের উপর দিয়েই তখন জল ছুটে চলে কলকল্ স্বরে। ফেরার পথে তাই হয়েও ছিল। জুতো-মোজা-সমেত তারি উপর দিয়ে চলে এসেছিলাম। খুলি নি। কারণ, সেদিন ফেরার পথে বৃষ্টির মধ্যেই সারা বেলা পথ চলতে হয়েছিল। জলে সমস্ত ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছিল। নতুন করে ভেজবার আর কিছু বাকি ছিল না। বর্ষার প্রচণ্ড প্রকোপে বর্ষাতির তলায় জামা-কাপড়ও সম্পূর্ণ ভিজে। যেন সদ্য স্নান সেরে উঠলাম। ভিজে জামা-কাপড়-জুতো-মোজায় পথ চলাতে নবীন আনন্দের আস্বাদ। চারিদিকে যেমন বর্ষা-প্লাবিত প্রকৃতি, হৃদয়ও তেমনি বর্ষণমুখর। মুখে চোখে বৃষ্টিধারার ছাট লাগে। চারিদিকে জলের স্রোত ছোটে, তারি মাঝে ছপছপ্ করে পথ চলি। সাবধানে পা ফেলি। সতর্কগতি ক্রমে সাহস সঞ্চার করে। দেখি, জলের মধ্যেও পথ চলার ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। মনে গুঞ্জরণ ওঠে: 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—ময়ূরের মত নাচে রে!'—হিমালয়ে বর্ষামঙ্গল।

আশ্চর্য লাগে এ সিক্ত-সজ্জায় পথ-চলায়। গায়ের ভেজা কাপড় গায়ে শুকায়। আবার পথে বৃষ্টি নামে—আবার ভেজায়, আবার শুকায়। দিনশেষে পথ-চলা সাঙ্গ হলে, জামা-কাপড় ছাড়ি। আশঙ্কা হয়, পরদিন এই বৃষ্টি-ভেজার অত্যাচারের দুর্ভোগ আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু কোন কিছুই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। পাহাড়-পথে অভ্যস্ত জীবন-ধারা বৃষ্টির লক্ষ ধারাকে সানন্দেই গ্রহণ করে।

শিশিরবাবু বলেন, দেবতার কি মহিমা। কলকাতা হলে সামান্য একটু জলে ভিজলেই অব্যর্থ ফ্লু। আর এখানে? জলে এত ভিজি তবুও জ্বর নেই। এত চলি, এত খাই—মনে হয় পাথর পর্যন্ত হজম করতে পারি।

অনাচারে অত্যাচারে শুধু স্বাস্থ্য ভাঙেই: অবস্থাবিশেষে স্বাস্থ্য গড়েও।

বিরেহী নদী পার হয়েই বাঁ দিকে একটু উপরে ছোট একখানি গ্রাম।

গোণা গ্রাম—তা থেকে হ্রদের নামকরণ গোণা-তাল। হ্রদটি এখান থেকে আধ মাইলের উপর দূরে। হ্রদের উপর অপর পারে আর একটি গ্রাম আছে, নাম তার ডোরমা। সে গ্রামের অধিবাসীরা হ্রদের নাম দিয়েছে—ডোরমাতাল। বলে, গোণা-তাল নাম হবার কোন কারণ নেই। ও গ্রাম তো জল থেকে অনেক দূরে, আমরা থাকি জলের কত কাছে—এর ঠিক নাম আমাদের গ্রামের নামে।

দুই গ্রামে এই নাম নিয়ে বিরোধ।

আত্মপ্রাধান্য মনুষ্য-স্বভাব। হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলেও ঈর্ষার কীট সুযোগ বুঝে বাসা বাঁধে।

পাহাড় ধসার সময় গোণা-গ্রাম বেঁচে গিয়েছিল। গ্রামের কিছুদূর দিয়ে পাহাড়ের ধস নামে। নদী পার হয়ে বাঁ দিকে গ্রামে যাবার পথ। আমাদের পথ গিয়েছে ডান দিকে হ্রদের অভিমুখে। পথের চারিপাশে পাহাড় ধসার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। চতুর্দিকে ভাঙা পাথর, কাঁকর, বালি, মাটির বিবাট বিরাট স্তূপ। তারি মাঝে মাঝে পাথর চাপা ঝরনার ক্ষীণ ধারাগুলি কোথাও বা আত্মপ্রকাশ করছে। সে সব ধারার জলও ধ্বংসের মসী মাখা। মলিন, কৃষ্ণাভ। কোথাও বা জলে গন্ধকের গন্ধ আনে। বাঁ দিকে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়— মৈথানা। বিকৃত বিকট বিকলাঙ্গ। যেন অতিকায় এক দানবের বীভৎস কংকাল।

কিন্তু, আশ্চর্য লাগে এই বিধ্বস্ত শ্মশানের মধ্যেও নবীন জীবনের স্ফুরণ দেখে। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ। তবুও, সেই ঊষর ভূমি ভেদ করে নবীন তরুলতার সুশ্যাম সজীবতা।

বিরাট পাহাড় ধসে পড়ে, নির্মূল হয় বৃহৎ বনস্পতি। তারপর, একদিন আবার সেই ধ্বংসের মধ্যেও নবীন প্রাণের পুনঃ সঞ্চার হয়। হিমালয়ের পাথর ঠেলে নবজীবনের সবুজ পতাকা হাতে পাদপ শিশু মাথা তোলে, নবীন প্রাণের আনন্দ আনে।

কালের বিচিত্র ধর্ম।

নিদারুণ শোকাতুর মানুষও একদিন তার সে শোকের অসহ্য জ্বালা ভোলে। কালের কল্যাণময় কোমল প্রলেপ দগ্ধ হৃদয়েও ভ্রান্তিমগ্নী শান্তি আনে। তাই তো, সংসারে মানুষ বাঁচে। এখানেও ধ্বংসের মধ্যে প্রকৃতি আবার নবীন সাজে হাসে।

॥ ৬ ॥

অল্প গেলেই হ্রদের বিপুল বারিরাশি চোখে পড়ে। চারিদিকে ঘন সবুজ বনময় গিরিশ্রেণী। তারি মাঝে সুনীল জলরাশির প্রশান্ত বিস্তৃতি।

পাহাড়ের কিছু উপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি। পথ নেমে জলের ধারে লুপ্ত

হয়েছে। তারই অল্প দূরে ডান দিকে ধ্বংসস্তূপের বাঁধ ভেঙে জলধারা হ্রদ থেকে বেগে ছুটে চলেছে। নিম্নগামী ধারা পাষাণ-কারা ভেদ করে উন্মাদপ্রায় উন্মত্ত। এই বিরহী গঙ্গার ধারা ধরেই আজ সারাদিন এসেছি।

নদীর মুক্তিদ্বারের অল্প উপরে নূতন ধর্মশালা। বাসোপযোগী হলেও এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

অমরনাথ জানায়, ঐখানেই আমাদের রাত্রিবাস। দু'দিন এখানে আনন্দে কাটানো যাবে।

রেঞ্জারবাবু দূরে হ্রদের অপরদিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ ওপারে বোট্ হাউস। গত বর্ষায় হ্রদের জল ঢুকে ক্ষতি করেছে। ওখানে থাকা এখন চলবে না।

সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা বাড়ি। দূরে নীল-জলের ধারে সবুজ পাহাড়ের গায়ে শ্বেতবিন্দুর মত মনে হয়।

পথটুকু শেষ হবার আগে ধর্মশালার কাছে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্র। সবুজ ঘাসের উপর হলুদ-রঙের বিচিত্র শোভা।

আশ্চর্য বোধ হয়। হঠাৎ এত ফুল ফুটল কোথা থেকে?

অমরনাথ বলে, দূর থেকে দেখে সব 'মেরিগোল্ড' মনে হয়।

নামতে নামতে দেখি, সত্যই তাই। আমাদের চিরপরিচিত গাঁদাফুল। হঠাৎ দেখে মনে হয়, কারা যেন জলের ধারে গেরুয়া-কাপড় বিছিয়ে রেখেছে।

গাঁদাফুলে সরস্বতী পূজার কথা স্মরণ করায়। প্রতিমার সামনে পুষ্পপাত্রভরা গাঁদাফুল। অঞ্জলি ভরে অঞ্জলি দেওয়া—ছেলেবেলার ভয়-ভক্তি-মেশানো সে এক অপূর্ব অনুভূতি!

রেঞ্জার জানান, হ্রদের চারিদিকে অনেক জায়গায় ফুটেছে দেখবেন। এ-সব স্বামীজির হাতে-করা বাগিচা।

স্বামীজি! এখানে সাধু কেউ থাকেন নাকি?

শুনি, আজ বছর কয়েক হল একজন এসেছেন। তাঁরই একার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠা; নিজে থাকেন কিছুদূরে হ্রদের ধারে একটি গুহায়। স্থলপথে সেখানে যাবার পথ নেই। জলপথে নৌকোয় যেতে হয়। বনবিভাগের সরকারী নৌকা তো আছেই, স্বামীজির নিজেরও একটি আছে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের নৌকা এপারে এনে রেখেছে তো?

একটি পাহাড়ী সেলাম ঠুকে সম্মুখে দাঁড়ায়। মলিন বেশভূষা। দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু, সবল স্বাস্থ্য, মুখে সরল হাসি। বলে, আমি চৌকিদারের ছেলে। বাবার বয়স হয়েছে, শরীরও ভালো নেই। তাই আমি এসেছি নৌকা নিয়ে। ধর্মশালায় থাকার সব ব্যবস্থা করেছি।

ধর্মশালা দোতলা বাড়ি। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি। একতলায় কুলী ও পিয়নরা উঠেছে। আমরা থাকব দোতলায়। উপরে ওঠবার সিঁড়ি নেই।

ভবিষ্যতে হবার ব্যবস্থাও নেই। একটা মই লাগানো আছে। তাই দিয়ে উঠলাম। সিঁড়ি না করার হয়তো কারণও আছে। পাহাড়ে বাড়ি তৈরি হয় সাধারণত পাহাড়ের গায়। এখানেও তাই উঠেছে। সেইজন্যে পাহাড়ের গা থেকে সোজা বাড়ির উপর তলায় যাওয়া-আসা করা যায়। এখানেও বাড়ির পিছন দিকে একটা কাঠ ফেলে পাহাড়ের সঙ্গে সোজা যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ দোতলা হলেও সেখান থেকে এটা একতলা।

দোতলায় দুটি ঘর। তিনদিকে টানা বারান্দা। কাঠের রেলিং দেওয়া। সামনের বারান্দার নীচেই প্রাঙ্গণ। ফুলের রঙে রঙীন হয়ে আছে। মাঝখানে একটা শিমগাছ। শিম-এ ভরে আছে। আরও কিছু নীচে হ্রদ। ঘরের ভিতর বা বাইরের বারান্দায় বসে মনে হয় যেন স্টীমারে চলেছি। সামনে প্রসারিত হ্রদের বিপুল বারিরাশি। হ্রদের অপরদিকে দূরে দেখা যায় একটি পার্বত্য নদী, হ্রদে এসে পড়েছে। এতোদূর থেকে জলের ধারা নজরে আসে না; বালি-মাটি পাথর কুচির সাদা রঙ উজ্জ্বল দেখায়।

রেঞ্জার বলেন, ঐ বিরহী-নদী। অপর দিকে হ্রদে এসেছে, আর এক দিকে হ্রদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওপারে নদীর যে সাদা ধারা-পথ দেখা যায় তার অনেকখানি হ্রদের জলে আগে ঢাকা ছিল। হ্রদের জল ক্রমে ক্রমে নেমে আসছে।

শিশিরবাবু বলেন, তাহলে তো কিছুকাল পরে হ্রদের অস্তিত্ব যাবে, শুধু নদীর ধারাই থাকবে।

অমরনাথ জানায়, তাই হবারই হয়তো সম্ভাবনা, কিন্তু সে 'কিছুকাল' এখনও দীর্ঘকাল। এখনও হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল হবে, চওড়াও প্রায় সওয়া-মাইল। জলের গভীরতা এখনও অনেক। নৈনীতাল হ্রদের দ্বিগুণ আকার হবে।

বিরহী-নদীর উৎসমুখ চিরতুষার প্রদেশে হিমপ্রবাহে। তুষারমৌলী সেই গিরিশ্রেণী হ্রদের অপর পারে বহুদূরে দেখা যায়। নন্দাঘুন্টি শিখর। বরফ ঢাকা পাহাড়-চূড়া যেন আকাশ স্পর্শ করে। রাশি রাশি সাদা মেঘের পুঞ্জ ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। যেন অলক্ষ্যে বসে কোন্ এক ধুনুরী সাদা তুলা পিঁজছে।

হ্রদের ডানদিকে অরণ্যময় সবুজ পাহাড়। তারই বহু ঊর্ধ্বে একটি বড় গ্রাম আছে। নাম তার রামনি। এখানে থেকে দেখা যায় না।

বাঁ দিকের উঁচু পাহাড়গুলির পিছনে 'কুয়ারী পাঁস'। তুষারাবৃত গিরিসংকট।

ঐসব পাহাড়গুলির উপর দিয়ে একটি পথ আছে। পর্বতচূড়া আরোহণ-কারীদের অভিযান পথ। ছাপার হরফে সে সব পথের সৌন্দর্যের বর্ণনা পড়েছি। ছবিও দেখেছি। আজ মানসপটে সেই অদৃশ্য দৃশ্য কল্পনার রঙীন তুলিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

॥ ৭ ॥

গোপা-তালের তীরে দু'দিন কাটল। নৌকা করে লেকে বেড়ালাম।

প্রথমদিনেই বোট্ হাউস দেখে এসেছি। কাঠের ছোট্ট বাড়ি। দুখানি মাত্র ঘর। হ্রদের উপকূলে। গত বর্ষায় হ্রদের জল একটু বেশী বেড়েছিল। তাই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করে সব ভাসিয়েও দিয়েছিল। কাঠের দেওয়ালের গায়ে, কাঠের মেঝেতে জলধাবার নিষিদ্ধ প্রবল প্রবেশের অত্যাচার কাহিনী এখনও আঁকা আছে।

অমরনাথ সব পরীক্ষা করে দেখে। তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। মন্তব্য করে, খুব বেশী ক্ষতি করে নি। কয়েক শ' টাকা খরচ করলেই সংস্কার হতে পারে। চায়ের সেট-এর পাত্রগুলি খুব বেঁচে গেছে।

তারপর চৌকিদারের ছেলেকে হুকুম দেয়, চায়ের কেট্‌লি, কাপ ডিশ নিয়ে চলো—আমাদের জন্যে। লিস্টে ঠিকমত নোট করে রাখো।—আবার মিলিয়ে তুলে রাখবে।

সরকারী অফিসারের সতর্ক দৃষ্টি সজাগ আছে।

বোট্ হাউস-এর কিছু উপরে ডোরমা গ্রাম। ছোট গ্রাম। কয়েকখানি মাত্র ঘর। চৌকিদার ঐ গ্রামেরই লোক। নৌকায় বসে দাঁড় হাতে চৌকিদারের ছেলে গল্প করে, বাবা এখন আর বেশী কাজকর্ম করতে পারেন না। নৌকা বাইতেও সাহস পান না। আমার কিন্তু চালাতে খুব আনন্দ লাগে। কেমন দাঁড়ের সঙ্গে নৌকা চলে!

কথা বলতে বলতে দুই হাতের দুইটি দাঁড় ছপাৎ করে জলে ফেলে। জল ছিটকে ওঠে। ধীরে ধীরে হাত চালায়, জল কেটে নৌকা চলতে থাকে। শান্ত জলের উপর নৌকার গতিপথের বিচিত্র রেখা ফুটে ওঠে।

তারপর জানায় আমরা তো এই জলেই মানুষ। জন্মে অবধি এমন দেখছি। গ্রামের বৃদ্ধরা কিন্তু এ জলকে ভয় করেন। গল্প শুনেছি, চোখের উপর তাঁরা দেখেছেন এই জল জমতে। ক'দিন ধরে আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি নেমেছিল। তারপর গভীর রাতে সে নাকি এক অতি বিরাট শব্দ করে পাহাড় ভেঙে পড়ে। সেই মুষলধার বৃষ্টির মধ্যেও ঘর ছেড়ে আতঙ্কে গ্রামের সব লোক বেরিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, পৃথিবীর প্রলয় এসেছে। সারারাত পাহাড় ধসার ধ্বংসলীলা চলে। তারপর দিনের আলো ফুটলে সব প্রকাশ পায়। তখনও সামনের ঐ পাহাড় ধসে ধসে পড়ছে। তিনদিন ধরে এমনি করে পড়তে থাকে। প্রকাণ্ড বড় বড় পাথর সশব্দে এসে ছিটকে পড়ছে চারিদিকে—নদীর এ-পারেও—কামানের গোলার মত। যেমন তার প্রচণ্ড বেগ তেমনি ভয়ঙ্কর গর্জন। চারিদিকে আবছায়া ধুলোর ধোঁয়া। নদীর এ-পারের গাছপালা, মাঠ—সব ধুলোয় মলিন, বিবর্ণ হয়ে

গেছে, যেন ধূসর বরফ ঢাকা। পাহাড় থেকে চতুর্দিকে জলও নামছে। হ্রদের জল বাড়ছে। গ্রাম ছেড়ে সবাই পাহাড়ের আরও ওপরে বনের ভিতর আশ্রয় নিল। এমনিভাবে বছরখানেক কাটার পর হ্রদের বাঁধ ভাঙল। এখন এসব সুন্দর জায়গা—আপনারা দেখতে আসেন; কিন্তু সে সব দিনের গল্প বলতে বৃদ্ধদের এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

নৌকার উপর নিশ্চিন্ত আরামে বসে বিগত কালের সেই ভয়াবহ কাহিনী শুনতে বেশ লাগে। যেন বই-এর পাতায় পড়া রোমাঞ্চকর দুর্ঘটনা। অথচ যা শুনছি তার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। Frank Smythe-এর Kamet Conquered বইখানিতে এর সরকারী অনুরূপ বিবরণ পড়েছিলাম।

পাহাড়ের নাম মৈথানা। ১১,১০৯ ফুট উঁচু পাহাড়ের অংশ ধসে পড়ে। দুইবারে। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ কিউবিক ফুট পাথর ভেঙে পড়েছিল। নদীর গতিপথ রোধ করে ভেঙে-পড়া পাথর ও মাটিতে যে বাঁধের সৃষ্টি হয়, তারই উচ্চতা এক হাজার ফুট! হিমালয়ের কোলে অবশ্য নবজাত শিশু-পাহাড়। তবুও যেন হঠাৎ-বড়োর দম্ভে ভরা। উদ্ধত। কল্যাণী নির্ঝরিণীর সহজ গতিপথ অবরুদ্ধ হোল।

হ্রদের দীর্ঘতা হয়ে এল তিন মাইল।

তারপর, জল জমে বাঁধ ছাপিয়ে ওঠার উপক্রম দেখে কর্তৃপক্ষ সময়মত গ্রামে গ্রামে বন্যার সতর্ক-নির্দেশ পাঠালেন। অলকানন্দা ও গঙ্গার দুই তীরের গ্রাম ও শহরবাসীরা নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের বহু উপরে আশ্রয় নিল। বাঁধ থেকে ১৪০ মাইল দূরে হরিদ্বার। সেখানেও সাবধান-রব উঠল।

১৮৯৪ সালের ২৫শে আগস্ট। রাত্রি ১১টা ৩০। বাঁধ ছাপিয়ে—ভেঙে—জল ছুটল। ঘণ্টায় বিশ থেকে ত্রিশ মাইল গতিবেগ। বাঁধের মুখে গভীরতা হল ২৮০ ফুট। প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে অলকানন্দার উপর চামোলী শহর। তার মাইল পাঁচেক আগে অলকানন্দার সঙ্গে বিরহী-গঙ্গার সঙ্গম। বন্যার জলভারে অলকানন্দাতেও স্ফীতি আনল। চামোলীতে নদীর গভীরতা হল ১৬০ ফুট!

তারপর, দুদিনেই হ্রদের জল ৩৯০ ফুট নেমে গেল, এবং দেখা গেল বিরহী-নদীর তলভূমি বন্যায়-বয়ে-আনা প্রকাণ্ড পাথর ও মাটির প্রলেপে ৫০ ফুট উঁচু হয়ে গেছে।

১৯৩১ সালে হ্রদের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৯০০ গজ, প্রস্থ ৪০০ গজ, গভীরতা প্রায় ৩০০ ফুট।

এই প্রবল বন্যায় মানুষের অসামান্য ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয়েছিল সামান্যই। সময়মত সতর্ক সংবাদে সকলেই সাবধান হয়েছিল। হয়নি শুধু একটি লোক। সে সপরিবার বাঁধের নীচেই বাসা বেঁধেছিল, বহু সতর্কবাণী সত্ত্বেও। বাঁধ ভাঙার উপক্রম হলে তাদের জোর করে দুবার সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। তবুও, তারা সেখানেই ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকে।

কোনরকমেই আর সরানো যায় নি। বন্যার সেই ভয়ংকরী ভৈরবী মূর্তির কাছে শুধু এরাই আত্মাহুতি দেয়।

চৌকিদারের ছেলে গল্প করছিল,—শুনেছি, লোকে তার নাম দিয়েছিল গোণা ফকির। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকত। বলত, ভগবান—রাখবার, মারবারও তিনি। যদি জান্ নেবার মর্জি থাকে, তিনি নেবেনই, আমি পালিয়ে বাঁচব কোথায়! যাবই বা কেন?—কোন্ এক রাজার গল্প শুনিয়ে বলত, অতোবড় রাজা, সব ব্যবস্থা করেও সাপের কামড়ে মরার ভাগ্য লিখন কাটাতে পারেন নি। আমি তো অতি সামান্য মানুষ, প্রাণ বাঁচাতে পালাব কোথায়? শেষ পর্যন্ত নড়েও নি। বন্যা শুরু হলে তাদের আর চিহ্নও পাওয়া যায় নি। লোকে বলে মস্ত ভক্ত ছিল"। আমি বলি, আস্ত পাগল!

নির্বাক হয়ে তার গল্প শুনি।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘ জমে আসে। মেঘের জটাজালে সূর্যকিরণ বন্দী হয়। আলোছায়ার খেলা চলে। দু'ফোটা বৃষ্টি পড়ে। সমুখেই রামধনুর রঙীন রেখা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আকাশের বুকে নয়, সবুজ পাহাড়ের গায়ে। অদূরে হ্রদের জলের ভিতর সে রঙীন রেখার একপ্রান্ত বিলীন হয়।

॥ ৮ ॥

নৌকা করে চলেছি সাধুর গুহায়।

আগেই শুনেছি, তিনি এখন এখানে নেই।

তাঁর পূর্বাশ্রম আলমোড়া অঞ্চলে। পাহাড়ের অধিবাসী। শিক্ষিতও। আজ বছর পাঁচ ছয় হল এখানে এসেছেন। গুহার ভিতরে একা থাকেন। সাধন-ভজন করেন। গ্রামবাসীরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। তাদের সামান্য আহার্যের নৈবেদ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

কুতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, এখন তিনি কোথায়? পাহাড়ের উপরে আরও একান্তে নিভৃতে কোথাও আছেন নাকি?

চৌকিদারের ছেলে উত্তর দেয়—না, ওদিকে নয়। নীচে গেছেন। আজ মাসকয়েক হল। এবার ফেরবার সময় হয়েছে।

নীচে—অর্থাৎ পাহাড় ছেড়ে হরিদ্বার, দিল্লী প্রভৃতি শহর অভিমুখে।

শহরে যাওয়ার কারণও শুনি। অর্থের অভাবে ধর্মশালার কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। তাই সঙ্গতির সন্ধানে শহরে যাওয়া।

বিচিত্র জগৎ।

শহর থেকে মানুষ আসে হিমালয়ে শান্তির আশায়, সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানে।

আবার, সত্যসন্ধানী সাধু সাধনা ফেলে হিমালয় ছেড়ে শহরে ছোটেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে। আত্মসুখের লোভে নয়, শহরবাসী যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনের প্রয়োজনে।

অমরনাথ বলে, সাধুর আশ্চর্য ক্ষমতা। একার চেষ্টায় এখানে এমন ধর্মশালা তৈরি করা সহজ কথা নয়। ধর্মশালার বাকি অংশও হয়তো তিনি শেষ করাতে পারেন। কিন্তু, সমস্যা হয়েছে—দৈনিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টএ জানিয়েছেন, তারা যদি এটা নিয়ে চালাতে চায়, তিনি দিতে রাজী আছেন। এই নিয়ে কথাবার্তাও চলছে। গভর্নমেন্ট থেকে নেবার প্রধান কারণ হল, তারাও এখানে একটা নতুন বাংলো করতে চায়। ওপারে বোট্ হাউস-এর কাছে জমিও ঠিক করা আছে।

শিশিরবাবু বলেন, কিন্তু সারা হ্রদের চারিদিকের মধ্যে এই ধর্মশালার জমিটি সবচেয়ে ভালো জায়গায়। উঁচু জমি। সামনেই হ্রদ। ওপারে আকাশ-ছোঁয়া বরফের পাহাড়। অপরূপ দৃশ্য ধর্মশালা থেকে। বোট্ হাউস্ থেকে এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

অমরনাথ স্বীকার করে। বলে, তাই তো এটা নিয়ে নেবার আমার এত উৎসাহ।

আমি বলি, তোমাদের নেওয়া-না-নেওয়ায় আমার উৎসাহ নেই। আমি আশ্চর্য হই, সাধুটির সৌন্দর্য-দৃষ্টি দেখে। হ্রদের চতুর্দিকের মধ্যে সবচেয়ে রমণীয় স্থানটি ঠিক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রূপদ্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়!

গুহার কাছে নৌকা থামে। পাহাড়ের গায়ে জলের ঠিক উপরেই ছোট গুহা। কাঠের ফ্রেমে ছোট দরজা। হ্রদের দিকে—কাঠের একটি ছোট জানালাও আছে। জলে নৌকা বাঁধা। তাঁর আসা-যাওয়ার নৌ-যান।

অমরনাথ বলে, নেমে দেখবেন চলুন। সব খোলাই তো রয়েছে।

সাধুর অনুপস্থিতিতে নামতে অসম্মত হই। নৌকা থেকে বসেই দেখতে পাই তাঁর সামান্য মালপত্র। উঁচু করে সাজিয়ে রাখা। সবার উপরে একটি প্রাইমাস-স্টোভ। তার নীচেই একটি তবলা।

অনুসন্ধানে জানি, সাধুজি সঙ্গীতজ্ঞ। সুমধুর ভজন করেন। গ্রামের লোকেরা প্রায়ই শুনতে আসে। শুনে যথার্থ আনন্দ পায়। গ্রামে বসেও নিস্তব্ধ নিশীথে তাঁর সুরের অস্ফুট-ধ্বনি শোনা যায়।

মৌন অচল হিমাচলে শব্দময় সঙ্গীত-স্পন্দন। যেন, হ্রদের ঐ শান্ত স্তব্ধ জলে মৃদু-সমীরণে ঈষৎ ঢেউ-এর খেলা।

স্বামীজির দর্শন পেলাম না। কিন্তু মানুষটির প্রকৃত পরিচয় অন্তরে অনুভব করি। পান্থশালার পরিমিত পারিপাট্য, হ্রদের ধারে ধারে গাঁদাফুলের স্নিগ্ধ শোভা, নিভৃত গুহায় স্তব্ধ বাদ্যের নির্বাক্ ধ্বনি—অদৃষ্ট মানুষটিকে যেন অতি নিকটে এনে দিল। সৌন্দর্যের সাধনাও শিব-সুন্দরেরই আরাধনা।

কলকাতা শহরের একটি ঘটনা মনে পড়ে।

শীতকাল। শহরের এক অঞ্চলে সঙ্গীতের এক বড় জলসা চলেছে। বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন। মার্গ-সঙ্গীতের পরিবেশে আসর জমেছে। এক বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ যন্ত্র-সঙ্গীত আলাপ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করছেন। এমনি সময়ে গেরুয়াধারী এক সাধু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে উঠে এসে কর্তৃপক্ষদের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, তিনিও কিছু যন্ত্র-সঙ্গীতের আলাপ করতে চান। উদ্যোক্তারা আশ্চর্য হলেন। গুণীজনের এই আসরে একজন অখ্যাত অজানা ব্যক্তির এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য। বিনীতভাবে জানালেন, আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ চলছে ; এর মধ্যে বাইরের কারো কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

সাধুজির তবুও বিশেষ আগ্রহ। অবশেষে, শ্রোতাদের অনুমতি নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য তাঁকে বাজাতে দেওয়া হল। তাঁকে জানানো হল, এর বেশী সময় যেন তিনি কোনক্রমেই না নেন। তিনি বাজালেনও সেই স্বল্পসময়ের জন্য। শ্রোতাগণ স্তম্ভিত। কী গভীর জ্ঞান! কী সুমিষ্ট ধ্বনি! কী সুনিপুণ হাতের খেলা! তাঁরা আরও শুনতে চান। সাধুটি বলেন, আজ আর নয়। যদি অনুমতি পাই, কাল আমার নিজের যন্ত্র নিয়ে এসে কিছু শোনাব।

পরের দিন সেইমত ব্যবস্থাও হয়। সকলেই প্রকৃত গুণীর অসাধারণ গুণের পরিচয়ে মুগ্ধ হন। শ্রোতাদের উৎসাহ বাড়ে। অনুরোধ করে, তার পরের দিনের আসরেও যোগ দেবার জন্যে। কর্তৃপক্ষরাও পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু, সাধুজি কোনমতেই সম্মত নন। শেষ পর্যন্ত হলেনও না। বলেন, যাচ্ছিলাম গঙ্গাসাগরে। স্টীমার ছাড়ার দু'দিন আগে এ-শহরে পেঁছে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আপনাদের জলসার খবর পেলাম। তাই শুনতে এসেছিলাম। শুনে আনন্দও পেলাম। কাল স্টীমার ছাড়বে। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। আর থাকবার প্রশ্ন ওঠে না।

তাঁর সঙ্গীতের উচ্চ প্রশংসা শুনে বিনীতভাবে বলেন, ও কিছুই নয়। অতি সামান্যই জানি। জানতেন বটে আমার গুরুদেব! অমন বাজনা কখনও শুনি নি, কণ্ঠ-সঙ্গীতও নয়।—বলে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন।

কর্তৃপক্ষরা সংকোচভরে বলেন, আমাদের আসরে যাঁরা যোগ দেন, তাঁদের কিছু প্রাপ্য হয় ; আমাদের প্রণামীটা যদি—

তিনি বাধা দিয়ে বলেন, মন ভরে আমি আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি, তার চেয়ে বেশী আর কোনও প্রাপ্য নেই। প্রয়োজনও নেই।

উদ্যোক্তারা জানান, আবার যদি কখনো এ-পথে আসেন ও আমাদের ভাগ্যে থাকে—আবার শোনার আগ্রহ রইল।

সাধুটি হাসতে থাকেন। স্নিগ্ধ হাসি। সঙ্গীতের মতই মধুর।

তপস্যার ক্ষেত্র থেকে বয়ে-আনা আনন্দের ফসল। স্বর্ণপ্রভ। দিব্যগন্ধি।

বদরীনাথের এক সাধুর কথাও মনে হয়।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে মন্দির খোলার সময় আসেন। আবার কার্তিক মাসে দীপাবলির সময় মন্দির বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে যান। মন্দির কমিটির উদ্যোগে তাঁর এখানে আসা ও থাকা। তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে মন্দিরে কয়মাস অখণ্ড কীর্তন চলতে থাকে। মন্দির-তোরণের উপরের একটি ঘরে দিবারাত্র এই নাম-ধ্বনি চলে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে একটি লম্বা বারান্দা। হলঘরের মতন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সাধুজি সেখানে নিজে কীর্তন করেন। সঙ্গে তাঁর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ থাকেন। যাত্রীরা বসে নাম-সুধা পান করেন, কীর্তনেও যোগ দেন। একপাশে একটি অল্প-উঁচু বেদীর উপর সাধুজি বসেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ। শ্মশ্রু-গুম্ফজটাভারে গম্ভীর-দর্শন। অথচ, আয়তনয়নে সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি। মুখে সুমিষ্ট হাসি। জরি-দেওয়া সিল্ক-এর অঙ্গাবরণ। বোধ করি, মন্দির থেকে বিশেষ ব্যবস্থা-করে-দেওয়া সাজসজ্জা। দেখেই বুঝি, ওটা ওঁর অঙ্গের ভূষণ নয়, প্রয়োজনও নয়। কেননা, আসন নিয়েই বেশভূষা খুলে ফেলেন। নগ্নদেহে বসেন। প্রকাণ্ড বীণাটি হাতে তুলে নেন। কখনও বা কোলে রাখেন। সুদীর্ঘ অঙ্গুলিগুলিতে শিল্পীর লক্ষণ ফোটে। যন্ত্রটি ধরা দেখেই বোঝা যায় কত প্রিয়, কত সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন। তারপর, ধীরে ধীরে স্বর ফোটে, সুর ওঠে। গম্ভীর। মধুর। ভাবাপ্লুত। ভক্তিদীপ্ত। মনে হয়, দেবতার পার্থিব মন্দিরের মধ্যে সুরের অপার্থিব পরিবেশ। মনপ্রাণ স্নিগ্ধ-দিব্য-ভাবে রোমাঞ্চ বোধ করে।

সাধুজির সঙ্গে বাইরেও দেখা হয়। সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ করি। স্মিত-বদনে তাকান। তার বেশী আলাপ হয় না। মৌনী তিনি। মৌনী—অথচ ভগবদ্‌কীর্তনকারী। শুধু দেবতার নাম-কীর্তনেই ধ্বনির উচ্চারণ। শুনি, এককালে ভারতবর্ষের একজন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এখন সুরসাধনায় কেবল দেব-আরাধনা।

ভাবি, সত্যই শিবের নামও তো—বীণাধর, সামপ্রিয়, স্বরময়!

॥ ৯ ॥

ধর্মশালায় বসেও সময় কেটে যায় অলস-মন্থর গতিতে।

বোট্-হাউস-এর জন্যে রাখা মন্তব্য-পুস্তিকাটি পড়ি। বহু বছরের বহু লেখা। অধিকাংশই সাহেবদের। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ মাছ ধরার। কী আকারের কতগুলি মাছ। কত তার ওজন। হ্রদের কোন দিকে ধরা। কিসে ধরা। কী চারায়। কবে কোন্ দিনের কোন্ সময়ে। আকাশের কী অবস্থা। বাতাসের কী গতি। জলের কী রঙ। সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা। যেমন মৎস্যশিকারে আনন্দ, তেমনি অকপট ফলাফল স্বীকারেও আগ্রহ। কোথাও সাফল্যের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথাও বা বিফলতার করুণ হুতাশ।

পড়তে বেশ লাগে। লেখার মধ্যে শুধু মাছ ধরাই নয়, লেখকের চরিত্র-চিত্রও ধরা পড়ে।

চারিদিকে সৌন্দর্যময় প্রকৃতির অপরূপ রূপলীলা দেখেও সময় কাটে। দোতলার বারান্দায় বসে উপভোগ করি।

ঘরের ভিতর থেকে অমরনাথ ডাক দেয়, বলে, শুধু সৌন্দর্যই পান করছেন, আসুন, চাও একটু পান করবেন।

বলি, বাইরেই পাঠিয়ে দাও। এখানে।

সে রাজী হয় না। তাই, ঘরের ভিতরেই যাই। দেখি, ঘরের মেঝেতে তার প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটির উপর রঙীন টেব্‌ল্‌ক্লথ পেতেছে। তার উপর চায়ের কাপ-ডিশ-এর সুন্দর রঙীন সেট সাজানো। মাঝখানে একটা প্লাসের মধ্যে ফুল সাজিয়ে ফুলদানি হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বলে, দেখুন, কেমন চায়ের টেবিল সাজিয়েছি। ক' চামচে চিনি দেব বলুন।

সাজসজ্জা আয়োজনের প্রশংসা করি। হেসে বলি, সবই সুন্দর হয়েছে, কিন্তু, তোমার গৃহলক্ষ্মীটি কই?

সেও হেসে উত্তর দেয়, সে কথাই যখন তুললেন তখন শুনুন তার কাহিনী। সে বছর তখনও ট্রেনিং-এ আছি। ট্রেনিং শেষ হলেই চাকরি শুরু হবে। তখনও কয়েক মাস বাকি। ক্যাম্পে আছি। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে খবর পেলাম— আমার নাকি বিয়ের ঠিক করছেন। ছুটি নিয়ে যেন বাড়ি চলে আসি। তখনি তাঁকে লিখে জানালাম, ট্রেনিং-এর সময় বিবাহ করার এখানে নিয়ম নেই। তাই ছুটির অনুমতি পাওয়াও সম্ভব নয়। লিখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ক'দিন পরে হঠাৎ আমাদের অফিসার আমাকে ডেকে পাঠালেন। খুব কড়া লোক। আইন-কানুন সব সময়ে মেনে চলেন। ভাবলাম, কোথাও কিছু দোষ করেছি নাকি। ভয়ে ভয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। যেতেই বললেন, তোমার এক সপ্তাহের ছুটি। কালই তুমি বাড়ি যাবে। ঠিক এক সপ্তাহ পরে ফিরবেও। যেন, কোনও কারণে কামাই না হয়।

অবাক হয়ে বললাম, আমি তো ছুটি চাই নি।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি চাও নি, কিন্তু তোমার বাবা চেয়েছেন। ছুটি মঞ্জুরও করেছি।

আমি সংকোচভরে বললাম, কিন্তু ছুটির কারণটা—

তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি কারণ জানতে চাই না। তোমাকে যা বলা হচ্ছে তাই করো। বাবার কথা শুনবে। কালই রওনা হবে। গুড্‌লাক্, ইয়ংম্যান!—বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। আমার কিন্তু মনে হল, তাঁর ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা। নির্বাক্ হয়ে চলে এলাম। বাড়িও গেলাম। বিবাহও করলাম। ফিরে এসে ট্রেনিং শেষ হবার পরই চাকরি শুরু হল। গত দেড় বছরের মধ্যে মাত্র তিন দিনের ছুটি পেয়ে

একবার বাড়িও গিয়েছিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল সেই বিয়ের পর একবার। সে আছে মথুরায়। বি. এ. পরীক্ষা দেবে। ইচ্ছা আছে, এবার এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাব। তাকে নিয়ে একবার কলকাতায়ও যেতে পারি। গেলে অবশ্য আপনাকে জানাতে ভুলব না।—আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন? আমি তা বলে তার কথা বেশী ভাবি না। ভাববোই বা কখন? সব সময়েই তো কাজ করছি।

তারপর অতি ধীরে ধীরে বলে, তবে সত্যি বলতে কি, সন্ধ্যাব পর অন্ধকারটা ভাবী হয়ে ওঠে।

আমি বলি, চলো বাইরে বারান্দায়। চা-টা ওখানে জমবে আরও ভালো। দেখছ না, জ্যোৎস্না উঠেছে কি রকম?

বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে বসি। কাঠের দেওয়ালে ঠেসান দিয়েছি। পা-দুখানি সোজা করে আরামে ছড়িয়েছি। নির্বাক্ হয়ে সামনে তাকিয়ে থাকি। চারিদিকে নিঝুম নিস্তব্ধ। একটু আগেই হ্রদের নীল জলে সন্ধ্যার ঘন-কালো ছায়া নেমেছিল। দূরে গগনস্পর্শী পাহাড়গুলি অন্ধকারের অন্তরালে বিরাট আকাব দৈত্যের রূপ ধরেছিল। এখন জ্যোৎস্নার স্বর্ণময় স্পর্শে সেই ঘনীভূত আঁধার তরল হয়েছে। সুদূর আকাশ-পটে এখন তুষার-শিখর স্নিগ্ধোজ্জ্বল। স্বর্ণকান্তি তার রূপ। হ্রদের জলেও জ্যোৎস্নাব রূপচ্ছটা। তরঙ্গ-জালে যেন আকাশেব এক চন্দ্র সহস্রখণ্ডে খণ্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে।

প্রকৃতিব এই প্রশান্ত স্নিগ্ধ শোভা অন্তরে অপার আনন্দ আনে। হিমালযেব ধ্যান-গম্ভীব রূপ। জ্যোৎস্নাস্নাত, চিরমৌন, নিশ্চল।

হঠাৎ দেখি, হ্রদের জলে সচল যান। ধীবে ধীরে এগিয়ে আসে।

অমরনাথ জানায়, চৌকিদারেব ছেলে নৌকা আনছে। তাকে বলেছিলাম, চাঁদ উঠলে আসতে। জ্যোৎস্নায় নৌ-বিহার হবে। চলুন, যাওয়া যাক।

আমি যেতে অসম্মত হই।

সে একাই যায়।

হ্রদেব জলে তরী তার ধীরে ধীবে বয়ে চলে। জ্যোৎস্নার আলোবেও তরণীর কালো রূপ। দূরে সেই কালো ছায়া ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে মিলিয়ে যায়। বিরহী-হৃদয় বিরহী-হ্রদে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় সানন্দ সান্ত্বনা খোঁজে।

যুগ-যুগান্তের বিরহ-কাতর শঙ্করের তপস্যার হোমানলে ক্ষুদ্র মানব স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।

আমার দৃষ্টি কিন্তু হ্রদের অসীম সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। জলেব উপর দিয়ে আমার মন ভেসে চলে। চারু চন্দ্রিমার স্বর্ণময় সোপান বেয়ে স্বপ্নলোকে উঠতে থাকে। দূর-দূরান্তের মসীমাখা আঁকাবাঁকা গিরিশিখরের পথে পথে ঘুরতে থাকে।

মনে পড়ে, ঐ পথ দিয়ে ঘুরে গিয়ে নামা যায় ফুলময় উপত্যকায়। তারও

উপরে লোকপালে। হেমকুণ্ডে। এই তো ক'দিন মাত্র আগে সেখানে ছিলাম। হিমগিরির দুর্গম গোপন-পুরে। সুরলোকের সন্ধানে।

লোকপাল-নন্দনকানন

॥ ১ ॥

জনসমাগমে রমণীয় স্থানও শ্রী হারায়। পিপুলকুঠি তারই সাক্ষ্য দেয়।

রেলপথ থেকে ১৩৫ মাইল দূরে। হিমালয়ের অন্দরে, নিভৃত অঞ্চলে। চারিদিকে বিরাট পাহাড় ; তারই কোলে, অলকানন্দা থেকে হাজারখানেক ফুট উপরে স্নিগ্ধ শীতল পার্বত্য আবহাওয়ার আমেজে তন্দ্রালস গ্রামখানি শান্ত ছিল। হঠাৎ বাস চলাচলে সজাগ, চঞ্চল হয়ে উঠল। এখন ছোটখাটো শহর। পাথরে-বাঁধানো পথের দুইদিকে বাড়ির ভিড়। সারি সারি দোকানপাট। জামাকাপড়ের, মনিহারির, মুদির, খাবারের দোকান—সরাইখানা, চায়ের স্টল--সব কিছুই আছে। পাহাড়ী স্থানীয় জিনিসপত্রও বিক্রী হয়—হরিণের ছাল, বাঘ-ভালুকের চামড়া, চামর, কস্তুরী, শিলাজিৎ। শিলাজিৎ কালো তরল পদার্থ। শুদ্ধ ভাষায় শিলাজতু। বহু উঁচু পাহাড়ের উপর কালো পাথরের অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হয়। অতি ঘোর কালিবর্ণ। পাহাড়ীরা বলে, পর্বতের স্বেদ। বহুগুণবিশিষ্ট। শুনি, সব অসুখেরই প্রতিষেধক। সর্ব-রোগ নিরাময়ের কল্পতরু।

গ্রামের প্রান্তে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি।

বদরীনাথের যাত্রীপূর্ণ বাসগুলি এসে এইখানে যাত্রীদের উজাড় করে হাঁপ ছাড়ে। বাস ঘিরে লোক দাঁড়ায়। কুলীর দল আসে, ডাণ্ডী-কাণ্ডী-বাহকরা আসে, ঘোড়াওয়ালাও আছে। এবার বাস ছেড়ে হাঁটা পথ—৩৫ মাইল দূরে বদরীনাথ। সবাই ডাকে, চল, আমি নিয়ে যাব।

অধিকাংশই কেদার-ফেরত যাত্রী। এখন বদরীনাথ দর্শনে চলেছে। সাধারণতঃ দুই যাত্রার একই কুলী, তাই সঙ্গে থাকে। অনেকের সঙ্গে আবার পাণ্ডার লোকও আছে।

এদিকে বদরীনাথ-তীর্থ সাঙ্গ করে যাত্রীর দলও এখানে ফিরেছে। এবার ফিরতি-বাস্-এর টিকিট পেলেই সোজা হৃষীকেশ। তীর্থ-শেষের আনন্দ, গৃহে ফেরার আকুল আগ্রহ। কিন্তু টিকিটের আশায় অপেক্ষা করতে হয়। দু' দিন, তিন দিন। কখনও তারও বেশী।

দুই দিকের যাত্রীর স্রোতে ছোট শহর প্লাবিত হয়। রাত্রি-বাসের স্থান পাওয়াই কঠিন। ধর্মশালা কানায় কানায় ছেপে ওঠে। দোকান ও চটীগুলিও ভরে যায়।

সে বছর পরিচিত একটি দোকানদারের ঘরের সামনে পথের এক পাশে চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম। যাত্রীদের দুর্গতি দেখে দুঃখ হয়।

দেখছিলাম স্থানীয় দোকানদারদের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে কি আশ্চর্য রকম! এই তো সে বছরেও দেখেছি, যাত্রীদের তারা সর্বত্র সাদরে ডেকে নিত, যেমন করে হোক আশ্রয় দিত। আহারের সামগ্রী বিক্রী করে যে সামান্য পয়সা পেত, তাতেই পরিতুষ্ট। চটীতে থাকার জন্যে কোথাও ভাড়া দিতে হত না। দেওয়ার প্রশ্নই উঠত না। তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে সেবা করা—সে তো ভাগ্যবানের পুণ্যলাভ!

এখন বাস্ চলাচলের ফলে সে বিশ্বাস যেতে বসেছে। অনেক জায়গায় নতুন আবহাওয়া এসেছে। স্থানাভাবে বিপন্ন যাত্রীদল আশ্রয়ের সন্ধানে ঘোরে। কোন রকমে মাথা গোঁজার স্থানটুকু পেলেই হয়। সবাই ক্লান্ত, পথশ্রমে শ্রান্ত। দোকানদাররা প্রয়োজনের তাগিদ বোঝে। দাম হাঁকে—একটা ঘর—শুধু এক রাত্রির জন্যে পাঁচ টাকা, দশ টাকা! কোথাও বা কুড়ি টাকাও চায়। নিরাশ্রয় যাত্রীরা দিতে বাধ্যও হয়। যারা পারে না, অন্যত্র আশ্রয়ও পায় না, পথের বুকে ধূলিশয্যায় শয়ন করে। ঘর-ভাড়ার বিরুদ্ধে আপত্তি বা প্রতিবাদের মূল্য কোথায়? ঘর তাদের, প্রয়োজন পথিকের। প্রয়োজন না থাকে নিও না। বেশী ভাড়া—? দিতে না পার, দিও না, অন্যত্র দেখ। সোজা কথা। বলে, ব্যবসার ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার কিসের? ওটা নিবুদ্ধিতার পরিচয়।

কথা শুনে মনে পড়ে, ঠিক এমনি কথাই শহরের ব্যবসায়ীদের মুখে শুনেছি বটে!

'ব্ল্যাক্ মার্কেট' তার কালিমা নিয়েও কেমন চালু হয়ে যায়। শহরে কারও কাছে দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখে যখন কৌতূহলী প্রশ্ন করা যায়, আরে এ পেলেন কোথায়? তখনই নিঃসংকোচ উত্তর শুনি, কেন? 'ব্ল্যাকে'!

পিপুলকুঠি আমার ভাল লাগে না। এখানে রাত্রিবাসও করতে চাই না। চার মাইল দূরে সোজা পথে গরুড়গঙ্গা। সেই দিকেই অগ্রসর হয়ে যাই। আবার যখন রাত্রিবাস করতে বাধ্য হই, তখন বাধ্য হয়েই শহরের এই তপ্ত আবহাওয়া সহ্যও করি।

সে-বছর রাত্রে থাকতেই হল। অনুসন্ধানে জানলাম, ডাকবাংলো খালি রয়েছে। অনুমতি নিয়ে সেখানে উঠলাম। মোটর স্ট্যাণ্ডের বেশ খানিকটা উপরে। শহরের কলকোলাহল থেকে দূরে। পাথরের সুন্দর বাড়ি। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতর আসবাবপত্র। নেয়ারের খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা। এমন কি আর্শিও। জানলায়, দরজায় তারের জাল-লাগানো—মাছি, মশা, পোকার গতি-রোধের জন্যে। স্নান-ঘরে জলের কল, স্যানিটারি ব্যবস্থাও। সব কিছু দেখে মন প্রফুল্ল হয়। সাবান দিয়ে ভালো করে মুখ হাত ধুই, স্নান

করি। কয়দিনের ধূলি-মলিন বেশ-ভূষা ছেড়ে ফর্সা কাপড় পরি। তারপর একখানা চাদর গায়ে বাইরে বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসি। পাশে টেবিলে গরম চায়ের কাপ। সামনে প্রাঙ্গণে একটি খোবানি গাছ। ছোট ছোট ফল ধরেছে। তার পিছনেই পাহাড়ের ঢালু-গায়ে ধাপে ধাপে শস্য-শ্যামল ক্ষেত। দু-তিনটি পাহাড়ী মেয়ে সেখানে কি কাজ করছে। তারও নীচে সোজা বাঁধানো যাত্রা-পথ, যেন সবুজ-শাড়ির ধূসর পাড়। কয়েকটি যাত্রী চলেছে ধীর পদক্ষেপে। দূরে—নদীর পরপারে স্তরে স্তরে পাহাড়ের শ্রেণী। স্নিগ্ধ নীলাভ। দুটো চিল উড়ছে বহু উপরে নীল আকাশের গায়ে।

একা বসে তাকিয়ে থাকি। নীচে শহরের কোলাহলের অস্ফুট গুঞ্জন কানে আসে। মনে হয়, শহরের কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করে চলে এসেছি। এখন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

আবার, হাসিও পায়—শহর-বাসের সুখ-সুবিধায় পরিপুষ্ট এই মন। হঠাৎ এই সুন্দর গৃহে সভ্য জগতের পারিপাট্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ পেয়ে কেমন পুলকিত হয়ে ওঠে। মানসিক তৃপ্তির এ-ও এক রূপ। বিচিত্র!

চমকে উঠি। গাছের ছায়ায় কে যেন আসে! ধীরে এসে দাঁড়ায়। যুক্তকরে অভিবাদন করে। দেখেই চিনতে পারি।

—আরে! শের সিং যে! কোথা থেকে এলে?

তিন বছর আগেকার কথা। শের সিং গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে মাল নিয়ে গোমুখে। তারপর আরও কয়েক জায়গায়।

হাসিমুখে বলে, বাজারে হঠাৎ আপনাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম।

তারপর কুশল প্রশ্ন করে, সেবারকার সব সঙ্গীদের খবর নেয়। যেন কত আপনার জন।

জিজ্ঞাসা করি, এবার যাত্রায় যাও নি?

বলে, হ্যাঁ গিয়েছি বই কি। এই দুবার ঘুরে এলাম। আবার কাল সকালে একটা নতুন দলের সঙ্গে চলেছি।

আমার সব ব্যবস্থা হয়েছে কিনা খোঁজ নেয়। পুরনো দিনের গল্প করে—গোমুখের দুর্গম পথহীন পথ, মদ্‌মহেশ্বরের দুরারোহ চড়াই, বাসুকী-তালের যাত্রাপথে বরফের উপর দুর্গতি। আরো কত কি! বলে, সে-সব পথের কথা প্রায়ই মনে হয়। শুধু কেদার-বদরী যাওয়া—এ আর কী!

চোখের উপর সে-সব দিনের ছবি ভেসে ওঠে। বলি, হ্যাঁ, আমরাও সে-সব গল্প করি প্রায়ই। তোমাদের কত কষ্টই না হয়েছিল।

আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে তাকায়। বলে, কষ্ট? আমরা তো খুব আনন্দেই গিয়েছিলাম। আপনাদের সঙ্গে ছিলাম তাই তো আমাদের ওসব দুর্গম তীর্থ দর্শন হল, নইলে কি আর এমনি হত। প্রতি বছর আমি খোঁজ নিই, আপনি এলেন কিনা। কিন্তু কোন বারেই ধরতে পারি না। চলে গেলে খবর পাই—

এসেছিলেন, ফিরে গেছেন। এবার দেখা হল—তবু সঙ্গে যাওয়া হল কই?—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বলে, কি কাজ করতে পারি এখন বলুন?

বলি, কিছুই করবার নেই। বসো। গল্প কর।

কিছু করার সুযোগ না পেয়ে দুঃখিত হয়। দেখে বলি, আচ্ছা এক কাজ কর। শার্টটা ওখানে শুকোচ্ছে, সাবান নিয়ে একটু কেচে দাও।

যেন স্বর্গের চাঁদ পায়। হাসিমুখে উঠে পড়ে। কেচে নিয়ে এসে যত্নভরে টাঙিয়ে দেয়।

ফিরে এলে খাবার বার করে খেতে দিই। চা গরম করি। তাকে দিই। নিজেও খাই। তৃপ্তির সঙ্গে। সুখ-দুঃখের গল্প করে। যেন কত পরমাত্মীয় বন্ধু।

বিদায় নেবার সময় দুটো টাকা তার হাতে দিই। জিজ্ঞাসা করে, কি কিনে আনতে হবে?

বলি, আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে। খাবার কিনে খেও।

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। বলে, আমি তো কোন কাজই করতে পেলাম না! সঙ্গে যাওয়াও হল না!

তার আন্তরিক সরলতার কাছে সামান্য টাকা দুইটি আমার চোখে নিরর্থক ঠেকে।

হেসে বলি, এবাব হল না। পরের বছর হবে।

উৎসাহিত হয়ে সে বলে, ঠিক। আপনি নিশ্চয় মনে রাখবেন। আমিও খবর রাখব।

সন্ধ্যা নামে। সে ধীরে শহরে ফেরে।

এমনি করেই তারা আমার মনের কোণে অলক্ষ্যে বাসা বাঁধে। ভাবি, হিমালয়ের দুর্গম পথের এরাই সত্যকার বন্ধু। গিরিরাজ যেন তাঁর রাজসভায় সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর রাজদূত পাঠিয়ে!

॥ ২ ॥

পিপুলকুঠি থেকে বদরীনাথ ৩৭ মাইল। মাঝপথে যোশীমঠ। ৬,০০০ ফুট উচ্চতা। যাত্রাপথে বড় শহর। প্রসিদ্ধও। মাহাত্ম্যের কারণ বিশেষত দুটি। শীতকালে যখন বদরীনাথের মন্দির ছয় মাস বন্ধ থাকে, তখন এইখানে মন্দিরে বদরীনাথের পূজা হয়। তা ছাড়া, পুণ্যস্মৃতি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ভারতের চতুর্মঠের মধ্যে এইখানে একটি। যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ। তাঁর তপশ্চর্যার নিভৃত গুহাটি মঠের নিকটেই। শহরের কিছু উপরে।

পাহাড়ের গায়ে শহরটি দেখতে সুন্দর। ফলফুলের সম্পদ ও শোভা আছে, পথের পাশে অজস্র গোলাপের গাছ। বাগানে আপেল, পিয়ার (নাসপাতি), সবেদা, খোবানি, পিচ ফল রয়েছে।

এবার কিন্তু শহরে প্রবেশ করতেই বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ল। ভারত সরকারের সেনা-নিবাস হয়েছে। পথের ধারে ছাউনি পড়েছে। খাকি বেশভূষা পরা লোকজন ঘুরছে। তাদের সঙ্গে দু-একটি গেরুয়া-পরা সাধুও নজরে পড়ল। কে কার পিছনে ঘুরছেন বুঝলাম না।

শুধু অনুভব করলাম, যোশীমঠেরও সে শান্ত পরিবেশ আর নেই। হয়তো এ যুগে থাকবার কথাও নয়।

যোশীমঠ থেকে যাত্রা-পথ অনেকখানি উৎরাই-পথে নেমে গেছে। একেবারে নীচে অলকানন্দার উপত্যকায়। সেখানে ধৌলী নদীর সঙ্গে সঙ্গম। সঙ্গমে তীর্থক্ষেত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগ। পঞ্চপ্রয়াগের এই একটি মাত্র প্রয়াগ যেখানে এখনও বাস্ পৌঁছয় নি। অপর চারটি বাস্-পথে ধরা পড়েছে—দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ।

বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকানন্দা পরমানন্দা নন। সংহারিণী রুদ্রমূর্তি। খরধার প্রবাহে প্রখর বেগে ছুটে চলেছেন—দুই দিকের পাহাড়ের পাথর কেটে। চারিদিকে উচ্ছলিত জলোচ্ছ্বাস। শব্দময়, গতিময়। প্রচণ্ড প্রবাহ। সঙ্গমের কাছে ধৌলী-নদীর উপর পুল। পুরনো জীর্ণ সেতুটির এখন সংস্কার হয়েছে। আগে এক-একজন করে যাত্রী পার হত; এখন লোহার শক্ত ঝোলাপুল—নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে যাত্রীরা সারি সারি পার হয়ে যায়।

পুল পার হয়ে অলকানন্দার তীর ধরে পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে পথ চলেছে। অলকানন্দার প্রসিদ্ধ গিরি-খাত (gorge)।

যোশীমঠ থেকে সাত মাইল দূরে পাণ্ডুকেশ্বর। পাণ্ডুরাজা ও পাণ্ডবদের স্মৃতি ধরে নামকরণ। বদরীনাথ সেখান থেকে আরও বারো মাইল পথ।

পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছবার দুই মাইল আগে ঘাট চটী। ছোট চটী। খানকয়েক দোকানঘর মাত্র। চটী ছাড়িয়েই পথ একেবারে নদীর জলের ধারে নেমে গেছে। তাই বোধ করি 'ঘাট চটী' নামের সার্থকতা। নদীর ধার দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার এঁকে-বেঁকে পথ সামান্য উঠেছে। পথের প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড কালো পাথর। এই পাহাড়-পথে অতি সাধারণ পাথর—বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। তবুও আমার কাছে এই সামান্য পাথরটি এক অসামান্য রূপ নিয়ে বিরাজ করে। কয় বছর আগেকার একটি ঘটনার এটি নির্বাক সাক্ষী। তাই প্রতি বছর এ-পথে যাবার সময় এর দিকে সাগ্রহ-নয়নে তাকাই। দেখেই চিনি, এবং সেই পরিচিতির সূত্র ধরে সেদিনের ঘটনাটি স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে।

সে-বছর কেদারনাথ পৌঁছে শুনলাম কাশ্মীরের মহারানী এসেছেন। মহারানী—অতএব চারিদিকে জাঁকজমক, লোক-লস্করের হৈ-চৈ। তাই আমিও সারাদিন শহর ছেড়ে কাটিয়ে এলাম বাসুকী-তালের জনহীন পথে পথে। বৈকালে ফিরে এসে আশ্রয়-স্থলে বিশ্রাম করছি; একটি পূর্ব-পরিচিত ভদ্রলোক দুজনকে

সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন। শুনলাম, এরা মহারাণীর সঙ্গে এসেছেন। আমাকে অনুরোধ করলেন, চলুন, মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন—ব্যবস্থা করে দিই।

বিনীত ভাবে জানালাম, আলাপে প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই।

ইচ্ছা না থাকার কারণ সুস্পষ্ট।

'কাশ্মীর' নাম শুনলেই তখন যেন মনের মধ্যে একটা জ্বালা উঠত। এখনও যে না ওঠে এমন নয়। কাশ্মীরে মেজদাদার জীবনের শেষ দিনগুলির বেদনাভরা স্মৃতির এমনি প্রবল প্রদাহ।

তাই মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় না।

এর পরে প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। যাত্রা-পথ ছেড়ে হিমাচলের কোন এক নিভৃত অঞ্চলে একান্তে শান্তভাবে আমার কিছুদিন কাটল। তার পর, বদরীনাথে চলেছি। মহারাণীর কথা স্মরণেও নেই। একমনে ধীরে ধীরে পথ চলেছি। এই ঘাট চটীর কাছে হঠাৎ এক বৃহৎ যাত্রীদল নেমে এল বদরীনাথের দিক থেকে। বহু লোকজন—কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা ডান্ডী করে—হৈ-চৈ করে সব নেমে চলেছেন। বেশভূষা, চাল-চলনে ধন-দৌলতের উৎকট প্রকাশ মনকে সংকুচিত করল। পথ ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। 'বাবুজি, সামালকে, সামালকে'—বলতে বলতে ডান্ডীবাহকরা ডান্ডী নিয়ে চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আবার পথ চলতে শুরু করেছি। হঠাৎ মনে পড়ল—সেই মহারাণীর দলটা না? বদরীনাথ দর্শন করে তা হলে ফিরছেন। ভালোই হল, আমি পরে যাচ্ছি।

এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে একজন আমার কাছে ফিরে এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে সবিনয়ে জানালেন, পাহাড়ের ঐ বাঁকে ডান্ডী নামিয়ে মহারাণী অপেক্ষা করছেন—আমার যদি আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে, তিনি একবার আলাপ করতে চান—এই সংবাদটুকু পাঠিয়েছেন।

দ্বিধা কাটিয়ে ফিরে চললাম। আহ্বানকারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-মহারাণী কে এবং আমার পরিচয়ই বা পেলেন কি করে?

শুনলাম, ইনি মহারাজা হরি সিং-এর প্রধানা মহিষী। এখন রাজ-মাতা। যুবরাজ করণ সিং-এর জননী। আমার এ অঞ্চলে আসার খবর তিনি শুনেছিলেন। আজ পথে আমাকে দেখে, কেন জানি না, তাঁর সন্দেহ হয়, তাই কিছু পিছনে আমার যে সঙ্গীটি আসছিলেন তাঁকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং পরিচয় পেয়ে ডান্ডী থামিয়ে এখন সংবাদ পাঠিয়েছেন।

এই পাথরটির কাছে পথের উপর দুইটি ডান্ডী নামানো রয়েছে দেখলাম।

অপর ডান্ডীটিতে তাঁরই এক সঙ্গিনী-যাত্রী—কোথাকার এক রাণী।

কাছে আসতেই দুই হাত তুলে মহারাণী অভিবাদন করলেন।

লক্ষ ললনার জনতার মধ্যে যদি তিনি থাকতেন এবং আমাকে কেউ প্রশ্ন করত, তাঁদের মধ্যে মহারাণী কে?—আমি নিঃসন্দেহে এঁকেই দেখিয়ে দিতাম। বর্ণে, রূপে, লাবণ্যে তাঁর এমনি এক মহিমান্বিত দীপ্তি ছিল। কিন্তু, আমার শোনা না থাকলে বিশ্বাসই হত না যে ইনি রাজমাতা। দেখে মনে হয়, রূপ-রাজত্বের স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন করিয়ে বয়স যেন এগিয়ে যেতে ভুলে গেছে।

তাঁর সঙ্গে আলাপ হল অল্পই, কিন্তু তাঁর কথাগুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে।

আমায় প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, আপনি ডাঃ মুখার্জির ভাই? কেদারনাথে যখন পেঁছেছিলাম তখন আপনিও সেখানে ছিলেন। অথচ দেখা হয় নি।

বললাম, হওয়ার তো কোন কারণ ছিল না।

তিনি মৃদুস্বরে বললেন, কিন্তু আমি আশা করছিলাম আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। অথচ, পথে আর কোথাও আপনার খবর পাই নি। আজ আপনাকে দেখে সন্দেহ হতে ডেকে কষ্ট দিলাম—একটা কথা বলার জন্যে। আপনার মাতাঠাকুরানী এখন কোথায় আছেন?

বললাম, পুরীতে। তাঁর কাছেই ছিলাম। তারপর এদিকে এসেছি।

তিনি তখন শান্ত কণ্ঠে বললেন, ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে আমাদের পরিবারের পরিচয় ছিল, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল। অথচ কি নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিড়ম্বনা—তাঁর যখন কাশ্মীরে জীবন নিঃশেষ হল, আমরাও তখন শ্রীনগরেই, তবুও এত বড় নিদারুণ দুঃসংবাদের কোন রকম আভাস পর্যন্ত আমাদের কাছে পেঁছয় নি! সব শেষ হয়ে যাবার পর—তাঁর মর-দেহ কাশ্মীর থেকে চলে গেলে আমি খবর পেলাম। অথচ, আমি হলাম—

কথার মাঝে তিনি থেমে গেলেন। একটু চুপ করে আবার বললেন শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে,—আর কেউ জানুক বা না জানুক আমি জানি কাশ্মীরের কত বড় হিতৈষী বন্ধু চলে গেলেন, আজ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যে যোগসূত্র এখনও রয়েছে, তার জন্যে কাশ্মীর তাঁর কাছে ঋণী। তাই সেদিন আমার ছেলে যখন কলকাতায় গেল তাকে বলেছিলাম যে আজ কাশ্মীরে তোমার যে প্রতিপত্তি ও পদের মর্যাদা, তা কতখানি ডাক্তার মুখার্জির জন্যে তা তুমি জানো। কলকাতায় গিয়ে তাঁর জননীকে প্রণাম করে আসবে এবং নিজের মুখে জানিয়ে আসবে যে তাঁর শেষ দিনগুলির খবর যেমন তাঁর কাছে অজ্ঞাত, তেমনি সেখানে আমাদের নিজের দেশে উপস্থিত থেকেও আমরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।—এ ব্যথা আমারও কখনও ভোলবার নয়!

তাঁর কথা ভারী হয়ে উঠল। চোখ তুলে দেখি, তাঁর দু-নয়ন-ভরা অশ্রুরাশি।

একটু চুপ করে থেকে আবার ধীরে ধীরে বললেন, আমার ছেলে ফিরে এলে আপনার মার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে লজ্জিত হয়ে আমায় জানাল, তাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে যায় নি; বললে, 'অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না, ডাঃ মুখার্জির মার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত মনের জোর কোনও মতেই পেলাম না।' —আমি আমার ছেলের এ অক্ষমতার কথা বুঝি, তবুও আমি এর জন্যে সত্যিই দুঃখিত। আপনি ফিরে গিয়ে মাকে আমার প্রণাম জানাবেন—আমার কথা তাঁকে বলবেন।

তিনি নিস্তব্ধ হলেন।

নির্বাক হয়ে শুনছিলাম। ভাবছিলাম, এ তো একজন সামান্য নারীর ব্যক্তিগত ব্যথার সমবেদনার কথা নয়, কাশ্মীরের মহারাণীর শোক-গাথাও নয়—এ যেন মূর্তিময়ী কাশ্মীর-দেশ-জননী এসেছেন—ভারত-মাতার পুত্রশোকের নিদারুণ ব্যথার অংশ নিতে।

তাঁকে জানালাম, ফিরে গিয়েই মাকে নিশ্চয় সব বলব। কিন্তু আপনি যদি কখনো কলকাতায় আসেন তো নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

তিনি বললেন, সে ইচ্ছা আমার আছে, কিন্তু কলকাতা যাওয়া আমার হয় না। আমার প্রণাম জানাবেন তাঁকে। আমারও মা তিনি। বলে হাত তুলে উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

ফিরে এসেই মার কাছে সব গল্প করেছিলাম। তাঁরও দু-চোখ বেয়ে শুধু অঝোরে অশ্রু ঝরেছিল।

এখন সব স্মৃতি-কথা। অশ্রু-সজল সেই কাহিনী এখন যেন পাষাণ-রূপ নিয়ে পথ-প্রান্তে ঐ পড়ে রয়েছে। তাই থাক। হিমালয়ের বন্ধুর পথ সাদর আহ্বান দিয়ে সজাগ করে তোলে পথিক-চিত্তকে। আবার পথ চলি। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। অলকানন্দার জল-তরঙ্গ মনের মধ্যে উদাস সুরে পূরবীর তান তোলে।

॥ ৩ ॥

ঘাট-চটী ও পাণ্ডুকেশ্বরের মাঝপথে—অর্থাৎ দুদিক থেকেই এক মাইল দূরে—পথের পাশে একটি ছোট ঘর। আজ কয় বছর আসা-যাওয়ার পথে উৎসুক নয়নে দেখতে দেখতে যাই। চোখে পড়ে, কেমন করে ছোট ঘর ধীরে ধীরে বড় হয়। একতলার উপর দোতলা ওঠে। মাথার ওপর গম্বুজও তৈরী হয়।

শিখদের একটি সুন্দর গুরুদ্বার।

শিখদের? প্রথম যে-বছর শুনেছিলাম আশ্চর্য বোধ হয়েছিল। বদরীনাথে ভারতের সর্ব-প্রদেশের যাত্রী দেখেছি। পাঞ্জাবীও। কিন্তু, শিখদের বিশেষ দেখি নি। এতদিনে হিমালয়ের এ-অঞ্চলে তাদের একটি নূতন তীর্থক্ষেত্র.

গড়ে উঠছে।

তাই এবার যাত্রা-পথে অনেক শিখ-যাত্রীরও সাক্ষাৎ হয়েছে। মুখ-ভরা দাড়ি-গোঁফ, মাথা-ভরা চুল, হাতে লোহার বালা—দলে দলে যাত্রী চলেছে। মেয়েরাও চলেছে—লম্বা গড়ন, সবল সুপুষ্ট দেহ—পায়জামা ও ঝোলা পিরাণ পরা—তারই ওপর রঙিন ওড়না উড়িয়ে। কেদার-বদরী-যাত্রীদের মত তাদেরও বিপুল উৎসাহ। কিন্তু মুখে তাদের 'জয় বদরীবিশালালকী জয়' ধ্বনি নয়, যাত্রী দেখলেই তারা হাসিমুখে ধ্বনি তোলে, 'জয় হেমকুন্ডকী জয়।'

তাদের জয়ধ্বনির আমিও প্রতিধ্বনি তুলি। কেননা আমিও এবার সে-পথের যাত্রী।

যাত্রা-পথের পাশেই* যেখানে নতুন গুরুদ্বারটি—সে স্থানটির নামকরণ হয়েছে গোবিন্দ-ঘাট। ঘাট—কেননা অলকানন্দার জলধারার ঠিক উপরেই। গোবিন্দ—শিখগুরু গোবিন্দ সিং।

গোবিন্দ সিং-এর নামের সঙ্গে যোগসূত্রের আবিষ্কার অতি আধুনিক।

'বিচিত্র নাটক' শিখদের ধর্মগ্রন্থ। গুরু গোবিন্দের রচিত। তাঁর স্ব-কথিত জীবন-কাহিনী। শুধু সেই জন্মের আত্ম-কথাই নয়—পূর্ব-জন্মের ইতিকথাও আছে। এরই এক অংশে তিনি তাঁর জন্মান্তরের সাধনার উল্লেখ করে বলেছেন হেমকুন্ডের কথা। সেইখানেই সপ্তশৃঙ্গ গিরিশ্রেণী; পান্ডুরাজ সেখানে যোগ-সাধনা করেছিলেন। সেই পবিত্র ক্ষেত্রে মহাকালের আরাধনা করে ঘোর তপস্যার ফলে গুরু গোবিন্দ বিধাতার সঙ্গে মিলিত হন।

অব মৈঁ অপনী কথা বখানী, তপ সাধত জিহি বিধি মোহি আনী।
হেমকুন্ড পর্বত হৈ জহাঁ, সপ্তশৃঙ্গ সোহত হৈ বহাঁ।
সপ্তশৃঙ্গ তিহি নাম কহাবা, পান্ডুরাজ জহাঁ জোগ কমাবা
তহঁ হম্ অধিক তপস্যা সাধী, মহাকাল কালকা অরাধী।
এহি বিধি করত তপস্যা ভয়ো, দ্বৈতে একরূপ হৈব গয়ো।।

এই পুণ্য-সাধনা-ক্ষেত্রের সন্ধান বহু অনুসন্ধান করেও শিখেরা পান নি।

১৯৩৬ সালে সন্ত সোহন সিং ও হাবিলদার মোদন সিং নামে দুইজন শিখ হিমালয়ের বহু দুর্গম তীর্থ ঘুরে এই গিরিশ্রেণীর শীর্ষদেশে হিন্দুদের অতি-প্রাচীন দুরূহ তীর্থ লোকপাল হ্রদের তীরে উপস্থিত হন। গুরু গোবিন্দের বর্ণনা মিলিয়ে এঁরাই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে এই 'বিচিত্র নাটক'-এর উল্লিখিত হেমকুন্ড! এই পাহাড়ের পাদমূলেই তো পান্ডুকেশ্বর—ঐখানেই তো পান্ডুরাজ শিবস্থাপনা করেছিলেন। ঐ তো অদূরে গগন-স্পর্শী তুষারশিখর সপ্তশৃঙ্গ। মহাভারতের আদি পর্বে মহারাজ পান্ডুর হিমালয় বাসের বর্ণনার মধ্যে এরই তো উল্লেখ আছে ঃ

*সম্প্রতি বদরীনাথের বাস্-পথ 'গোবিন্দ-ঘাট'-এর খানিক উপর দিয়ে চলে গেছে।

ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ প্রাপ্য হংসকুটমতীত্য চ।
শতশৃঙ্গে মহারাজ তাপসঃ সমপদ্যত ॥

আধুনিক মানচিত্র আজও সেই নামই বহন করে।

তাঁদের এই আবিষ্কার-কাহিনী শিখ-সমাজে প্রচার করতে তাঁরা পাঞ্জাবে ফিরে গেলেন। শিখদের বিরাট ধর্মসভা বসল, এঁদের প্রমাণ ও যুক্তি স্বীকৃত হল।

তার পরেই শুরু হল পুণ্যকামী শিখ যাত্রীদের তীর্থযাত্রা—নব আবিষ্কৃত প্রাচীন পবিত্র হেমকুণ্ডে। দুর্গম পার্বত্য পথ। দুরারোহ চড়াই। অল্পসংখ্যক যাত্রী চলে,—যেন গিরিশিখরের বহুদিনের পুঞ্জীভূত তুষার উদ্দীপিত ধর্মের উত্তাপে বিন্দু বিন্দু গলতে শুরু করে। যাত্রী চলে—পথে আশ্রয় নেই, কিন্তু বুক বেঁধে পুণ্য-লাভের আশা নিয়ে।

ক্রমে ক্রমে যাত্রাপথের মুখে—এই 'গোবিন্দ-ঘাট' গড়ে উঠল। গুরুদ্বার জাগল—নবীন তীর্থ-পথের তোরণ হয়ে সুন্দর একটি ধর্মশালাও তৈরী হল। শিখেদের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় পাহাড়ের সংকীর্ণ যাত্রাপথও প্রশস্ত হল। যাত্রীরা নিরাপত্তায় স্বস্তি বোধ করলেন। যাত্রা-পথ-শেষে ঘাংরিয়াতেও ধর্মশালা গড়ে উঠল। পাহাড়ের চূড়ায় হ্রদের তীরেও আর একটি সুন্দর গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত হল। এখন দুর্গম পথ সুগম হওয়ায় যাত্রী চলেছে দলে দলে,—পাহাড়ে ঝরনার মত।

পান্ডুকেশ্বর থেকে এক মাইল আগে বদরীনাথের যাত্রা-পথের দক্ষিণ দিকে এই গোবিন্দ-ঘাটের ধর্মশালার প্রবেশ পথ। পথের ধারে কাঠের ফলকে বিজ্ঞপ্তি আছে। গোবিন্দ-ঘাটের উচ্চতা ৬,০০০ ফুট। এখান থেকে লোকপাল বা হেমকুণ্ড প্রায় বারো মাইল। সেখানকার উচ্চতা ১৪,২৫০ ফুট। আরও একটি খবর লেখা আছে: এখান থেকে Valley of Flowers নয় মাইল তিন ফার্লঙ মাত্র। সেখানকার উচ্চতা ১৩,০০০ ফুট। সাত মাইল—একই পথ।

প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। এই নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় হিমালয়-অভিযানকারী ফ্রাংক স্মাইথ-এর একখানি বই-এ। ভ্যুন্দর নদীর (Bhyundar) উপত্যকায় ও তুষার-রাজ্যে কাটানো দিনগুলির বিচিত্র কাহিনী। নদীর উপকূলে অপরূপ এক পুষ্পরাজ্য। নানান রঙের ফুলের রঙে আলোকিত, সৌরভে আমোদিত।

১৯৩১ সাল। কামেট গিরিশিখর (২৫,৪৪৭ ফুট) আরোহণ করে ফেরার পথে স্মাইথ ও তাঁর সঙ্গীরা অকস্মাৎ এই উপত্যকাটি দেখতে পান। এমন বিচিত্র ও অপূর্ব কুসুম-সমাবেশ তাঁরা পৃথিবীর আর কোথাও দেখেন নি। স্মাইথ-এর **Kamet Conquered** বই-এ এর বিবরণী আছে। ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পরও এই উপত্যকার উজ্জ্বল স্মৃতি তাঁর মনকে সমাচ্ছন্ন করে রাখে। হিমগিরি দেবতার সত্যকার উপাসক তিনি। হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর রোধ করার উপায়

ছিল না।

১৯৩৭ সাল। তিনি আবার ফিরে এলেন ভুন্দর উপত্যকায়। নদীর শ্যামল-বনানীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় তাঁবু ফেললেন। হিমাচলের এই নিভৃত অঞ্চলে তাঁর কয়েক মাস কাটল। বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলির চূড়ায় ওঠেন, উপত্যকার বনে বনে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান—নানান বর্ণের নানান জাতির ফুলগুলি সংগ্রহ করেন। তাদের নাম-গোত্র-জন্ম-পরিচয় নেন, অজানা ফুলগুলি বিলাতে পাঠিয়ে অভিজ্ঞের মতামত জানেন। তারপর, তাঁর এই সৌন্দর্যময় অভিনব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে যে পুস্তক প্রকাশ করলেন তার নাম দিলেন Valley of Flowers। তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের ফুলের সংখ্যা হয়েছিল আড়াই শত।

এই গোবিন্দ-ঘাট থেকে সেই Valley of Flowers পথেরও যাত্রা শুরু। লোকপাল-ক্ষেত্রেরই আর এক অংশ।

এর কয়েক বছর পরের কথা।

শ্রীবুদ্ধ ... তাঁর হিমালয়-অভিযানের প্রসিদ্ধ ছায়াচিত্রের মাধ্যমে উপত্যকার ফুলরাজির বিচিত্র বর্ণবিন্যাস শহরবাসী লোক-সমাজে প্রচার করলেন। তিনি তাঁর স্বকীয় নামকরণ করলেন—নন্দন-কানন।

পাহাড়ীরা অনেকে এসব নতুন নাম পছন্দ করেন না, গ্রহণও করেন না। তাঁদের কাছে এখনও সেই প্রাচীন পরিচয়—লোকপাল—হেমকুণ্ড।

গোবিন্দ-ঘাটের কাছে কাঠের ফলকে স্বাধীন ভারতে এখন হিন্দী নামকরণ হয়েছে—ফুলোঁকী ঘাটি। কানে ও মনে যেন কাঠি বাজায়।

॥ ৪ ॥

সে-বছর বদরীনাথ থেকে ফেরবার পথে গোবিন্দ-ঘাটে এসেছি। শিখদের সেই ধর্মশালায় উঠেছি।

বদরীনাথ যাবার সময় ধর্মশালায় প্রবেশ করে হেমকুণ্ড ও Valley of Flowers-এর পথের খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন এখানে কয়েকজন শিখ-যাত্রী ছিলেন, দেখেছিলাম। এখন সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। যাত্রী কেউই নেই।

ধর্মশালার স্থানীয় শিখ ভদ্রলোকটি আমাদের আদর-অভ্যর্থনা করলেন, গরম চা খাওয়ালেন, ধর্মশালার উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। পরিচয় পেলাম, ইনিই সেই তীর্থ আবিষ্কারক সোহন সিং।

গুরুদ্বারের দুদিকে চওড়া রোয়াক। উপরে আচ্ছাদন নেই। পাশে তখনও রেলিঙ তৈরী হয় নি। ঘর তৈরীর মালমশলা, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা আছে। মাঝখানে প্রকাণ্ড হলঘর। এখনও মেঝে হয় নি। সেইখানেই গ্রন্থ মহারাজ অধিষ্ঠিত হবেন। সেই হলঘরটিকে ঘিরে চারিদিকে লম্বা টানা বারান্দার

মত ঘর। চারিদিকেই জানালা। একদিকের ঘরের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। সেইখানেই রাত্রিবাসের আয়োজন হল। নতুন ঘর। প্রকাণ্ড লম্বা। সিমেণ্টের মেঝে। কাঠের দেওয়াল। নতুন কাঠের সুবাস।

বাইরের খোলা বারান্দার একদিকে এসে দাঁড়ালাম। নীচেই অলকানন্দার বেগময়ী ধারা। তারই উপর পুরনো ঝোলা পুল। মাঝে মাঝে কাঠ ভেঙে গেছে। নতুন লোহার পুল তৈরী হবার কথা আছে। ঐ পুল পার হয়ে অপর পারে আমাদের নতুন যাত্রা-পথ।

ধর্মশালা থেকে কিছুদূরে অলকানন্দার সঙ্গে ভুন্দর নদীর সঙ্গম। ভুন্দর নদীর অপর নাম লক্ষ্মণগঙ্গা। সেই নদীর উপত্যকা দিয়ে যেতে হবে।

অপর পারের পাহাড়ের বুকে আঁকা-বাঁকা ক্ষীণ পথরেখা। অজানা জগতের কুহক-মাখা।

বদরীনাথে দেখা হয়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। কলকাতা ছাড়ার আগে তিনি কেদার-বদরী যাত্রার উদ্দেশ্যে এ-পথের সন্ধান নিতে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, যাত্রা সাঙ্গ করে তিনি বদরীনাথে অপেক্ষা করবেন, তার পরে একসঙ্গে লোক-পাল ও Valley of flowers-এ যাওয়া যাবে। বদরীনাথে তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু লোকপাল-যাত্রা তাঁর বন্ধ করতে হল স্বাস্থ্যের কারণে। রক্তের চাপ তাঁর আগে থেকেই ছিল, হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বদরীনাথের বাঙালী সরকারী ডাক্তার সাবধান করে দিলেন, লোকপালের মত উঁচু জায়গায় তাঁর যাওয়া ঠিক হবে না।

বদরীনাথ থেকে গোবিন্দ-ঘাটে আসার পথে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হল। বললেন, আপনারা এগিয়ে যান। গোবিন্দ-ঘাটে আপনাদের সঙ্গে মিলব। ইচ্ছা ছিল, লোকপালের পথে ক'দিন একসঙ্গে কাটাব, তা যখন হল না, আজকের রাত্রিটা অন্ততঃ একসঙ্গে আনন্দে কাটানো যাবে—নাই বা গেলাম আজ যোশীমঠ পর্যন্ত। এখন তো বাড়ি ফেরার পথ।

গোবিন্দ-ঘাট-এ এসে তাঁদের দলের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। ঘরের ভিতর তাঁদের জন্যে একধারে কম্বল বিছিয়ে আয়োজন করে রাখি।

বিকেল বেলা। বৃষ্টি নামল। মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। তাঁদের জন্যে উৎকণ্ঠা হয়, শরীর খারাপ, ভিজবেন নিশ্চয়। পাণ্ডুকেশ্বরে থেকে যাবেন নাকি ? কিন্তু থেকেই বা লাভ কি ? পাহাড়ে বৃষ্টি—পথ-চলার মধ্যে এড়ানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে ডাক শুনি।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াই। ঐ তো এসে গেছেন।

উৎসাহে বলি, আরে ! চলে আসুন ভেতরে। একেবারে ভিজে নেয়ে গেছেন। বর্ষাতি, ছাতায়—কোন কিছুতেই এ-বৃষ্টি বাগ মানে না। আর ভিজবেন না,

ভেতরে এসে শুকনো জামা-কাপড় দিচ্ছি, ছেড়ে ফেলুন। গরম চাও তৈরী হয়ে যাবে এখনই।

তবুও ঘরে ঢোকেন না। বাইরে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। হাসতে থাকেন।

বলেন, না, আর ভেতরে ঢোকা নয়। সেই কথাই বলছি। কিছু মনে না করেন তো আমরা যোশীমঠেই চলে যাই। বৃষ্টি এখন তবুও একটু কমেছে। কাল যদি আবার আরও জোরে নামে! আপনারা তো চলে যাবেন ওপরে, আমাদের তো সেই নামতেই হবে। আজ বেবু যতটা পারা যায় এগিয়ে থাকা যাক্।

আমিও স্বীকার করি। বলি, সত্যি বলতে কি—শুধু রাত্রি কাটানোর প্রস্তাবটা আমারও মনে ধরে নি। একসঙ্গে ওপরে যাবার কথা। ডাক্তারের মতে তা যখন একেবারে সম্ভবই নয়, তখন কাল ভোরে উঠে আমরা যাব নির্দিষ্ট পথে, আর আপনারা যাবেন ফিরে—সেট মনে বড় লাগত। এ মন্দের ভালো হয়েছে।—আপনারা এগিয়ে চলুন। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলে ভিজবেন না।

বন্ধুটি পিছন ঘুরে এগিয়ে যান। থমকে দাঁড়ান। আবার ফিরে আসেন। সংকোচভবে বলেন, একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। রাখবেন?

বলি, নিঃসংকোচে বলুন কি হুকুম।

তিনি বলেন, সঙ্গে এক টিন না-খোলা বিস্কুট আছে। কলকাতা থেকেই এটা আলাদা করে রেখেছিলাম—লোকপাল তীর্থে এর সৎকার করব বলে। এখন বেচারী ফিরে চলেছে আমাদের সঙ্গে। ওটা দিয়ে দিই,—নিয়ে যান—সেখানে সদ্‌গতি হবে।—তারপর হাসিমুখে বলেন, আমাদের কথা নিশ্চয় তখন মনে পড়বে।

তখনই জবাব দিই, মনে এমনি অনেক সময়েই পড়বে। তবুও দিন, আপনার ইচ্ছার অন্ততঃ এইটুকু পূরণ হোক্।

তারপর বলি, আমারও একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। এখানে এসেই আপনাদের অভ্যর্থনার জন্যে রাত্রিতে পরমান্নের ব্যবস্থা করেছিলাম—আমসত্ত্ব দিয়ে খাবেন বলে। পরমান্ন এখনও তৈরী নয় বটে, কিন্তু আমসত্ত্ব বার করা রয়েছে—সেটা নিয়ে যান, পথে কাজ দেবে।

বন্ধু এসে নিয়ে নেন। বলেন, এমনি করেই ভাগ্যে জোটে। ক'দিন হল আমাদের ওটার স্টক্ ফুরিয়েছে। ভালো কথা, লোকপাল থেকে ব্রহ্মকমল আনবেন। অদ্ভুত নাকি সে ফুল! কলকাতায় বসে বসেই দেখব, আঘ্রাণ নেব।—আর ক'দিন পরেই তো বাড়ি পৌঁছোচ্ছি! চললাম।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। বৃষ্টিধারার ঝালরের মধ্যে দিয়ে চারিদিকে আবছায়া আবহাওয়া। আকাশের মেঘ পাহাড়ের বুকে নেমে আশ্রয়

নিয়েছে। দূরের পাহাড় চোখে পড়ে না। কাছের পাহাড় মেঘের পর্দার অন্তরালে অস্পষ্ট। তারই মধ্যে যাত্রী চলেছে। কর্দমাক্ত পথে। সিক্ত তনু। শ্রান্ত পদ। গৃহমুখী মন। যাত্রা অন্তে দীর্ঘ পথ দীর্ঘতর হয়ে তাদের সামনে পড়ে থাকে।

আমাদের মন কিন্তু উন্মুখ।

কাল ভোরে রওনা হতে হবে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে ঘাংরিয়া। লোকালয় নেই। ধর্মশালা আছে। সেখানে রাত্রিবাস চলে। তবে সংস্কার অভাবে জীর্ণ, অপরিচ্ছন্নও। বন-বিভাগের একটা নতুন বাংলো হয়েছে—রেস্ট হাউস্। ব্যবস্থা করতে পারলে সেখানে থাকা যেতে পারে। পথে একটি গ্রাম আছে। চৌকিদার সেইখানেই থাকে। ঘাংরিয়া থেকে একদিন হেমকুণ্ড বা লোকপাল ও আর একদিন Valley of flowers দেখে তিনদিন পরে আবার এই গোবিন্দ-ঘাটে ফেরা। তাই যে জিনিসগুলির একান্ত প্রয়োজন শুধু সেই-গুলি নিয়ে যাবার আয়োজন হয়েছে।—অর্থাৎ শুধু খাওয়া, পরা ও শয্যার ব্যবস্থা। অতিরিক্ত মাল এখানেই থাকবে। নইলে অযথা মালের বোঝা বাড়বে। খাদ্য-সামগ্রীর সংগ্রহ হয়েছে পাণ্ডুকেশ্বর থেকে—আটা, ঘি, আলু। চাল নিয়ে লাভ নেই—অত উঁচুতে জলে সিদ্ধ হতে চায় না।

সঙ্গী কুলী বলে, খিদে হবে ওখানে খুব। কিন্তু চায়ের প্রয়োজন হবে আরও বেশী। গুঁড়ো দুধ ও বেশী করে চিনি নিতে যেন ভুল না হয়। কেরোসিন তেলও খানিকটা টিনে করে নিতে হবে।—দেখেশুনে তারাই সব বেঁধে ঠিক করে রাখে।

রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙল। বাইরের ঘরের ছাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে। শিল পড়ছে নাকি?

কম্বল ছেড়ে উঠে জানালার কাছে দাঁড়াই। বড় টর্চটার আলো বাইরে ফেলি। সূচীভেদ্য অন্ধকার। টর্চের আলো জানালার বাইরে বৃষ্টির ধারাজালে আবদ্ধ হয়। পিছনের গাঢ় অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়। চারিদিকে হু-হু করে জলের তোড় নামছে শব্দ করে। সব ছাপিয়ে অলকানন্দার গভীর গর্জন।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘরের ভিতর বিছানায় শিশিরবাবুর মুখে ফেলি। পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে আছেন। বলেন, জেগে আছি। সব দেখছি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। সকালেও থামবার আশা দেখি না। জল না থামলে যাওয়া সম্ভব হবে?

বলি, সম্ভব না হলে যাবও না। এখন ঐ নিয়ে ভাবতে বসলেও তো বৃষ্টি থামবে না।

অতএব, আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া। অবিশ্রান্ত বারিধারার মেঘ-মল্লার সুরের সঙ্গে অনিশ্চয়তায় মন দুলতে থাকে।

কখন রাত্রি ভোর হয়েছে জানা নেই। বেলা আটটা বাজে। এখনও চারিদিক অন্ধকার। যেন নিশীথ-রাতের নিবিড় আঁধার তরল হয়েছে মাত্র। বৃষ্টি তেমনি চলেছে। শ্রাবণের ধারার মত। অক্লান্ত, অঝোরে।

পথে একটিও যাত্রী নেই। দলে দলে ভেড়া-ছাগলের আনাগোনাও নেই। পশু-পক্ষী-জন-মানবহীন জগৎ। চারিদিকে শুধু জল, জল। জলেরই কেবল কলকল ছলছল শব্দ।

কম্বল-গায়ে সঙ্গী কুলী এসে বসল। বলে, বলুন, কি করা যাবে।

হেসে বলি, চল, যাবে না? এতক্ষণ তো পাঁচ-ছ মাইল পথ চলে যাবার কথা।

সে-ও হেসে জবাব দেয়, আমরা সব সময়েই তৈরী আছি। হুকুম হলেই বার হতে পারি।

জানি, এটা তাদের মুখের কথা নয়। সত্যই এরা পারে এতো বড় নিঃস্বার্থ নির্ভরযোগ্য সঙ্গী জগতে দুর্লভ।

তারপর আবার হেসে বলে, আমাদের কষ্টের ভয় নেই, ক্ষতিরও ভাবনা নেই। পাহাড়ের ঝড়-জল আমাদের সঙ্গী, 'ডর' করি শুধু গরমকে। কিন্তু এই জলে বেরুলে আপনাদের কষ্ট হবে, জিনিসপত্রও সব ভিজে যাবে। এ-বৃষ্টিতে বর্ষাতি কোন কাজই দেবে না। যা বলবেন তাই হবে।

হবে আর কি? যা দেখছি আজ সারাদিনই এখানে কাটবে।

অতএব, গরম গরম চা আনাই। তাদের দিই, নিজেরাও খাই।

বাইরে বেলা গড়িয়ে যায়। তবুও আকাশে আলো খোলে না। নিবিড় কালো নিশ্ছিদ্র নিখিল।

॥ ৫ ॥

নীচে থেকে শিখ ভদ্রলোকটি এসেছেন খবর নিতে। তিনি এখানকার সব দেখাশুনা করেন। একটা কমিটি আছে। তারা টাকাকড়ি তুলে ধর্মশালা তৈরি করেছেন। সরকারের সহযোগিতায় পথঘাটেরও সংস্কার হচ্ছে।

হেমকুণ্ডের তীরে গুরুদ্বার তৈরী হয়ে গেছে, ঘাংরিয়ার ধর্মশালাটিও নতুন করে করার প্রস্তাব আছে। অমায়িক ভদ্রলোক। নিজেই বাড়ি-তৈরীর দেখাশুনা করেন। প্রচুর উৎসাহ।

বলেন, একাই এইসব করেছি। করছিও। কারও এতদিন সাহায্য পাই নি। এবার কাজ এগিয়েছে। লোকে এখন কাজের লোভে আসতে শুরু করছে।

এ-রকম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হেমকুণ্ডের পথে এগিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তাঁর পরামর্শ চাইলাম। তিনি জানালেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সং-পরামর্শ যিনি দিতে পারেন, তিনি আজ দিন তিনেক হল এখানে এসে গেছেন।

এখনই আসছেন ওপরে, আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁর কাছেই সব জানতে পারব।

একজন শিখ সাধু। 'ডাক্তার' নামেই এখানে খ্যাত। হয়তো পূর্বাশ্রমে চিকিৎসা করতেন। সংসার ছেড়ে এখন তিনি বেশীর ভাগ সময় হিমালয়ে থাকেন। সম্প্রতি ছয় সপ্তাহ হেমকুণ্ডে ছিলেন।

সাধুটি এলেন। অতি সাধারণ বেশভূষা। গেরুয়া নয়। শিখদের মত পরনে লম্বা ঝোলা পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। একমুখ সাদা দাড়ি গোঁফ। সৌম্য মূর্তি। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। ধীর শান্ত কথা বলার ভঙ্গী। হিন্দী ইংরাজী দুই-ই জানেন।

বললেন, আপনারা এসেছেন, ভালোই। যান, দর্শন করে আসুন। এ ভাবে বৃষ্টি হলে পথে কষ্ট হবে ঠিকই, হয়তো কোথাও পাহাড়ের ধস্ নেমে পথ ভেঙে গেছে দেখবেন। তবে যাওয়া অসম্ভব নয়। অসুবিধা হতে পারে, এই পর্যন্ত।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে বৃষ্টি এভাবে চললেও আপনি যেতে বলেন ?

মৃদু হেসে জবাব দিলেন, আমি বলার কে ? মনে বিশ্বাস যদি থাকে, বেরিয়ে পড়লে, কোন ভয় নেই বলেই মনে করি। আর, বৃষ্টির কথা ভাবছেন ? কাল সকালে জল থেমেও তো যেতে পারে।

বললাম, যে রকম ঘনঘটা মেঘ, কাটার কোন লক্ষণই তো নেই।

তিনি বললেন, এখন দেখে কিছু বুঝবেন না। বিকালে দেখবেন, যদি একবারও মেঘ ছিঁড়ে সূর্যের আলো ফোটে, কাল সকালে আকাশ একেবারে নির্মেঘ হয়ে যাবে।

বাইরে মেঘের প্রলয়-আঁধার, সাধুজির ভাষায় আশার আলো।

তাঁর কাছে হেমকুণ্ডের বর্ণনা শুনি। তাঁর অভিনব জীবনের কয়দিনের বিচিত্র কাহিনী।

কুণ্ডের ধারে যে ধর্মশালা, তাতেই থাকতেন। নিঃসঙ্গ। পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। ক্বচিৎ কখনও যাত্রী গেলে লোকমুখ দর্শন হত। আহার্যের কোনই আয়োজন নেই। কাছে থাকে শুধু 'চানা'। ফুরিয়ে গেলে উপবাসী থাকতেন। যাত্রী গেলে আবার দিয়ে আসত। শুধু ছোলাই। হ্রদের জল—সুশীতল, সুস্বাদু। বলেন, সে-ও তো পুষ্টিকর।

শান্তকণ্ঠে বলতে থাকেন, দেবতাত্মা হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে অতিপবিত্র এসব তীর্থ-স্থান। হিন্দু বলুন, শিখ বলুন—ধর্মের মূল কথায় কারো প্রভেদ নেই। ধর্ম নির্বিশেষে দেবতাত্মার সঙ্গে পরিচয় করার এসব প্রকৃষ্ট পরিবেশ। চারিদিকে প্রকৃতির কি প্রশান্ত রূপ। আত্মস্থ হবার প্রকৃতই অনুকূল আবেষ্টনী। রাত্রিদিন আসনে থাকতাম। আপনা হতেই ধ্যান আসে। চক্ষের পলকে রাত্রির আঁধার, দিনের আলো যেন কোথায় মিলিয়ে যেত। সত্যিই সেখানে

—'দিনানি যত্র গচ্ছন্তি ক্ষণপ্রায়াণি দেহিনাম্'! চারিদিক নিস্তব্ধ নিস্পন্দ। মৌনী প্রকৃতিরও যে ভাষা আছে, এক একদিন তাই যেন শুনতে পেতাম। গভীর রজনী। অকস্মাৎ শব্দ শুনে আসন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। কে যেন কথা কয়। অথচ, কোথাও কিছু নেই। বাতাসও নেই। শব্দের কারণের কোন নিদর্শন পাই না। ভাবি, মনের ভুল? কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রেই তো আছে—

ভগবানপি তত্রৈব তেষামানন্দমাবহন্।
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ স্বয়মায়াতি মজ্জনে ।।

সকলে সত্যিই বিশ্বাস করে—গহনরাতে দেবতারা আসেন হেমকুণ্ডের তীরে—

কথার মাঝে হঠাৎ থেমে যান। ধীরে ধীরে বলেন, থাক্ ওসব কথা। ওসব বলবারও নয়, বোঝাবারও নয়। অনুভূতি সাপেক্ষ। সেটা প্রমাণও নয়।

কোন কিছু প্রশ্ন করি না। চুপ করে শুনি।

তখন সহজ কণ্ঠে বলেন, হেমকুণ্ডে পেঁছবার কিছু আগে পথে খানিকটা বরফ পাবেন। এখন গলতে শুরু করেছে। সেই জায়গায় পথ ছেড়ে সাবধানে পাহাড়ের একটু ওপরে উঠে সেইখানের বরফের ওপর দিয়ে পার হবেন—বরফ সেখানে এখনও শক্ত আছে। পথ ধরে গেলে সেখানে যে বরফ আছে—তা ভেতরে গলে গিয়ে এখন বিপজ্জনক হয়ে আছে। আপনাদের সঙ্গে যে লোক যাচ্ছে তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব। কোন ভয় নেই আপনাদের।

কল্প-লোকের মানুষ যেন মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন। মানুষের দরদী হৃদয় রুদ্ধ দুয়ার খোলে।

এঁকে দেখেছিলাম তার পর আর একদিন। ক্ষণিকের দেখা। তবুও মনের পটে চির-ভাস্বর রেখা এঁকে দিয়েছে।

হেমকুণ্ড দর্শন করে ফিরে এসেছি। গোবিন্দ-ঘাটে রাত্রি কাটাচ্ছি। ভোরে উঠে নেমে যাব যোশীমঠে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্নার আলো এসে কম্বলের উপর পড়েছে। ঘড়িতে দেখি, রাত দুটো। শয্যা ছেড়ে বাইরে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

জ্যোৎস্না-প্লাবিতা ধরণী। তুষার-মৌলী শৈলশিখরের রজতদীপ্তি। গিরিরাজ হিমালয় যেন ধ্যান-মৌনী। শুধু আনন্দোচ্ছল অলকানন্দার জলধ্বনি। স্তব্ধ হয়ে দেখি, কান পেতে শুনি। হঠাৎ চমক লাগে নদীর তীরে একটি মূর্তি দেখে। জলের ধারেই প্রকাণ্ড উঁচু পাথর। তারই উপর সমাসীন মানুষ-মূর্তি। ধ্যানমগ্ন। নিশ্চল, নির্বিকার। যেন পাথরেরই একটা অংশ। বিরাট হিমালয়ের অঙ্গে যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অতি নগণ্য ধূলিকণা। তবুও সেই বিরাটেরই অংশ।

সেই যোগাসীন মূর্তিকে অলক্ষ্যে প্রণাম করে চলে এলাম। কি জানি, আমার হৃদ্‌স্পন্দনের ক্ষীণ ধ্বনিতেও যদি তাঁর ধ্যান-স্তব্ধতায় বিঘ্ন আনে!

হঠাৎ মনে পড়ে সক্রেটিস্-এর জীবনের একদিনের কাহিনী।

এথেন্সবাসীরা যুদ্ধরত। সেনাদলে সক্রেটিস্ও আছেন। তাঁর এক সঙ্গী সৈনিকের মুখ দিয়ে প্লেটো বর্ণনা করেছেন সেদিনের কথা: ভোরে উঠে দেখি সক্রেটিস্ তাঁবু থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একাগ্রমনে গভীর চিন্তা করছেন। দুপুর হল, তিনি তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। বিকাল গেল, সন্ধ্যা হল, রাত্রিও এল—তিনি তবুও সেই একইভাবে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গভীর ধ্যানমগ্ন। আত্মস্থ। তার পরদিন ভোরেও দেখা গেল তাঁর সেই একই ধ্যানস্তিমিত যোগমূর্তি। নিশ্চল, নিস্পন্দ। তারপর, প্রাতঃসূর্য উঠল। তাঁরও ধ্যান ভাঙল। সূর্যবন্দনা করে তিনি ধীর-চরণে চলে এলেন।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। এক মহামানবের সাধন-চিত্র। পাশ্চাত্ত্য এথেন্সে। ভাবি, দেশ-কাল অতিক্রম করে আত্মসমাধির সেই চিরন্তন রূপ কি এখনও তেমনি রয়েছে!

॥ ৬ ॥

দ্বিপ্রহরের আহার সাঙ্গ করে কম্বল গায়ে ধর্মশালায় শুয়ে আছি। বাইরে এখনও বাদলের তেমনি মাতন চলেছে।

হঠাৎ শিশিরবাবু বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ব্যাপার কি?

আবিষ্কারের আস্ফালনে বলেন, ধরেছি! ঠিক ধরেছি এবার! বিস্কুটের টিনটা বার করুন। ঐটেই যত নষ্টের গোড়া। এতবার হিমালয়ে ঘুরেছি, বৃষ্টিতে তো এমন করে কখনও আটক করে রাখে নি। বুঝেছি, ঐ বিস্কুটের টিন-এর জন্যই সে-ভদ্রলোকদের লোকপাল যাওয়া হল না। এখন আমাদের ঘাড়ে চেপে আমাদেরও বিঘ্ন ঘটাচ্ছে!

বললাম, অতএব কি করতে বলেন?

তিনি বলেন, টিন খুলে এখনি তার সৎকার করব। ভয় নেই, কিছু বাঁচিয়ে রাখব প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্যে।

কথামত কাজও করেন। ভোগের ভাগও পাই।

বিকালবেলা।

চা খেয়ে কম্বল-শয্যায় বসে দুজনে বই পড়ছি, আবৃত্তি করছি। সংস্কৃত স্তব। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও।

মধুময় লাগছে।

অকস্মাৎ তির্যকভাবে একটি সূর্যরশ্মির স্বর্ণ-ফলক এসে কবিতার পাতায় বিঁধল।

দুজনে ছুটে বাইরে এলাম।

আকাশের পশ্চিম কোণে মেঘ ছিঁড়েছে। অস্তমান সূর্যের রাঙা আবিরে মেঘের ঝালর রক্তিম হয়ে উঠেছে।

বর্ষণ-মুখরা প্রকৃতি ক্ষান্ত শান্ত হয়েছে।

আকাশের আলো মনে আশার দীপ জ্বালাল।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, দেখুন, ঠিক ধরেছিলাম কিনা?

বলি, অকাট্য প্রমাণ। এ নিয়ে একটা থিসিস্ লিখুন।

॥ ৭ ॥

এই গোবিন্দ-ঘাটে এর পরের বছর একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল।

সেবার এসেছিলাম একা। তবুও, এখানে পৌঁছে একান্তে নির্জন স্থান পেলাম না। সেটা জুন মাস। যাত্রার সময় সবে শুরু হয়েছে। যাত্রীর প্রথম জোয়ার—বেশ ভিড়। বদরীনাথের যাত্রীরাও এসে আশ্রয় নিচ্ছে। গুরুদ্বারাটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এই লম্বা টানা দালান-ঘরটির একপাশে আশ্রয় নিয়েছি। সারি সারি অন্য যাত্রীদের বিছানা পাতা। সুশ্রী চেহারা। গৌর বর্ণ। টানা চোখ। টিকলো নাক। মুখে স্নিগ্ধ দীপ্তি। উজ্জ্বল কান্তি ক্লান্তিতে ঈষৎ ম্লান হয়েছে। বেশ সপ্রতিভ ভাবে আমাকে অভিবাদন করলেন, নমস্তে বাবুজি, কোথা থেকে আসছেন? হেমকুণ্ডে যাবেন বুঝি?

বললাম, ইচ্ছা আছে।—প্রকাশ করলাম না যে এ-পথ আমার অজানা নয়।

তিনি সেইদিনই সেখান থেকে অল্প আগে ফিরেছেন। অপরিসীম ক্লান্ত।

বললেন, পথ বড় কঠিন। বরফও এখন অনেক রয়েছে। চলে যান, কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু মন ভরে যে আনন্দ নিয়ে এলাম তাতে শরীরের এ-কষ্ট কিছুই মনে হয় না, মনে থাকেও না। সত্যিই এ সব দেবতার স্থান আমার ঐ দেবতাকে নিয়ে দর্শন করিয়ে এলাম।—বলে জানালার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

দেখি, জানালার কাছে—তাক্-এর মত জায়গাটিতে—ছোট একটি বাঁধানো ছবি। শ্রীকৃষ্ণের। ত্রিভঙ্গমুরারি, বংশীধারী। কাগজে রঙিন্ ছাপানো ছবি; কিন্তু মূর্তিটি সুন্দর। বাঁধানো কাঁচের উপর চন্দনের ফোঁটা।

ছবির নীচে ছোট পুষ্পপাত্রে কয়টি ফুল। পাশেই ধূমায়িত সুগন্ধি ধূপ।

বললেন, দেখছেন বাবুজি—কি হাসিভরা মুখখানি! কানাইয়া আমার সন্তোষ পেয়েছেন যে!

চুপ করে সেই ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। কপোল বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসে।

ভক্তিবিগলিত ধারা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ভাবি, সুন্দরতর কে? ঐ ছবির দেবতা, না

মানুষ ভক্ত ? অথবা, দুয়েরই মধ্যে একেরই প্রকাশ ?

কিন্তু, আশ্চর্য ! শিখ-মহিলা,—শ্রীকৃষ্ণের ছবি কেন ?

প্রশ্ন করব কিনা ভাবছি এমন সময় তাঁরই এক সঙ্গী উপস্থিত হলেন। গেরুয়াবাস একটি সাধু। সঙ্গে আরও কয়েকটি মহিলা-যাত্রী। সম্ভবতঃ সবাই পাঞ্জাবী হিন্দু—শিখ নয়। সাধুটি এসেই বললেন, মাতাজি, কত আগে একলা চলে এসেছেন আপনি! আমি এঁদের নিয়ে পেছিয়ে পড়েছিলাম। বাঃ, আপনি তো গুছিয়ে বসে গেছেন!

মাতাজি মৃদু হেসে বলেন, একলা কোথায় ? আমার কানাইয়া আমার হাত ধরে নিয়ে চলে এলেন। এখন ওঁকে বিশ্রাম করাচ্ছি। দুদিন পথে কষ্ট হয়েছে কম ?

ভাবটা এমনি যেন শ্রীকৃষ্ণের সজীব পদযুগল পেলে এখনি সব ফেলে পদসেবা করতে বসেন।

অন্যান্য যাত্রী এসে হাজির হয়। প্রায় সবই বদরী-যাত্রী। ধর্মশালার শিখ ভদ্রলোকটি এসে আমাকে বলেন, চলুন, আপনার এই ভিড়ের মধ্যে অসুবিধে হবে, নীচের একপাশের ঘরটিতে আপনারা থাকার ব্যবস্থা করে এলাম।

বুঝি, আমার অসুবিধার কথা নয়, অন্য যাত্রীদেরও স্থান দেওয়ার প্রয়োজন। চলে আসি।

ঘণ্টা দুই পরের কথা।

সেই সাধু যাত্রীটি ব্রস্ত হয়ে এসে জানান, একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। মাতাজির কাছে শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি ছিল—সেটি পাওয়া যাচ্ছে না।

আশ্চর্য হয়ে বলি, সে ছবি তো আমাকেও তিনি দেখাচ্ছিলেন—তাঁরই বিছানার ধারে জানালার কাছে রেখেছিলেন। সেখান থেকে যাবে কোথায়, নেবেই বা কে ?

তিনি বলেন, এই একটুকু আগে আমরা নীচে এসেছিলাম—সব মুখ হাত ধুতে। আধ ঘণ্টাও হবে না। ফিরে গিয়ে দেখি—সবই ঠিক আছে, নেই শুধু সেই ছবিখানি।

জিজ্ঞাসা করি, ওখানে তখন আর কেউ ছিল না ?

বলেন, অপর যাত্রী কয়েকজন ছিল—কিন্তু তারা ছবি সম্বন্ধে জানে না বলে।

স্তম্ভিত হয়ে শুনি।

তিনি বলতে থাকেন, মাতাজি কেবলি কাঁদছেন, কোনও সান্ত্বনাই তাঁকে দিতে পারছি না। আমরা জানি, এ-মূর্তি যে তাঁর প্রাণ-স্বরূপ। কি করা যায় বলতে পারেন ? সব জায়গায়, সবার কাছে অনুসন্ধান করছি—কেউই কিছু বলতে পারছে না।

আমিই বা বলব কি, বুঝি না।

তবুও উপরে যাই তাঁর সঙ্গে। সেখানে নতুন যাত্রীর জনতা দেখি।

সেই জানালার কাছে দেখি, সবই তেমনি আছে। নেই শুধু ছবিটি। আর, সেই ধূপশিখাটিও নেই, নিবে ছাই হয়ে গেছে।

একটি ছোট্ট ছবি—কিন্তু কি বিরাট যেন শূন্যতা রেখে গেছে।

মাতাজির মুখের দিকে অতি সংকোচভরে তাকালাম,—মনে হচ্ছিল, যেন সদ্য পুত্রহারা জননীর মুখের দিকে তাকাতে যাচ্ছি। কিন্তু,এ কী অপরূপ রূপ! শয্যা-প্রান্তে বসে জানালার সেই শূন্যস্থানের প্রতি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন—যেন পাষাণ-মূর্তি। অঙ্গের কোথাও কোন স্পন্দন নেই। আকুল ক্রন্দন নেই। শুধু দুই নয়ন থেকে অবিরল ধারা নেমে আসছে যেন ধ্যানস্তব্ধ হিমাচলের বুকে তুষার-গলা ঝরনার ধারা।

পরদিন সাধুজির কাছে আবার খবর নিয়েছিলাম। ছবির সন্ধান মেলে নি; মাতাজিও জলস্পর্শ করেন নি।

ভাবি, হৃদয়-ভরা অত প্রেম, তবুও এ-রিক্ততার অনুভূতি কেন?

কিন্তু, এ-তো এক নারীর কথা!

দেখেছিলাম, এক সত্যিকার সাধুকে এমনি আর এক পরিস্থিতিতে।

গঙ্গাসাগর চলেছি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেজদাদাকে কেন্দ্র করে বড় একটি দল হয়েছে। স্বতন্ত্র একটি স্টীমারেরও আয়োজন হয়েছে। মেজদাদার যে-বন্ধুটি স্টীমারের ব্যবস্থা করছেন, তিনি এসে জানালেন, একজন সাধুও যেতে পারেন সঙ্গে। গত বছর এই বন্ধুটি কৈলাস-মানস-সরোবর গিয়েছিলেন, সেইখানে তিব্বতের পথে এই সাধুটির সঙ্গে তাঁর অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়—দু-একটি অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল সেই সময়ে। এখন তিনি কলকাতায় এসেছেন গঙ্গাসাগর দর্শনের উদ্দেশ্যে।

সকলেই বললাম, ভালোই তো। সত্যকার সাধু সঙ্গ। সৌভাগ্যের কথা।

স্টীমারেই প্রথম পরিচয়। নাগা সন্ন্যাসী। মাথা-ভরা জটা; রুক্ষ রূপ। কিন্তু মুখ-ভরা হাসি। হাতে একটি শঙ্খ। বয়স বেশী বলে মনে হয় না। শহরে এসেছেন, তাই কৌপীন পরা। গঙ্গাসাগরের প্রসিদ্ধ শীত, তবুও গায়ে কিছু নেই। নেমে এসেছেন হিমালয় থেকে। নেপালের এক নিভৃত অঞ্চলে তুষার-রাজ্যে গুম্ফায় থাকেন। বলেন, সে-ও এক অপূর্ব পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কুম্ভকর্ণ পর্বত। দুর্গম কঠিন পথ।

তারপর, ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি টেনে বলেন, চল, দেখে আসবে। হিমালয়ের মধ্যে অমন স্থান কমই আছে। প্রকৃত শিবক্ষেত্র।

স্টীমারে দু'দিনের মধ্যেই বেশ আলাপ হয়। স্বল্পভাষী। সরল মন। শিশুর হাসি। সস্নেহ ব্যবহার। অথচ, সর্ব বিষয়েই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, উদাসীন। খাওয়া-পরা-শোওয়া—কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। সারাক্ষণই ধ্যান চলেছে। বেশ লাগে তাঁর সঙ্গ-সুখ। কাছে গিয়ে বসলে, কেন জানি না, মনে একটা তৃপ্তি বোধ হয়—যেন গঙ্গায় অবগাহন করে উঠছি।

তাঁর নির্বিকার ভাবের পরিচয় পেয়েছিলাম, গঙ্গাসাগরে পরবর্তী একটি ছোট ঘটনায়।

আমাদের সঙ্গে আর একজন হিমালয়বাসী সাধু ছিলেন। তিনি বাঙালী। গেরুয়াবাস। আচারনিষ্ঠ। সুশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ। বিধিমত জপতপ পূজাদি শুদ্ধভাবে পালন করেন।

গঙ্গাসাগরে একদিন এই দুই সাধু সাগরের চরে রয়েছেন ;—আমরা সেদিন স্টীমারে আছি। দুপুরে তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হয়েছিল এক সেবা-কেন্দ্রের উপর।

সন্ধ্যাবেলায় স্টীমারে ফিরে এসে বাঙালী স্বামীজী গল্প করছিলেন। এক সময় হাসতে হাসতে বললেন, আজ একটা মজা হয়েছে। আপনারা বুঝি আমাদের প্রসাদের ব্যবস্থা করেছিলেন ? আজ তীর্থ-উপবাস, তাই আমি কিছু গ্রহণ ক'রি নি। তীর্থে এসে এ-সব নিয়ম মানা উচিত। কিন্তু নাগা সাধুটিকে খাইয়ে দেওয়া গেছে—শুধু খাওয়ানো নয়—একেবারে অন্ন-পাক—খিচুড়ি ! তিনি প্রথমে বলেছিলেন, তাঁর এ-সবের কিছুই দরকার নেই—খেতেও চান নি। কিন্তু সেবা-কেন্দ্রের ভদ্রলোকটি বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—আমিও তাতে যোগ দিয়ে দিলাম। নাগা স্বামীজী তারপর আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অম্লানবদনে খেয়ে নিলেন।—তীর্থে এসে একেবারে অন্নভোজ !—বলে উচ্ছ্বসিত হাসতে থাকেন।

পরিষ্কার বুঝি, এই খাওয়া না-খাওয়ায়, তীর্থক্ষেত্রে এ-সব বিধি-নিয়ম পালনে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু বাঙালী স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী আমার অন্তরে কোথায় যেন ব্যথা জাগায়।

গঙ্গাসাগরে পৌঁছুবার কিছু আগে হঠাৎ স্টীমার দাঁড়িয়ে গেল। জল কম। অথচ চারদিকেই দেখি, শুধু জল আর জল। সারেঙ্ বলে, এই জলের অল্প নীচেই চর পড়েছে। জল না বাড়লে এগুনো যাবে না। অতএব, দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

মেজদা সাধুজিকে বলেন, স্বামীজী, কই আপনার শাঁখ কই ? জোরসে বাজান, গঙ্গার জল আনিয়ে দিন। স্টীমার আটকে গেল যে। ভগীরথের কথা মনে আছে তো ?

হাসিভরা মুখ নিয়ে সাধু সত্যিই উৎসাহিত বালকের মত উঠে দাঁড়ান।

দেখি, শাঁখ হাতে স্টীমারের উপরে খোলা ছাদে গিয়ে ওঠেন। একটা পা একটু এগিয়ে দিয়ে আর এক পা একটু পিছনে রেখে বুক চিত করে দাঁড়ান। মাথা পিছন দিকে কাত করে আকাশের দিকে মুখ একটু তোলা। দুই হাতের মুঠোয় শাঁখ ধরা। শাঁখে ফুঁ দিলেন। শঙ্খধ্বনি উঠল। গভীর, গম্ভীর। একটানা। চারিদিকে, গঙ্গার বিস্তীর্ণ বারিরাশির উপর, দিক্‌দিগন্তে, আকাশের প্রান্তে প্রান্তে সে-ধ্বনি ছুটে চলে; চারিদিক শঙ্খনিনাদে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।—সারা বিশ্ব যেন শুধু একটা জমাট ধ্বনি-রূপ। মনে পড়ে, হিমালয়ের হিমরাজ্যের উচ্ছল চঞ্চল নির্ঝরিণীর হঠাৎ যেন জমে স্তব্ধ বরফ হয়ে যাওয়া!

সাধু হাসিমুখে ধীরে ধীরে নেমে আসেন।

দেখতে দেখতে গঙ্গার জল বাড়ে, স্টীমার দোলে। সারেঙ্ জানায়, জোয়ার এসেছে!

সহজ-বুদ্ধিতে সবই বুঝি। গঙ্গায় জোয়ার আসে, ভাটা পড়ে। দৈনন্দিন ঘটনা। তবুও অকারণেই মনের শুষ্ক বেলাভূমিতে একটা অনাবিল আনন্দ-স্রোতের ঢেউ খেলে যায়।

গঙ্গাসাগরের মেলা।

সেদিন যোগের স্নান। বিপুল জনতা।

মেলার একপ্রান্তে দুটি হোগলার ঘরে আমাদের আশ্রম-স্থান। সকালেই স্নানা সেরে মন্দিরে দর্শনাদি হয়েছে। এখন যাত্রীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরছি; ঘুরে ফিরে মন্দিরেও আবার দর্শন করে যাচ্ছি।

সঙ্গে সাধুজি আছেন। তাঁকে সাবধান করে দিয়েছি, দেখবেন, যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। এই ভিড়ে হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাব না।

মনে মনে হাসি পায়। সাধু—সর্বস্ব-ত্যাগী। তাঁরও আবার হারিয়ে যাবার আশঙ্কা করি!

হারালে ক্ষতি নেই জানি। কিন্তু দায়িত্ব আছে—কলকাতায় তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার।

হঠাৎ একটা ভীষণ ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি; প্রকাণ্ড জনতার এক বিপুল স্রোত এসে পড়ল; যাঁরা দল বেঁধে একসঙ্গে যাচ্ছিলেন, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেন। কোনমতে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। সাধুজিকে দেখতে পাই না। একধারে একটু উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিকে তাকাতে থাকি। নজরে পড়ল—ঐ যে! মাথার উপর একরাশ জটার ভার, একটু গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা আছে—যেন সাদা শিবস্থাণ, ছোটখাটো সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকেই খুঁজছেন। কোন রকমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই। কাছে যেতে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে ধরেন। যেন, কতকালের ছাড়াছাড়ি! হেসে বলেন, আর হাত ছাড়ছি না। এমনি করেই দুজনে যাব।

ভাবি, কত দূরে ? কোথায় ?

সাধু বলেন, চল আবার একবার মন্দিরে যাব ; একটু প্রয়োজন আছে।

মন্দিরের কাছে এসে বলেন, না, ওদিকে যাত্রীদের সঙ্গে নয়—ভেতরে যাব।

একটি প্রকাণ্ড চাতালের উপর কপিল ঋষির মূর্তি। যাত্রীরা সকলে সেই চাতালের নীচে সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করছে। ঠিক দাঁড়িয়ে নয়—ঠেলাঠেলির মধ্যে যতটুকু দাঁড়ানো সম্ভব। একটা প্রবহমাণ প্রবল জনস্রোত।

সকালে দর্শনে যখন এলাম, মেজদাদা সঙ্গে ছিলেন। ব্যবস্থা মত পিছন দিক দিয়ে চাতালের উপর উঠে ভালো ভাবে একান্তে নিশ্চিন্ত মনে দর্শনাদি হয়েছিল।

কিন্তু এখন সেখানে প্রবেশ করব কি করে ভাবি। কর্তৃপক্ষের একজনকে সাধুর উদ্দেশ্য জানালাম। কি জানি কেন, পথ ছেড়ে দিলেন, বললেন, দেরি করবেন না, চট করে দর্শন করেই চলে আসবেন।

চাতালের উপর উঠে দাঁড়িয়েছি। নীচে যাত্রীদের উন্মত্ত কলরোল চলেছে। ফল-ফুল ইত্যাদি সবলে নিক্ষেপ করে মূর্তির দিকে ফেলছে। পুষ্প-বৃষ্টি জানি, ফল-বৃষ্টি এই প্রথম দেখলাম। পুরোহিতদের নিষেধ মানে না। অঞ্জলি ও নৈবেদ্যের প্রকাণ্ড স্তূপ জমেছে—মূর্তি প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। দুজন পূজারী সারাক্ষণ সেই সব এক পাশে সরিয়ে ফেলছেন,—আবার দেখতে দেখতে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। অবাক হয়ে দেখছি ভক্তি-বিহ্বল যাত্রীদের সে কি উগ্র ভক্তি-নিবেদন ; মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড নারকেল পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলছে।

কোনরকমে আত্মরক্ষা করে সাধুজিকে বললাম, চলুন, এবার নেমে পড়ি।

তিনি একজন পূজারীকে ইঙ্গিত করে কাছে ডাকলেন, কি বললেন, কোলাহলে তাঁর কথা আমার কানে এল না। শুধু দেখলাম, মাথার জটা-বাঁধা কাপড়টুকু খুলে একটি শিলাখণ্ড বার করে পূজারীর হাতে দিলেন। শিলাটার আকৃতি অনেকটা কৈলাস-শিখরের মত ;—লিঙ্গাকৃতি, মাথার উপরে স্বর্ণাভ, অপর অংশ কৃষ্ণবর্ণ—সর্বাঙ্গে চক্রাকার রেখা।

পুরোহিত শিলাখণ্ডটি নিয়ে মূর্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়ে সেখানেই রেখে দিলেন।

যাত্রীর ভিড় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। পূজারীরা সকলেই তাদের পূজার্চনা নৈবেদ্যাদি নিয়ে শশব্যস্ত।

সাধুজিকে বলি, চলুন, এবার নেমে যাই। আর দাঁড়ালে নারকেলের আঘাতে মাথা ফেটে যাবে।

তিনি আবার সেই পূজারীকে ডাকেন, বলেন, কই ? আমার ওটা ফেরত দিন।

পুরোহিত আশ্চর্য হন। ফেরত ? সে কথা তো বুঝি নি। এখন আর ঐ ছোট্ট শিলাটুকু ওখান থেকে কি করে পাওয়া যাবে ? ওর ওপর যে বিরাট

স্তূপ জমে গেছে।

সাধুর অনেক অনুনয়ে মূর্তির কাছে তিনি ফিরে যান; প্রায় এক কোমর ফুল-ফলের স্তূপের মধ্যে হাতড়াতে থাকেন। এদিকে ফল-ফুলের অবিরাম বৃষ্টি চলেছে। সেখানে দাঁড়ানোই অসম্ভব। তিনি ফিরে আসেন, বলেন, ও আর পাওয়া সম্ভব নয়। উনি এখানেই থাকুন।

সাধুর মুখ ম্লান হয়ে যায়। হাতের মুঠো থেকে আরও একটি শিলাখণ্ড বার করে বলেন, না, তা হবার নয়। রাখতে চান তো এইটে রেখে দিন। ওটা আমার ফেরত চাই-ই। ও যে আমার শিউজি আছেন। নিয়ে আসুন আপনি।

পূজারী অক্ষমতা প্রকাশ করেন, ব্যস্ত হয়ে বলেন, অন্য কাজ রয়েছে আমার, দেখছেন না? আমার কাজ করতে দিন। আপনারা আর দাঁড়াবেন না, মাথায় আঘাত লাগবে—নেমে যান—ও আর পাওয়া যাবে না।—তিনি তাঁর কাজে চলে যান। না গিয়ে উপায়ও নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। কিন্তু, মিথ্যা আশা,—ঐ ছোট্ট শিলাখণ্ডটুকুর উদ্ধারের কোন উপায় বা সম্ভাবনাই দেখি না। সাধুজির হাত ধরি। বলি, চলুন, নেমে যাই।

মুখের পানে তাকিয়ে দেখি, চক্ষুদুটি লাল হয়েছে, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে। কি নিদারুণ করুণ মূর্তি!

একরকম জোর করেই হাত ধরে তাঁকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে এলাম।

তিনি কঠিনকণ্ঠে বললেন, আমার শিউজিকে না নিয়ে আমি যাব না। কৈলাস থেকে নিয়ে এসেছিলাম, গঙ্গাসাগরে স্নান ও স্পর্শ করিয়ে আমার কাছে রাখব বলে। তুমি চলে যাও—আমি ওকে ছাড়ব না।

চমকে উঠি। এ যে শোনা কথা—'আমি ওকে ছাড়ব না, কখনই ছাড়ব না—তোমরা চলে যাও।'

মনে পড়ে, এক নিঃস্ব বিধবার একমাত্র মৃত সন্তানকে তাঁর বাহুপাশ ছিঁড়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলাম,—এ যে সেই আকুল বিলাপ-ধ্বনি!

সাধুর হাতখানি হাতের মধ্যে চেপে ধরি। অনুভব করি, অবরুদ্ধ রোদনে তাঁর সারা অঙ্গ কেঁপে উঠছে।

মনে মনে ভাবি, এতবড় সাধু, সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী, কঠোর তপস্বী—তাঁরও হারাবার ধন আছে, ব্যথা পাবার অন্তর আছে!

কি বোঝাব বুঝি না। তবুও অকরুণ তর্ক তুলি, আপনার শিউজি কি শুধু ঐ শিলাখণ্ডেই আছেন? নাই বা রইল ওটা আপনার কাছে—তাতে দুঃখ করবার কি আছে?

তিনি অশ্রুভরা চোখে আমার পানে তাকাতে থাকেন। সত্যই, দেখে দুঃখ হয়। প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি, বলি, আপনি তো সব কিছু করেছিলেন, মাথায় বয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনিই তো আপনার কাছে রইলেন না।

আমার কি মনে হয় জানেন? শিউজির ইচ্ছা ছিল—আপনি তাঁকে শুধু এখানে পেঁছে দিয়ে যাবেন—হিমালয়ে না থেকে তিনি সাগর-সঙ্গমেই থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে-ইচ্ছা আপনি পূর্ণ করেছেন। তাঁর যদি আবার সাধ যায়, হিমালয়ে ফিরে যেতে—আপনারই কাছে ঠিক তিনি ফিরে যাবেন। এ বিশ্বাস কি আপনি রাখেন না?

তিনি নির্বাক। চোখ দুটি সাক্ষ্য দেয়—অন্তরে কি গভীর বেদনার আলোড়ন চলে।

মেজদাদাকে গিয়ে ঘটনাটি বলি। সাধুজি তাঁকেও করুণভাবে জানান, ওটি আমার ফেরত চাই-ই।

গঙ্গাসাগর ছাড়ার আগে, কর্তৃপক্ষদের মেজদাদা বিশেষ করে অনুরোধ করে এলেন, তাঁরা যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যদি শিলাটির পুনরুদ্ধার হয়।

স্টীমারে ফেরার পথে সাধুজি সারাক্ষণই ধ্যানরত থাকতেন। তাঁর সেই হাসি-ভরা মুখে এক নিদারুণ বেদনার ছায়া দেখতাম।

কলকাতার বাইরে গঙ্গার ধারে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল। স্টীমার সেখানে থামল। প্রণাম করে বিদায় নিলাম, হাত ধরে বললাম, এখনো তো তিন-চার দিন এদিকে থাকবেন, একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে? এর মধ্যে হয়তো গঙ্গাসাগর থেকে খবরও এসে যাবে।

তিনি ম্লান হেসে বলেন, চেষ্টা করব। তুমি চলে এসো কুম্ভকর্ণে।

দুদিন পরেই শিলাখণ্ডটি ফিরে এল।

সাধুজিকে তখনই সানন্দ-সংবাদটি পাঠানো হল।

কিন্তু সংবাদ পেয়েও তিনি আর এলেন না। কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন।

॥ ৮ ॥

ভোর হতেই গোবিন্দ-ঘাট ছাড়লাম। এখান থেকে ঘাংরিয়া সাত মাইল।

ধর্মশালা থেকে বার হয়েই অলকানন্দার উপর পুল। লোহার তারে ঝোলা পুল। সংস্কারের অভাবে অবস্থা শোচনীয়। পায়ের তলায় কাঠগুলি জীর্ণ, কয়েক জায়গায় খসে পড়েও গেছে;—ফাঁক দিয়ে পনেরো-কুড়ি হাত নীচে নদীর উদ্দাম স্রোত চোখে পড়ে, দেখে মাথা ঘোরে। দু'দিকে রেলিং নেই, পুলের দুইদিকের ঝোলা তার ধরে অতি সাবধানে পার হতে হয়। চলার সঙ্গে সঙ্গে পুলও দুলতে থাকে। সতর্কতা আমাদেরই, পাহাড়ীরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে পার হয়। প্রকাণ্ড বোঝা নিয়েও। অভ্যাসে সবই হয়।

পুল পার হয়ে খানিকটা চড়াই। Zigzag করে পথ উঠেছে। কুলীরা পাক-দণ্ডী অর্থাৎ 'শর্ট-কাট্' করে দেখতে দেখতে উঠে যায়। আমরা পথ ধরেই চলি, কেননা জানি, অনভ্যস্ত চরণে পাকদণ্ডী দিয়ে ওঠায় অযথা ক্লান্তি বোধ হয়।

যেটুকু সময় বাঁচে, পাকদণ্ডী-শেষে দম নিতে সে-সময় নিঃশেষ হয়।

চড়াই-এর উপর থেকে নীচে অলকানন্দা ও ভুন্দর নদীর সঙ্গম সুন্দর দেখায়। দূরে অলকানন্দার অপর পারে বদরীনাথের যাত্রাপথ। পাহাড়ের গায়ে কে যেন সরল রেখা এঁকে গেছে। তারই উপর সচল যাত্রীর দল। দলে দলে চলেছে—যেন পিপীলিকা-সারি।

চড়াই-শেষে সোজা পথ। দেখতে সোজা হলেও ধীরে ধীরে পথ উঠেছে—চলার মধ্যে ধরা পড়ে। তবে, চলার কষ্ট নেই। নতুন তৈরি প্রশস্ত পথ। ভয়েরও কোন কারণ নেই।

দুই মাইল এসে একটি গ্রাম।

বেলা হয়ে গেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। সকালের সোনালী রোদে বনস্থল ঝলমল করে।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। গ্রামের নাম পুণগাঁও। শিশিরবাবু মন্তব্য করেন, নিশ্চয় পুণ্য গ্রাম। গ্রামের মধ্যখানে পথের-বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বর। তার চারিদিকে- পথের দুইপাশে—সারি সারি বাড়ি। অথচ, কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নেই। ঘুমন্ত পুরী। একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকে না, মুরগী পর্যন্ত ঘোরে না।

শিশিরবাবু বলেন, দু'দিন বৃষ্টির পর আরামে বোধ হয় সব ঘুমুচ্ছে।

আশ্চর্য লাগে। একটা লোকেরও দেখা নেই। একটা ছোট ছেলেও কাঁদে না!

এ কি! দরজায় যে সব বাইরে থেকে শিকল টানা!

সঙ্গের পাহাড়ী সঙ্গী সমস্যার সমাধান করে। বলে, এ গ্রামে এখন কেউ নেই। চার মাইল উপরে আর একটা গ্রাম আছে, পথেই পড়ে। এখন গ্রামসুদ্ধ সবাই সেখানে আছে। দিন কয়েক পরে আর একটু শীত পড়লে আবার সবাই এখানে নেমে আসবে। তখন ওপরের গ্রামের ঘর-বাড়ি সব বন্ধ থাকবে। গ্রাম দুটি, কিন্তু গ্রামবাসী এক। একটা গ্রীষ্মাবাস, অপরটি শীতাবাস।

বেশ লাগে। মানুষ নেই, অথচ মানুষের ছেড়ে-যাওয়া সব জিনিসপত্র। ঘর-বাড়ি, উঠানে ধান-ভানার উদুখল, ঘরের চালে লতার জালি—বড় বড় লাউ, কুমড়া, ক্ষেতে ফসল,—আলুর চাষ। গাছে শিম ঝুলছে, লেবু গাছে ফল ধরেছে। জন মানবের সাড়া নেই, অথচ চারিদিকেই জীবন্ত মানুষের সাক্ষ্য। তার আহারের আয়োজন, বসবাসের ব্যবস্থা।

হঠাৎ নজরে পড়ে, উঠানের এক কোণে চটা-ওঠা ভাঙা ছোট একটি রঙীন কাঠের খেলনা। ধূলি-মলিন অবহেলিত।

নগণ্য নির্জীব। তবুও মনের পটে কি জীবন্ত ছবি-ই না আঁকে।

মনে পড়ে, ক'দিন আগেকার এক ছবি।

সাঁওতাল পরগণা। ছুটির দিনগুলি কাটাচ্ছি। দুপুর বেলা। অলস

অবসর। আহার শেষে নিশ্চিন্ত আরামে ঘরে এসে বসেছি। বাড়ির ছোট্ট নাতিটি সবে হামা ছেড়ে হাঁটতে শিখেছে। টল্‌মল্‌ করে চলে। চলায় আনন্দ পায়। হাসির ঝলকে আনন্দ উথলে পড়ে। টলতে টলতে এসে দাঁড়ায়। ছোট টেবিল থেকে বই টেনে ফেলে। দোয়াত-কলম ধরতে চায়। হেসে বারণ করলে জল-ভরা গেলাসের উপর নজর পড়ে। থপ্‌ করে ধরে টেনে ফেলে দেয়। জলে ভিজে তার পায়ের লাল জুতা গাঢ় লাল হয়ে ওঠে। ভিজা জুতা পা থেকে খুলে তাকে কোলে তুলে নিই। জানালার কাছে নিয়ে দাঁড়াই। বাইরে বাগানে রঙ্‌-বেরঙের ফুল দেখাই। অমনি বাইরে যাওয়ার বায়না ধরে। ফুল, ফুল, ফুল—চাই। বিছানায় বসিয়ে বই-এর ছবি দেখাই। গল্প করি,—'নদী, গাছ, পাখী, পাহাড়, বরফ—তুমি চলেছ ঘোড়ায় চড়ে—টগবগ করে, আমি চলেছি পায়ে হেঁটে—লাঠি হাতে—চলেছি, চলেছি—অ-নে-ক দূ-র—'

মুখের পানে তাকিয়ে অবাক হয় শোনে। চোখের পাতা কাঁপতে থাকে—ধীরে ধীরে চোখ ভরে ঘুম নামে। তন্দ্রা-কাতর শান্ত ক্ষুদ্র দেহখানি শয্যা'পরে এলিয়ে পড়ে।

কিছু পরে তার মা এসে কোলে তুলে নিয়ে যান।

একা চুপ করে শুয়ে আছি। হঠাৎ নজর পড়ে তার ফেলে যাওয়া জুতাটির উপর। ছোট লাল 'জুতুয়া'। কচি কচি পা থেকে খুলে ফেলা। সেই টল্‌মল্‌ চলা। ফেলা-ভাঙা চপলতা। খিলখিল হাসি। শিশুর সৌরভ।

সেই সামান্য শূন্য নিদর্শনের মধ্যে নিস্তব্ধ গৃহখানি যেন আবার প্রাণময় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আজ প্রভাতে বিরাট হিমালয়ে পরিত্যক্ত গ্রামের একটি নগণ্য ক্রীড়নকও তেমনি প্রাণ-চঞ্চল মুখর হয়ে উঠল।

গ্রাম ছেড়ে পথ এগিয়ে চলে। কখনো পাহাড়ের কিছু উপর দিয়ে, কখনো বা নদীর ধার ধরে, কখনো বা ছায়াশীতল বনের মধ্য দিয়ে। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট লতানো গাছে স্ট্রবেরি ফলেছে। লাল রঙের ছোট্ট ছোট্ট ফল। তুলে সংগ্রহ করি—সঙ্গীদের দিই, নিজেও খাই। অম্লমধুর। অল্পরস। তবুও, পথ-ক্লান্ত পথিকের রসনায় অমৃতের আস্বাদ আনে।

নির্ঝরিণীর উপকূলে বিচিত্র উপলখন্ড। সম্মুখে সুদূরে আকাশের তুষার-ধবল গিরিশিখর। নদীর দুই তীরেই আকাশ-চুম্বী গিরিশ্রেণী। পাহাড়ের মাথা থেকে বিক্ষিপ্ত পাথরের সোপান বেয়ে মাঝে মাঝে ঝরনা নেমেছে, ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিলিত হতে।

চার মাইল এসে আবার একটি গ্রাম। ভুন্দর নাম।

গ্রামে প্রবেশ করবার পূর্বেই লোকালয়ের পরিচয় পেলাম।

প্রকান্ড ভুটিয়া কুকুর তারস্বরে আতঙ্কময় অভ্যর্থনা জানাল। পাহাড়ী

ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে পথের পাশে গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়াল। সকৌতুক, সলজ্জ দৃষ্টি। সারা পৃথিবীর সমগ্র শিশু জাতির সেই চিরন্তন স্বভাব-সুলভ কৌতূহল।

গ্রামের ভিতর পথ অতীব অপরিচ্ছন্ন, বিকট দুর্গন্ধে ভরা। গত দু'দিন বৃষ্টির ফলে পথের কাদায় ও মানুষের পরিত্যক্ত আবর্জনায় নরককুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির চারিদিকের এত অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে মূর্তিমান অসুন্দর।

হিমালয়ের শুধু এই গ্রামখানিরই এই বিকৃত পরিচয় নয়। পাহাড়ী গ্রাম মাত্রেই সাধারণত অতীব অপরিচ্ছন্ন। প্রতি গ্রামে প্রবেশ করেই দুঃস্থ গ্রাম-বাসীদের দুর্বহ জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখে যেমন মনে দুঃখ জাগে, তেমনি চোখে ঠেকে তাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মজ্জাগত অপরিচ্ছন্নতা। সাধারণত পাহাড়ীদের সুশ্রী চেহারা। কিন্তু সারা অঙ্গে নোংরা-মাখানো। ছোট ছেলেমেয়েগুলির চোখ-ভরা পিচুটি জমে আছে, নাক বেয়ে ধারা নেমে আসছে। তবুও তারই মধ্যে নজরে পড়ে টুকটুকে লাল ফোলা ফোলা গাল—যেন কাদা-মাখা ডালিম ফল।

বেশভূষা—যত স্বল্পই হোক না কেন—অত্যন্ত মলিন। যেমন শরীরের তেমনি বেশভূষারও জলের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক। স্নান করা—একটা বিশেষ অনুষ্ঠান-পর্ব। অনেক জায়গায়—বিশেষতঃ যেখানে শীত বেশী—কল্পনার অতীত।

বেশ মনে পড়ে, সে-বছর কৈলাস-মানস-সরোবর থেকে ফেরার পথে তিব্বতে তাক্‌লাকোট গ্রামে এসে পৌঁছেছি। গাঢ় নীল আকাশ ভরে চনচনে রোদ উঠেছে। তবুও কনকনে হাওয়া বইছে। ক'দিন তিব্বতের নিদারুণ শীতে—এক মানস-সরোবর ছাড়া—আর কোথাও স্নান করা হয় নি। রোদের উত্তাপ দেখে রোদে বসে ভালো করে তেল মাখলাম; ঝরনার অতি শীতল জলে স্নান শুরু করলাম।

আমাদের স্নান দেখতে চারিদিকে তিব্বতীদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! যেন শ্রীক্ষেত্রে স্নান-যাত্রা দর্শনের সমারোহ। আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে, এমনি অবাক হয়ে দেখে, মনে হয়, ভাবে,—এরা করে কী!

সে তো শীত-প্রধান দেশে স্নানের কথা। জল-আতঙ্ক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু, এই গ্রামবাসীদের অপরিচ্ছন্ন জীবন-যাত্রার কারণ, প্রকৃত শিক্ষার অভাব। অর্থের অনটন এর মূলগত হেতু নয়। অপরিচ্ছন্ন ধনীও দেখেছি, আবার দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভব দেখেছি। নির্ধন সাঁওতালদের গ্রামগুলি তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এখানেও হিমালয়ে তার প্রমাণ পাই, সর্বত্যাগী শিক্ষিত ব্রহ্মচারী বা সাধু-সন্ন্যাসীর ক্ষুদ্র কুটিরে। ঘরের মেঝেতে ধুলা জমে

নেই ; সামান্য অঙ্গাবরণ, একটি কমণ্ডলু, লোটা, কম্বল—ঘরের মাঝখানে ধুনি —সবই নির্মল, পরিচ্ছন্ন। নিত্যস্নাত তনুও স্নিগ্ধোজ্জ্বল। দেবতার মন্দিরের মধ্যেও তো দেখেছি জল-ধৌত মার্জিত বিশুদ্ধ পরিবেশ, মানুষেরই যত্নে ও প্রচেষ্টায়। অথচ, মন্দিরের বাহিরেই সেই মানুষেরই আবাস-গৃহে কি জাল-জঞ্জাল-ভরা কলুষ মূর্তি! যেন মানুষের গৃহে দেবতার স্থান নেই, মানুষের দেহে দেবতার মন্দির নেই!

হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গ্রামগুলির এই অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্নতা মনকে পীড়া দেয়।

আজ সকালে কিন্তু এই গ্রামে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া অনুভব করলাম। কেউ কথা বলে না, প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না। কেমন যেন থমথমে ভাব। আশ্চর্য! এমন তো আর কোথাও দেখি নি!

পাহাড়ী সঙ্গীদের কাছে কারণ জানলাম। কাল রাত্রে তাদের এক বার্ষিক উৎসব গেছে। সারারাত্রি নাচ-গান-মাতন হয়েছে, এখনও তার জের চলেছে।

এখন বুঝতে পারলাম, পথের পাশেই একটা ঘর থেকে কেন এত লোক বেরুচ্ছে মুখ মুছতে মুছতে!—স্খলিত চরণে, রক্তচক্ষু নিয়ে।

ভুন্দর এই পথের শেষ গ্রাম। গ্রামের কিছু নীচে, যাবার পথে, ডান দিকে আর একটি পার্বত্য নদী, ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিশেছে। সেই নদীর উপত্যকার শেষদিকে বরফ-ঢাকা উঁচু পাহাড়ের চূড়া চোখে পড়ে। ২২,০৭০ ফুট। নাম, হাতী-পর্বত। হাতী মেলে না, হাতীর আকৃতির সঙ্গে পাহাড়টির সাদৃশ্য বলে প্রসিদ্ধি আছে।

ভুন্দর গ্রাম থেকে ঘাংরিয়া এক মাইল।

কিছু দূর নদীর ধার দিয়ে পথ। এই পথে পরের বছর জুন মাসে এক জায়গায় অনেকখানি বরফ পড়ে ছিল। শীতকালে পড়া বরফ; কখনো বা পাহাড়ের উপর থেকে জমা-বরফের এক-একটা স্তূপ নীচে উপত্যকায় গড়িয়ে নেমে আসে, তুষার-আবরণ দিয়ে পথ ঢেকে রাখে এবং সূর্য-কিরণের খরতাপ যেখানে কম লাগে সেখানে শীতের পরও অনেকদিন জমেও থাকে। তার পর বর্ষা নামে ও ক্রমে ক্রমে বর্ষার পর নিম্ন প্রদেশের এইসব বরফ গলে নিশ্চিহ্ন হয়।

গ্রাম ছেড়ে আসার মাইল খানেকের মধ্যে ছোট এক পুলে ভুন্দর নদী পার হতে হয়। পুল অর্থে—দুটি লম্বা পাইন গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি শুইয়ে রেখে দুই পাড়ের সংযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্ষায় এসব পুল ভেসে যায়। পুলের হাত তিন-চার নীচে নদীর দুরন্ত স্রোত প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয়, যেন যাবার পথে সহস্র তরঙ্গের বাহু তুলে আহ্বান করে।

পুল পার হয়ে অল্প গিয়ে চড়াই শুরু। সঙ্গী পাহাড়ী বলে, আর এক মাইল পথ। এই পেঁছে গেলাম। কিন্তু চড়াই-এর পথ যেন শেষ হতে চায় না। প্রতিবারেই পাহাড়ের বাঁক ঘুরে মনে হয় এইবার হয়তো দেখব যাত্রা-শেষের আশ্রয়স্থল। কিন্তু কোথায় বাংলো? ঘুরে ঘুরে পথই চলেছে—এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেই চলছে। মন ডুবে যায় প্রকৃতির রূপ-তরঙ্গে। চারিদিকে বড় ছোট নানান্ ফুলের গাছ। নানান্ রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। নদীর অপর পারে পাহাড়ের মাথায় বরফ-ঢাকা; কোথাও-বা জল-প্রপাত নামছে—জলকণার ওড়না উড়িয়ে, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনির ঝংকার তুলে।

ঘাংরিয়া পেঁছুবার আগে পথের শেষভাগে এক নিবিড় অরণ্য। চতুর্দিকে বিশাল বনস্পতি। অতিবৃদ্ধ বৃক্ষ সব। আদিম অরণ্যানী। যেন, উদ্ভিদ-জগতে প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজ করছে। বিরাট-দেহ তরুশ্রেণী। বিপুল-বিস্তীর্ণ শাখা-বহুল। অঙ্গ-ভরা প্রাচীনতার চিহ্ন। শুষ্ক শৈবালে আকীর্ণ। বার্দ্ধক্য-জীর্ণ বল্কল। কোথাও চারিদিকে ঝুরি নেমেছে; ডালে ডালে লতানো গাছে জাল বুনেছে। যেন চারিপাশে মহা-স্থবির ঋষিগণ ধ্যানে বসেছেন। শুষ্ক লোল চর্ম। জটাজুটধারী। স্থানীয় পাহাড়ীদের বিশ্বাস—এঁরা সত্যই বৃক্ষরূপী প্রাচীন মহর্ষি। এঁদের যুগ-যুগান্তর তপস্যা অনন্তকাল-ব্যাপী।

পথ চলতে কোথাও বা দেখি উৎপাটিত-মূল পতনোন্মুখ বিরাট এক বৃক্ষ। সঙ্গী গাছগুলি তাকে হেলানো অবস্থায় যত্নভরে বুকে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে—যেন বন্ধুর কোলে অন্তিম শয্যা রচিত হয়েছে। অনুভব করি, চারিদিকে যেন শুষ্ক অথচ সুন্দর মরণের সস্নেহ স্পর্শ।

হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশের অরণ্যগুলির সঙ্গে প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে এই সব অঞ্চলের অরণ্যের বিশেষ পার্থক্য আছে।

নীচের জঙ্গলগুলিতেও প্রকাণ্ড গাছ আছে—নিবিড় অরণ্যের ভয়াবহ অন্ধকারও আছে। কিন্তু, সে সব বন সজীব, প্রাণময়, চঞ্চল, মুখর। সেখানে উজ্জ্বল সবুজের স্নিগ্ধতা—যৌবনের দীপ্তি। চারিদিকে গিরি-নির্ঝরিণীর উচ্ছ্বলিত জল-কল্লোল। গাছে গাছে শাখে শাখে বিচিত্র রঙের পাখীর সুমধুর কাকলী। পাতায় পাতায় বাতাসে মর্মর-ধ্বনি তোলে। বনের পশু আচম্বিতে ছুটে যায়,—দূরে উচ্চ রব তোলে, বনস্থল কেঁপে ওঠে। সারাক্ষণই ঝিল্লিরবের একটানা সকম্পন গুঞ্জরণ। প্রাণ-চঞ্চল বনানী। প্রফুল্ল সজীবতা।

হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশের এই সব অরণ্যের, কিন্তু, সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এখানে প্রথমেই চোখে পড়ে চারিদিকের অতি-বিশুষ্ক বিরস রূপ। সবুজের সজীবতা নেই,—জীবনের চঞ্চলতা নেই। চারিদিক নীরব, নিস্পন্দ। ঝরনার

কলধ্বনি নেই—সারা অরণ্য জলহীন, রুক্ষ, শুষ্ক। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের কোন নিদর্শন নেই, তাই প্রাণের চঞ্চলতাও নেই। বাতাসও স্তব্ধ হয়ে আছে—তাই মর্মর-ধ্বনিও নেই। এক বিরাট নিস্তব্ধতা সারা বনস্থলটিকে যেন পরিপূর্ণ ভরাট করে রেখেছে। চলতে গিয়ে নিজের পদধ্বনিতে নিজেই চমকে উঠি। প্রচণ্ড কোলাহলে যেমন কানে তালা লাগে, এই নিস্তব্ধতাও ঠিক তেমনি কানে বধিরতার ভাব জাগায়। অনাদি কালের আদিম অরণ্যানী—শব্দ নেই, ভাষা নেই, বর্ণের বৈচিত্র্য নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই। জীবনোত্তর লোকে মহা-স্থবির সন্ন্যাসীর বিভূতি-বিভূষিত ঊষর কান্তি। ধ্যানস্তিমিত, নিশ্চল, নীরব মূর্তি।

মনে হয়, তুচ্ছ জীবন-মৃত্যুর পরপারে অনন্ত কালের এক মহা অরণ্যরাজ্যে এসে পেঁছেছে এক অতি-ক্ষুদ্র নগণ্য মানব-শিশু।

॥ ৯ ॥

ঘাংরিয়া।

জায়গার নাম। লোকালয় নয়। বনের এক প্রান্তে বড় বড় কয়েকটা গাছ কেটে খানিকটা খোলা জায়গা। মাটির বুকে কাটা-গাছের গুঁড়ির অংশগুলি যেন অস্ফুট বেদনায় মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়।

অতি সুন্দর একটি নতুন বাংলো। বন-বিভাগের বিশ্রাম-কুঠি, রেস্ট-হাউস।

পাথরের বাড়ি। কাঠের মেঝে। স্লেট ও করোগেটের ছাদ। কাঁচের জানালা। দুইটি ঘর। ঘরের ভিতর চেয়ার, টেবিল, খাট—আগুন-জ্বালাবার আয়োজনও। পাশেই স্নানাগার।

ঘাংরিয়ায় পেঁছেই অমরনাথের সঙ্গে দেখা। এই প্রথম পরিচয়। Forest Officer—সরকারী পরিদর্শনে এসেছে। আমাদের একটু আগেই পেঁছেছে। সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। যেন কতকালের জানাশুনা। এমনি অনাবিল আনন্দ। বলে, চলে আসুন। এই বাংলোতেই থাকবেন। একটা ঘর আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি। আমি পাশের ঘরেতে থাকব। ধর্মশালায় থাকা আপনাদের চলবে না—অতি অপরিষ্কার। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারও। দিনের বেলায় রোদ যায় না। এখানে রোদ-পোয়ানোর আরাম আছে।

চাপরাসীকে দিয়ে বাংলোর বাইরে খোলা জায়গায় চেয়ার বার করিয়ে দেয়। চা তৈরি করে আনায়। রৌদ্রে বসে চা-পান করি। ভাণ্ডারী শিশিরবাবু তাঁর বাড়ি থেকে আনা নিমকি, গজা ঝুলি থেকে বার করেন, সবাইকে বিতরণ করেন, তারপর নিজে কামড় দিয়ে বলেন, এখনও কেমন মুচমুচে রয়েছে দেখুন।

হেসে বলি, শুধু মুচমুচে কেন? স্বাদে সুদূর বাংলার স্মৃতি জাগায়।

অমরনাথ জানায়, ভাগ্যে সে এসেছিল—তাই চৌকিদারও নীচে গ্রাম

থেকে তার সঙ্গে এসেছে, এখানে কেউ থাকে না। এইসব বন-বিভাগের বাংলোতে থাকতে হলে পৌড়ী থেকে* কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ District Forest Officer-এর অনুমতির প্রয়োজন হয়। তারপর হেসে বলে, অবশ্য স্থানীয় চৌকিদারের সঙ্গে কেউ যদি বিশেষ ব্যবস্থা করে ব্যবহার করে তো স্বতন্ত্র কথা। এ-বাড়ি মাত্র দিন দশ-বারো হল শেষ হয়েছে। এই প্রথম আমরা এখানে বাস করছি। গৃহ-প্রবেশ বলতে পারেন। আপনারা এলেন, ভালোই হল। দল বেঁধে আনন্দ উপভোগ করা যাবে।

বনে-জঙ্গলে কর্তব্যের তাড়নায় তাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। তাই পথের পথিককে ক্ষণিকের সঙ্গী ভাবে পেলেও আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধে ফেলে।

ঘাংরিয়া উঁচু জায়গা। ১০,০৮৪ ফুট। তাই রৌদ্রের উগ্রতা নেই। স্নিগ্ধ, মনোরম। চারিদিকের অতি-শীতল আবহাওয়ার আবরণ ভেদ করে সূর্যের যে রশ্মিটুকু নেমে আসে শীতকাতর অঙ্গে তা সত্যই আরাম-প্রদ।

বাংলোর সামনে বসে দুইদিকের গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের একটি চূড়া দেখা যায়। ম্যাপ খুলে নাম পাই—বামনি ধর্—Bamani Dhaur. ঐদিকেই Valley of Flowers-এর পথ। ভুন্দর নদীর উপত্যকা ধরে। বাংলো থেকে নদী দেখা যায় না। কিছু নীচেও বটে, জঙ্গলের গাছেও দৃষ্টি রোধ করে। কিন্তু জলস্রোতের নিরন্তর শব্দ ভেসে আসে।

বিকেল বেলা। একটি যুবক এল। কোট-প্যাণ্ট পরা। সঙ্গে এক পাহাড়ী, তার পিঠে একটা বেতের ঝুড়ি। Valley of Flowers দেখে ফিরছে। ঝুড়ি-ভরা একরাশ ফুল সংগ্রহ করে এনেছে। বলে, ফুল ঝরে গেছে অনেক, গত দু'দিন বৃষ্টির ফলে। এখন মাত্র প্রায় চল্লিশ রকম ফুল দেখতে পেলাম।

হেসে বলি, আর সেগুলি ঝুড়ি ভরে তুলে নিয়ে এলে? আমরা এখানে বসে Basket of Flowers দেখব বলে?

সে লজ্জিত হয়। বলে, ফুল না তোলা ভালো—ঠিকই। কিন্তু, আমার প্রয়োজন আছে। তবে, এই কয়টি মাত্র ফুল সেখান থেকে তুলে আনা কিছুই নয়। যেন, সাগর থেকে এক ফোঁটা জল তোলা, অথবা এই হিমালয় থেকে একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নেওয়া। দেখবেন গিয়ে সেখানে কত রকম ফুলের কত রঙের বাহার।

নবাগতের সঙ্গে পরিচয় হয়। নাম বিপুলানন্দ। গাড়োয়াল শ্রীনগরে বাড়ি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বটানি-তে এম. এস্-সি. পাস করেছে। এখন এই ভুন্দর-ভ্যালির ফুল সম্বন্ধে গবেষণা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসা।

বলে, বিদেশ থেকে সাহেবরা এসে এখানকার ফুল সম্বন্ধে বই লিখছেন, কত

---

* আজকাল নতুন জেলার নাম চামোলী। তাই অনুমতি-পত্রও নিতে হয় চামোলীর দপ্তর থেকে।

তথ্য আহরণ করছেন ; তা করছেন তাঁরা করুন, কিন্তু আমরা করি না কেন ? অথচ, এরই তো কত কাছে আমরা থাকি। চলুন, এবার ফেরবার পথে শ্রীনগরে আমাদের বাড়িতে ক'দিন কাটিয়ে যাবেন। আমার বাবা রিটায়ার্ড ফরেস্ট অফিসার, সেখানে আছেন। ভালো লাগবে আপনাদের।

তার শ্রীনগরের বাড়ির বর্ণনা শুনে তখনই চিনতে পারি। শিশিরবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, শহরের এলাকার বাইরের পাহাড়ের ওপর সাদা দোতলা বাড়িটা তো ? সামনে দুদিকে সবুজ-রঙের রেলিঙ্ ঘেরা বারান্দা আছে ? বহুদূর থেকে বাস-এ বসেও সকলেরই চোখে পড়ে। আমরা আসার সময় বলছিলাম—কি চমৎকার জায়গায় সুন্দর বাড়িটি! ভালোই তো,—কাটিয়ে যাব তোমাদের সঙ্গে ক'দিন। কিন্তু, এখন আপাততঃ তুমি তো এসে থাক আমাদের ঘরেতে। আর একসঙ্গে যখন হওয়াই গেল, চলো আমাদের সঙ্গে আবার Valley of Flowers-এ, লোকপালে—লোকপাল তো তোমাদের এখনও দেখা হয় নি ?

বিপুল আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়। তার ঝুড়ি নিয়ে আমাদের ঘরটিতে আশ্রয় নেয়। একই সঙ্গে সকলের আহারের আয়োজন হয়।

অমরনাথ চৌকিদারকে ডাকে। বলে, তোমাকে তো একবার এখনি গ্রামে যেতে হবে দেখছি। যে তিনদিন আমরা এখানে আছি, গ্রাম থেকে একটা লোক যেন রোজ দুধ দিয়ে যায়। আলুও কম পড়তে পারে দেখছি, কিছু এনে রাখা ভালো।

শিশিরবাবু বলেন, আলু আমরা সঙ্গে এনেছি। মিল্ক পাউডারও আছে।

অমরনাথ জানায়, আপনাদের আলু, আটা, ঘি—সব খুলে রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে আনা সামগ্রীও আছে। কিন্তু, এখন লোক-সংখ্যায় বেড়েছি—আরও কিছু আনিয়ে রাখা ভালো। টাটকা দুধেরও যখন সেই সঙ্গে ব্যবস্থা হতে পারে—তাও করিয়ে নেওয়া যাক। কাল চৌকিদার আমাদের সঙ্গে Valley of Flowers-এ যাবে, তাই আজই গিয়ে কাজ সেরে আসুক।

চিন্তিত হয়ে বলি, এতখানি চড়াই-উৎরাই-এর পথ—গ্রামে গিয়ে ফিরতে যে ওর সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে আসা, দরকার কি ? এখন তো ব্যবস্থা হয়েছে,—কাল পরশু না হয় দেখা যাবে।

অমরনাথ হেসে ওঠে। বলে, এটুকু পথ ওদের কাছে কিছুই নয়—চড়াই-উৎরাই করতেও ওরা কাবু হয় না। জঙ্গল দিয়ে আসতে জানোয়ারের ভয়ও ওদের বিশেষ নেই—হাতে একটা লাঠি থাকলেই হল। অন্ধকারের জন্যে অবশ্য একটা লণ্ঠন দিতে হবে।

শিশিরবাবু বলে ওঠেন, লোকগুলির তো আশ্চর্য রকম সাহস ও শক্তি!

অমরনাথ হাসতে হাসতে বলে, আশ্চর্য বটে! তবে সাহসের পরিচয় পাবেন এখনি।

চৌকিদারের সঙ্গে অমরনাথের কথা হতে থাকে। প্রস্তাব শুনে পথের দুর্গমতার কোন কথাই চৌকিদার তোলে না, হিংস্র জন্তুরও উল্লেখ করে না, শুধু আপত্তি জানায় এক কারণে—ফিরতে অন্ধকার হলে ভূতের ভয় আছে।

অমরনাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, দেখলেন তো, এদের সাহসের দৌড়? এখন এ-ভয় ভাঙবে কি করে? লাঠিতেও ভাঙবে না, লণ্ঠনেও দূর হবে না—যুক্তি-তর্কতে তো ঘুচবেই না। এ-ভয় যে এদের মজ্জাগত সংস্কার। দেবতাতেও যেমন অটুট ভক্তি ও বিশ্বাস, ভূত-প্রেত-অপদেবতাতেও তেমনি নিদারুণ ভয়। দেখেন নি? গ্রামে গ্রামে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় যেমন দেব-দেবীর মন্দির উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে অপদেবতাদের পরিতুষ্টির জন্যে গাছের ডালে নিশান উড়ছে, ছেঁড়া-কাপড়ের টুকরো ঝুলছে, পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে ছোট ছোট স্তূপ গড়েছে।

চৌকিদারকে অবশেষে যেতে রাজী হতে হয়। ভূতের ভয়ের চেয়ে, বোধ করি, তার সরকারী অফিসারের ভয় আরও বেশী। তবে, তার সঙ্গে আরও অন্ততঃ একজনকে যেতে হবে।

রাম-নাম অগতির গতি। কিন্তু বাস্তব জগতের ভীরু নির্বোধ মানুষের কাছে মানুষের সঙ্গ মনে সাহস সঞ্চার করে।

শিশিরবাবু অমরনাথকে বলেন, দুজনে যাচ্ছে, যাক্। কিন্তু সাবধান করে দিন—যেন সহজ অবস্থায় ফেরে, গ্রামে যা মত্ত হাওয়ার গন্ধ পেয়ে এলাম!

অমরনাথ উত্তর দেয়, সতর্ক করেও লাভ নেই। ও স্বভাব কি আর নিষেধ করে আটকানো যায়? সুযোগ পেলেই খাবে,—এই শীতে না খেয়েও ওদের উপায় নেই, তবে সহজে মাতাল ওরা হয় না—এই ভরসা।

বাংলোর পাশেই বন। বিপুল জানায়, এর মধ্যে Himalayan Silver Fir, Spruce, Yew, Maple ও Cedar গাছই বেশী।

বনের মধ্যে দু'টি ধর্মশালা। একটি কালীকমলি-ক্ষেত্রের, অপরটি শিখেদের। আমাদের সঙ্গের লোকজনেরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গল থেকে গাছের বড় বড় ডাল কেটে এনেছে। আগুন জ্বেলেছে। রান্নার কাজ চলেছে, শীত-নিবারণের ব্যবস্থাও হয়েছে।

ধর্মশালার অল্প দূরে বনের শেষে উন্মুক্ত প্রান্তর। তারই উপর দিয়ে নৃত্যভঙ্গে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণকায়া পার্বত্য নির্ঝরিণী। তুষারশীতল জলধারা। সুনির্মল।

প্রান্তরের কোন এক প্রান্তে ভেড়া-ছাগল চরছে। দৃষ্টি-পথে আসে না, সচল জীবগুলির গলায় বাঁধা ঘণ্টার ধ্বনি শ্রুতিপথে জানিয়ে যায়। নীচের গ্রাম থেকে পাহাড়ীরা এখানে চরাতে আসে। গরমের কয়মাস থাকে।

অমরনাথ বিপুলের কাছে সংবাদ নেয়, ওপরে ডালিতে ভেড়া-ছাগলের দল

দেখলেন নাকি ?

বিপুল জানায়, না। সেদিকে দেখি নি।

অমরনাথ মন্তব্য করে, তাহলে ঠিক আছে। কয়বছর থেকে ঐ অঞ্চলে চরানো নিষেধ হয়েছে—ফুলগুলি সব নষ্ট হয়ে যায় বলে। চারিদিকে নোংরাও হয়। প্রতি দলে ভেড়া-ছাগল কম থাকে না—হাজার খানেকের ওপর হবে। এক এক অঞ্চলের সব গ্রামগুলির পশুগুলিকে একসঙ্গে চালিয়ে গ্রামের কয়েকজন নিয়ে আসে। পাহারা দেবার জন্যে সঙ্গে থাকে প্রকাণ্ড বড় বড় ভুটিয়া কুকুর। ভীষণ আকৃতি। গলায় ঘণ্টা বাঁধা। পাহাড়ের নিম্ন প্রদেশে যখন গ্রীষ্মকাল —পাহাড়ের মাথার উপর এই সব স্থানে তখনও বেশ শীত এবং সবুজ কচি ঘাসে ভরা। পাহাড়ের অতি উচ্চে এই ধরনের অঞ্চলকে বলে 'বুগিয়াল্'।

শিশিরবাবু প্রশ্ন করেন, যারা চরাতে আসে তারা থাকে কোথায়, খায় কি ?

অমরনাথ বলে, তাদের অতি কঠোর জীবন। তবুও সানন্দে বহন করে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস; কোথাও বা পাথর সাজিয়ে ছোট্ট একটি ঘর তোলে। পরনে মোটা কম্বলের আলখাল্লা—ঐ সব ভেড়া-ছাগলের লোম থেকে নিজের হাতেই বোনা। খাদ্যের মধ্যে গ্রাম থেকে সঙ্গে আনা আটা ও ক্ষেতের আলু। কদাচিৎ কখনো হরিণ মারতে পারলে কয়দিন ভূরিভোজের আনন্দ-লাভ করে। জীবন-যাপনের জন্য স্বল্পই তাদের প্রয়োজন, তাই অল্পই তাদের আয়োজন। যেটুকু আছে তাতেই পরিতুষ্ট, যা নেই, তার জন্যে অভাব বোধ করে না, অভিযোগও করে না।

অমরনাথ হঠাৎ হাতের ঘড়ি দেখে। বলে, আমি কিন্তু এখন অভিযোগ করছি—চা খাবার সময় হয়ে গেছে।

অতএব, বাংলোয় ফিরি। অমরনাথ চায়ের ব্যবস্থা করে। বলে, আপনাদের আনা দার্জিলিং-এর চা এখন থাক। পরে খাওয়া যাবে। এখন এখানকার স্থানীয় চা খান।

জিজ্ঞাসা করি, কই, এখানে তো কোথাও চা-বাগান দেখি নি, আছে বলেও তো শুনি নি ?

সে বলে, চা-বাগানের চা নয়। এখানে জঙ্গলে এক রকম বড় গাছ হয়। থুনির। তারি শুকনো ছাল। গরম জলে দিলে চা-এর মত রঙ হয়, কষা-কষা স্বাদও হয়, একটু সুগন্ধ আছে। এখানকার পাহাড়ীরা চা বলে তাই ব্যবহার করে।

দুধ চিনি দিয়ে সেই চা-ই তৈরি হয়। মুখে দিয়ে দেখি, বিচিত্র আস্বাদ! অভাবে কেমন লাগে জানি না। অভ্যাসে যে-স্বাদের সঙ্গে পরিচয়, আবার গরম জল আনিয়ে সেই দার্জিলিং-চায়েরই ব্যবস্থা হয়।

ঘরের মধ্যে বিপুল বাতি জেলে মেঝেতে বসেছে। চারিদিকে ছড়ানো

ফুল। ঝুড়ি থেকে নামিয়ে সাজিয়েছে। সামনে খানকয়েক Illustrated Weekly-র মত বৃহৎ আয়তন পুরনো পত্রিকা। একটা বাঁধানো খাতা হাতে। তাতে প্রতি ফুলটির বর্ণনা লিখছে। পরিচিত হলে তার নাম লিখছে। নাম না জানা থাকলে একটি মোটা বাঁধানো বই দেখে নাম বার করার চেষ্টা করে। বইখানি R. Strachey-র প্রসিদ্ধ Catalogue of the Plants of Kumaon and Adjacent Portions of Garhwal and Tibet। নাম সম্বন্ধে অমরনাথের সঙ্গে আলোচনাও করে। দুইজনে একমত হলে সহজেই মিটে যায়। মতভেদ হলে তর্ক-আলোচনা হয়। তাতে সিদ্ধান্তে না পৌঁছুলে খাতার মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন সংযুক্ত হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে ফুলগুলি একে একে সযত্নে রেখে দেয়। বলে, ফুলগুলি এভাবে রাখলে নষ্ট হবে না। শুকিয়ে ঠিক চেপে থাকবে। তারপর ল্যাবরেটারিতে যথারীতি এদের রাখার ব্যবস্থা হবে।

কবে, কোথায়, উপত্যকার বা পাহাড়ের ঠিক কোন্ স্থানে, কি অবস্থায়, কোন্ মাসে ও দিনে এগুলি সংগৃহীত তারও বিবরণী রাখে।

বিপুলের ধারণা, কয়েকটি নতুন ফুল ও চারাগাছ সে পেয়েছে—যা এখনও অজ্ঞাত। কোন বইয়ে তার উল্লেখ নেই। অমরনাথ বিজ্ঞের মত সাবধান করিয়ে দেয়, অত চট করে আবিষ্কারক হবার আশা করা ঠিক নয়। ভালো করে অনুসন্ধান করবেন ফিরে গিয়ে। Smythe-এর Valley of Flowers বইখানি আপনার সঙ্গে নেই—তাতেও ভালো করে দেখবেন।

ফুলগুলির আকার, রঙ্, পাতা, পাপড়ি, শিরা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দুজনে বিচার করবে, প্রতি ফুলটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে। মশগুল হয়ে দুজনে আলোচনা চালায়। ঘরের মধ্যে বসে ফুল ছিঁড়ে ফুলের চুল-চেরা বিচার চলতে থাকে।

বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রমাণ-বিচার-সাপেক্ষ তাদের বিজ্ঞান জগৎ। তাতেই তাদের আনন্দ। বিজ্ঞানই তাদের কাছে সর্ব-শক্তিমান।

আমি অলক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে আসি। বারান্দায় ইজিচেয়ারে কম্বল গায়ে আরামে বসি। দেখি সামনের উপত্যকায় দুই-পাশের গিরিশ্রেণীর মধ্যে রাত্রের আঁধার নিবিড় হয়ে ওঠে,—যেন কোন্ এক বিরাটাকার মসীকালো দৈত্য প্রসারিত দীর্ঘ দুই বাহুর মধ্যে জমাট অন্ধকার ধরে রেখেছে। দিনের আলোয় দেখা বনের বড় বড় গাছগুলির শাখা-প্রশাখা সেই ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। শুধু জেগে আছে বামুনি ধুর্—বহুদূরের সেই তুষারধবল গিরিশিখরটি। অন্ধকারের কোন্ এক গোপন-পথে রজনীতে সে যেন অতি নিকটে চলে এসেছে। সাদা বরফের দিনের আলোয়-দেখা উজ্জ্বল দীপ্তি, রাতের অন্ধকারে আরও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়—চূড়াটি থেকে থেকে যেন

কাঁপছে।

হঠাৎ মনে পড়ে, দিনের বেলা শোনা চৌকিদারের মুখের কাহিনী, 'বাবুজি, দূরে ঐ যে হিমালয় দেখছেন, রাত্রে দেখবেন ও জেগে ওঠে, কাছে আসে, জ্যোতি দেখায়। ও যে দেওতা আছে।—আর নীচে ঐ যে জঙ্গল দেখছেন—রাত্রে ভরে যায় দানোতে!'

বিদ্যা-বুদ্ধিহীন অন্ধ-বিশ্বাসীর চোখে দেখা আর এক হিমালয়!

আবার ভাবি, রাত্রিশেষে দিবালোকে কালই তো যাব ঐ সুদূর অঞ্চলে। তুষারশীর্ষ, গিরিরাজের পাদদেশে। কল-কল্লোলিনী গিরি-নির্ঝরিণীর উপ-কূলে। কত পাখীর গানে ভরা, কত ফুলের রঙে রঙিন প্রকৃতির সেই প্রকৃত লীলাভূমি।

সৌন্দর্য-পিয়াসী পর্যটকের চোখে দেখা সে-ও তো এক হিমালয়।

আবার মনে হয়, ঐদিকেই তো আর এক অঞ্চলে লোকপাল। যেখানে হেম-কুণ্ডের তীরে বসে সেই শিখ-সাধু সাধনা করেছিলেন। শিখ-গুরু সিদ্ধ হয়েছিলেন। আঁধার-ঘেরা ঐ সুদূর হিমগিরির অলক্ষ্য কন্দরে এখনও হয়তো কোথাও সাধুসন্ত এই গভীর রাতে একান্তে ধ্যান-নিবিষ্ট রয়েছেন। লোকচক্ষুর অগোচরে, দিবারাত্রির নির্বিচারে, তাঁদের দীর্ঘ তপশ্চর্যার অশ্রুত পুণ্যকাহিনী চিরকাল অজানাই থাকে। সাধনা-লব্ধ তাঁদের জ্ঞান। অটুট তাঁদের বিশ্বাস। তাঁদের চোখে বোধ করি, এই নগাধিরাজ—সত্যই দেবতাত্মা হিমালয়।

অসীম, অনাদি, অনন্ত।

হঠাৎ চমকে উঠি।

রাত্রের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে এক বন্য পশুর আর্ত রব ওঠে।

কান পেতে শুনি। নদীর ওপারে নীচের জঙ্গলে কাকর-মৃগ ডাকছে—Barking deer!

এ পারের পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি ওঠে। ক্রমে কাছ থেকে দূরে—আরও দূরে শব্দ সরে যায়। স্বরের সূত্র ধরে বেশ বুঝতে পারি—গভীর দূর বনের মধ্যে হরিণ ছুটে চলে যাচ্ছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শব্দ মিলিয়ে যায়। তবুও বহুক্ষণ তার অনুরণন বাজতে থাকে।

যেন, সুপ্ত বনানীর আচম্বিত নিদ্রা-ভঙ্গের পর সহজে তন্দ্রা আর আসে না!

তার পর, আবার চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ।

ক্ষণিকের জাগ্রত বাস্তব হিমালয় আবার কল্প-লোকের চিরন্তন রহস্যে আবৃত হয়।

॥ ১০ ॥

ঘাংরিয়া থেকে Valley of Flowers প্রায় আড়াই মাইল। পথে দুরূহ চড়াই নেই। বাংলো ছেড়ে বনের মধ্যে ধর্মশালার পাশ দিয়ে এসে সেই প্রশস্ত প্রান্তর। তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট পার্বত্য নদী। এখানেও দুইটি গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি রেখে সাময়িক পারাপারের ব্যবস্থা হয়েছে। নদী পার হয়ে অল্প দূর আসার পর পথ দুইদিকে চলে গেছে। ডান হাতের অর্থাৎ পূর্ব-দিকের সরু পথটি লোকপাল বা হেমকুণ্ডের পথ। আর সামনের অর্থাৎ উত্তরমুখী পথটি Valley of Flowers-এর পথ। মাইলখানেক সেই পথে ভুন্দর নদীর ধার দিয়ে এসে নদীর উপর কাঠের পুল। খরস্রোতা স্রোতস্বিনী। প্রতি পদক্ষেপে নদীর জলধারা নীচের দিকে নেমে চলেছে, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে সহস্র জলকণার ফোয়ারা সৃষ্টি করে। নদীর ধারাপথে কত ছোট বড় জলপ্রপাতই না চোখে পড়ে।

পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ। সম্মুখ-পথের একসঙ্গে বেশী দূর দৃষ্টি চলে না। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই পথের সামনে দেখি একটি অতিসুন্দর পাখী। ময়ূরের মত রঙ্। কিন্তু ময়ূর নয়। বৃহদাকার মোরগ জাতীয়। আমাদের অতর্কিত আবির্ভাবে চমকে ওঠে, স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণিক তাকায়। তার পরই ডানা মেলে সৌন্দর্যের ছটা ছড়িয়ে পাশের জঙ্গলে ছুটে পালায়—যেন ত্রস্ত, সলজ্জ সুন্দরীর নীল শাড়ীর ঘোমটা টেনে সরে যাওয়া!

চৌকিদার উত্তেজিত হয়ে বলে, একটু আগে জানতে পারলে ধরে ফেলতাম। মুনিয়াল পাখী। বনের রাজা। হিমালয়ের শুধু এই সব উঁচু জায়গায় থাকে। কি সুন্দর রঙ্ দেখলেন? এইসব পাখী সাহেবরা ধরে নিয়ে যেত, মেরে ঘর সাজিয়ে রাখবে বলে।

মুনিয়াল! নাম শুনে মনে পড়ে কুলু উপত্যকায়ও এর কথা শুনেছিলাম, রঙিন পালকও দেখেছিলাম এক পাহাড়ীর টুপিতে। সেখানকার শৌখীন লোকের টুপির উপর এরই দু-একটা পালক লাগাতে পারা অতি বড় সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয়। এক শিকারী সাহেবের টুপিতে সব সময়েই এর পালক থাকত বলে নামই হয়েছিল মুনিয়াল সাহেব।

আজ হঠাৎ সেই পালকের জীবন্ত অধিকারীকে দেখে আনন্দ হল।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, দেখুন না, বোধ হয় ঐ গাছগুলির আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদেরই দেখছে—একটা ফটো তুলে আনুন, কলকাতায় গিয়ে দেখানো যাবে।

হেসে উত্তর দিই, শহরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করবেন, এখানে এসে রাজদরবারে যেন রাজ-দর্শন করে যান।

বিপুল মন্তব্য করে, পশুপক্ষীর রাজ্যে আশ্চর্য নিয়ম দেখেছেন? স্ত্রী-জাতির চেয়ে পুরুষ-জাতির স্বাভাবিক দেহ-সৌন্দর্য কতো বেশী। পশুরাজেরই কেশর আছে, সিংহীর নেই। হরিণের মাথায় শৃঙ্গের শোভা, হরিণীর নেই। ময়ূরের পেখমে রঙের মেলা, ময়ূরীর নেই। মুনিয়ালও তাই। স্ত্রী-মুনিয়ালের রঙের কোন চটকই পাবেন না—বিবর্ণ!

নদীর দুই দিকে পাহাড়ের গায়ে—জলের কিনারায় নানান্ ফুলের গাছ। অনেক ফুল এখন সেপ্টেম্বরের শেষে শুকিয়ে গেছে, কোথাও বা ঝরেই গেছে, কতক বা গাছে ঝুলছে। তবুও পাহাড়ীরা সাবধান করে দেয়, বেশী কাছে গিয়ে গন্ধ নেবেন না, মাথায় চক্কর দেবে, মূর্ছাও যেতে পারেন।

নদী-পারে সামান্য চড়াই। তারপর, আবার নদী ধরে পথ চলেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে বরফ-গলা জলের ধারা নেমেছে। পারাপারের পুল নেই। এ সময়ে জল কম, তাই ঝরনার জলের মধ্যে মাথাতোলা পাথরগুলির উপর পা রেখে পার হই। জল কোথাও বেশী থাকলে জুতো মোজা খুলে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যাই। কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল। এর পরের বছর জুন মাসে এ পথে আবার এসেছিলাম। সে সময়ে এই সব ঝরনার উপর অনেক জায়গায় বরফের আচ্ছাদন ছিল—সেই বরফের উপর দিয়েই তখন পার হতে হয়েছিল। সাবধান হয়ে—কেন না, তলার বরফ গলে কোথাও পাতলা হয়ে আছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। মে-জুনে নদীর জলের উপরও অনেক জায়গায় বরফে ঢাকা দেখেছিলাম। এখন সেপ্টেম্বরে পথের বা নদীর উপর সে-সব বরফ নেই। আবার অক্টোবর-নভেম্বরে বরফ দেখা দেবে।

ধীরে ধীরে পথ সামান্য উঠেছে। তার পরেই মনে হয় যেন পথের শেষ—সম্মুখেই এক উত্তুঙ্গ গিরিপ্রাচীর। সেইদিক থেকে একটি ছোট নৃত্যশীলা ধারা নেমে এসেছে—ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিশছে। দেখি, তিনদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা,—শুধু ডান দিকে ভুন্দর নদীর এক সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা। সেই অংশেরই Smythe নাম দিয়েছিলেন Valley of Flowers। পাহাড়ীরা কেউ বলে কাণ্ডোলিয়া সেইন, কেউ বা বামুনি ধর্ গিরিশিখরের সঙ্গে নামযোগ করে।

পাহাড়ে ঘেরা এক সুরম্য প্রান্তর। প্রায় আড়াই মাইল দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তীর্ণ, পূর্ব-পশ্চিমেও ব্যাপ্তি এক মাইলের উপর। উত্তরে দূরে প্রান্তর-শেষে বরফের পাহাড়। রাটাবান্ গিরিশিখর। ২০,২৩০ ফুট উঁচু। তার কিছুদূরে নীলগিরি পর্বত,—২১,২৪০ ফুট। এই সব শিখর পাশে রেখে সম্মুখের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে গেলে বদরীনাথের নর-পর্বতের উপর পৌঁছানো যায়। এই উপত্যকাও নর-পর্বত গিরিশ্রেণীর অংশবিশেষ। উপত্যকার অপর দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকেও বরফের পাহাড়। সেদিক দিয়ে গিরিশ্রেণী অতিক্রম করলে

বদরীনাথের পথে হনুমান চটীতে নামা যায়।

শিশিরবাবু মন্তব্য করেন, সে হনুমানজিরই সম্ভব, আমাদের মত অক্ষম মানুষের জন্যে ও পথ নয়।

এই বিস্তীর্ণ ময়দানের মাত্র কয়েক স্থানে ভূর্জপত্র বৃক্ষের ছোট ছোট বন। নইলে তিনদিকে গিরিশ্রেণীর পাদদেশ অবধি উন্মুক্ত সমতল ক্ষেত্র। ঘন সবুজ ঘাসে ভরা। তারই ভিতর অগণিত ফুলের চারা। যেন চারিদিকে নানান্ রঙে রঙিন কার্পেট বিছানো।

অমরনাথ বলে, আগস্ট মাসে একবার ইন্‌স্‌পেকশনে আসতে হবে। তখনি এখানকার সবচেয়ে বেশী রূপের জৌলুস। সে সময়ে, শুনেছি, গাছে ফুল, ঘাসে ফুল, মাটির কোলে ফুল, পাহাড়ের কোণে ফুল, নদীর তীরে ফুল, জলের ভিতরে শিকড়ে ফুল। শুধু ফুল-ময় জগৎ।

বটানিস্ট বিপুল তার সঙ্গে সায় দেয়। বলে, শীতকালে সাদা বরফের মোটা লেপ গায়ে এ উপত্যকা ঘুমিয়ে থাকে। নদী, মাঠ—সর্বত্র বরফে ঢেকে একাকার হয়ে থাকে। তারপর শীত শেষ হলে মে-জুন মাসে চারিদিক আবার জেগে ওঠে। নদীর বরফ গলা জল কলকল-রবে আবার ছুটতে থাকে। চতুর্দিকে ফুল ফুটতে শুরু হয়। কিন্তু সবচেয়ে বাহার খোলে জুলাই-আগস্টে বর্ষার জল পাবার পর। তারপর, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আবার ফুল ঝরার পালা।

শিশিরবাবু বলেন, আশ্চর্য লাগে ফুলগুলি সাজানোর ভঙ্গী দেখে। অনেক জায়গায় মনে হয় যেন সাজানো ফুলের বাগান। ঐ দেখুন না, ওদিকে শুধু সাদা ফুলই ফুটেছে। আবার এদিকে তাকান, সব গোলাপী ফুল। ঐ পাথরটার পাশে একরাশ বেগুনী রঙের ফুলই শুধু ফুটেছে। আবার, এইখানে দেখুন, লালফুলের ছড়াছড়ি—কে যেন রক্তচন্দনের অজস্র ফোঁটা ছড়িয়ে গেছে! ফুল-বিশেষে স্বতন্ত্র 'বেড'। মনে হয়, কোন নিপুণ রূপদক্ষ মালীর হাতে অতি যত্নে তৈরী ও সাজানো বাগান। ভগবানের কি অপরূপ সৃষ্টি।

বিপুল বৈজ্ঞানিক। অতএব, তার কাছে এ সব সুন্দর হলেও বিস্ময়কর নয়। সে গম্ভীর হয়ে বলে, বিজ্ঞানে জানা যায়, ফুলেরও জাতিভেদ আছে, জাতিগত ধর্ম আছে, তাই স্বতন্ত্র জন্ম ও বাসও আছে। যে জায়গায় যে-আবহাওয়ায় বা যে-পরিবেষ্টনে যে-ফুলের জন্ম হওয়ার কথা—সেখানে শুধু সেই ফুলই হবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ঐ দেখুন, খোলা ঢালু জায়গায় Cassiope Fastigiata ও Gaultheria Trichophylla জন্মায়, তাই ঐখানে ফুটেছেও। Sedum Trullipetalum হয় পাথরের কাছে, হয়েছেও তাই এইখানে। আবার, ঐ নদীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, Epilobium Roseum—যাকে Willow Herb বলে—জন্মায় জলের ধারে, তাই জন্মেছেও ঐদিকে। তা ছাড়া কয়েক রকম ফুল আছে সর্বত্র ছড়িয়ে ফোটে,—ঠিক যেমন এক শ্রেণীর লোক আছে সর্বত্র ঘোরে ফেরে,—যেমন দেখছেন হলদে রঙের

ফুলগুলি Geum Elatum—এখানে কিছু, ওখানে কিছু, চারিদিকে ছড়িয়ে ফুটেছে। এ ছাড়া, Aster, Inula, Coryalis, Polygomus, Blue Bell, Potentilla—এসব তো রয়েছেই। জুন মাসে এলে হলদে ও লাল দুই রঙ-এরই Potentilla দেখবেন, হলদে Anemone পাবেন—তার আবার সাদাও হয়, সাদাগুলি যেখানে ফুটে থাকে, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন তাজা বরফ পড়ে রয়েছে। Primula-গুলিরও রঙ্-এর বাহার আছে, লাল থেকে শুরু করে গোলাপী—এমন কি নীল, বেগুনীও হয়! বেগুনী Geranium-ও তখন ফোটে। বরাস—Rhodorendron তো আপনাদের এইসব অঞ্চলের অতি পরিচিত ফুল। Sausuria—যাকে ব্রহ্মকমল বলে—এখানে এখন সব ঝরে গেছে; কাল লোকপালের পথে সে ফুল দেখতে পাবেন।

কথার স্রোতে হঠাৎ বাধা পায়। একদৃষ্টে মনোযোগের সঙ্গে মাঠের এক অংশে তাকিয়ে থাকে। ত্বরিত গতিতে সেই দিকে যায়। একটি মাত্র ফুল তুলে হাতে ধরে দেখতে দেখতে ফেরে, উৎসাহিত হয়ে বলে, এ নীল ফুলটি Blue Poppy—এ সময়ে এই একটি মাত্র ফুটেছে দেখছি। নিঃসঙ্গ কোথা থেকে জন্মাল কে জানে!

বৈজ্ঞানিকেরও এবার বিস্ময় জাগে।

কেন জানি না, ফুলগুলির নাম, ধাম, গোত্র, রূপবৈচিত্র্যের এত জ্ঞানলব্ধ পরিচয় এই দিব্য পরিবেষ্টনের মধ্যে নিরর্থক ও তুচ্ছ বোধ হয়।

আমি বলি, চল গিয়ে খানিক বসা যাক্ ঐ পাথরটার ওপর। স্থির হয়ে বসে এই শান্ত আবহাওয়া উপভোগ করা যাক।

মাঠের মাঝে মাঝে কালো বড় ছোট পাথর পড়ে আছে। কোন কোনটি ঠিক বেদীর মত—সমতল, মসৃণ।

সেই দিকে এগিয়ে যাই। পা ফেলতে সংকোচ লাগে। চারিদিকেই ফুল। না মাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তবুও যেতেই হয়। আলগোছে সন্তর্পণে পা ফেলি। এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকাই। দেখি, কয়েকটি ফুল পায়ের চাপে পিষে গেছে, দেখে মনে ব্যথা লাগে। কয়েকটি বা ভূ-শায়িত হয়েও ডাঁটির ভরে আবার মাথা তোলে, স্প্রিং-এর মত দুলতে থাকে—দেখে আবার আনন্দ জাগে।

একটি সমতল পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে সকলে বিশ্রাম করি।

কি প্রশান্ত আবেষ্টন!

উপরে মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। চারু চন্দ্রাতপ।

চারিদিকে গিরিপ্রাচীর। উন্নত মহান্।

দূরে সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-শিখর। সুনির্মল, জ্যোতির্ময়।

কুসুমাকীর্ণ ধরণীর দেহ।—'দিব্যবৃক্ষ-বনাচ্ছন্ন'। 'দিব্যপুষ্প-বিশোভিত'।

রূপে গন্ধে বর্ণে পুলকিত দশদিক্।

নিঃশব্দে ব্যজন করে স্নিগ্ধ সমীরণ।
এই অসীম সৌন্দর্যরাশির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে ফেলি।

হঠাৎ মানুষের স্বরে চমকে উঠি।

অমরনাথ বলে, সঙ্গে ফ্লাস্কে চা এনেছি ; রুটি ও আলুর সব্জিও আছে। এবার বার করতে বলি।

মানুষের দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অশরীরী মনকে সজাগ করে তোলে।

কিন্তু এই পরিবেষ্টনে সব কিছুই—সামান্য আহার্যও—মধুময় মনে হয়।

অল্পদূরে মাঠের মধ্যে এক জায়গায় এক সময়ে তাঁবু ফেলার সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও রয়েছে। তাঁবুর চারিপাশে চাপা দেবার জন্য ব্যবহার করা পাথরগুলি এখনো তেমনি চতুর্দিকে লাইন করে সাজানো আছে। তাঁবুর চারিধারে জল-নিকাশের নালাগুলির চিহ্ন এখনও বর্তমান। নিশ্চয়, এখানে কারা তাঁবু ফেলে তার মধ্যে কয়েক রাত্রি বাস করে গেছে। কি সুন্দর ও শান্ত দিনগুলি তাঁদের কেটেছিল, কল্পনা করি।

ভাবি, এবার আমরাও তাঁবু আনব।

॥ ১১ ॥

অমরনাথ চৌকিদারকে ডাকে। বলে, চল, সেই মেমসাহেবের কবর কোথায় দেখি।

১৯৩৯ সালে এক ইংরাজ মহিলা কুসুম-সন্ধানে এখানে আসেন। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ 'কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেন' থেকে। একাকিনী। রূপপিয়াসিনী। মালিনীর রূপে।

তাঁর সঙ্গে দুইটি পাহাড়ী অনুচর ছিল। তাঁবু ফেলে এখানে থাকতেন। ফুল সংগ্রহ করতেন। বিলাতে পাঠাতেন। বীজ সংগৃহীত হ'ত।

একদিন উপত্যকার পাশের পাহাড়ের অল্প উপরে উঠে ফুল তুলতে গিয়ে মহিলা অকস্মাৎ পড়ে যান। পাহাড়ী সঙ্গীরা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। এসে দেখে, প্রাণহীন দেহ। মুঠি-ভরা ফুলের গুচ্ছ। ফুলের রাজ্যে ফুলশয্যায় শেষ শয়ান!

এখন সেখানে পাথরে খোদাই করা একটি স্মৃতি-ফলক আছে, শুনি।

তাই দেখতে চলি।

মাঠের মধ্যে গভীর খাদ কেটে একটা বড় ঝরনা নেমেছে। সাবধানে পার হই তারপর, কোমর-উঁচু ফুলগাছের জঙ্গল ভেদ করে নদীর দিকে নেমে চলি সেই স্মৃতিস্তম্ভের কাছে।

স্তম্ভ নয়। দূর থেকে দেখাও যায় না। আশপাশের গাছে, ঘাসে, ফুলে আড়াল করে রাখে। কবরের ভূমিখণ্ডের উপর বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পাথর

ফেলা। সেই পাথরগুলির গায়ে ভর দিয়ে রাখা একটি চতুষ্কোণ শ্বেতপাথরের স্মৃতি-ফলক। তাতে লেখা—

In Loving Memory
of
Joan Margaret Legge
February 21st 1885
July 4th 1939

I will lift up mine eyes unto the Hills
From whence cometh my help.

শেষ চরণ দুটির অক্ষরগুলি চোখের উপর ভাসতে থাকে।

কানে যায় চৌকিদারের বলা কাহিনী।

দুর্ঘটনার পরই এখান থেকে লোকে ছুটে গিয়ে নীচের গ্রামে খবর দেয়, যোশীমঠেও তখনি লোক যায়। ডাক্তার, পুলিস, অফিসার সাহেবরা আসেন। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে। কিন্তু, শেষে এখানে রাখাই ঠিক হয়। এইখানে নদীর কাছে মাটি খুঁড়ে কবর হয়। কবরের উপর প্রথমে শুধু কয়েকটা পাথর সাজানো ছিল। কয়েক বছর পরে এক সাহেব এই লেখা সাদা পাথরটি এখানে রেখে যান।

নির্বাক হয়ে শুনি।

কেন জানি না, এই অকস্মাৎ-মৃত্যুর করুণ কাহিনী মনে বেদনার ছায়াপাত করে না। প্রকৃতির এই বিরাট ও মহান্ রূপবাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন-মৃত্যুর ভেদাভেদ বোধও যেন লুপ্ত হয়ে যায়। মনে হয়, জন্ম-মৃত্যু—সে যেন এক অবিচ্ছিন্ন-সুরের খেলায় বিভিন্ন সপ্তক মাত্র। পরস্পর-বিসম্বাদী নয়, একের রেশ অপরের মধ্যে সহজেই মিলিয়ে যায়। সুরের অনন্ত খেলা চলতে থাকে।

এই মরণের মধ্যে সমাপ্তিব ইঙ্গিত নেই, জীবনের ক্ষয় নেই, হারানোর ভয় নেই। হিমালয়ের শান্তিপূর্ণ কোলে এই মৃত্যু ভয়ংকর নয়—সুন্দর, মহান্।

অল্প কিছুক্ষণ আগেকাব কথা মনে পড়ে। কয়েক দিন তাঁবু খাটিয়ে এখানে কাটালে কি সুন্দর হয়!

এখন আবার ভাবি, এখানে মৃত্যুতেও কি আনন্দ নেই?

কে জানে?

কবরের দিকে তাকাই। তখনই মনে হয়, জীবিত সেই সুন্দর দেহখানি এতদিনে সুনিশ্চিত পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে।

মানুষের মাটির শরীর পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মিশে যায়। দেহের জলকণা ঐ নদীজলে লুপ্ত হয়। জীবিত মানুষের শেষ নিঃশ্বাস গিরিরাজ তাঁর স্নিগ্ধ

বাতাসে গ্রহণ করেন। শবদেহ-ধাত্রী ধরণী উর্বরা হয়ে ফুল্ল কুসুমিত হন। নব নব রূপে গন্ধে প্রাণহীন সেই দেহ আবার সঞ্জীবিত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

ফুল ফোটে, ঝরে; আবার ফোটে, আবার ঝরে। নদীর জল বরফ হয়; আবার গলে আবার জমে। চক্রাকারে জীবন-মৃত্যু নিরন্তর ঘুরতে থাকে।

ভাবি, কোথায় তাব শেষ, কোথায় তাব শুরু—কে তার সন্ধান রাখে?

মনে পড়ে আসিসিব St. Francis এর উক্তি: 'It is in dying that we are born to eternal life.'

হঠাৎ বাতাসে উড়ে এসে কবরের উপর পড়ে একটি সাদা ধবধবে ফুল। যেন গিরি-দেবতার আশীর্বাণী।

ফুল দেখেই মনে পড়ে আমার মায়ের হাসি-ভরা মুখখানি। মালা হাতে পুজো করেন। যাত্রা-কালে প্রণাম করতে যাই। পুজো করা ফুলের একটি তুলে নেন। আমার নত-শিরে ও হৃদয়ে হাত রেখে ধ্যাননিমীলিত নয়নে জপ করেন, আশীর্বাদী ফুল হাতে দেন। যাত্রাপথে সঙ্গে রাখা মায়ের সেই আশীর্বাদী ফুল বইএ-পড়া অক্ষয় কবচের মত অজানা কোন্ শক্তির বলে মনে সাহস ও বিশ্বাস আনে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সিন্ধুপারে এক প্রশান্ত আনন্দ-রাজ্যে নিয়ে যায়।

মায়ের হাতে দেবতারই আশীর্বাদ।

হিমাচলের এই দেবভূমিতে আমরাও অঞ্জলি ভরে ফুল আনি। কবরের উপব অনাদি-অন্তরের পুজোর অর্ঘ্য সাজাই।

॥ ১২ ॥

ভিন্ন পথ লোকপালের। কিন্তু, প্রকৃতির ভিন্ন রাজ্য নয়। একই গিরিশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ, তবে এ-পথে দুরূহ চড়াই ওঠার ক্লান্তি আছে।

ঘাংরিয়া থেকে লোকপাল বা হেমকুণ্ড, শুনি প্রায় পাঁচ মাইল। কিন্তু মনে হয়, তারও কম। ঘাংরিয়া বাংলো থেকে বার হয়ে মাঠের মধ্যে সেই ঝরনা পেরিয়ে একটু এগিয়ে এসে ডান হাতের বা পূর্ব-দিকের পথটি ধরতে হয়। সেদিকে আকাশ-চুম্বী গিরিশ্রেণী। সর্পিল গতিতে পথ উঠে গেছে একেবারে পাহাড়ের মাথায়।

ঘাংরিয়া ১০,০৮৮ ফুট। সামনের চড়াই-পথ পাহাড়ের মাথায় তুলেছে বোধ করি প্রায় ১৫,০০০ ফুট-এ। মাইল তিন-চারের মধ্যে এই প্রায় হাজার পাঁচেক ফুট উঠতে হয়। পাহাড়ের শিখরদেশে পৌঁছে অপরদিকে নামতে হয়। সেই-খানে হেমকুণ্ড—১৪,২৫০ ফুট উঁচুতে।

লোকপালের চড়াই শুরু হবার আগে পথের ডান দিকে এক সুদৃশ্য জল-প্রপাত দেখা যায়। যেন স্বর্গ থেকে বিপুল ধারা ধরায় নামছে। যেমন গতির

বেগ, তেমন গম্ভীর। হেমকুণ্ড-নিঃসৃত এই নির্ঝরিণী।

বার্চগাছ বা ভূর্জ-বৃক্ষের বনের মধ্যে দিয়ে প্রথম খানিকটা পথ। ভূর্জ গাছের সাদা ডাল, ধূসর পাতা। মাঝে মাঝে অন্য ফুলগাছেরও বাহার আছে।

ঘাংরিয়া থেকে হাজার দুই ফুট উঠলে তরু-রাজ্যের সীমা শেষ হয়। তখন শুধুই ফুল। চারিদিকে ফুলগাছের চারা। মাটিতে ও ঘাসেও ফুল।

যেমন Valley of Flowers-এ। তবে এ-পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমাগত উঠেছে—উপত্যকার মধ্য দিয়ে; তাই পথের আশেপাশে ভুন্দর-ভ্যালির সমতল-ভূমির বিস্তৃতি নেই।

চড়াই-এর শেষভাগে—পাহাড়ের মাথায় পেঁছিবার কিছু আগে—পথের বাঁ দিকে পাহাড়ের দুই চূড়ার মধ্য থেকে বরফের একটা লেলিহান জিহ্বা বার হয়ে নেমে এসেছে। পথ-রেখা গ্রাস করেছে।

গোবিন্দ-ঘাটের সেই শিখ স্বামীজীর সতর্ক বাণী স্মরণ হয়।

পথের কাছে বরফ গলছে। ভেঙে ভেঙে পড়ছে। জলের ধারা বয়ে চলেছে। সেখানে পার হওয়া বিপজ্জনক। উপর থেকে বোঝা যায় না, কতখানি পুরু বা শক্ত বরফ। হয়তো, সামান্য ভারও সইবে না। তাই পথ ছেড়ে পাহাড়ের কিছু উপরে উঠি। সেখানে অপেক্ষাকৃত জমাট বরফ। সঙ্গী পাহাড়ীদের নির্দেশমত সাবধানে সেইখানে পার হই। পায়ে সাধারণ টেনিস্ জুতা। পাহাড়ে হাঁটার ফলে তলায় রবার মসৃণ হয়েছে। বরফের উপর পিছল লাগে। পাহাড়ীরা হাত ধরে। সদা-সতর্ক তাদের দৃষ্টি!

পরের বছর জুন মাসে এখানে অনেকখানি বরফ ছিল। সঙ্গী পাহাড়ীরা সঙ্গে কুড়ুল এনেছিল। তাই দিয়ে বরফের উপর কেটে কেটে পা রাখার জায়গা—steps তৈরি করে দিয়েছিল। বছরের সে-সময় এ-পথে আরও কয়েক জায়গায় বরফ পেয়েছিলাম। সেপ্টেম্বরে বরফ সবচেয়ে কম থাকে। অক্টোবরের পর থেকে আবার নতুন বরফ পড়তে শুরু করে।

বরফ পার হয়ে নজর পড়ে পথের দুই দিকে প্রকাণ্ড সাদা সাদা ফুল। দুই হাতের মিলিত মুঠি ভরে ধরা যায় এক একটি ফুল। মাটি থেকে শুধু একটি ডাঁটি—তিন-চার হাত উঁচু; লম্বা পাতা—ক্যানা গাছের মত। তারই ডালে একটি করে সাদা ফুল। অপূর্ব সুন্দর। তীব্র সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়েছে।

এই-ই ব্রহ্মকমল।

বৃহদাকার শ্বেত পদ্মের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

লোকপালে হেমকুণ্ডে পূজার জন্য সকলে কমলফুল তুলি।

পাহাড়ীরা জানায়, সেখানে কুণ্ডের ধারেও অজস্র পাবেন।

ভাবি, এই-ই তো দেবতার পূজার ফুল। দিব্যকান্তি, দিব্যগন্ধী শুচি-শুভ্র।

শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিনে কমলফুলে শ্রীকেদারনাথেরও পূজার প্রথা আছে। কেদারনাথের উপরে পাহাড়ের মাথার বাসুকী-তালের পথে কমল ফোটে। প্রতি

দিন তখন সেখান থেকে ফুল আনা হয়।

কেদারনাথে গতবার ভাদ্র-আশ্বিনে গিয়েছিলাম। লোক পাঠিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝুড়ি ভরে কমলফুল আনানো হয়েছিল। শ্রীকেদারনাথের পাষাণময় লিঙ্গমূর্তি সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে সাদা ফুলের আবরণে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছিলাম। আপন হাতে দেবতার মূর্তি সাজানোর অসীম আনন্দের স্বাদ সেদিন সত্যই উপভোগ করেছিলাম। আবার মনেও হয়েছিল, দেবতার গড়া মানুষ, দেবতার সৃষ্ট ফুল,—সেই মানুষই স্বকল্পিত দেব-মূর্তিকে তাঁরই রচিত ফুলে সাজাবার ভরসা রাখে! গঙ্গার জলে গঙ্গার পূজা করে।

কমল হাতে শিশিরবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকেন, বলেন, ভগবানের কি আশ্চর্য সৃষ্টি! ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছি—চোখেও দেখেছি—কমল ফোটে চিরকাল জলে। স্থলপদ্ম স্থলে হয় বটে, কিন্তু কমলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য কই! এখানে দেখছি—পাহাড়ের ওপরে কমল ফুল! ভাল কথা, মানস-সরোবরে ফুটতে দেখেছিলেন?

উত্তর দিই, ফোটে বললে হয়তো স্বাভাবিকই শোনাত, কেন না, সরোবরেই তো পদ্ম ফোটার কথা। আর আমাদের মনে মানস-সরোবরের নামের সঙ্গে পদ্ম ফুলের স্মৃতি যেন জড়িয়েই থাকে। কালিদাসও বর্ণনা করেছেন, 'হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্য',—অথচ, স্বর্ণপদ্ম তো দূরের কথা, কোন পদ্মই সেখানে দেখা যায় না। পুরাকালের কথা জানি না। আমরা তো সেখানে ফুটতে দেখি নি, কেউ দেখেছেন বলে শুনিও নি, অভিজ্ঞ পর্যটকদের বই-এও উল্লেখ পাই নি।

মানস-সরোবরে পদ্ম নেই!

শিশিরবাবু আশাহত হন।

যুক্তি দেখিয়ে বলি, তবে একটা কথা। সরোবর নাম হলেও প্রকৃত সরোবর তো নয়। হয়তো দেবতাদের সরোবর, কিন্তু মানুষের কাছে সমুদ্র! মানস-সরোবরের ব্যাপ্তি হল প্রায় দু'শত বর্গমাইল! প্রতিদিন একটু বেলা হলেই তিব্বতের সে-অংশে ঝড়ের মত বাতাস ওঠে, মানসের জলে ঢেউ তোলে। সমুদ্রের মতনই কূলে ঢেউ ভাঙে।—সমুদ্রে তো পদ্ম ফোটার কথা নয়!

কমল হাতে শিশিরবাবু মনোমুকুরে মানস-সরোবরের ছবি দেখেন।

হঠাৎ কলকাতার বন্ধুদের কথা তাঁর স্মরণ হয়। বলেন, ফেরার পথে যেন মনে রাখবেন তাঁদের জন্যে কমল তুলে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে।

ফেরবার পথে একরাশ সংগ্রহ করে সঙ্গে নেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু কয়দিন পরেই ফুলগুলি অলকানন্দার জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। হিমরাজ্যের কমল, নিম্ন প্রদেশের প্রখর উত্তাপ সইতে পারে না। ম্লান হয়ে নষ্ট হয়।

পাহাড়ীরা বলেন, রোদ্রে ভালো করে শুকিয়ে রাখলে অনেকদিন থাকে। থাকে বটে, দেখছিও। কিন্তু সাদা রঙ বিবর্ণ হয়—বালির কাগজের ফুলের মত

মনে হয়। মন্দিরের অর্ঘ্য দেওয়া ফুল ঐ ভাবেই তুলে রাখে, পান্ডারা যাত্রীদের দেনও।

আর অল্প একটু চড়াই। পথ এঁকে-বেঁকে উঠেছে। ঘাড় তুলে শিশিরবাবু দেখেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত পাথর। প্রকৃতির কঠোর রূপ। তারই মাঝে মাঝে বরফ জমে আছে—কে যেন চুন লেপে দিয়েছে। কোথাও বা বরফ-গলা ধারা ঝরনার আকারে পাথরে গা বেয়ে নেমে চলেছে। বরফেরই মত ঠান্ডা জল।

চড়াই শেষে পাহাড়ের মাথার উপরে পেঁছে দাঁড়াই। যে পথ দিয়ে উঠে এলাম সেদিকে ফিরে তাকাই। বহু নীচে পাহাড়ের কটিদেশে ঘন বনের সবুজ মেখলা। তার উপরে পাহাড়ের অনাবৃত অঙ্গ। শুধু পাথর। এত দূর থেকে সেখানকার ফুলের বাহার চোখে পড়ে না। শুধু বড় বড় ঝরনার উচ্ছৃংখল ধারাগুলি দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে আঁকা সাদা খড়ির রেখার মত মনে হয়। আমাদের ছেড়ে আসা পথের সুদীর্ঘ চিহ্নটিও দেখা যায়। যেন কালো শ্লেটে ধূসর একটা ক্ষীণ লাইন। এখান থেকে দেখে মনে হয়, অত সরু পথে এলাম কি করে? অথচ আসার সময় দেখেছি এমন কিছু সংকীর্ণ নয়, ভয়াবহও নয়।

পাহাড়ের অপর দিকে তাকিয়ে দেখি। পথ আবার ধীরে ধীরে নেমে গেছে। সেদিকে চারিপাশে বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়া। নীচে শিখরগুলির পাদমূলে একটি সুন্দর হ্রদ। স্বচ্ছ সবুজ জল। শিখরদেশ থেকে কোথাও বা হিমবাহ (glacier) নেমে হ্রদের জলে পড়েছে। একদিকে কুণ্ডের জল থেকে ক্ষীণকায়া একটি নদীর ধারা বেরিয়েছে। পাহাড়ীরা বলে, লক্ষ্মণগঙ্গা। ভুন্দর নদীর অপর নাম। আসার পথে এরই ধারাকে পাহাড় থেকে উদ্দাম বেগে নামতে দেখেছিলাম—জলপ্রপাত রূপে। Valley of Flowers থেকে নেমে আসা ভুন্দর নদীর ধারাটির সঙ্গে ঘাংরিয়ার নীচে উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে।

পাহাড়ী সঙ্গীরা উত্তর পূর্ব দিকের বরফের পাহাড় দেখিয়ে বলেন, ঐ হল সপ্তশৃঙ্গ শিখর। আর দক্ষিণ-দিকের ঐ পাহাড়ের চূড়ার কাছে কাক-ভূষণ্ডী। ভুন্দর গ্রামের কাছে কাক-ভূষণ্ডী গঙ্গা; তার উপত্যকা দিয়ে যেতে হয় ওখানে। তিন-চার দিনে ঘুরে আসা যায়। বরফের মধ্যে সেখানেও হ্রদ। হেমকুণ্ডের মত।

জিজ্ঞাসা করি, সেখানে পুরাণের সেই অমর কাকের দেখা পাওয়া যায় নাকি? শুনি, এঁরা কেউ সেখানে যান নি। অতি দুর্গম পথ। সাধু-সন্ন্যাসীরাও কদাচিৎ কখনো যান।

হ্রদের দিকে নামতে শুরু করি। এতক্ষণ চড়াই ওঠার শারীরিক ক্লান্তি ছিল। পাহাড়ের উপর একটু দাঁড়াতেই সে-ক্লান্তি দূর হয়। হিমাঞ্চলের হাওয়ার এমনি স্নিগ্ধ প্রভাব। নবীন উৎসাহে নেমে চলি। অল্পই পথ। খানিকটা নামতেই সঙ্গী পাহাড়ীরা জানান, এবারে পায়ের জুতো খুলতে হবে। এ তো মানুষের গড়া মন্দিরে প্রবেশ নয়। সবটাই দেবতার স্থান। তাঁর

অন্দরমহল। এই পাথরগুলির পর আর জুতা চলে না ; হ্রদের চারিপাশে এর পর আর কোথাও অপরিষ্কার করাও চলে না। সাধু-সন্ন্যাসীরা কেউ কখনো এখানে থাকলে তাঁরাও প্রয়োজন মত এ-এলাকার বাইরে চলে আসেন। জলও অপরিষ্কার হবার উপায় নেই। কাছে গিয়ে দেখবেন। যদি কখনো কিছু— ঘাস-পাতাও—বাতাসে উড়ে এসে পড়ে—কোথা থেকে পাখীও উড়ে আসে, ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে চলে যায়। দেবতার অদ্ভুত লীলা।

হ্রদের কিছু উপরে একটা উঁচু টিলার উপর গভর্ণমেন্টের আবহাওয়া বিভাগের যন্ত্রপাতি। টেবিলের মত উঁচু-করে-রাখা কাঠের বাক্সের মধ্যে সাজানো। বরফ ও বৃষ্টিপাত এবং তাপমান ইত্যাদির মানযন্ত্র। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপরাজ্যে দৃষ্টিকটু লাগে।

অমরনাথ দেখে বলে, কয়েকটি যন্ত্র কাজ করছে না, খারাপ হয়েছে দেখছি। অথচ নিয়মিত রিপোর্ট বোধ হয় চলেছে অফিসে। নীচে থেকে একজন মাঝে মাঝে এসে রিপোর্ট পাঠায়। এখন সন্দেহ হয়, আসে কিনা!

এই অঞ্চলের নাম লোকপাল। হ্রদের নাম হেমকুণ্ড।

প্রায় গোলাকৃতি হ্রদ। আধ মাইলের উপর চওড়া। পরিধি এক মাইলের বেশী।

আবহাওয়া-বিভাগের টিলা থেকে নেমে কুণ্ডের ধারে শিখদের গুরুদ্বার। নতুন গৃহ। পাথর গেঁথে তৈরী। পরিষ্কার একখানি বড় ঘর। হ্রদের দিকে মুখ করা। ঘরের ভিতর গুরুগোবিন্দ সিং-এর ছবি, গ্রন্থ মহারাজও আছেন। ঘরের বাইরে হ্রদের তীরে পতাকা-স্তম্ভ। গোলাকৃত একটি পাথরের বেদী, তারই মধ্যে প্রকাণ্ড লম্বা কাঠের খুঁটি। কাপড় দিয়ে সবখানি জড়ানো। মাথার উপর নীল পতাকা। স্তম্ভমূলে বেদীর উপর যাত্রীদের রেখে যাওয়া ব্রহ্মকমলের গুচ্ছ। আমরাও সেখানে ফুল সাজাই।

হ্রদের ধার দিয়ে বাঁ দিকে অল্প গিয়েই লক্ষ্মণগঙ্গার উৎপত্তি। হ্রদের জলের এই একটি মাত্র নিকাশ পথ, শুনলাম। হ্রদের জলরাশি স্থির শান্ত। নদীর উৎস-মুখে গতির বেগ, মুক্তির আনন্দ। চারিদিকে ছড়ানো পাথরের উপর খেলা করে জল ছোটে— ছলছল কলকল। যেন মার কোল থেকে টলমল্ করে-চলা শিশুর প্রাণখোলা মধুর হাসি। ধারার উপর কাঠ ও পাথর সাজিয়ে ছোট পুল। অল্প জল— পড়ার ভয় নেই, পড়লেও ক্ষতি নেই।

ধারার ধারে ধারে চারিদিকে ফুল। নানারকম চারাগাছও আছে।

পাহাড়ীরা জানায়, জড়ি-বুটি সব। এর মধ্যে নানা রকম ওষুধ তো আছেই, এমন কি মরা মানুষও বাঁচে এমন শেকড়ও আ[illegible]।—উৎসাহের সঙ্গে মাটি খুঁড়ে শিকড়-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

অমরনাথ সাবধান করিয়ে দেয়, ভালো গুণ আছে অনেক শিকড়ের, ঠিকই। কিন্তু তেমনি আবার প্রচণ্ড বিষাক্তও আছে। মুখে লাগলে আর বাঁচবার কোন

উপায়ই থাকে না। ভালো ভাবে জানা না থাকলে ভুল হওয়ার আশংকা আছে—বাইরে থেকে দেখতে অনেক সময় একই রকম লাগে। এই যেমন এই চারাটা দেখছেন—এর শিকড়ের ভালো গুণ আছে, ঐ যে চারাটা—একই রকম দেখতে মনে হয়—কিন্তু কোথায় কি তফাত আমি জানি—ওটা বিষাক্ত।

বটানিস্ট বিপুলও সম্মতি জানায়,—চারাটির নাম বলে।

অমরনাথ বলে চলে, কিন্তু ক'টা গাছই বা আমরা এর মধ্যে চিনি ? আমাদের স্বাধীন দেশে এখন এইসব জড়ি-বুটি সম্বন্ধে ভালো ভাবে রিসার্চ হওয়া উচিত। অনেক নতুন ওষুধ বার হবে, মানুষের উপকার হবে।

শিশিরবাবু বলেন, হনুমান তো এসেছিলেন এই হিমালয়ে বিশল্যকরণীর সন্ধান করতে এবং শেষ পর্যন্ত গন্ধমাদন পর্বতই তুলে নিয়ে গেলেন। বদরীনাথের এইসব গিরিশ্রেণী সেই গন্ধমাদনের অংশ, শুনি।

পাহাড়ী সঙ্গীরা গল্প করে যান, হিমালয়বাসী কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসীরা এখনও এইসব জড়ি-বুটি সম্বন্ধে খবর জানেন। নিজেরা ব্যবহারও করেন, তাই দীর্ঘজীবীও হন। একবার এই অঞ্চলে কোথায় কোন্ এক সাধু এক মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন একটা শেকড় ব্যবহার করে। তার পর আর একজন লোক সন্ধান পেয়ে সেখানে গিয়ে অমরত্বের লোভে শেকড় তুলে খান, ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। ঠিক জিনিস চিনতে পারেন নি।

অমরনাথ বলে, সেইজন্যেই তো সাবধান করছিলাম। তবে তোমরা অবশ্য আমাদের চেয়ে বেশী চেনো এই সব গাছ।

কাছেই হ্রদের ধারে ধর্মশালা। পাথরের তৈরি লম্বা একখানি ঘর। ঘরের ভিতর অনেকগুলি চেরা কাঠ রয়েছে। তক্তাও জড়ো করা আছে। ধর্মশালার দরজার বাইরে দু'দিকে মাটিতে পাথরের উপর দেখি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আমাদের কুলী দুটি। বদরীনাথের দু'মাইল উপরে মানাগ্রামে এদের ঘর। এবার যখন শতোপন্থ যাই, তখন আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। সেখানে পাহাড়ের নিম্নদেশের লোকেরা বরফের উপর মাল বইতে পারে না। সেখান থেকে ফিরে আসার পরও এই মানাগ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ ছাড়তে রাজী হল না। বলে, আপনাদের তো মাল নিয়ে যাবার জন্যে লোকের দরকার হবেই। আমরাই নিয়ে যাব। আপনাদেরই সঙ্গে লোকপালও আমাদের দেখা হয়ে যাবে। তার পর পিপুলকুঠি পর্যন্ত গিয়ে আপনাদের বাস্-এ তুলে দিয়ে ফিরব।

প্রতি লোক দৈনিক চার টাকা হারে নেয়। তাদের কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিপলকুঠি যাওয়া হয়নি। যোশীমঠ থেকেই ফিরতে বাধ্য হয়। পাহাড়ের নীচের দিকের গরম সহ্য করতে পারে না। অথচ আমাদের কাছে যোশীমঠ ঠাণ্ডা জায়গা।

প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের স্বভাব, শক্তি গড়ে ওঠে। শুধু মানুষই বা কেন ?

কমলফুলগুলিও তো নীচের গরমে নষ্ট হয়ে যায়।

ঘুমন্ত কুলী দুটির ছবি তুলতে যাই। পায়ের শব্দে জেগে ওঠে। একজন চোখ বুজেই মুচকে হাসতে থাকে। অপরটি রোদ আটকাবার জন্যে চোখের উপর হাত রেখে আড়াল দিয়ে দেখে। সে-ও হাসে।

কঠিন পাথরের উপর ধূলি-শয্যা। তুষার রাজ্যে রৌদ্রের স্নিগ্ধ প্রলেপ। প্রকৃতির সহজ সামান্য দান। কিন্তু কি অসামান্য আনন্দ আনে এই অতি সাধারণ, স্বল্প-তুষ্ট মানুষগুলির মনে। নিবিড় শান্তিময় প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি।

ভাবি, শহর-সভ্যতার অত ধন-সম্পদ ; সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অত আড়ম্বর। তবুও সেখানে মনের এই অনাবিল সহজ শান্তির সন্ধান মেলে কই ?

ধর্মশালার সামনে জলের ধারে ছোট একটি পাথরের মন্দির। লোকপালের। ভিতরে একদিকে কালো পাথরের একটি ছোট মূর্তি। পূজারত। জটাজুট। এক হাত হাঁটুর উপর রাখা, অপর হাতে জপমালা। প্রবাদ, শ্রীরাম-সহোদর লক্ষ্মণজির মূর্তি। হেমকুণ্ডের তীরে তিনি দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শংকরাচার্যের নামের সঙ্গেও যোগাযোগের জনশ্রুতি আছে। অথচ, মূর্তিটি প্রাচীন বলে মনে হয় না। মন্দির বা মূর্তির মধ্যে চারুকলার সুন্দর নিদর্শনও পাওয়া যায় না।

মন্দিরের অপর কোণে ছোট ছোট আরও দুটি মূর্তি আছে। গণেশ ও লোকপাল। সে-ও প্রাচীন নয়। কিন্তু, স্থানটির প্রাচীনতা সম্বন্ধে পুরাণে প্রমাণ দেয়। নামকরণেরও কারণ পাওয়া যায়।

শিব-শংকর আত্মজ কার্তিকেয়র কাছে বদরিকাশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। বহুতীর্থ-প্রতিষ্ঠার পবিত্র কাহিনী। নারায়ণ বিষ্ণু এসে বদরীক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেছেন। নর-পর্বতে সুমেরু-শিখরে ভ্রমণ করেন। একদিন ভ্রাম্যমাণ শ্রীহরির কাছে ঋষিরা এসে অভিযোগ জানান যে লোকপালগণ গার্হস্থ্য জীবনযাপন করেন, তাই তাঁদের স্বতন্ত্র বাস প্রয়োজন, তাঁদের সান্নিধ্য তপস্যার বিঘ্ন ঘটায়। শ্রীহরি তখন লোকপালগণের অধিষ্ঠানের জন্যে নর-পর্বতের এক রমণীয় প্রান্তে এই পরম-তীর্থ স্থাপনা করেন। তারপর শৈলদণ্ডের আঘাতে পর্বত-ভূমি খনন করে সুমনোহর ক্রীড়া-পুষ্করিণী নির্মাণ করেন। দণ্ড-পুষ্করিণী। চারিদিকে তার সুরম্য উদ্যান।

'বনানি কুসুমামোদ রম্যাণি।'

পুরাণ-কাহিনী। সত্যাসত্যের প্রমাণ নেই। কিন্তু ভাবি, হিমালয়ের এই নরপর্বতের নিভৃত অঞ্চলের অপূর্ব পুষ্পরাজ্যের ও হ্রদটির সংবাদ পুরাণকার রাখলেন কি করে ? তখনও কি তীর্থযাত্রীর যাত্রা চলেছিল এই দুর্গম তীর্থে ?

যুগ-যুগান্তরের কুসুম-শোভা। পুরাণ-কাহিনীর সৌরভ-ভরা। শাশ্বত, সুন্দর। কলির কালক্ষেপে এখনও অম্লান। তাই দেখি, অতি-আধুনিক যুগেও সুদূর পাশ্চাত্ত্যদেশের বহুদর্শী বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টিতেও এখনও বিপুল

বিস্ময় আনে এই অঞ্চলের পুষ্প-সমারোহ।

মানুষের গড়া নয়,—দেবতার সাজানো বাগান—লুকানোর কথা নয়।

মন্দিরের পিছনেই হ্রদ। তীরের কাছে জলের মধ্যে ছোট বড় নানা আকারের পাথর। তারই একটির উপর একান্তে বসি।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ জলরাশি। পরপারে চারিদিকে বিশাল গিরিশ্রেণী। তারই উপর হংস-শুভ্র তুষার আবরণ। শীতের পর, মে-মাসেও সরোবর, মন্দির, ধর্মশালা, গুরুদ্বার বরফে আচ্ছাদিত থাকে। এখন সেপ্টেম্বরে দেখি, পাহাড়ের কোথাও বা তুষার-মুক্ত অনাবৃত অঙ্গের রুক্ষ ধূসর বর্ম। উপরে গাঢ় নীল আকাশ। মাঝে মাঝে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘ। সূর্যের আলো, মেঘের ছায়া অচল হিমাচলের সাদা বরফের উপর মায়া-জাল ফেলে বিচরণ করে। চারিদিক নীরব, নিশ্চল, গতিহীন। শুধু এই আলো-ছায়ার শব্দহীন সঞ্চরণ গতির ছন্দ জাগায়।

আসার সময় পাহাড়ের ওপর থেকে জলের রঙ চোখে লেগেছিল সবুজ। এখন বিস্মিত হয়ে দেখি, হ্রদের জলে কি অপরূপ বর্ণ-বিন্যাস। প্রকৃতি-দেবী যেন জলমুকুরে তাঁর রূপসজ্জা দেখছেন। আকাশের গভীর নীল, পাহাড়ের ধুম্র কালো রঙ, তুষারের শুভ্র রূপ— হ্রদের স্ফটিক-স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

যেন কোন এক বিরাট শিল্পী সজল পটভূমিতে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক অতিকায় বহুবর্ণ চিত্র এঁকে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

হঠাৎ মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। বাড়িতে দুর্গাপূজা। বিজয়া দশমী। সকালে পূজা-শেষে দর্পণে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। প্রতিমার পায়ের কাছে জলভরা একটি বড় গামলা। তার ভিতর ভাসানো একটি দর্পণ। সেই দর্পণে দশভুজার চরণ-দর্শন হয়। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সকলের সে কি উৎসাহ! মেঝের উপর মাথা নত করে দর্পণে মায়ের চরণ সন্ধান। ঐ যে সিংহের পিঠের উপর রাখা চরণখানি দেখতে পাওয়া যায়! কিন্তু আব একটি? আর একটি কই? অসুরের কাঁধে রাখা চরণখানি? ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে ফিরে দর্পণের আশেপাশে খুঁজি। ঐ যে দেখেছি! আলতা-মাখা মায়ের সেই চরণখানিও—সবুজ-বরণ অসুরের কাঁধে-রাখা রক্ত-রাঙা যেন রাঙাজবা!

আজ প্রকৃতির এই সলিল-দর্পণে জগজ্জননীর সেই অলক-রঞ্জিত চরণের সন্ধান দেবে কে, তাই ভাবি।

সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টারে ফিরি খুঁজিয়া।

স্বর্গারোহণী

॥ ১ ॥

কাঠের লম্বা টানা বারান্দা। সামনে কাঠের রেলিঙ্। উপরে করোগেটের ঢালু ছাদ। দোতলার বারান্দায় চেয়ার বার করে বসি।

সম্মুখে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। মাথায় তার বরফের আবরণ।

নীচেই অলকানন্দা নদী। তুষার-রাজ্যের রাজকন্যা। গিরি-প্রাসাদের সোপান বেয়ে ছুটে নেমে আসে। উচ্ছলিত কলোচ্ছ্বাস। যাত্রাপথে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড পথরোধ করে। রোষদীপ্তা স্রোতস্বিনী ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত সহস্র ফণা তুলে আঘাত করে। চকিতের কলহাস্যের বিপুল রোল তুলে পাথরের পাশ কেটে ছুটে নেমে যায়। পিছনে ধেয়ে নামে অচ্ছেদ্য অনুচরী অগণিত জলের ধারা। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ছুটে চলে। নিমেষে অদৃশ্য হয়। আবার নতুন ধারা নামে। ছল্‌ছল্ কল্‌কল্ ছুটে যায়। এ নামার শান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। যুগ-যুগান্তরের যাত্রাকাহিনী।

নদীর সেই চিরন্তন যাত্রা-পথের পাশেই তীর্থ-যাত্রীর যাত্রা এসে সাঙ্গ হয়। সে-যাত্রারও স্রোত চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে।

বদরিকাশ্রম।

‘বদর্য্যাখ্যং ক্ষেত্রং সর্বার্থসাধনম্।’

সর্বার্থসাধন অতি-পবিত্র বদরীক্ষেত্র।

সুন্দর, সুসজ্জিত, পাথরের বাড়ির বারান্দায় বসে ভাবি, এই সেই তীর্থক্ষেত্র!

‘ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।’

শুধু তাই?

ক্ষেত্রস্য স্মরণাদেব মহাপাতকিনো নরাঃ।
বিমুক্ত কিল্বিষাঃ সদ্যো মরণান্মুক্তিভাগিনঃ॥

এই তীর্থের শুধু স্মরণমাত্রেই মহাপাতক মানুষও অচিরে পাপমুক্ত হয়। মৃত্যুভয় দূর করে মুক্তিভাগী হয়।

আরও আছে।

অন্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ পরমদারুণম্ ।
তৎসমা বদরীযাত্রা মনসাপি প্রজায়তে ॥

অন্য-তীর্থে কঠোর তপশ্চর্যার যে ফল, শুধু মনে মনে বদরী-যাত্রা চিন্তা করলেও তার সমতুল ফল লাভ হয় ।

অতএব,—

বহূনি সন্তি তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে
বদরীসদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বহু তীর্থ আছে, কিন্তু বদরী-তুল্য তীর্থ হয় নি, হবেও না ।

স্কন্দ-পুরাণের তীর্থ-মাহাত্ম্য-কাহিনী । শাস্ত্র-বাচন ।

এখন সেখানে ইলেক্‌ট্রিক আলোর তলায় বসে পুরাণ-কাহিনী পড়ি । ভাবি, কোথায় সে বদরী-বৃক্ষ, কোথায়ই বা সে-আশ্রমের শান্তি !

যত দুরূহ তীর্থ, তীর্থ-মাহাত্ম্যেরও ততোই গরিমা । তাই, হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়, ছোট বড় শত সহস্র মন্দির । তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর নিভৃতে স্বতন্ত্র বাস । দুর্গম,—অতএব দুর্লভ । দুর্লভ, তাই লাভে মহান্ পুণ্য ।

কিন্তু এখন সভ্যতার যান চলাচলে দুর্গম হয়েছে, তাই দুর্লভও সহজলভ্য হয়েছে । যাত্রী চলেছে দলে দলে—সহস্র সহস্র । বদরীনারায়ণের ছোট শহর জন-কলরোলে মুখরিত । শহরের সভ্যতা সম্পদে সমৃদ্ধ । এখন এ-যাত্রাপথে হারিয়ে গেছে কষ্ট স্বীকার করে দুর্লভকে পাওয়ার অসীম আনন্দ ।

ওপরে সরকারী হাসপাতাল, জেলখানা, ডাকবাংলো ছাড়িয়ে এসে অলকানন্দার উপর লোহার পুল । পুল পার হয়ে এ-পারে শহর শুরু । পাথরে বাঁধানো সোজা সরু পথ । দুইদিকে সারি সারি বাড়ি । পোস্টঅফিস, দোকান, ধর্মশালা । পথের দক্ষিণে বাড়িগুলির পিছনে অল্প নীচে নদী । বামে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উঁচু স্তর উঠে গেছে । পাহাড়ের কোলে ধাপে ধাপে বাড়িও উঠেছে । কিছুদূরে এসে পথের উপর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ । একপাশে নদীর দিকে পাথরে-বাঁধানো বসবার জন্যে লম্বা জায়গা । পাহাড়ের দিকে মন্দিরের সোপান-শেষে প্রকাণ্ড তোরণ । কারুকার্যখচিত । দক্ষিণে নদীর দিকেও সোপানের আর এক ধারা নেমে গেছে । অলকানন্দার ঘাটে ও তপ্তকুণ্ডে । মন্দির ছাড়িয়েই পথের ডানদিকে সুন্দর একটি বাড়ি । মন্দির-কমিটির অতিথিশালা ।

তারই একটি ঘরেতে থাকি ।

সেক্রেটারী সাদর অভ্যর্থনা করে বল্লেন, পথের দিকের ঘরগুলিতে যাত্রীর কোলাহল । নদীর দিকের ঘরটি শান্ত—যেখানে প্রতি বছরই থাকেন, এবারও সেই ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে ।

তাই থাকিও। নদীর ধারে এই ঘরটিতে শান্তি আছে, শোভাও আছে।

ভোরে উঠে বারান্দায় বসে সে-শোভা উপভোগ করি।

বদরীনাথ উঁচু জায়গা। ১০,১৩৯ ফুট। শীত থাকাই স্বাভাবিক। তবুও, ভোরে ওঠার অসুবিধা নেই। যা কিছুর প্রয়োজন, ঘরের সঙ্গেই তার সুব্যবস্থা আছে। গরম জলেরও কোন অভাব নেই। যে কোন সময় তপ্তকুণ্ড থেকে বালতি ভরে আনলেই হয়।

বারান্দার নীচে নদীর নতুন ঘাট বাঁধানো হচ্ছে, দেখি। তপ্তকুণ্ডের কাছ থেকে লম্বা টানা সেই ব্রহ্মকপালীর শিলা পর্যন্ত। যাত্রীদের বেড়াবার, বসবার রম্যস্থান হবে। ভাবি, নদীর দুর্দান্ত স্রোতে রাখবে তো? না রাখলেই বা ক্ষতি কি? নদীর কূলে প্রকৃতির ছড়ানো পাথরগুলির উপর বসার আনন্দ কি কম?

ওপারে ছোট ছোট কয়েকটি কুটির। বদরিকাশ্রমে যে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী, এখনও একান্তে থাকেন, ঐ-পারে তাঁদের বাস। প্রতি বছর এ পারে বারান্দায় বসে তাঁদের দেখতে পাই। কেউ নামছেন নদীর তটে, কেউ বা চলেছেন উপরে এক ঝরনার ধারে। কারো গেরুয়া বাস, কারো বা কৌপীনসার। এ-পারে বসেও ও-পারের শান্ত আবহাওয়ার শান্তি অনুভব করি। পাহাড়ের সবুজ-অঙ্গে গেরুয়া রঙের কয়টি ফুল যেন বাতাসে দুলে যায়!

সেক্রেটারী বলছিলেন, এবার অলকানন্দার ওপর নতুন ব্রীজটা তৈরি হয়ে গেল, দেখছেন?

দেখি বটে। সুন্দর লোহার পুল। তপ্তকুণ্ডের নীচেই।

এই নতুন পুল-তৈরির ইতিহাস আছে।

অলকানন্দার দুই তীরে দুই গিরিশ্রেণী। বামে নর-পর্বত। দক্ষিণে নারায়ণ পর্বত। যেন, নর-নারায়ণের সম্প্রসারিত দুই বাহুর আবেষ্টনে সংফুল্লা পার্বত্য নদী তরঙ্গ-ভঙ্গে বয়ে চলেছেন।

নারায়ণ-পর্বতের কোলে বদরীনারায়ণের মন্দিরকে ঘিরে শহর উঠেছে। শহরের পিছনে নারায়ণ-পর্বতের উচ্চ শিখর। গ্রীষ্মকালেও স্বল্প তুষারাবৃত। তার পিছনে আকাশ-চুম্বী নীলকণ্ঠ শিখর। চির তুষার আচ্ছন্ন। ২১,৬৪০ ফুট উঁচু। বদরীনাথ শহর থেকে এই শিখরের দর্শন মেলে না। শহরের সমীপবর্তী গিরিশ্রেণী দৃষ্টিপথ রোধ করে। নদীর অপর পার থেকে নীলকণ্ঠের অনুপম শোভা চোখ ও মন আকর্ষণ করে। হিমালয়ে এর চেয়ে আরো উঁচু শিখর বিরল নয়। কিন্তু, এমন কমনীয় কান্তি কচিৎ দেখা যায়। বিদেশী পর্যটকও এর শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে নামকরণ করেন: The Queen of Garhwal।

ভারতবাসীর কানে নীলকণ্ঠ নাম আরও মধুর শোনায়। শুভ্র জটাজুট যোগীশ্বর নীলকণ্ঠ। ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব মহাদেব।

ওপার থেকে অবাক হয়ে দেখি। পাণ্ডাজি বলেন, চূড়ার নীচে দেখেছেন?

সাদা বরফের মাঝখানে হঠাৎ খানিকটা কালো দাগ। নীলকণ্ঠ যে!

কালো চিহ্নটি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে অলৌকিক কোনও কারণ নেই। কেন না, বুঝি, পাহাড়ের ঐ অংশের মসৃণ অঙ্গ এমনি সোজাভাবে নেমেছে যে বরফ পড়লেও স্থায়ী হয়ে ওখানে থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। তবুও, শিখরের ঠিক কণ্ঠদেশে এমন চিহ্নটির সঙ্গে নামকরণের আকস্মিক যোগাযোগ যুক্তিবাদী মনেও ক্ষণিক আনন্দ আনে।

কিন্তু, সৌন্দর্যেরও বিপদ আছে।

শহরের ঠিক মাথার উপরে ও অতি সন্নিকটে তুষার-শীর্ষ শিখর। শীতকালের পর যখন বরফ গলে, তখন অতিকায় তুষারের ধস্ (avalanche) পাহাড়ের উপর থেকে হঠাৎ নেমে আসে। শহরের অংশ ধ্বংস করে।

১৯৫২ সালের কথা। সে বছর যখন আসি, তার কিছুদিন আগেই এই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পেঁছে দেখি, শহরের চারিদিকে ধ্বংসের লীলা। তুষার-বন্যা-বিধ্বস্ত। যেন, ভূকম্পনের পর করুণ দৃশ্য। ওই অতিথিশালাটিরও এক অংশ ভেঙে গিয়েছিল। সেই সব ভাঙা অংশের গহ্বরে তখনও বরফের স্তূপ জমে রয়েছে। তবে, বহু ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয় নি। কেন না, সাধারণত যে-সময়ে এই সব বরফ গলে নেমে আসে, তখনও মন্দির খোলে না। শহরবাসীরাও এখানে তখন থাকে না।

মাঝে মাঝে এমন দুর্ঘটনা হলেও মন্দিরটির কোনকালে ক্ষতি হয় না।

স্থানীয় লোকেরা দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে বলেন, নারায়ণের অসীম কৃপা!

নদীর অপর পারে নর-পর্বতের কোলে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে সেখানে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। নদী থেকে গিরিশ্রেণী বেশ কিছু দূরে। তাই, শঙ্কিত ও সাবধানী কর্তৃপক্ষের মন ঐদিকে এই বিপদ এড়ানোর উপায় খোঁজে। গভর্ণমেণ্টও অনুমোদন করে,—নতুন শহর ও-পারে গড়ে তোলা হোক্। শুধু মন্দিরই থাকবে এ-পারে। দেবতাকে স্থানচ্যুত করার বাধা ও আপত্তি আছে।

সেই পরিকল্পিত ব্যবস্থার প্রথম সূচনা,—পারাপারের এই নতুন সেতু।

পূর্বে অপর পারের সাধুদের কুটিয়াতে যাতায়াতের পথ ছিল—প্রায় আধ মাইল আগে শহরের প্রবেশ-পথের কাছে পুরানো সেতুটি। সেখান দিয়ে—অর্থাৎ প্রায় মাইলখানেক ঘুরে গেলে, তবে শহর থেকে ঐ সব কুটিয়াতে পেঁছানো যেত। যাত্রীদের নিত্য যাতায়াতের পথ নয়। দর্শন-প্রার্থী যাত্রীরাই শুধু যেতেন।

সেক্রেটারী নতুন পুলটি দেখিয়ে বলছিলেন, এখন বড় সুবিধা হয়ে গেল। যাত্রীরা এখন এপারে সোজা মন্দিরে এসে উঠবে। এঁর মধ্যে অনেকে এ-পুল দিয়ে যেতে আসতে শুরু করেছে। ও-পারে বড় সড়বও হচ্ছে, নতুন খুব ভালো একটা ধর্মশালা তৈরিরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাতে আপনাদের সব রকম আয়োজন

থাকবে।

এমন জায়গায় এমন সুন্দর লোহার পুল করায় মানুষের বাহাদুরি আছে, স্বীকার করি। আবার প্রশ্নও করি, কিন্তু সাধুদের হবে কি?

সেক্রেটারী বলেন, কেন? তাঁদেরও তো মন্দিরে ও তপ্তকুণ্ডে আসা কত সহজ হয়ে গেল। এক মাইল ঘুরে আসতে হবে না। যাঁরা মন্দিরে প্রসাদ বা ক্ষেত্রগুলিতে ভাণ্ডারা নিতে আসেন—তাঁদেরও যাতায়াতের কত সুবিধা হয়ে গেল।

হেসে বলি, সুবিধে বটে। সদর রাস্তার ওপর এখন তাঁদের কুটিয়াগুলি পড়ল। শুধু যে স্বতন্ত্রতা হারালো, তাই নয়, সকাল থেকে এখানে বসে দেখছি, সারি সারি যাত্রী চলেছে পুল দিয়ে অপর পারে। সাধু-সন্দর্শনে নয়, লোটা-হাতে!

সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করি, শহরের উন্নতি হচ্ছে; রাস্তা খুলছে; তার ওপর সাধুদের কুটিয়া পড়লো। এর জন্যে betterment levy বা কোন ট্যাক্স বসবে না?

সেক্রেটারী হাসেন। বলেন, ঠাট্টা করছেন আপনি। যেমন দেবতার মন্দির, তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীদের বাসও তো এইসব তীর্থক্ষেত্রের গৌরব। তাঁদের ওপর কর-ধার্যের কথা ভাবতেই পারা যায় না।

আমি বলি, তা হলে এখন ভাবতে শিখুন। স্বাধীন ভারতেও কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে যে। শুনুন তবে উত্তরকাশীর এক সাধুর চিঠিতে-লেখা খবর।

উত্তরকাশী হিমালয়ের এক বহু প্রাচীন, অতি-শান্ত তীর্থক্ষেত্র। অনেক সাধুসন্তের সেখানে নিভৃতে বাস। একান্তে সাধন-ভজন করেন। কঠোর সন্ন্যাসজীবন পালন করেন। প্রবাদ, বারাণসী কাশীতীর্থ মর্ত্যের মানুষের জন্যে, হিমালয়ের উত্তরকাশী দেবতাদের জন্যে। সেখানেও উত্তরবাহিনী ভাগীরথী-গঙ্গা, দুইদিকে বরুণা ও অসি—দুই নদী, গঙ্গার উপর দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির—সব কিছুই আছে। এমন কি, মণিকর্ণিকার ঘাট পর্যন্ত। অবশ্য কাশীর তুলনায় আয়তনে সবই ছোট। শহরও ছোট। তবে ক্রমে ক্রমে সভ্যতার শ্রী ও সম্পদে সমৃদ্ধ হচ্ছে। বড় বড় বাড়িও উঠছে। সেনানিবেশও বসেছে। শহরের বাইরে সাধুদের কুটিয়া ও আশ্রমগুলি। সেবার গঙ্গোত্রী যাবার পথে উত্তরকাশীতে কয়দিন ছিলাম। এক পূর্ব-পরিচিত স্বামীজির আশ্রমেও গিয়েছিলাম। ভাগীরথীর ঠিক উপরেই অতি মনোরম শান্ত স্থান। শহরের বাইরে—একান্তে, নিভৃতে। একাই থাকেন। জলের কয়েক হাত উপরেই তাঁর ভজন-কুটি। জিজ্ঞাসা করি, বর্ষায় ঘরে জল আসে না?

বলেন, এখনও তো কোন বছর আসে নি। বেশী জল নামলে—অপর পারে

জল ছড়িয়ে যায় ; এপারে এখানে এতদূরে ওঠে না। অথচ, কি সুবিধে দেখুন, কয় হাত নামলেই গঙ্গার জল। জলের কোন অভাব নেই। সারাক্ষণই ভাগীরথী-তীরে আসন করে আছি। মনে কত শান্তি ও আনন্দ আনে।

সেই স্বামীজিরই ক'বছর পরে এক চিঠিতে খবর পেলাম। শহরের অনেকরকম উন্নতিসাধন হচ্ছে। জলের পাইপও বসেছে। শহর থেকে কিছু দূরে এক পাহাড়ের উপরের ঝরনার জল সেই পাইপ-এ আনা হয়েছে। তাই, জলের ট্যাক্সও বসেছে। নোটিশ হয়েছে সকলের ওপর—যাঁদের এলাকার সামনে দিয়ে পাইপ গেছে তাঁদেরও ধার্য ট্যাক্স দিতে হবে—তাঁরা পাইপ-এর জল ব্যবহার করুন বা নাই করুন। স্বামীজির উপরও নোটিশ হয়েছে; কেননা তাঁর আশ্রমের কাছ দিয়ে পাইপ-লাইন গেছে। খবরটি দিয়ে স্বামীজি লিখছেন, পাইপ-এর জলের আমার কোনও প্রয়োজন নেই এবং থাকতেও পারে না,—নিজের চোখেই সব দেখে গেছেন। গঙ্গামায়ের কোলের উপরই তো আশ্রয় পেয়েছি। তবুও, ট্যাক্স দেবার দায়িত্ব হয়েছে বলে দাবি করে নোটিশ দিয়েছে। অথচ বহু বছর হয়ে গেল সব কিছু ছেড়ে হিমালয়ে চলে এসেছি। টাকাকড়ি তো দূরের কথা, পূর্বাশ্রমের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কারো সঙ্গে সংশ্রব পর্যন্ত রাখি নি, রাখার কথাও নয়। এখানে সব মহাত্মাদেরই সেই একই কথা। সবাই একান্তে আপন সাধনভজন নিয়ে আছেন। কোথায় পাবেন ট্যাক্স দেবার টাকা? অর্থ-জালে যদি আবার জড়াতেই হয় তো হিমালয়ে এই সন্ন্যাস-জীবনই নিরর্থক। এখন শুধু ভাবছি কোথায় আবার তিনি টেনে নিয়ে যাবেন।

ভাবি, শহর-লোকালয় ছেড়ে সর্বত্যাগী হয়ে সাধুরা এলেন হিমালয়ে বনবাসে ভগবৎ-সাধনায়, কিন্তু নগর-ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত ভাবে তাড়না করে আসে এঁদেরও পিছনে—এখানেও—করের কৃপাণ-হাতে।

॥ ২ ॥

বদরীনাথে একদিন ওপারে গেলাম স্থানীয় ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তার বলে নয়। বাঙালী। তাই, খবর পেতে তিনি নিজেই এসে আলাপ করেন। একদিন রাত্রে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। তাতে রাজী হই না। বলি, আপনার বাড়িতে তো নিশ্চয় যাব, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নয়।

তিনি ছাড়েন না। অগত্যা চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

ওপারে হাসপাতালের পাশে তাঁর থাকবার বাড়ি। সরকারী কোয়ার্টারস্। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে যাই। সঙ্গে চলেছেন স্থানীয় আর একজন বাঙালী। সেদিনই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। এখানে কাজ নিয়ে এসেছেন। কয়েক মাস থাকতে হবে। মন্দিরের কাছে একটি ঘরে থাকেন। একা। একটি পাহাড়ী ছোকরা তাঁর বাড়ির কাজকর্ম করে দেয়।

ভদ্রলোক বলেন, এমনি করেই চলে যাচ্ছে দিন। ক'টা মাস কাটলে বাঁচি।

দেরাদুনে জমি কিনেছি কিছু। একটা ছোট বাড়িও করেছি সেখানে। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় অল্প যা কিছু আনতে পেরেছিলাম—তাই দিয়ে আবার এক নতুন জীবন শুরু করেছি। স্ত্রী আছেন দেরাদুনে, চাষ করাচ্ছেন সেখানে। ছেলে ও মেয়ে তাঁর কাছে আছে। স্কুল কলেজে পড়ে—তাই তাদের আসার উপায় নেই। আমি একলাই পড়ে আছি এখানে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

হেসে বলি, কেন? তীর্থ-বাস হচ্ছে। পুণ্যলাভ করছেন তো।

উত্তর দেন, প্রথম যখন আসি তাই মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু, বাধ্য হয়ে বেশীদিন থাকতে হলে ও-সব ভাব আর থাকে না। সংসারী মানুষ, মশাই!

যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করি, ডাক্তারবাবুর ওখানে প্রায়ই যান নিশ্চয়?

বলেন, হ্যাঁ। বিদেশে বাঙালী পরম আত্মীয় মনে হয়। দুটো সুখ-দুঃখের কথা মাতৃভাষায় মন খুলে বলা যায়। তা ছাড়া—আরও একটা কারণ আছে। —বলে মুচকে হাসতে থাকেন। বলেন, সব্জির মধ্যে আলু ছাড়া এখানে খাদ্য তো নেই। মাঝে মাঝে মুখটা ওখানে বদলানো যায়।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, অন্য সব্জি ওঁরা পান কোথায়? নীচে থেকে আনান বুঝি?

এঞ্জিনিয়ার হেসে বলেন, সে তো দু-একরকম আনান-ই। হাসপাতালের জিনিসপত্র যখন আসে সেই সঙ্গে আনানোর কোন অসুবিধে নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রীও সঙ্গে আছেন। তিনি রাঁধেনও ভালো। হাজার হোক বাঙালী মেয়ে তো! কিন্তু সে-সব এমন কিছু নয়।—বলে, আবার মুচকে হেসে চাপা-গলায় বলেন, একটু মাছ-মাংসও চলে যে!

মাছ-মাংস! আশ্চর্য হই। জিজ্ঞাসা করি, এখানে মাছ-মাংস? এ-সব চলে নাকি?

উত্তর শুনি, চালালেই চলে। তীর্থক্ষেত্র হল গঙ্গার দক্ষিণ কূলে—এপারে। ও-দিকটা তো বদরী-পুরীতে নয়। অপর পারে যে! ডাক্তারবাবু কারিতকর্মা আছেন। বিশেষ ব্যবস্থা করে কিভাবে যোগাড় করান। অবশ্য মাঝে মাঝে। শুনেছি, পাহাড়ীরাই এনে দেয়, পয়সা পায়। তারাও কেউ কেউ খায় যে!

কোন মন্তব্য করি না। তবুও তিনি নিজেই বলে চলেন, দেখুন, ও-সব নিয়মকানুন হল তীর্থ-যাত্রীদের জন্যে, যাঁরা আসেন পুণ্য করতে। আর, তাঁরা আসেনও তো দু'দিনের জন্যে। খুব জোর দু-রাত্তির বাস। কিন্তু যাদের চাকরির তাড়নায় মাসের পর মাস এখানে কাটাতে বাধ্য হতে হয়—তাদের পক্ষে ও-নিয়ম চলবে কেন? এই দেখুন না যেমন রীতি-নীতি তার সমাধানও তেমনি। এখানকার এক অফিসারের স্ত্রীর সন্তান হল—এ-পারে পুরীতে হবার নিয়ম নেই। তাই, ও-পারে একটা বাড়ি নিয়ে সেইখানে তাঁকে সপরিবার থাকতে হচ্ছে। বললাম যে, ও-পারে দোষ নেই।

চুপ করে শুনি। ভাবি, এত কৈফিয়ত-এরই বা প্রয়োজন কি।

ডাক্তারবাবু আমাদের পেয়ে খুব খুশি। বলেন, আজ চায়ের সঙ্গে শুধু পাঁপরভাজা, পকৌড়ি খেয়ে গেলেন—এ ঠিক হল না। শতোপন্থ থেকে ঘুরে আসুন—তারপর রাত্রে একদিন এখানে আহার করতেই হবে।

বলে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি চুপ করে রইলে কেন? ভালো করে তুমিও বলো।

ভদ্রলোক সাদাসিধে, মনখোলা। অনেক কিছুই গল্প করেন। জিজ্ঞাসা করেন, আর একজন বাঙালী ডাক্তারবাবুও যে এখানে এসেছেন—দেখা হয়েছে নাকি? দেবপ্রয়াগে এক বছর ছিলেন। এখন বদলী হয়ে গেলেন কাশীতে। যাবার আগে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ করে যাচ্ছেন। ভালোই করেছেন; আবার কবে এদিকে আসা হয় কি না হয়। তারপর একটু রাগ করেই বলেন, কিন্তু দেখুন, ওঁর একটা আচরণ দেখে আমার আজ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, দু-এক কথা শুনিয়েও দিয়েছি। তিনি নিজে খুব ভক্ত—সারা পথ স্ত্রীকে নিয়ে হেঁটে এসেছেন। তা আসুন। কিন্তু, ছোট ছেলেমেয়ে দুটো—সাত-আট বছর মাত্র বয়েস হবে—তাদেরও সমস্ত পথ হাঁটিয়ে এনেছেন।

আমি তখনি বলি, সে ভদ্রলোক যে রয়েছেন আমাদেরই বাংলোতে, সামনের দিকের ঘরে। আসার সময়ও তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে বারান্দায় দেখলাম। রোগা লিকলিকে চেহারা—একটার পায়ে যেন কি বাঁধাও দেখেছিলাম।

ডাক্তারবাবু বলেন, তাই থেকেই তো জানতে পারলাম। ছেলেটার পায়ে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে গেছে—তবুও হাঁটিয়ে এনেছেন; এখন এসেছেন ঘা সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। আমি শুনেই বললাম—ঐ বাচ্ছা দুটোকে এই পাহাড়ের পথ হাঁটিয়ে আনলেন কি বলে? দুজনের জন্য একটা ডাণ্ডিও তো ভাড়া করতে পারতেন? তিনি কি উত্তর দিলেন জানেন? নির্বিকার ভাব দেখিয়ে বললেন, পায়ে হেঁটে না এলে তীর্থে আসার পুণ্য ওদের হবে কি করে? জবাব শুনে আমিও দিলাম দু-কথা শুনিয়ে,—বাপ, না—

আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাই—বলি, চলুন, আর ঘরে বসে গল্প নয়। সন্ধ্যা হবার আগে এ-পারে একটু ঘুরে বেড়ানো যাক।

ডাক্তারবাবু উল্লসিত হন। বলেন, খুব ভালো কথা। চলুন। এ-পারটা বেশ নিরিবিলি। সাধুদের কুটিয়াও আছে। দর্শন করে আসবেন। আমি প্রায়ই এদের কাছে যাই। কে জানে, কারো কৃপায় যদি কিছু পেয়েই যাই। বলা তো যায় না।

বলি, চলুন এমনি বেড়ানো যাক্। সাধুদের নাই বা বিরক্ত করলাম।

গল্প করতে করতে এগিয়ে চলি। কিছুদূরে একটি কুটিয়ার কাছে এক সাধুকে দেখে ডাক্তারবাবু সেদিকে যান। আমাদের ডাকেন, চলে আসুন। ওঁর

একবার খবর নিয়ে যাই। কিছুদিন আগে নিউমোনিয়া হয়েছিল। চিকিৎসা করেছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

জিজ্ঞাসা করি, কি চিকিৎসা করলেন ?

বলেন, পেনিসিলিনেই কাজ হয়েছিল। বুকে যা সর্দি জমেছিল, আমি তো ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু, খুব তাড়াতাড়ি সেরে গেছেন। তবে, দুর্বলতা এখনও আছে। পথ্য তো কিছু নেই—ক'দিন আমি একটু দুধের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। এমন অসুখেও সামান্য একটা কম্বলেই এই শীতে কাটিয়ে দিলেন। আশ্চর্য!

সাধুজীর কুটিয়ার বাইরে ছোট বাগান। সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। নানান্ রঙের মরসুমী ফুল। বাগানের এক অংশে বয়ে যাওয়া ছোট্ট একটি ঝরনার জলধারার মুখ বন্ধ করে জলাধার তৈরী হয়েছে। লম্বাচওড়ায় তিন-চার হাত মাত্র হবে। অতিরিক্ত জল অপর দিক দিয়ে বার হয়ে বয়ে যাচ্ছে,—নীচে অলকানন্দার দিকে। জলের ধারে কয়েকটি সমতল পাথর। বসবার সুন্দর আসন। তারই একটির উপর স্থির হয়ে বসে আছেন।

দেখলেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে। সাদা লম্বা দাড়ি-গোঁফ। অঙ্গে সামান্য একটা আবরণ। সৌম্যমূর্তি। শান্ত দৃষ্টি।

সকলে প্রণাম করলাম। বসতে বললেন। সম্প্রতি রোগভোগের চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পায়। বাঙালী। বাঙলাতেই কথা বলেন। স্বল্পভাষী।

'কেমন বোধ করছেন?'—ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে মৃদু হেসে আকাশপানে হাত তুলে নমস্কার করে শুধু বলেন, তাঁরই দয়া।

প্রায় পঁচিশ বছর এখানে আছেন, শুনি। হিসেব করে বলি, মাকে নিয়ে আমিও প্রথম এখানে এসেছিলাম—১৯২৮ সালে। তখন হৃষিকেশ থেকেই হাঁটতে হয়েছিল। মার জন্য অবশ্য ডাণ্ডী ছিল—কিন্তু, তিনিও হাঁটতেন প্রায়ই। এখন বাস হয়ে যাতায়াতের অনেক সুবিধে হয়েছে বটে, কিন্তু তখনকার যাত্রার আনন্দ অন্য রকমের ছিল বলে মনে হয়। এই বদরীপুরীও তো কত শান্ত ছিল।

হঠাৎ নতুন পুলটার কথা মনে হয়। জিজ্ঞাসা করি, এখানকার শান্ত আবহাওয়ার এতে বিঘ্ন ঘটাবে না তো ?

তাতেও তিনি মৃদু হাসেন, বলেন, শান্তি তো মনে! মন যদি সুসংযত আত্মস্থ থাকে, বাইরের শংকোলাহলও সেখানে পৌঁছতে পারে না। তবে তীর্থক্ষেত্রের শান্তির কথা স্বতন্ত্র। এখানকার আবহাওয়ার পরিবর্তন তো ঘটছেই। এ-পুল তৈরি তার একটা সামান্য স্পর্শ মাত্র। নানান্ শ্রেণীর লোক এখানে আসতে শুরু করেছে, বহুরকম উদ্দেশ্য নিয়ে। স্থানীয় লোকদেরও জীবনযাত্রার রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের মনোবৃত্তির বিবর্তন ঘটছে।

তারপর আরও মৃদুভাবে বলেন, যারা দুদিনের জন্যে আসে তাদের চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু কয়েক দিন থাকলেই কত কি না দেখা যায়। এমন কি বন্দুক হাতে পাখি শিকার করতে আসতে দেখা গেছে। বড় শহর গড়ে উঠেছে, শহরের লোকের মনোভাবও দেখা দেবে, আশ্চর্য কি? সেই সঙ্গে শহরের যা কিছু দুর্নীতি এখানেও ধীরে ধীরে মানুষের মনে বাসা বাঁধছে। কলির যুগধর্ম। এর প্রতিকারও নেই, প্রতিরোধও নেই।

চুপ করে শুনি। তাঁর কথার ভাবে, বলার ভঙ্গিমায় বেশ বুঝি, এটি অভিযোগ নয়। ভবিতব্যের স্বীকৃতি মাত্র।

আবার শান্তভাবেই তিনি বলেন, মানুষের মানসিক প্রবৃত্তি রক্তবীজের মত রক্তে থাকে। সুযোগ সুবিধা পেলেই সজাগ হয়ে ওঠে। লোভনীয় কিছু না থাকলে মানুষও নির্লোভ থাকে। এখন এখানে অনেক কিছুই আসছে ঘটছে। এখানকার লোকেও দেখে শিখছে। তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতাবোধ রক্ষাকবচের কাজ করত—এখন তার প্রভাব যাচ্ছে। মানুষের নীচ বৃত্তিগুলি খাদ্য পেয়ে এখানকার মানুষের মনেও মাথা তুলছে—তারাও মানুষ হয়ে উঠছে। মানুষ-খেগো বাঘ, শুনেছি, মানুষের রক্তের স্বাদ পাবার পরই মানুষ-খেগো হয়ে ওঠে—তার আগে নয়। এও তেমনি আর কি!

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, দুঃখ করার কিছু নেই, করেও লাভ নেই। তবে এই শরীরটাকে অন্য কোথাও নিভৃতে সরানো প্রয়োজন। তীর্থক্ষেত্রের—বিশেষত হিমালয়ের এই সব অঞ্চলের—একটা বিশেষ প্রভাব আছে। কত প্রাচীন মুনি-ঋষির তপোভূমি। তাই তো বদরিকাশ্রমে এসে মন্দিরের অত কাছে থেকেও এ-পারে দূরে থাকা!

অভিযোগ শুনেছিলাম আর এক সাধুর কাছে।

ইনিও বাঙালী। বছর ত্রিশের উপর এখানে আছেন। হঠাৎ আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। গেরুয়া বেশভূষা। বৃদ্ধ হলেও সক্ষম সবল দেহ। গোল মুখখানি সাদা-কালো দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন। অভ্যর্থনা করে বসতে বললাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনি এখানে ক'বার এসেছেন শুনেছি, কিন্তু কোনবারই আলাপ হয়নি। আমার কথা আপনাকে পুরী নিশ্চয় বলেছেন?

মনে পড়ল কলকাতা ছাড়ার আগেই এক স্বামীজি এঁর কথা বলেছিলেন বটে।

বললাম, হ্যাঁ। তা আপনি নিজেই কষ্ট স্বীকার করে এসে গেছেন!

তিনি বলেন, মন্দিরে রোজই আসি। এ-বাড়ি তো পথের ওপরেই।

তারপর শুরু করেন তাঁর বক্তব্য। স্থানীয় এক সেবাশ্রমের কর্মীদের বিরুদ্ধে অশেষ অভিযোগ।

বলেন, অনেকগুলি সাধুসন্ত সেখানে নিয়মিত ভান্ডারা পাচ্ছিলেন, হঠাৎ ক্ষেত্রের সেবাকার্য এখানে বন্ধ হল। কোন পূর্ব বিজ্ঞপ্তি নেই। সাধুদের দুর্দশার কথা কেউ একবার ভাবলেনও না। শুধু তাই নয়। সাধুদের দান করার উদ্দেশ্যে যে-সব কম্বল এসেছিল, সেগুলি বাজারে বিক্রী হয়েছে। ক্ষেত্রের পুস্তকাগারে যে-সব ধর্মগ্রন্থ ছিল তা ওজন-দরে বিক্রী করেছে। এখনও বাজারে গেলে দেখা যাবে তাতে ঠোঙা তৈরী করে জিনিস বিক্রী হচ্ছে!

স্তম্ভিত হয়ে শুনি। তিনি উত্তেজিত হয়ে আরও অনেক কিছুই জানান।

ক্ষমাহীন চক্ষু ক্রোধে জ্বলতে থাকে। মন্তব্যের মধ্যেও আগুন ছোটে। বলেন, গেল, সব গেল—ধর্মের আর কিছুই রইল না;—পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব। যাবে, নিশ্চয় যাবে। মহামায়ার খেল্ দেখবেন তখন।

ভাবি, গেরুয়াবাস তো নয়, যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। মূর্তিমান্ অভিশাপ।

সব শুনে আশ্বাস দিই, ফিরে গিয়েই কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করে জানাব।

তাতে তিনি নিরস্ত হন না। তাঁদের উপরও তাঁর বিশ্বাস নেই। উত্তেজনা-বশে আবার অভিযোগগুলির পুনরুক্তি করতে বসেন।

চুপ করে বসে থাকি। বাইরে তাকাই। চোখে পড়ে, অলকানন্দার উদ্দাম স্রোত। চিরন্তন। মঙ্গলময়। কর্ণকুহরে বেঁধে স্বামীজির ক্রোধোন্মত্ত বাক্যবাণ। সুতীক্ষ্ন। বিষময়।

স্বামীজি বলেন, আমার কাছে তো শুনছেন, আমি এখানকার আরও কয়েক-জনকে নিয়ে আসব, তাঁদের মুখেও শুনবেন। বাজারেও আপনাকে নিয়ে যাব—নিজের চোখে দেখবেন—যা কিছু বলছি সত্যি কিনা।

আমি প্রমাদ গনি। তৎক্ষণাৎ বলি, আর সকলে এসে নতুন কিছু বলবেন না তো? যা জানবার আপনার কাছেই তো জানলাম।

তাতে সন্তুষ্ট হন না। বলেন, অন্য লোকের কাছেও শুনুন। সত্যাসত্য নিজেই যাচাই করে দেখুন—যখন এসেছেনই এখানে।

বিনীতভাবে জানাই, ও-জন্যে তো এখানে আসা নয়। তবে খবরগুলি আপনি জানাতে চেয়েছিলেন, জানিয়েছেনও। আমার দ্বারা যেটুকু করবার নিশ্চয় করব। অন্য লোকের মুখে আবার শোনার প্রয়োজন নেই।

তবুও, ছাড়েন না। সবাইকে দল বেঁধে আনতে চান।

ভাবি, অভাব-অভিযোগ-অপকীর্তি সে-সব তো আছেই; এখানে এসেও সেই অশান্তির দুর্ভোগ। স্বামীজিকে বলি, দেখুন, আপনি প্রাণ খুলে সব জানিয়েছেন, এবার আমিও মন খুলে একটা কথা বলি। কিছু মনে করবেন না। এখানে এইসব আলোচনা আমার কাছে রুচিকর নয়। তবুও সব শুনেছি, যা করবার নিশ্চয় করব। আর, সত্য-যাচাই-এর কথা বলছেন? আপনার কথায় যদি বিশ্বাস করে থাকি অপর লোকের কাছে যাচাই করার কথা ওঠে না। আর আপনার

কথায় যদি সন্দেহ থাকে, অপরের কথাতেও যে সে-সন্দেহ থাকবে না, কে বলতে পারে? অতএব, ও-প্রসঙ্গ আর না।

তিনি হেসে ওঠেন। বলেন, আচ্ছা, থাক্, ও নিয়ে আর নয়। অবশ্য বলে রাখি, আমার নিজের লাভ-ক্ষতি ওতে কিছু হয় নি। কয়েকটি অসহায় সাধুর দুরবস্থা দেখেই মনটা আকুল হয়ে উঠেছিল। আর লোকগুলির তীর্থক্ষেত্রেও আচরণ দেখে। কিন্তু, যাক্ ও সব। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি হরেনকে চেনেন তো? হরেন—আমাদের হরেন গো!

ভাবি কয়েকটি হরেন নাম-ধারীকে তো চিনি। এঁর হরেনটি কে?

প্রশ্ন করে বুঝতে পারি। বলি, ওঃ! তার কথা বলছেন? আসার আগের দিনও দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তার সঙ্গে যে প্রায় রোজই দেখা হয়।

স্বামীজি বলেন, তা আমি জানি। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, তার মেয়ের বিয়েটা এখনও দিলে না কেন? বুড়ো বাপ এখনও রয়েছেন, এই বেলা দিয়ে দেওয়াই ভালো। সব দিক দিয়েই সুবিধে—তা সে বুঝবে না।

মেয়ের বিবাহের জন্যে হরেনের চিন্তা ও চেষ্টার কথা জানা ছিল। তাই বললাম, সে চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও কোথাও যোগাযোগ হয় নি। পাত্র পছন্দ হয় তো কুষ্ঠি মেলে না, কুষ্ঠি মেলে তো পাত্র পছন্দ হয় না।

তিনি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলেন, না—নাঃ! ওর কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাপ থাকতে থাকতে কোথায় নিজের মেয়ের বিয়ের দায়িত্বটা কাটিয়ে নেবে, তার মর্মও বোঝে না। আমার নাম করে তাকে আপনি বলবেন।

এরপর তাঁর সঙ্গে যে ক'দিনই দেখা হয়েছে, হরেনের মেয়ের বিবাহের জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তা প্রতিদিনই প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি, যেদিন ফিরে আসি সেদিনও তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে মন্দিরে চলেছেন। সিঁড়ির উপরে মন্দিরতোরণের কাছ থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছেন, আমরা নীচে রাস্তা দিয়ে চলেছি। দূর থেকে হাত তুলে নমস্কার করলাম। হাসিমুখে হাত তুলে তিনিও চেঁচিয়ে বললেন, যাত্রা করলেন তাহলে! ধীরে ধীরে পথ চলবেন। বাড়ি পেঁছে চিঠিতে পেঁছানো সংবাদ দেবেন যেন। আর, ভালো কথা, হরেনকে বলবেন, বাপ থাকতে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে দেয় যেন।

'আচ্ছা'—বলে চলতে থাকি। তাঁর কথাগুলি কানে কিছুক্ষণ বাজতে থাকে।

হিমালয়-বাসী সর্ব-ত্যাগী এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কার এক অনূঢ়া কন্যার বিবাহের জন্যে এ কি দুশ্চিন্তার নিগ্রহ!

আর একবারের একটি ছোট্ট ঘটনা। ছোট হলেও মনে উজ্জ্বল রেখা রেখে গেছে।

বিকেল বেলা। বদরীনাথে বাড়ির সুমুখে পায়চারি করছি।

এক স্বামীজী এলেন। গেরুয়া-বাস। লম্বা চেহারা। দাড়ি গোঁফ মাথা কামানো। হাতে দীর্ঘ দণ্ড।

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো উমাপ্রসাদবাবু ?

হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনি বাঙালী দেখছি। যাত্রায় এসেছেন নাকি ?

বলেন, না। এইখানেই এক কুটিয়াতে থাকি। এখনি সেক্রেটারী মশায়ের কাছে শুনলাম, আপনি কাল এসেছেন। তাই আলাপ করতে এলাম।

বললাম, চলুন তবে, বসা যাক কোথাও। কোথায় বসবেন ? আমি আছি সামনের এই বাড়িরই একটি ঘরে, সেখানেও যাওয়া যেতে পারে, নদীর ধারে নিরিবিলি কোথাও বসা যেতে পারে। কি বলেন ?

তিনি প্রশ্ন করেন, হাঁটবেন একটু ? তবে চলুন না—আমার কুটিয়াতে। নাঃ—ওপারে নয়। শহর ছাড়িয়ে মানা গ্রামের পথে যেতে অলকানন্দার ধারে। বেশীদূর নয়—আধ মাইলটাক হবে।

তাই চলি।

পথ থেকে ডাইনে নামতে হয় অলকানন্দার কূলে। নদীর ধারে সমতল ভূমি। সেইখানেই পাথরের দেওয়াল দেওয়া ছোট্ট একটি বাড়ি। দুইখানি পাশাপাশি ঘর। সামনে ছোট বারান্দা। সম্মুখেই নদী। ঘরে বা বারান্দায় যেখানে বসা যাক—গঙ্গার দর্শন পাওয়া যায়।

স্বামীজি বলেন, এইখানে সনক-আদি ঋষিদের আশ্রম ছিল। অতি পবিত্র স্থান।

ঘরের ভেতর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্র কিছুই নেই। ভূমিতে কম্বল শয্যা। একটা কাঠের তক্তার উপর কয়েকখানি বই—সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, ইংরাজীও। সবই ধর্ম-গ্রন্থ।

স্বামীজি বলেন, নিজেও পড়ি, মাঝে মাঝে অন্য সাধুসজ্জন ব্রহ্মচারীরা আসেন, তাঁদের কাছেও পাঠ করে শোনাতে হয়, আলোচনাও হয়। কেউ বা কখনো দু-একটা বই নিয়েও যান পড়তে। এই করে ও নিজের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে মনের আনন্দেই।

মনে মনে প্রশ্ন জাগে, কিন্তু, আহারের ব্যবস্থাটা চলে কি করে ? মন্দিরের প্রসাদ, না, ক্ষেত্রের ভাণ্ডারা ? প্রশ্ন করতে হয় না। কথায় কথায় প্রকাশ পায়।

স্বামীজি বলেন, এই ঘরটায় আমি আছি। পাশের ঘরটা খালি ছিল। কয়েক দিন হল, এক ব্রহ্মচারী এসেছেন। এখন কিছুকাল থাকবেন, বলছেন। আমার সুবিধাই হয়েছে। লোকটি ভালো। শান্ত প্রকৃতি। উন্নতি করবেন মনে হয়। আমার ভোজনের ব্যবস্থা উনি নিজেই করে দেন। আমার এখন ও-সময়টা ছুটি—অর্থাৎ নিজের কাজে একটু বেশী সময় দিই।

'ভোজন' বললেন বটে, কিন্তু, তার উপকরণটা কি তখনি জানতে পারি।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে নদীর ধারের জমিটা দেখিয়ে বলেন, ঐ দেখুন আমার ক্ষেত। দেখবেন চলুন, কেমন আলু লাগিয়েছি। হচ্ছেও বেশ। এখানকার জমি যে বড় ভালো। পাহাড়ীরা এসব বোঝে না। এইখানটায় এক রকম শাক এনে লাগিয়ে দিয়েছি—হবে বলে মনে হয়। আমার খাদ্য শুধু এই আলু। লবণ ছেড়েছি আজ ক'বছর হল। অন্ন-ময়দা-আটা এ-সবও ছেড়েছি। শুধু ফলমূলই এখন আহার্য। কিন্তু, ফল এখানে হয় না, বড় একটা আসেও না, তাই মূল ধরেই আছি। অবশ্য দুধটা কখন-সখন কেউ দিয়ে গেলে পাই। শহর থেকে এখানে অনেকে আসেনও। তাঁর অসীম দয়া।

নদীর তটে স্থানটি মনোরম লাগে। স্বামীজির সঙ্গও ভালো লাগে। বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়। গল্প করতে করতে কয়েকবারই দেখি তিনি বলেন, আপনি কাল এসেছেন, আমি একদিন পরে খবর পেলাম। পেয়েই চলে এসেছি। কাল পেলে কালই আসতাম। মাত্র আর দু'দিন থাকবেন বলছেন,—একটা দিন এর মধ্যে চলে গেল বিনা পরিচয়ে!

আমি আশ্চর্য হই। সম্পূর্ণ অপরিচিত। পথিক-জীবনে হঠাৎ পরিচয়। নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া ঝরা-পাতার ক্ষণিকের তরে কূল ছুঁয়ে যাওয়া। আজকের দেখা, কালকের ভুলে যাওয়া। আবার হঠাৎ মনে-হওয়া। এতে একদিন বৃথা চলে-যাওয়ার দুঃখ ওঠে কোথায়? তার উপর সাধু-সন্ন্যাসী!

তাই জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা আপনি ক'বারই দুঃখ করলেন—একদিন আগে আলাপ হল না। নাই বা হল, তাতে ক্ষতি কি?

হেসে উত্তর দেন, লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই জানি। তবুও, মনে ওঠে ও-কথা। আজ প্রায় ত্রিশ বছর কলকাতা ছেড়েছি। আর যাই-ও নি ও-অঞ্চলে। যাবার ইচ্ছাও হয় না। এখানেই নিজের সাধন-ভজন নিয়ে আছি। পূর্বাশ্রমে যখন শহরে ছিলাম এবং কলেজে পড়তাম তখন আপনার পিতাঠাকুর জীবিত। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য দান ভোলবার নয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের তখনকার ছাত্ররা তাঁকে পিতার মতোই দেখতাম, ভক্তি করতাম। আজ এতোদিন পরে হঠাৎ যখন শুনলাম তাঁরই এক ছেলে এসেছেন এখানে, তখনি, কেন জানি না, মনে হল, আমার এক ভাই এসেছে। তাই খবর পেয়েই চলে এলাম।

স্তব্ধ হয়ে শুনি। চোখে জল নেমে আনে। কঠিন কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের অন্তরালে অলক্ষ্যে বয়ে-যাওয়া ভক্তি-প্রীতির ফল্গুধারা। মৃদু মধুর তার কলধ্বনি। অফুরন্ত তার উৎস। অমৃত সে-ধারা।

যাত্রীদের মধ্যেও বিচিত্র প্রকৃতির লোক দেখি।

একটি যুবকের সঙ্গে একবার পরিচয় হল। বদরীনারায়ণের মন্দিরের চারিদিকে পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উপর পরিক্রমা করছে। প্রায় সব যাত্রী—এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরাও করে থাকেন। এ-পরিক্রমায় নাকি অশেষ পুণ্য আনে। একাগ্রতা যে আসে তাতে সন্দেহ নেই। তিব্বতী লামাদের হাতে যেমন 'ওঁ মণি পদ্মে হুং'—মন্ত্র-লিপি-ভরা ঘূর্ণি-চক্র ঘুরতে থাকে, এখানেও তেমনি যেন কোন এক শক্তি অলক্ষ্যে বসে মন্দিরকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের ঘোরাতে থাকেন। বন্‌বন্‌ করে ঘুরে চলেছেই।

ছেলেটিও তেমনি ঘুরছিল। এখানকার পুলিস-অফিসারটি তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

কালো রঙ। লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথায় একটা বড় বাঁণ্ডন রুমাল ঘুরিয়ে বাঁধা—বেদুইনদের মতো। তারই তলা দিয়ে কপালে ও পিছনদিকে কয়েকগাছি ঘন-কালো বেঁকিড়া চুল বেরিয়ে আছে। টানা চোখদুটি জ্বলজ্বল করছে। টিকালো নাকটি চিরন্তন-জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে আছে। গায়ে লম্বা গরম কোট। পরনে কাপড়—লুঙির মতন করে। খালি পা,—মন্দিরের মধ্যে হবারই কথা। হন্‌হন্‌ করে ঘুরছিল চরকির মত।

পরিচয়ে জানলাম মূর্তিমান চক্রই বটে।

পায়ে হেঁটে এসেছে বদরি-নারায়ণে—ত্রিবাঙ্কুর থেকে!

বললাম, ঘোরা শেষ হলে চলে এসো আমার আস্তানায়,—এই মন্দিরের বাইরেই।

হেসে বলে, ঘোরা আমার অত সহজে শেষ হবে না। চলুন, এখনই আপনার ওখানে ঘুরে আসি।

সবই তার 'ঘোরা'। অদ্ভুত তার জীবন। গল্প করে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন-প্রদেশে দেশ। ত্রিচুর জেলায়। গ্রামের নাম পল্লীস্যেরী। নাম শুনে বলি, বুঝেছি, ওটা আমাদের ভাষায় হবে, বোধ করি পল্লীশ্রী। সুন্দর নাম। তোমার নিজের নামটি কি?

হেসে বলে, বলছি,—সেটি অত সহজ বা সুন্দর নয়। মনে রাখতে পারবেন না; কাগজ দিন, লিখে দিই

বড় বড় হরফে ইংরাজিতে লিখে দেয়—শ্রীঅবনপরম্ভুমাধোরম্‌ অনন্তকৃষ্ণম্‌।

একত্রিশ বছর বয়স। ১৯৫৪ সালের ৩রা জুলাই দক্ষিণ-ভারত থেকে পায়ে হাঁটতে শুরু করে। ভারতবর্ষের নানান্‌ স্থানে ঘুরেছে। ৬৯৬২ মাইল অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছে—১০ই মে ১৯৫৬ সালে।

বলে, এ আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হচ্ছে। স্কুল-কলেজে ইতিহাসের

পাতায় পড়তাম—নিজের চোখেও দেখেছি—মানুষের একটা ধর্ম,—ঘর-বাঁধা। যেখানেই বসবে—আশ্রয় খুঁজবে, মনোরম একটি গৃহ রচনা করতে পারলেই যেন পরম শান্তি। আমার রক্তে কিন্তু বাইরের ডাক। ঘর-ছাড়া মনকে কেবলি পথে ডাকতে থাকে।

কথা বলতে বলতে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর হেসে বলে, তা বলে ভাববেন না যেন ছন্নছাড়া আমার জীবন। বাপ-মার আমি আদরের সন্তান ছিলাম।

জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা এখন কেউ নেই নিশ্চয় ?

আশ্চর্য হয়ে বলে, থাকবেন না কেন ? বাবা-মা-দাদা সবাই আছেন। দেশে থাকেন। ধনী না হলেও সচ্ছল অবস্থা। আমিও কলেজ ছাড়ার পরই চাকরি পেয়ে গেলাম। কিন্তু আমার তখন হেঁটে বেরুবার নেশা লেগেছে। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, অথচ বাবা-মাকে ছেড়ে বহু দূরে বেরিয়ে পড়ার কোথায় যেন জোর পাই না, চাকরির শিকল আরও জোর করে আমায় বাঁধলো। মাসে দেড়শ টাকা মাইনে। কোন অভাব নেই,—তবুও মনে তৃপ্তি নেই। বিয়ের জন্য বাবা-মা ধরেন। কোন রকমেই রাজী হই না। বেশ বুঝি, ও-জীবন আমার নয়। রাত্রেও স্বপ্ন দেখি, আমি যেন চলেছি—পায়ে হেঁটে —দেশ থেকে দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে—পথের শেষ নেই—চলার শ্রান্তি নেই—আনন্দেরও সীমা নেই।

এমনি করে সে বলে যায়। কথার মধ্যেও তার চঞ্চল পদধ্বনি শুনি।

সে বলতে থাকে, অতৃপ্ত-বাসনার শুধু স্বপ্ন দেখেই এইভাবে ক'বছর কেটে গেল। তারপর একদিন এক জার্মান যুবক হঠাৎ এসে দাঁড়ালো আমাদের অফিসের গেট-এ। মোটর-সাইকেল হাতে। গগল্‌স চোখে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে সেই সাইকেল চড়ে। মুখের লাল রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে। চোখমুখে কি উজ্জ্বল প্রফুল্ল ভাব। কথা বলে যেন আনন্দ উছ্‌লে পড়ে। ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কত দেশের কত গল্প বলে।

তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সব। সেইদিনই সে আবার তার যাত্রা-পথে চলে গেল। কিন্তু, অজানিতভাবে আমার শিকল ভেঙে দিয়ে গেল। তার পরদিনই আমি চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। কাঁধে এক ছোট্ট ঝোলা—সামান্য দুটো জামা-কাপড়। পকেটে আমার চাকরি থেকে সঞ্চিত সামান্য পুঁজি। কিন্তু, মন-ভরা অসামান্য আনন্দ।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়িতে জানাও নি ? পালিয়ে এসেছ ?

আশ্চর্য হয়ে বলে, পালাব কেন ? বাবা-মাকে বলেই এলাম। তাঁরা আমাকে সত্যি করেই চেনেন। তাই বাধা দেন নি, আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। মা শুধু বলেছিলেন, দেখি, ক'দিন থাকতে পারিস্‌।

বললাম, প্রায় দু'বছর হ'ল বাড়ি ছেড়েছ, তাঁদের আর খবর পাও ?

হেসে বলে, পাই বই কি। এই তো আজই চিঠি পেয়েছি। দেখুন না।

বার করে দেখায়। চার পাতা তাদের ভাষায় দীর্ঘ পত্র। বলি, পড়ে শোনাও, বাবা কি লিখেছেন।

সে শোনায়। দেশের সব খবর, খুঁটিনাটি অনেক কিছু।

বলে, ওসবে আমার আগ্রহ নেই, তবুও ওঁরা প্রতি চিঠিতেই জানান। টাকা পাঠাবেন কিনা জানতে চান। জানাই, এখনও তার প্রয়োজন নেই।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, চলে কি করে তোমার?

সে হেসে উত্তর দেয়, চলি তো পায়ে, তার খরচা নেই। আর খাওয়ার খরচ? সে আর কতটুকু? যা প্রয়োজন শুধু তাই খাই,—যেখানে যেমন পাই। তার মধ্যে শৌখিনতা নেই। যে টাকা সঙ্গে এনেছিলাম তা এখনও শেষ হয় নি। না হওয়ার আরও কারণ আছে। যেখান দিয়ে আসি, সুযোগ পেলে সেখানে কারো কোন কাজ করে দিই—ক্ষেতের কাজ, ঘরের কাজ, কখনো বা আমার অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিই—এইভাবে কিছু আয়ও হয়। তা ছাড়া, কোথাও দেখেছি—বিশেষত গ্রামে—লোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আহার্য দিয়েছে—আনন্দের সঙ্গে। পথের ছেলেকে ঘরে ডেকে খাওয়ানো—এতেই যেন তাদের তৃপ্তি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, দেখুন, ঐ যে বলছিলাম ঘর-বাঁধা মানুষের ধর্ম, ঠিক তেমনি আবার যাযাবর জীবনেরও একটা প্রবল আকর্ষণ আছে—মানুষের সেটাও একটা আদিম ধর্ম। আমি সেই জাতের।

হেসে বলি, তাই বুঝি মাথার ওপর বেদুইনদের মতো কাপড় বেঁধেছ?

সেও হেসে ওঠে। কাপড়টা টেনে মাথা থেকে খুলে ফেলে। মাথা-ভরা একরাশ লম্বা চুল চারিদিকে নেচে নেমে আসে। হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, এই জন্যেই বেঁধে রেখেছি। এ দু'বছর চুল কাটিনি। এইবার এইখানে মুণ্ডন করব।

তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পরিবর্তন আসে। চোখের দৃষ্টিও শান্ত হয়। যেন, আশ্বিনের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার পর শরতের গাঢ় নীল আকাশ, রূপালি রৌদ্র।

ধীরে ধীরে বলে, এখন হিমালয়ের এই অঞ্চলে দু'বছর কাটাব। এখানে মন্দিরের কিছু ওপরে একান্তে একটি গুহার মধ্যে এখন আছি। নিভৃতে শান্তভাবে দিন কাটে। মন্দির থেকে ধর্ম-পুস্তক নিয়ে যাই—পড়ি। সকালে সন্ধ্যায় একশো আট বার মন্দির পরিক্রমা করি। এতেও এক অনির্বচনীয় অনুভূতি!

দুজনের কেউই কোন কথা বলি না কিছুক্ষণ।

তারপর সে বলে, দু'বছর পরে হিমালয় থেকে নামব। এখানে আসার পথে পশ্চিম ও মধ্য ভারত, রাজপুতানা, কাশ্মীর ঘুরে এসেছি। নামার পর যাব পূর্ব ভারতে, তারপর দক্ষিণে। আপনাদের বাংলাদেশেও যাব—তখন আপনার সঙ্গে

হয়তো আবার দেখা হবে।

হঠাৎ সজাগ হয়ে বলে, ভালো কথা, আপনার নাম-ঠিকানাটা লিখে দিন।

তার ডায়েরি বার করে হাতে দেয়। বেশীর ভাগই তাদের মাতৃ-ভাষায় লেখা, কদাচিৎ কোথাও ইংরাজিতে। খাতাটির প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা :

"Live for Truth and die for Truth."

॥ ৪ ॥

সেই চারণিকের সঙ্গে যে পুলিস অফিসারটি আমার আলাপ করিয়ে দেন তাঁর সঙ্গেও সেইদিনই আমার প্রথম পরিচয়।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে সাধারণ বেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখ দেখে তাঁকে চিনলাম। মুখে পুলিসের ছাপ ছিল না, কিন্তু চেনার চিহ্ন ছিল।

কয় বছর আগে এই যাত্রা-পথে এক পাহাড়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। পোস্টমাস্টার। অতি অমায়িক ও সজ্জন। সকলেরই—বিশেষতঃ যাত্রীদের সাহায্য করতে সব সময়েই প্রস্তুত। নিজের দপ্তরের কাজেও, অফিসের বাইরেও।

সে বছরেও দেখা হল পথে—শ্রীনগরে। অফিস ঘরে টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতির মধ্যে শব্দ তুলে বার্তা দিচ্ছেন, নিচ্ছেন। হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে উল্লসিত হন, আরে! আপনি এ বছরেও এসে গেছেন! বসুন, বসুন—চা আনাই।

এক জোড়া প্রকান্ড গোঁফের মধ্যে শুভ্র দাঁতগুলি বার করে হেসে ওঠেন। সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কুশল সমাচার নেন। যেন, পরম আত্মীয়ের সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ।

তিনি জানান, এবার বদরীনাথে আমার ভাই-র সঙ্গে আলাপ করবেন। সেখানে থানার চার্জে এখন আছেন।

বদরীনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভাইটিকে দেখেই চিনি। সেই বিরাট গোঁফের আর এক জোড়া। মুখের আকৃতিরও সাদৃশ্য আছে।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই পরিচয় করি।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে? না হয়ে থাকে, চলুন, আমার ওখানে উঠবেন।

বলি, থানায় তো? কিন্তু, এমন কিছু তো করি নি যে ওখানে পুরবেন।

ভদ্রলোক হেসে ওঠেন। থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হন। বলেন, এবার যাত্রীর যা ভিড়, জায়গা পাওয়া খুব কঠিন। আমার ওখানে আশ্রয় দিতে হয় প্রায়ই। একা থাকি,—যথেষ্ট জায়গা আছে। এই শীতের দেশে বাইরে যাত্রীরা পড়ে থাকতে পারে না। যতটুকু পারা যায় তাদের সেবা করার চেষ্টা করি।

তাঁর ভাই-এর মতনই কথাবার্তা, ব্যবহারও। যদিও পুলিস!

একপাশে দাঁড়িয়ে গল্প করি। জিজ্ঞাসা করি, একা থাকেন বললেন, বাড়ির সব আনেন নি কেন? এখন তো ক'মাসই এখানে থাকতে হবে?

বলেন, ঠাণ্ডা জায়গা। অসুবিধে হয়। কিন্তু আসল কারণটি হচ্ছে খরচা। এখানে সামান্য জিনিসপত্রেরও কি ভীষণ দাম—নিশ্চয় জানেন। একদিন দু'দিনের জন্যে ততটা গায়ে লাগে না। তা ছাড়া যাত্রী যাঁরা আসেন তাঁরা খরচা হবেই জেনে আসেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে মাসের পর মাস এখানে সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার।

মন্তব্য করি, কেন? এখানে থাকার জন্যে নিশ্চয় বাড়তি ভাতা পান আপনারা?

অফিসারটি দুঃখপ্রকাশ করেন, সেইটিই তো কথা। এই দূর-দুর্গম পাহাড়ের দেশে থাকলেও তা পাবার নিয়ম নেই। সে আইন হল হিল্-স্টেশনের জন্যে, আর এটা হিল্-স্টেশন নয়! সরকারের সোজা জবাব। এই নিয়ে লেখালেখি চলছে অনেক দিন থেকে। আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীন ভারতে একটা সুরাহা হবে। কিন্তু তাও এখনো হল কই? অথচ দেখুন, প্রতি বছর মিনিস্টার, ডেপুটি-মিনিস্টার, হোমড়া-চোমড়া অফিসাররা সব বেড়াতে আসছেন—আর দেশের কি টাকাটাই না খরচ হচ্ছে শুধু তাঁদের জন্যে!—যাক্, ও-সব দুঃখের কথা না আলোচনা করাই ভালো।

আমিও ভাবি, দেশের কি চরম দুর্ভাগ্য, হিমালয়ের এই দূর অঞ্চলেও এই সাধারণ মনোভাব জাগবার সুযোগ পাচ্ছে!

কথার মোড় ঘোরাই। জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি তো আপনার খালি বললেন, হাজত ঘরগুলির অবস্থা কি?

তিনি বলেন, সে-ও শূন্য। আগে কখনো ব্যবহার করার প্রয়োজন হত না, শুধু শাসনের কটাক্ষ নিয়ে থাকত। বছর দুয়েক থেকে মাঝে মাঝে এখন খুলতে হয়। যাত্রীদের সঙ্গেই দু-একজন চোর-জোচ্চোর আসতে শুরু করেছে। বাস্ হয়ে এখন আসার সুবিধা হয়েছে কি না! যাত্রীর সংখ্যাও যেমন বাড়ছে, চোরেরাও তেমনি তাদের কর্মস্থল বিস্তার করছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবার এখানে এই এক মাসে মাত্র একটি কেস হয়েছে। কিন্তু তবু হয়েছে তো, স্বীকার করতেই হবে। হয়ত আরও হত—খুব কড়া নজর না রাখলে।

জিজ্ঞাসা করি, কি চুরি হয়েছিল?

বলেন, জিনিস সামান্যই। তাহলেও চুরি। তপ্তকুণ্ডের ধারে কাপড় রেখে যাত্রী স্নান করতে নেমেছিল—যেমন সবাই নামে। এবার কি রকম ভিড় দেখেছেন? সেই সুযোগে তার সেই কাপড়খানা ও খুচরো কিছু পয়সা একজন চুরি করে। তারপর থেকে ওখানে পুলিস-পাহারা দিতে হয়েছে, সাধারণ বেশেও ঘুরছে। এ-সব তীর্থস্থানে এমন ব্যবস্থা করার যে দরকারও হয় সেইটিই আমার

কাছে লজ্জার বিষয়।

আমি তখনি সায় দিই যে এই তীর্থ-পথে নিশ্চিন্ত মনে আসাটাই কত বড় শান্তি। চুরির ভয় নেই, ঠক্‌বার আশংকা নেই—পথ-জোড়া যেন আপন ঘর, চারিদিকে আপন জন। নিজের চোখেই দেখেছি, যাত্রী নেমেছে নদীতে স্নান করতে, তার টাকার থলিটি পাড়ে রেখে। স্নান সেরে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে, থলিটির কথা ভুলেই গেছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মনে পড়ায় ফিরে গেছে, দেখে ঠিক তেমনি পড়ে আছে। অনেকের হয়তো নজরে পড়েছে, কিন্তু তবুও কেউ চোখ দেয় নি।

কয় বছর আগেকার এক ঘটনা পুলিস-অফিসারের কাছে গল্প করি।

শীতকাল। কলকাতা শহর। বিকেলবেলা কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছি। দেখি দুজন পাহাড়ী অপেক্ষা করছে। অপরিচিত মুখ। প্রশ্ন করে জানতে পারি ; যমুনোত্রীর পাণ্ডাব ছেলে, অপরটি তার গ্রামবাসী। ওপরে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। অবাক হয় ইলেকট্রিক আলো-পাখা দেখে ; ভয়-বিহ্বল হয়ে সসংকোচে চেয়ারে বসে।

জিজ্ঞাসা করে জানি, দেশ ছেড়ে এই তাদের প্রথম বার হওয়া, শহরও দেখা।

অনেকে যেমন মনে করেন, শহরসভ্যতা ছেড়ে হিমালয়ের পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিক ব্যাপার, এদের পক্ষেও এখানে আসা তেমনি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। প্রথমে পাহাড়ে হাঁটা-পথ,—পঞ্চাশ-ষাট মাইল হলেও সেটা কিছুই নয় ; কিন্তু তারপর প্রথম বাস্ চড়া, প্রথম ট্রেনে ওঠা এবং অবশেষে কলকাতা শহব! সে এক বিস্ময়কব অভিজ্ঞতা। বিস্ফারিত নয়নে তাদের সেই কাহিনী শোনায়। কথার স্রোতে অপরিচয়ের সংকোচভার ভেসে যায়।

বলে, দু'দিন আগে কলকাতায় পেঁাছেছি। স্টেশনে নামলাম। চারিদিকে তাকিয়ে তাজ্জব লাগছিল। চড়াই-উৎরাই নেই। দূর দেখা যায় না। এ কি! বাইরে এসে একটা মানুষ-টানা গাড়িতে উঠলাম। তাকে কলকাতা নিয়ে যেতে বললাম। সে তবুও জিজ্ঞাসা করে, কোথায় নিয়ে যাব? তাকে যত বলি কলকাতায়,—তবুও সে বোঝে না, বলে, কলকাতায় কোথায়? এমন সময় একজন লোক এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলে, কোলকাতায় কোথায যাবে?—তাকেও বললাম, কলকাতায় যাব, আবার কোথায়? তখন সে গাড়ির লোকটাকে কি বলে দিল, সে একটা ধর্মশালায় নিয়ে গেল।

বুঝলাম, ভাগ্যক্রমে একজন সৎ লোকের নজরে পড়েছিল, তাই তাদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাও হয়েছে। এখন হ্যারিসন রোডে এক ধর্মশালায় আছে এবং পাণ্ডার যে খাতাটি সঙ্গে এনেছে, তাতে লেখা যাত্রীদের নাম-ঠিকানা বার

করে তাদের বাড়ি যাচ্ছে। আমার কাছে আসাও তেমনি খাতার পাতায় নাম বার করে।

কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য শুনি। তার ভগিনীর বিবাহ দিতে হবে, অর্থের প্রয়োজন। পাণ্ডাজী কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, অর্থ-সংগ্রহের জন্যে। তাঁর ধারণা, এখানে পথের দু'ধারে টাকা ছড়ানো আছে, তুলে নিতেই যা কষ্ট! দুজনের যাতায়াতের খরচ পড়বে দেখলাম প্রায়—দেড়শো টাকা!

আমাদের বাড়িতে এসে তাদের থাকতে বললাম। জিনিসপত্র নিয়ে আসার কথা বলায় বললে, জামা-কাপড় তো এই গায়েই রয়েছে, আর এই খাতাটা—অন্য আর কিছু নেই।

জিজ্ঞাসা করি, বিছানা, কম্বল, কিছু আনো নি?

দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর বলে, হ্যাঁ ছিল—দুখানা কম্বল ও একটা লোটা। তা এখন আর নেই।

গল্প শুনি। দুজনে ট্রেনের কামরায় ওপরের বাংকে রাত্রে শুয়েছিল। ভোর হলে নীচে নেমে বসে—ওপরে তাদের কম্বল ও লোটা গুছিয়ে রেখে। হু-হু করে ট্রেন চলেছে, জানালা দিয়ে ভোরের বাতাস আসছে—আরামে বসে ঝিমোচ্ছিল। এমন সময় একটা বড়ো স্টেশন এল। বহু যাত্রী। কত লোক উঠল, নামল। তারা যেমন বসে ঘুমুচ্ছিল, তেমনি ছিল। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। ওদের ঘুম ভেঙেছে। পরের স্টেশনে জল নেবে বলে লোটার সন্ধান করতে দেখে—লোটাও নেই, কম্বলও নেই। সহযাত্রীরা অম্লান বদনে বলে, আগের স্টেশনে নিশ্চয় কেউ নিয়ে চলে গেছে। নজর রাখো নি কেন? অমন নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে ঘুমুলে যাবেই তো। কোথাকার লোক সব! উজবুক!

গল্প করতে করতে আশ্চর্য হয়ে বলে, তাজ্জব ব্যাপার! এক জনের জিনিস আর একজন নিয়ে গেল! এ হয় কখনো?

ওরা কয়দিন আমাদের বাড়িতে ছিল। কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি তাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম—যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মন্দিরেও পাঠালাম। ট্রামে বাস-এ চড়ল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের সারাদিনের নব নব অভিজ্ঞতার উত্তেজনা-পূর্ণ কাহিনী শুনতাম। ঘরের টেবিলের উপর নির্বিচারে ধূলি-মলিন পা দুখানি তুলে দিয়ে বসত—আরাম করে। মনে কিন্তু ধূলার স্পর্শ নেই। প্রাণ খুলে কথা বলত। একজন হয়তো কথা বলছে, অপরজন তখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে গান ধরেছে গলা ছেড়ে। হঠাৎ কোন শহুরে সভ্যভব্য বন্ধু এসে পড়লে, আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কি ব্যাপার হে? বলতাম, এসো, বসো, এ-সব আমার পাহাড়ী বন্ধুরা।

একদিন পাঠালাম সিনেমায়। কৃষ্ণ-চরিত্রের কি একটা ফিল্ম ছিল। দেখে এসে

সে কী উত্তেজনা! বলে, আজ তো দর্শনই মিলে গেল, কৃষ্ণজির বাঁশীও শুনে এলাম।—বলে আমাকেই নমস্কার করে বসে। তাদের সঙ্গে যে-লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম তার কাছে শুনি, সিনেমা-হলে তাদের চুপ করে বসিয়ে রাখাই মুশকিল—জয়ধ্বনি করে চেঁচিয়ে ওঠে, সিট্ ছেড়ে ছুটে যেতে চায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করতে।

বোঝে না, কলি-কালে সিনেমার পর্দায় অদৃশ্য দেবতাও কত সহজে ধরা পড়েছেন! আসল পরমহংসদেব ও নকল শ্রীরামকৃষ্ণে প্রভেদ বোঝাই ভার। আর কিছুদিন পরে পানের দোকানে তো নিশ্চয়ই, সম্ভবতঃ ঘরে ঘরেও সিনেমার রামকৃষ্ণের ফটো চালু হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে তাদের কয়দিন কাটলো। কিছু অর্থ-সাহায্যেরও ব্যবস্থা হল। তারপর টিকিট কাটিয়ে ট্রেনে বসিয়ে দেবার জন্য একজন লোক দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলাম। বিদায়-কালে তাদের জিজ্ঞাসা করি, এবার দেশে ফিরছ,—এত ঘুরে গেলে, দেখে গেলে—সবচেয়ে তাজ্জব কি দেখলে বল।

তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সত্যিই অনেক কিছু দেখেছি যা কখনো ভুলব না, এ-যেন এক স্বপ্নের দেশ।—বলতে বলতে গম্ভীর হয়। তারপর বলে, অনেক কিছুই তাজ্জব দেখলাম বটে, কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব লেগেছে, এ-দেশে একজনের জিনিস অপর একজন নিয়ে নেয়! কি আশ্চর্য!

শহর-সভ্যতার বিস্ময়-সমুদ্র মন্থন করে এই তাদের বিষময় চরম অভিজ্ঞতা!

পুলিস-অফিসার গল্প শুনছিলেন। বললেন, আমার নিজের জেলার লোকের মিথ্যা গর্ব করছি না। সত্যি, ঐ হল তাদের প্রকৃত রূপ। গাড়োয়ালে এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানে তালা-চাবি যে কি পদার্থ ও কি তার প্রয়োজন, লোকে তা মোটেই জানে না। আমাদের এখানে একটা প্রবাদ আছে জানেন? ঘরে তালা পড়েছে—মানে গৃহস্থের সর্বনাশ হয়েছে!

শুনে আমি বলি, ও-ধরনের প্রবাদ আমাদের অঞ্চলেও আছে যে। বোধ হয় তালার প্রচলনের সঙ্গে প্রবাদটারও চলন হয়েছে। তবে যে-সব গ্রামের কথা আপনি বলছেন সে-রকম গ্রাম আমি নিজেও চোখে দেখেছি। অবশ্য বাস্-এর, এমন কি, যাত্রার পথেও এখন আর সে-সব দেখা যায় না। যাত্রাপথ ছেড়ে কিছু ভেতরে গেলেই পাওয়া যায়। তবুও, কি রকম বিশ্বাসী মানুষ এখনও এ-পথে আছে—এই সে-বছরও তার পরিচয় পেলাম। ফাটার ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠেছি। পুরনো বুড়ো চৌকিদার যাবা মাত্রই আমায় দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে, আপনি এসে গেছেন? সে-বছর আপনার চাকুটা এখানে ফেলে গিয়েছিলেন যে। আমি তুলে রেখে দিয়েছি। খুব সুন্দর জিনিসটা। কত লোক ওটা টাকা দিয়ে নেবার জন্যে ধরাধরি করেছিল—একজন দশ টাকাও দিতে চেয়েছিল—আমি কিছুতেই দিই

নি,—বললাম, তাঁর জিনিস, আমি দেব কি করে ? তিনি নিশ্চয়ই আবার আসবেন, এলেই দিয়ে দেব। গত বছর এখানে আপনি আসেন নি, দু'বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি।—তখনই গিয়ে নিয়ে আসে, অতি যত্নভরে বার করে দেয়। যেন, কত মহামূল্য এক সামগ্রী।

বার করতেই চিনতে পারি। ঠিক বটে। আমারই। মোগলসরাই স্টেশনে কেনা অনেকগুলি ফলা-সমেত সেই ছুরিটি। সেটা যে সে-বছর এইখানে ফেলে গিয়েছিলাম তা জানতামই না, সন্দেহ করি নি। বাড়ি ফিরেও ছুরির কথা মনে হয় নি, পরের বার আসার সময় খুঁজে পাই নি, এই পর্যন্ত।

ছুরিটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে চৌকিদার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। যেন, একটা দায়মুক্ত হল।

আমিও তখনি খুশী-মনে ছুরিটি তাকে আবার দিয়ে দিই, বলি, এটি তোমার কাছেই থাক। এটি তোমায় দিলাম।

এ-সবের মর্ম সে বোঝে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হয়তো ভাবে, যার জিনিস তাকে দিলাম, ফেরত দেয় কি !

তার এই আচরণে প্রকৃত আনন্দ পাই। অশিক্ষিত, অতি-দরিদ্র। তবুও—অথবা, তাই-ই হয়তো—অপহরণ করতে শেখে নি, লোভের বশীভূত হয় নি। এরাই তো এ-অঞ্চলের মাথার মণি।

অফিসারটি বলেন, আমাদের শিক্ষাহীন দেশে এখনও সেই আদর্শ ও ধারা বজায় আছে। মনে হয়, দেশের লোকের মজ্জাগত সংস্কার ও দৃঢ় ধর্ম-বিশ্বাস এর কারণ। কিন্তু, দুঃখের বিষয় সভ্যজগতের নতুন হাওয়া লেগে এবার ঘুণ ধরতে শুরু করেছে। তবে যাত্রীদের মধ্যে যে-সব চুরি হয়, সাধারণতঃ এখনও বাইরে থেকেই লোক আসে এ-সব করতে।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, কি ধরনের চুরি এখানে হয় ?

তিনি বলেন, স্থানবিশেষে প্রকারভেদও হয়। এখানেও তাই। এখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। যাত্রীরা এখানে আসেন প্রাণ-ভরা ভক্তি নিয়ে। যা কিছু করেন, যা কিছু দেখেন সব কিছুই ভক্তিরসে সিক্ত করে নেন। গেরুয়া দেখলেই মনে করেন সাধু, ভস্মমাখা হলে তো কথাই নেই। তখনি ভাবেন, হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসী। দর্শনেই মুক্তি। সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণিপাত করেন। ধূর্ত লোকে এসব জানে। গেরুয়া গায়ে অথবা ভস্ম মেখে যাত্রীদলে যোগ দেয়। বলে, হিমালয়ের গুহায় বাস করি, কেদার-বদরী তীর্থ করতে বেরিয়েছি।—পুণ্যলোভী যাত্রীরা ভোজন দেয়, পরে কখনও সঙ্গীও করে নেয়। সাধু-সঙ্গের পরম ভাগ্য, পরমানন্দ। সাধুর ওপর অন্ধ বিশ্বাস এমনই আছে, ক'দিনের আচার-ব্যবহারে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। এদিকে সাধু-বেশী সঙ্গীটি দৃষ্টি রাখে কোথায় যাত্রীর টাকার থলি। তারপর একদিন হঠাৎ অদৃশ্য—লোকটিও, পথের পুঁজিও।—এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, ধরাও পড়েছে

দু-একজন। আবার আর এক ধরনের চুরিও দুবার হয়েছে। পথের সঙ্গীভাবে যাত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। একই পথের যাত্রী। দুর্গম পথ। একসঙ্গে যায়। একই চটিতে ওঠে। সুখ-দুঃখের গল্প করে। এই সুযোগে যাত্রীর বাড়ির খবরা-খবর নেয়, ঠিকানাও জানে। তারপর, একদিন পথে কোন বড় চটীতে থেকে যায়, সঙ্গী-যাত্রীকে জানায় 'আপনি এগিয়ে যান, আমি দু'দিন এখানে কাটিয়ে যাব—জায়গাটায় মন বসে গিয়েছে—আবার দেখা হবে পথে।'—বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনার ভানও করে। যাত্রী যাত্রা-পথে এগিয়ে যায়, দুঃখপ্রকাশ করে বলে, দু'দিন একসঙ্গে বেশ থাকা গিয়েছিল। তারপর, ধূর্ত লোকটি যাত্রীর নাম নিয়ে তার বাড়ির ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে, 'পথে হঠাৎ সর্বস্বান্ত হয়েছি, টেলিগ্রাফে টাকা পাঠাও, পোস্টমাস্টারের কেয়ারে।' পোস্টমাস্টারের সঙ্গে ইতিমধ্যে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আলাপ করে—তার সামনেই তার পাঠায়। একদিন অপেক্ষা করার পরই টাকা আসে। না এসে উপায় নেই। তারপর, উধাও! প্রায় মাসখানেক পরে, বাড়ি ফিরে যাত্রী সব কিছু জানতে পারে। তখন কোথায় কে! শুধু, পথের সঙ্গীটির বন্ধুত্বের উজ্জ্বল স্মৃতিখানি কালিমায় লিপ্ত হয়ে যায়।

পুলিস অফিসারটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে দু-একটা চুরি হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, জানি। তবে, এই তীর্থ-পথের ওটা একটা কলঙ্ক হয়ে ওঠে। এই দেখুন না কত বড় লজ্জার বিষয়—এখন কোন কোন চটীতে পুলিশকে যাত্রীদের সাবধান করিয়ে দিতে হয়—যেন নিজের নিজের জিনিসের উপর ঠিকমত নজর রাখে।—যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এর প্রতিরোধ করতে। কিন্তু ভাবনা হয়, আমার দেশের লোকের কথা ভেবে, এ প্রবৃত্তি যেন ওদের মধ্যে না প্রবেশ করে!

দুশ্চিন্তারই কথা বটে।

এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়লাম, যুক্তরাষ্ট্রের এটর্ণি জেনারেল তাঁর বার্ষিক বিবৃতিতে বলছেন, ১৯৫৮ সালে এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় প্রতি ৬৪·২ মিনিটে একটি করে নরহত্যা (murder), ৪৬·৪ সেকেণ্ডে একটি করে সিঁদেল চুরি (burglary) এবং প্রতি ৬·১ মিনিটে একটি করে নারীধর্ষণ (rape) হয়েছে। সেই বৎসরে শুধু গুরুতর আইনগত অপরাধের সংখ্যা উঠেছে—১৫, ৫৩, ৯২২।

সভ্যদেশের সভ্যতার কলঙ্কিত পরিচয়!

॥ ৫ ॥

কিন্তু, কালের প্রবল প্রবাহ রোধ করবে কে ?

মনে পড়ে, সাধুজির সেই নির্বিকার অভিমত ;—যুগ-ধর্মের প্রভাবে তীর্থ-ক্ষেত্রের মর্যাদা-হানির কাহিনী,—সভ্য-সমাজের সমস্যাগুলির হিমালয়ের এই নিভৃত অঞ্চলেও অবাঞ্ছিত প্রবেশ।

প্রতি বছর আসা-যাওয়ার পথে তার নিদর্শন পাই।

সে-বছর পথ ধরে চলেছি। কে একজন পথের একটু উপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে—ইংরাজিতে—Have tea here, Sir, Good tea। তাকিয়ে দেখি, একটা ছোট দোকান। বাইরে একটা গাছ, তার তলায় বেঞ্চ। সেইখানে দাঁড়িয়ে এক পাহাড়ী ছেলে। একটু পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।—আমার তখন চা খাওয়ার দরকার নেই। তাই বললামও। তবুও সে ছাড়ে না। বলে, সকাল থেকে বসে আছি—একটিও যাত্রী এখানে বসে নি। কড়ার দুধ তেমনি রয়েছে, দেখুন না। হিন্দী ইংরাজি মিশিয়ে কথা বলে।

ছেলেটিকে দেখে কৌতূহল জাগে, মায়াও হয়। উঠে গিয়ে বলি, তাহলে দু'গ্লাস তৈরি করো।

আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি তো একা। সঙ্গী কেউ পেছনে আসছেন বুঝি ?

বলি, করো তো তুমি ভালো করে তৈরি।

দুজনে একসঙ্গে চা খেতে খেতে ছোট্ট তার জীবনের কাহিনী শুনি।

সেই বছর স্কুল-ফাইনাল পাস করেছে। একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, সেকেণ্ড ডিভিসনে।—কিন্তু উৎসাহ থাকলেও আর কলেজে পড়ার মত অর্থ-সংস্থান নেই। মাইল তিনেক দূরে গ্রাম। বাবা আছেন, অন্য ভাই-ও আছে। সামান্য জমি-জমা,—তাঁরাই চাষবাস করেন, সংসার চলে যায়। এর এখন আর ক্ষেতে গিয়ে কাজ করার মত মন নেই। বলে, বাবার সঙ্গে তাই নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে। তাহলে লেখাপড়া শিখতে গেলাম কেন ?

অগত্যা এই ছোট দোকানটুকু খুলেছে, কিন্তু চলছে না, আর এতে হবেই বা কি ? আমাকে ধরে, কলকাতায় নিয়ে চলুন আমাকে—আরও পড়তে পারলে তো ভালোই, নয়ত সেখানে চাকরি দেবেন একটা।—ছলছল চোখে বলে, জীবন কি আমার এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ?

দেখি, শহরের সেই একই সমস্যা এখানেও দেখা দিয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষার স্বাদটুকুই পেয়েছে। সে-শিক্ষা কার্যকরী নয়। জ্ঞানের পিপাসা জেগেছে—মেটাবার ক্ষমতা নেই। বেকারের গ্লানি এসেছে। মনের ও গৃহের শান্তি ভেঙেছে।

ভাবি, গাড়োয়ালে অন্তত একটা মিলিটারী-কলেজও তো খুললে পারে। এখানকার ছেলেদের সেনা-বিভাগে যোগ দেবার আকর্ষণ বহুকাল ধরেই আছে।

আমাদের বদরীনাথের পান্ডাজির নাতিটিও পাস করেছিল। পান্ডাজি আমায় ধরলেন, কলকাতায় থেকে আরও লেখাপড়া করবে। তাঁদের গ্রামে ডাক্তার নেই—ডাক্তার হবে।

শেষের প্রস্তাবটা শুনে ভালো লেগেছিল। মনে হল, সত্যিই,—গভর্ণমেন্টও যদি এখান থেকে ভালো ছেলে বেছে খরচ দিয়ে ডাক্তারি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন—অনেক ছেলের ভবিষ্যৎ খোলে, দেশেরও উপকার হয়। কয়েক জায়গায়—যাত্রা-পথে সরকারী হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারি আছে, নইলে কোনও গ্রামেই একজনও ডাক্তার নেই, লোকে চিকিৎসাও পায় না। যে-সব রোগ ওষুধে সারবার কথা, ওষুধ না পেয়ে লোকে তাতে মারা যায়। শিশু-মৃত্যুর তো কথাই নেই। স্বাস্থ্য-রক্ষার অতি-সাধারণ নিয়মগুলিও জানে না, এ-সবের প্রয়োজনীয়তারও বোধ নেই। মানস-সরোবর যাবার পথে একদিন আমাদের একটা কুলীর প্রবল জ্বর আসে। এক সঙ্গীর কাছে ওষুধ ছিল, তিনি তাকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, চুপচাপ কম্বল গায়ে শুয়ে থাক। কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখি, সে লোকটাকে ঘিরে অন্য কুলীরা বসেছে এবং সর্দার কুলী তাকে কি একটা গাছের পাতা সমেত ডাল দিয়ে খুব মারছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি?—শুনলাম, ওর জ্বরের প্রকৃত কারণ ওরা ধরতে পেরেছে। ওকে দানোয় পেয়েছে! তাই, তার চিকিৎসাও চলেছে।—জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কিসের ডাল?—শুনি, বিছুটি!—ভাবি, চমৎকার চিকিৎসা! লোকটার কিন্তু সেই দিনই জ্বর ছেড়েছিল। আমার সঙ্গী বলেন,—আমরাও জানি,—তাঁর ওষুধে। কুলীরা বলে, তাদের চিকিৎসায়। এই সব বিষয়ে এই ধরনেরই ওদের মূঢ় বিশ্বাস। সেখানে উন্নতির ক্ষেত্র আছে।

গাড়োয়ালে একবার এক গ্রামে গেলাম। যাত্রাপথ থেকে অনেকখানি ভেতরে। সেখানে এক পরিচিত অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। খবর না দিয়ে হঠাৎ পৌঁছুই। আমাদের পেয়ে তাঁর সে কি আনন্দ! ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী সেখানে থাকেন। ছেলেরা ভালো করে লেখাপড়া শিখে বড় বড় চাকরি করে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আছে। কদাচিৎ কখনো গ্রামে আসে। বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু একটিও দোকান নেই। সংসারে যার প্রয়োজন সব ঘরে আছে। তার বাইরে কোন কিছুর দরকার হলে দশ মাইল দূরে যাত্রা-পথে যে শহর আছে, সেখান থেকে আনতে হবে। ভদ্রলোকের কিছুদিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা হয়েছে—মাঝে মাঝে অসহ্য যাতনা হয়, ফোলেও। চিকিৎসার দরকার। কিন্তু, ডাক্তার নেই। পাহাড়ের পাঁচ হাজার ফুট নীচে সেই দশ মাইল দূরে সরকারী হাসপাতালের একজন মাত্র ডাক্তার। তাঁকে এখানে আনানোর

অনেক অসুবিধা, এঁরও যাওয়া অসম্ভব। অতএব, চিঠি লিখে চিকিৎসা চলছে, রোগ-ভোগও চলেছে!

এইসব মনে পড়ে। তাই, পাণ্ডাজির নাতিকে ডাক্তার করানোর অভিপ্রায় শুনে রাজী হই, কিন্তু তখনি মনে আশঙ্কা জাগে, পাহাড়-প্রদেশের শান্ত, নিরীহ ছেলে—হঠাৎ কলকাতার ছাত্রসমাজের ও শহর-সভ্যতার মধ্যে গিয়ে কি পরিণতি হবে কে জানে। পাণ্ডাজিকেও সে-কথা জানাই। তিনি বলেন, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ছেলেটি কলকাতায় আসে। মন দিয়ে পড়াশুনাও করে। কিন্তু, চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি কলেজে তার ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। তারপর, ভালো ভাবেই এম্. এস্-সি পাস করেছে। এখন কলকাতাতেই একটা ভলো চাকরি করছে। আচার-ব্যবহারে, নম্রতায় কোন পরিবর্তন হয় নি। তার ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য এসেছে। কিন্তু, গাড়োয়াল তাকে হারিয়েছে। প্রতি বছরে একবারের জন্যে দেশে যাওয়াও তার সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এ রকম আরও অনেককে জানি। গাড়োয়ালে বাড়ি। উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন। এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভালো ভালো চাকরি করেন। গাড়োয়ালে সে-সব চাকরির বা কাজের কোন সুযোগই নেই। দু-তিন বছর অন্তর কয়েকদিনের জন্যে যদি একবার দেশে যাওও—সে যেন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে থাকা। তাঁদেরও মন বসে না—নিজেদের লোকেদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আর মিশতেও পারেন না।

এ শিক্ষালাভে গাড়োয়ালের উন্নতি হয় নি, কয়েকটি লোকের উপকার হয়েছে। গাড়োয়ালের বহু ছেলেরা যারা এখন সাধারণ শিক্ষা পাচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন পথ খোলে নি, বরং ব্যর্থতার গ্লানিতে মন তিক্ত হয়ে উঠছে।

আর একবারের এক ঘটনা। বাইরের লোকের প্রভাবও কি ভাবে আবহাওয়া বিষাক্ত করে তোলে।

এই ১৯৫৯ সালে। কেদারনাথ থেকে ফিরছি। বাস্ যে পর্যন্ত গেছে—কীর্তিনগর... কিরাঘাটেতে সকাল আটটায় নেমেছি। এইবার বাস্-এ বসে রুদ্রপ্রয়াগ চলে আসব। কুড়ি মাইল পথ। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। টিকিটের জন্যে নাম রেজেস্ট্রি করতে গিয়ে খবর পেলাম,—দুটি মাত্র বাস্ এখন চালু আছে। আমাদের নামের নম্বর পড়ল—২৪৬। দিন দুই তিন পরে যেন খোঁজ নিই। কিছুদিন থেকে মাত্র বাস্ ঐ পর্যন্ত আসছে—তাই সাময়িকভাবে কয়েকটি দোকান খুলেছে। ছোট জায়গা। তাকিয়ে দেখে বুঝলাম, শ'খানেক যাত্রীও হবে না, নম্বরটা বাড়িয়েই লেখা হচ্ছে। তার কারণও সুস্পষ্ট। কিছু পরে নিজের চোখেও দেখলাম—পুলিসের বা কণ্ডাকটারের সঙ্গে একটু ব্যবস্থা করা।

এ-সব আমার ভালো লাগে না—বিশেষতঃ এই হিমালয়-পথে। পাহাড়ী সংগীকে বলি, কুড়ি মাইল মাত্র। হেঁটেই যাব। গতবারও তো এ পথ হেঁটেই গিয়েছিলাম।—সে বলে, দাঁড়ান। আর একবার চেষ্টা করব। প্রিন্সিপাল সাহেবের একজন পুরানো ছাত্র ওখানে রয়েছে মনে হল।

অবশেষে, আশ্বাস পাওয়া যায়, দুপুরে বারোটায় টিকিট মিলবে। পেয়েও ছিলাম, এবং বাস্ যখন ছাড়ল—কোথায় সেই ২৪৬ যাত্রী! একটিও পড়ে নেই—বরং বাসে জায়গা খালি পড়ে!

পথ থেকে একটু উপরে একপাশে ছোট্ট একটা দোকান। সেইখানে সেই চার ঘণ্টা আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছোকরা দোকানদার—বছর ষোলো বয়স। ইংরাজিতে বলে, আমি সাধারণ দোকানী নই। আমি ছাত্র। আমার কাছে 'ফার্স্টক্লাস পিওর' ঘি আছে। নিন—এখানে আর কারো কাছে পাবেন না—সর্বত্র বনস্পতি।

শুনি, বাস্-এর পথে অগস্ত্যমুনিতে স্কুলে পড়ে। এখন ছুটি। তাই এখানে দোকান চালাচ্ছে।

ভাবলাম, বলছে ভালো ঘি। একটু নেওয়াই যাক। একটা ছাত্রকে সাহায্যও করা হবে। নিই। কিন্তু রাঁধতে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরোয়। ভাজা জিনিস ফেলে দিতে হয়।

ছোকরা হাসে। বলি, এই তোমার খাঁটি ঘি? ছাত্র হয়ে এইসব করছ?

সে নির্লজ্জের মত বলে, বাঃ, ব্যবসা করছি—ওসব একটু-আধটু করতে হয়। ওতে আবার দোষ কি? ছ'টাকা করে সের বলেছিলাম, না হয় একটু কমিয়েই দেবেন।

তারপর জেরা করে' বার করি, বাইরের একটা লোক ওখানে ক'টা দোকান খুলেছে—এইসব ছেলেদের বসিয়ে চালাচ্ছে।

বাস্ হয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে, সন্দেহ নেই। বিশেষত যাত্রীদের। দশদিনের হাঁটা-পথ এখন দুদিনেই চলে যাওয়া যায়। কিন্তু, তাতে এইসব অঞ্চলের লোকেদের অনেক ক্ষতিও হয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে দু-তিন মাইল অন্তর সারি সারি চটি ছিল। পথের নিকটস্থ গ্রামবাসীরা এইসব দোকান চালাত—ব্যবসা করত। এখন দেড়শো মাইলের উপর বাস্ হয়ে গেছে—এসব দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট জায়গায় বাস্ দাঁড়াবারও বিশেষ দরকার হয় না, ছুটে বেরিয়ে যায়—যাত্রীদেরও কেনাকাটার তাগাদা থাকে না। স্থানীয় বহু লোক এইভাবে ব্যবসা হারিয়েছে, তাদের মনে একটা বিক্ষোভও জেগেছে। বাস্ চলল তাদেরই দেশে, অথচ লোকের দৈনন্দিন জীবনে কোন উপকার হল না। গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ক'জনেরই বা প্রয়োজন হয়? যাদের হয়ও সকলের ভাড়া দেবার ক্ষমতাও থাকে না। জিনিসপত্রের দামও কিছু কমে নি, বরং বেড়েই

চলেছে। হবার মধ্যে শৌখীন জিনিসপত্র ওখানে পৌঁছে গেছে। বাস্ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে এইসব লোকেদের যদি অন্য কোন উপজীবিকার বা কোন কিছু কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হত, লোকেদের উপকার হত, এই ক্ষোভেরও কারণ হত না। বাস্ আসায় আর এক বিপরীত বিপত্তিও ঘটেছে। বাইরে থেকে অনেক উৎসাহী ব্যবসাদার এসে গেছে। শহরগুলিতে নতুন দোকান খুলে বসছে। স্থানীয় ব্যাপারীরা সেখানেও ব্যবসাচ্যুত হচ্ছে।

দেশের লোকেরা তাই প্রথম বাস্ চলার আনন্দ-উদ্দীপনা কেটে গেলেই দেখে, সভ্যতার যান তাদের মুখের অন্ন নিয়ে এল না, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল। অথচ, বাস্-কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে তাদেরই দেশের বুকের উপর দিয়ে চলে যায়। তারা নিঃসহায়, নিরুপায়।

চাষের কথা বলি। পাহাড়ে চাষ হয় পাহাড়েরই গায়। স্তরে স্তরে ক্ষেতের ধাপ উঠেছে—সাহেবরা বলেন, terraced cultivation। দূর থেকে দেখতে সুন্দর লাগে। মোষের লাঙলে চাষ হয়। কঠিন পরিশ্রম করে এই পাহাড়ের পাথুরে জমি তৈরি করতে হয়। পাহাড়ের বুকে লাঙল দেওয়া—সে কি সহজ কথা! তবুও, মানুষের অদম্য উদ্যম, বুক-ভরা আশা। কিন্তু অলক্ষ্যে বসে ভাগ্যবিধাতা হাসেন। চাষীও জানে। তাঁর সঙ্গে যে তার ভয়-ভক্তি-প্রেমের সম্পর্ক—বিশ্বাসের দৃঢ়-বাঁধনে বাঁধা।

সে বছর আসছি গঙ্গোত্রী থেকে কেদারনাথের পথে। মধ্যে পাওয়ালির চড়াই। পাহাড়ীরা বলে, জার্মান কো লড়াই। একদিনও পথে বৃষ্টি পাইনি। তবুও, রোজই ছাতা-লাঠি দুই সঙ্গে রাখি—যদি আসে। একদিন আঠারো মাইল হাঁটতে হবে, চড়াইও অনেকখানি উঠতে হবে। ভাবি, বৃষ্টি তো কোনদিনই হয় না—আকাশও পরিষ্কার—ছাতার ভার অযথা বওয়া কেন? সঙ্গে নিই না। মাঝপথে হঠাৎ দূর পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখা দেয়। ছোট একখণ্ড মেঘ—কিন্তু ঘন কালো। চোখের সামনে সেই ছোট মেঘ বড় হয়ে ফুলতে থাকে, পাহাড়ের মাথা থেকে অন্য পাহাড়ে আকাশ বেয়ে লাফিয়ে ছুটে আসে। নিমেষে আকাশ, পাহাড় চারিধার ছেয়ে ফেলে। দিনের আলো নিবে যায়।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে তখনও আট মাইল বাকি। এই দুর্যোগে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু, আশ্রয় বা মেলে কোথায়? এ-পথে চটি নেই। ছুটে চলি। ঢোল-বাজানোর একটা শব্দ আসে না? হয়তো কাছাকাছি লোকালয় আছে। ঠিকই তাই। পাহাড়ের বাঁক ঘুরলেই নজরে পড়ে কিছু নীচে এক ছোট গ্রাম। পথ ছেড়ে সেইদিকে নামি। একটি লোকের সঙ্গে দেখা। আশ্রয়ের কথা বলি। সানন্দে সে আমাদের নিয়ে চলে, বলে, জল তো নেমে এল, গ্রামে যেতে ভিজে যাবেন। ঐখানে আমার নতুন একটা ঘর করছি—সেইখানে আপাততঃ উঠবেন চলুন। এখনও কিন্তু দরজা-জানলা বসে নি।

মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ছুটে সেখানে উঠি। সুন্দর দোতলা বাড়ি। মাথার জল মুছতে মুছতে বলি, না থাক দরজা-জানলা—এখানেই আজ রাত কাটাব—আপনার আপত্তি যদি না থাকে।

তিনি বলেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমার বাড়ি ধন্য হবে। কিন্তু, খাবার ব্যবস্থা আমি ঘর থেকে করে নিয়ে আসব। এ-বৃষ্টি থামতে এখনও ঘণ্টা দুই লাগবে—তারপরও চলবে থেকে থেকে এখন সাতদিন।

আবহাওয়া সম্বন্ধে কথা বলেন যেন আবহবিদ্যা-বিশারদ। অবশ্য, তাহলেই না-মেলার আশঙ্কা হয় বেশী।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, এ-সব বোঝেন কি করে?

তিনি দ্বিধা না করে বলেন, কেন? বাজনা শুনছেন না? দেবতার পুজো হচ্ছে যে। বৃষ্টির অভাবে ফসলের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই দেবতাকে বার করতে হয়েছে। এই সাতদিন আশপাশের সব গ্রামগুলি ঘুরে এলেন—প্রতি গ্রামে ঘরে ঘরে পুজো পেয়ে এলেন। সাতদিনের পরিক্রমা। শেষ হলেই বৃষ্টি নামবেই—দিন সাতেক চলবেও। আজ শেষ হল—বৃষ্টি আসবেই আমরা জানতাম। চিরকাল এ দেখেও আসছি।—চলুন না, দর্শন করবেন—খুব জাগ্রত দেবতা আমাদের।

জল কমলে দেখতে যাই। দুটো বাঁশ সমান্তরালে রাখা। তার উপরে মাঝ-খানে চেঁচাড়ি-দিয়ে-তৈরি হাতদেড়েক উঁচু একটা ছোট মন্দির মত। ভিতরে রঙিন-কাপড়ে-ঢাকা একটি ছোট মূর্তি। বাঁশ দুটোর দুইদিকে দুজন লোক—কাঁধের উপর তাই নিয়ে উন্মাদের মত নাচছে, একবার হেঁট হচ্ছে আবার লাফিয়ে উঠছে, কখনো বা ঘুরে ঘুরে চক্র দিচ্ছে। দুজন ঢুলিও ঢোল বাজাচ্ছে নেচে নেচে। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক। সকলেই বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে গেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সকলেই আনন্দে বিভোর। দেবতা তাদের পুজো নিয়েছেন, প্রার্থনা শুনেছেন।

আমাদের গৃহস্বামী বলেন, আপনারা পাহাড়ে আসতে ভালো করে নজর করেন নি? ইন্দ্রদেবের আদেশে ঐরাবত এলেন যে প্রথমে ঐ পাহাড়ের মাথায়—তারপর তাঁর বিশাল শরীর ফুলিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে পা রেখে দাঁড়ালেন—প্রকাণ্ড শুঁড় তুলে জলের ধারা ছড়াতে লাগলেন।

ফসলের জলের অভাব হলে এই হয় এদের জল পাওয়ার ভরসা।

কিন্তু দেবতাও সব সময় প্রসন্ন থাকেন না। চাষী তাও জানে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ক্ষেত-তৈরির এত কষ্ট, ফসলের এত আশা—সব কিছুই হয়তো এক-দিনের পাহাড়-ধসায় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যায়ও তাই। তবুও মানুষ হাল ছাড়ে না, নইলে পেট চলে না। আবার বহু কষ্ট স্বীকার করে অন্যত্র নতুন ক্ষেত তৈরি করে। আবার একদিন সেখানেও ভাঙে। এই তাদের চাষের জীবন। তবুও হাসিমুখে সব মেনে নেয়। ভালো ফসল হলে, নিজেদের পরিশ্রমের গর্ব

করে না, মাথায় তুলে নেয় দেবতার অশেষ করুণার দান বলে। আবার, প্রকৃতির বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতি হলে, দেবতাকে দোষ দেয় না, বলে, নিজেদের কোন পাপেরই এই শাস্তি।

চাষীদের এই শঙ্কাকুল অনিশ্চিত জীবনে আশা দিতে হবে, আত্ম-ভরসা জাগাতে হবে, তাদের সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশের চাষীদের সমস্যা আর হিমালয়ে চাষের সমস্যার মধ্যে রূপভেদ আছে, তার প্রতিকারেরও তাই ভিন্ন রূপ দিতে হবে। হাল-আমলের গতানুগতিক চাষের উন্নতির পন্থাগুলি সব সেখানে চলে না।

আর একটি ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। নতুন আইন-কানুন প্রবর্তনের কথা।

গাড়োয়ালের এক গ্রামে এক পাহাড়ী-বন্ধুর বাড়িতে কদিন আছি। একদিন গল্প হচ্ছে, হঠাৎ তিনি আমায় বললেন, একটা আইনের প্রশ্ন করি। উত্তরাধিকারী হবার আমাদের কি নতুন আইন রয়েছে বলুন তো!

আমি বলি, এখানেও আইনের প্রশ্ন? কি ব্যাপার বলুন, উত্তর দিচ্ছি।

তাঁর এক বিশেষ বন্ধুর কথা। কিছুকাল আগে মারা গেছেন। গ্রামের মধ্যে ছোট একটি বাড়ি, অল্প জমি-জমা। সেইখানে থাকতেন। সাধারণ অবস্থা। অভাব ছিল না, শান্তি ছিল। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র মেয়ে। এ পক্ষের দুটি ছেলে। কোন স্ত্রী জীবিত নেই। ছেলে দুটি বড় হয়েছে। বাড়িতে থাকে, ক্ষেত-খামারের কাজ করে। কয়েক বছর আগে মেয়েটির বিবাহ দিয়েছেন। একমাত্র মেয়ে, মা-হারা। বিয়ে দিতে অনেক খরচ করেছিলেন। জামাইটি এ-দেশের হলেও বহুদিন দেশ-ছাড়া। বাইরে থেকে লেখাপড়া করেছে, এখন পাঞ্জাবে ভালো চাকরি করে। অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু সমাজে এঁদের চেয়ে কিছু নীচু। তাই বিয়ের প্রস্তাবে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আপত্তি উঠেছিল। তবুও, পাত্রটি ভালো বলে ভদ্রলোক হাতছাড়া করেন নি; সম্পত্তির খানিকটা বিক্রী করে বিয়ে দেন। বিয়ের পর জামাই আর আসে নি। জাত সম্বন্ধে দু-একটা মন্তব্য নাকি তার কানে গিয়েছিল। মেয়েও আর আসে নি। বাপের শেষ অসুখের খবর পেয়েও নয়। কিন্তু, মারা যাবার কিছুদিন পরেই এক উকিলের চিঠি—বাড়ি ও জমির অংশ মেয়ে দাবী করে। ছেলেরা চিঠি পেয়ে সন্ত্রস্ত, কি করবে বোঝে না। পরামর্শই বা করবে কার সঙ্গে? চুপ-চাপ বসে ছিল। সম্প্রতি সমন এসেছে কোর্ট থেকে—ভগ্নী ভাইদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে—তার অংশের দাবী করে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েদেরও কি ছেলেদের সঙ্গে স্বত্ব হয়েছে? এই কি নতুন আইন? মেয়েটার বিয়ে দিতে সম্পত্তির খানিকটা তো বিক্রী করে দিতে হল —আর ওই ছোট একটা পাথরের বাড়ি, তার অংশ নিয়ে মেয়ে-জামাই করবেই

বা কি, আর তার ভাগই বা হবে কি করে? নগদ টাকাই বা ছেলেরা প কোথায়?

আমি বলি, ও-সব তর্ক এখন আর চলবে না। দেশের ভাগ্য-বিধাতারা এসব নতুন আইন করেছেন—কেননা, সমাজে ও দেশে মেয়েদের সমান অধিকার দেওয়াই উদ্দেশ্য, নইলে দেশে মঙ্গল আসবে না, জাতি-হিসেবে জগতে পেছিয়ে থাকবে।

ভদ্রলোক বল্লেন, গ্রামের লোকেরা এ-সব কিছুই জানে না। কোথা থেকে আইন করে তাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এতে তো এখানকার সব সংসার ভেঙে যাবে। গাড়োয়ালে প্রথম এই ধরনের মামলা হল, শুনলাম। আরও হবে নিশ্চয়। অথচ এখানকার লোকে কোর্ট-আদালত জানেই না—কখনও দরকারও হয় না।

আমি বলি, কোর্ট পর্যন্ত যাবে কেন? মেয়েদের অংশ ছেড়ে দিলেই হয়।

বন্ধু বলেন, ছোট বসতবাড়ি—তার মধ্যে অংশ ছাড়া, সে-কি সম্ভব!—তারপর হঠাৎ চিন্তিত হয়ে বলেন, আমার নিজের কথাও তো তাহলে ভাবতে হয় দেখছি। মেয়েদের সব ভালোভাবে বিয়ে দিয়েছি,—জামাইদের কাছে বাইরে থাকে। এখানে মাঝে মাঝে আসেও।—নাঃ, তারা কেউ ওরকম হবে না। তবু, আইনে যদি অধিকার দিয়ে থাকে—তারাই বা দাবী ছাড়বে কেন?—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সম্পত্তি থাকাও এক বিপত্তি!—গালে হাত রেখে চুপ করে ভাবতে থাকেন।

চারিদিকে আকাশ-চুম্বী গিরিশ্রেণী। বিরাট নিস্তব্ধতা। সেই অচল হিমাচলের নিভৃত অন্দরে প্রাচীন সংস্কারের অচলায়তন। সেই দুর্গম গিরিপ্রাচীর ভেদ করে প্রগতির আকস্মিক তুফান পাহাড়ী মানুষের শান্ত জীবনে দুশ্চিন্তার ও অশান্তির প্রচন্ড আলোড়ন তোলে।

॥ ৬ ॥

বদরীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণ যাত্রীদের মিলন-ক্ষেত্র। নতুন যাত্রী কারা এলেন, কত লোকই বা এলেন, সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলেই অনেকটা ধারণা করা যায়। যাত্রী-সংখ্যা তো কম নয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অবিরত আসছে। উঠছে, ভাঙছে, ফিরছে। শহরে প্রবেশ করার মুখে কর্তৃপক্ষের একটা দপ্তরও আছে—যাত্রী-সংখ্যা গণনার জন্যে। প্রতি দলের দলপতির নামধাম, কয়জন সঙ্গী—সব লেখা হয়। মে-জুন মাসে যাত্রায় সব চেয়ে ভিড়। প্রতিদিন হাজার খানেক যাত্রী—কখনো বা তারও বেশী—আসতে থাকেন। পটখোলার দিন—অর্থাৎ বছরের প্রথম যেদিন মন্দির খোলে—পাঁচ-ছয় হাজার যাত্রী হয়। প্রায় ছয় মাস মন্দির খোলা থাকে, আজকাল বাস্ চলাচল হয়ে সর্বসমেত লাখ-খানেকেরও উপর যাত্রী বছরে যায়। আগেও বহু যেতেন, সে-সময়েও বছরে পঞ্চাশ-ষাট হাজার হত। তবে তখন যাত্রীদের মনে নানারকম ভয় ছিল, ভাবনা

ছিল,—এখন অনেক কমে গেছে। কেদারনাথের যাত্রা, বাস্ হয়ে, সেই অনুপাতে বাড়ে নি। ও-দিকেও বাস্‌পথ এগিয়েছে, কিন্তু অনেকে আজকাল দুবার বাস্-বদলের ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে শুধু বদরীনাথেই যান। সারা তীর্থপথ ঘোরাতে তাঁদের উৎসাহের অভাব, সম্ভবত সময়েরও টানাটানি। তাই, শুধু বদরীনাথে দশ-বারো দিনেই ঘুরে আসেন। এ-যাওয়ার সার্থকতা কম। যাঁরা অবশ্য দু'বছরে ধীরেসুস্থে দু'জায়গায় যেতে চান—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। সে-রকম এক দম্পতির সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল।

বদরীনাথ থেকে ফিরে আসছি। পথের পাশে চটিতে কাঠের বেঞ্চের উপর দুজনে বসে চা খাচ্ছেন। সাধারণ যাত্রীর মত বেশভূষা নয়—তাই বিশেষ করে চোখে পড়ল। ভদ্রলোকের পরনে হাত-কাটা সার্ট, ফুল প্যাণ্ট—বুটের সঙ্গে ব্রিচেস্-এর মত পট্টি দিয়ে বাঁধা, মাথায় ক্যাপ, চোখে রঙীন চশমা, হাতে লাঠি। ভদ্রমহিলার সুশ্রী চেহারা, পরনে ফুল-কাটা নানান্ রঙে চিত্রিত সিল্কের শাড়ি, মাথায় রোদ আটকাবার জন্যে প্রকাণ্ড এক স্ট্রহ্যাট্, চোখে নীল চশমা, ঠোঁটে গালে লাল রঙের প্রসাধন। তাঁরও কাছে এক লম্বা লাঠি।

চটিতে সাধারণত চা দেয় মোরাদাবাদী গেলাসে। আজকাল কোথাও কোথাও কাপ-ডিসের প্রচলন হচ্ছে। গেলাসগুলি গরম হয়ে যায় অতি সহজেই। রুমাল বা সেই জাতীয় কাপড় দিয়ে না জড়ালে হাতে ধরা যায় না। এঁরা দুটি রঙিন রুমালে সেই ভাবেই ধরেছিলেন। পান করছেন দেখলাম খুব উপভোগ করে। আমাকে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক কটা বেজেছে বলতে পারেন?

হেসে উত্তর দিই, ঠিক সময় কি, তা জানা নেই। অনেকদিন শহর ছাড়া, ঘড়ি মেলাবার সুযোগ পাইনি। তবে আমার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে বলতে পারি।

সময় বলি। তাঁর ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল, তিনি চালিয়ে নেন। আমি বলি, এ-সব পথে এক-আধ ঘণ্টার তফাত হলেও ক্ষতি নেই—এখানে কেউ সময়ের সে-ভাবে মূল্য দেয় না, দরকারও হয় না।

তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। শিক্ষিতা মহিলা। সাহেবী কায়দায় ইংরাজি বলেন।

ভদ্রলোক বলেন, দেখুন, আমাদের একটা অনুরোধ রাখতে পারেন? আমাদের দুজনের কাছে দুটো ক্যামেরা রয়েছে। ছবিও তুলছি অনেক। উনি আমার ছবি তোলেন, আমি ওঁর তুলি—কিন্তু দুজনের ছবি একসঙ্গে তোলা হচ্ছে না। আমার ক্যামেরাটা ঠিক করে আপনার হাতে দিচ্ছি—আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াব—একটা ছবি যদি কষ্ট করে তুলে দেন—

মুখে সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়ান।

আমি সানন্দে ছবি তুলে দিই। দিয়ে বলি, একটু দাঁড়ান। আমারও একটা অনুরোধ আছে। এটা আমার অজানা ক্যামেরা—ঠিক উঠল কিনা জানি না।

আপত্তি যদি না করেন, আমার নিজের ক্যামেরায় একটা ছবি নিই—ওতে ঠিকই উঠবে, ভরসা রাখি।

ওঁরা আরও খুশী হন। ছবি তোলা হয়। কলকাতায় এসে ওঁদের পাঠিয়েও দিই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। সিন্ধু-প্রদেশে বাড়ি ছিল। পাকিস্তানের পর সব ছেড়ে আসতে হয়েছে। মিলিটারী এয়ার অফিসার। ফ্লাইট্ লেফ্টেনেন্ট। দিল্লীতে এখন আছেন। এক মাসের ছুটি নিয়েছেন। সস্ত্রীক বদরীনাথ বেড়াতে চলেছেন। এ যাত্রায় কেদারনাথ যাবেন না। বলেন, এবার এটাই শুধু করা যাক। ভালো লাগে তো আসছে বছর আবার এক মাস ছুটি নেব—তখন কেদারনাথ ঘুরে আসা যাবে। ভালো যে নিশ্চয় লাগবে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারছি। ধীরেসুস্থে পায়ে হেঁটে চলেছি। ইচ্ছে হলেই চটিতে বসি—চা খাই। সারাদিনে দু মাইল—চার মাইল গেলেও ক্ষতি নেই। এক মাস সময় হাতে রয়েছে—কম নয় তো! দুজনে বেশ দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে যাওয়া যাচ্ছে। রাস্তা দেখছি ভালোই—শুধু পাতালগঙ্গার কাছে দেখলাম এক-জায়গায় ভেঙে গেছে—সারানো চলছে—সেইখানটায় একটু সাবধানে পার হতে হল। যারা কাজ করছে তারাই হাত ধরে পার করিয়ে দিলে। আমি এঁর একটি ছবি সেখানে তুলে নিয়েছি—এই ড্রেস—সাজগোজ—আর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া-জামা লেঙ্গুটি-পরা ধুলোমাটি মাখা এক গাড়োয়ালি। দুজনকে চমৎকার মানিয়েছিল। বলে কৌতুক-দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকান।

মহিলাও হেসে উঠে বলেন, বটে! আমার কথাটা বলা হল—আর নিজের কি? মিলিটারী অফিসার। মস্ত বীরপুরুষ। সে-জায়গাটা পার হতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের তলায় একটা ছোট পাথর একটু সরে গেছে—আর অমনি—ওঁর তখনকার মুখের চেহারাটা যদি দেখতেন!—যে-লোকটা হাত ধরে ওঁকে পার করছিল, দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও নিয়েছি সেই অবস্থায় একটা ছবি তুলে! দেব তোমার কমাণ্ডারের কাছে পাঠিয়ে।

দুজনে এইভাবে হাস্য-পরিহাস করতে থাকেন। 'বাই' 'বাই' বলে এগিয়ে চলেন।

দেখি, মন-ভরা আনন্দ নিয়ে চলেছে। যেন, দুটি রঙিন পাখী—বনের মধ্যে গাছের এ-ডালে ও-ডালে বসতে বসতে উড়ে চলে। জানি, আর দু'দিন চলার পর, রঙের চটক্ যাবে, কিন্তু মনের আনন্দ কমবে না।

সেই ভদ্রমহিলার অত রঙিন বেশভূষা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও পাহাড়ের পথে দৃষ্টিকটু লাগে নি। কিন্তু চোখে লেগেছিল বদরীনাথের মন্দিরের মধ্যে আর এক মহিলার সাজসজ্জা দেখে।

দর্শনের জন্য যাত্রীর তখন বেশ ভিড়। মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহের দরজার সামনে একটু জায়গা নিয়ে বসতে যাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল সকলের দৃষ্টি বিগ্রহের প্রতি নয়—দরজার একধারে পাথরের যে উঁচু লম্বা বেদী মত বসবার জায়গা আছে সেই দিকে। তাকিয়ে দেখি একটি রূপসী মহিলা সেখানে বসে। রঙ-বেরঙের খুব দামী ও উজ্জ্বল শাড়ী পরা। অঙ্গ-ভরা হীরা-মুক্তার অলঙ্কার। তাঁর পাশেই বসে আছেন এক নধরকান্তি পুরুষ—গেরুয়াধারী! এমন ভাবে আছেন যে ইনি মহিলাটির সঙ্গী বলে বুঝতে ভুল হয় না। এই বিচিত্র সংসর্গ ও মন্দিরের মধ্যে রূপসজ্জার এমন উৎকট প্রদর্শন অদ্ভুত লাগে, যাত্রীরাও দেবতা ভুলে মানুষের লীলা দেখে।

লীলাই বটে!

মন্দির থেকে বেরিয়ে পরিচয় পাই। এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের কোন এক মঠের মঠাধীশ। অতএব, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। পরিধানে ওটা ঠিক গেরুয়া নয়, গেরুয়া অনুরূপ আর এক কি রঙ, শুনি। সঙ্গে সহধর্মিণী। তাঁদের মঠের নিয়মে বিবাহে বাধা নেই। সস্ত্রীক তীর্থ-দর্শনের পুণ্য অর্জন করতে বেরিয়েছেন।

তা করুন। কিন্তু, দেবস্থানের উপযোগী বেশভূষা করাও যে ধর্মেরই এক অঙ্গ, সে বোধের অভাব হয় কেন, বুঝি না। দক্ষিণ-ভারতে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে হলে পুরুষদের খালি গায়ে যাবার প্রথা আছে। দেহের সাজসজ্জা বাইরে ফেলে দেবতার কাছে যেতে হবে—এ-কথা ভাবতেও ভালো লাগে। উত্তর-ভারতে সেরূপ কোন রীতি নেই ; হিমালয়ের এই সব শীতাঞ্চলের মন্দিরে হবারও উপায় নেই। কিন্তু, তবুও সর্বত্রই মন্দিরে বেশ-ভূষার শালীনতা যাত্রী মাত্রেই মেনে চলেন। এতে মনে তৃপ্তিও আনে। মনে পড়ে, আমাদের দেশের পূজার্থিনী মহিলাদের কথা। কি শুচিশুভ্র রূপ-সজ্জা, স্নান সেরে গরদ বা তসরের শাড়ি-পরা, ভিজা চুল—এলো করে কাঁধ বেয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে রাখা, এক হাতে নৈবেদ্যের থালা—চন্দন ধূপকাঠি, অপর হাতে সদ্য-তোলা ফুলের সাজি,—মুখভরা স্নিগ্ধ-পবিত্র ভাব। ধন-দৌলতের জৌলুস নয়, উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসের বিকিরণ নয়—সহজসুন্দর ভক্তি-প্লুত অপূর্ব মূর্তি!

মন্দিরে দেব-দর্শনে একটা আনন্দ আছে। কেন আছে, তার মধ্যে যুক্তি-তর্ক চলে না। মানুষের বিচিত্র মন। কোন্ পথ দিয়ে তার আনন্দ আসে, দুঃখ জাগে—সব সময়ে তার কারণ পাওয়া যায় না। মন্দিরের বাইরের আবহাওয়ার মধ্যে মনের যে ভাব, মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহের সামনে দাঁড়াতেই সেই মনেরই একটা অকস্মাৎ পরিবর্তন আসে। বেশ লাগে বসে বসে মূর্তির সেবা-পূজা-আরতি দেখতে।

প্রাতে ও রাত্রে নির্বাণ-দর্শন। ভোরে রাত্রির অঙ্গাবরণ একে একে সব

খুলে ফেলা হয়। তখন দর্শন পাওয়া যায় বেশ-ভূষাহীন শুধু পাথরের মূর্তির। সৌম্যদর্শন নারায়ণ। যোগাসনে আসীন। পূজার অধিকারী একমাত্র রাওয়াল। দেবতাকে স্পর্শ করার আর কারো অধিকার নেই। দক্ষিণ-ভারতের নাম্বুদ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গর্ভগৃহে আর একজন সাহায্যকারী আছেন—নায়েব রাওয়াল। সব গুছিয়ে রাওয়ালজির হাতে তিনি এগিয়ে দেন। আর কারো ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। দ্বারের বাইরে দর্শন-গৃহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-আচার্য-উপাসকগণ সুর করে সমস্বরে বেদপাঠ করেন, স্তোত্র পড়েন।

এরি মধ্যে এক সময়ে বিগ্রহের লক্ষণাদি ব্যাখ্যাও করে দেন একজন,—রাওয়ালজি সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল দীপ নিয়ে সেই সব লক্ষণ দেখিয়ে দেন।

কালো পাথরের মূর্তি। প্রায় ফুট দুই উঁচু। কেউ বলেন যোগাসন, কারো মতে সিদ্ধাসন। চরণ দু'খানি দেখা যায়; চরণে পদ্ম-চিহ্ন—বর্ণনায় শুনি। দুইটি হাত কোলের উপর রাখা—স্পষ্ট দেখা যায়। কারো মতে চতুর্ভুজ মূর্তি—অপর দুইটি হাত একসময়ে থাকার কয়েকটি নিদর্শন মূর্তির অঙ্গে দেখানো হয়। কম্বু-গ্রীব—প্রদীপের আলোকেও শাঁখের ন্যায় রেখা গ্রীবায় স্পষ্ট ফোটে। যোগী নারায়ণ—শিরোভাগ থেকে জটাভার নেমে এসেছে দু'দিকে কাঁধের উপর। বুকের উপর উপবীত, মধ্যখানে ভৃগু-পদ-চিহ্ন। বিশাল-বক্ষ। ক্ষীণকটি। সুন্দর লীলায়িত মূর্তি। কিন্তু মুখমণ্ডলের অস্তিত্ব নেই—যেন কিসের আঘাতে অবলুপ্ত হয়েছে—এমনি মসৃণ, সমতল।

এ-মূর্তি কোন্ দেবতার তা নিয়ে মতভেদ আছে। সে কথাও প্রচার করা হয়। বৈষ্ণবেরা এই বিগ্রহে দেখেন—চতুর্ভুজ নারায়ণ। শৈবরা বলেন, দ্বিভুজ জটাধারী শিবমূর্তি। শক্তি-উপাসকদের মতে—দেবী ভদ্রকালীর মূর্তি। জৈনরা বলেন, ইনি তীর্থঙ্কর।' আবার, কারো মতে এটি ধ্যানী-বুদ্ধ-মূর্তি; নারায়ণের প্রাচীন মূর্তি অপসারিত হবার পর, এই মূর্তি তিব্বত থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাদ আছে, রাজা বৈখানস বদরীনারায়ণের মূর্তিতে রামচন্দ্রজির পূজা করতেন। ব্যাখ্যাকারী উপসংহারে বলেন, দেবতার মূর্তি। যে ভক্ত যেমন বিশ্বাস নিয়ে দেখবেন তিনি এখানে সেই রূপেরই সেই ভাবে দর্শন পাবেন। ভগবানই আশ্বাস দিয়েছেন ঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

মন্দিরের অন্যান্য বিগ্রহাদিরও সেইভাবে পরিচয় ও বর্ণনা দেওয়া হয়—দুই ঋষিভ্রাতা নর, নারায়ণ; নারদ, গরুড়, কুবের আদি।

শোনা যায়, বদরীনাথের নারদকুণ্ড থেকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এখানকার এই মূর্তি উদ্ধার করেন এবং গরুড়শিলার কাছে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে, ১৫শ শতাব্দীতে গাড়োয়ালের এক মহারাজা বদরীনাথে একটি মন্দির নির্মাণের জন্যে

স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং এখন যেখানে মন্দির সেইখানে মূর্তিটি নিয়ে আসেন। এর পর রাণী অহল্যাবাঈ সেই মন্দিরটির সংস্কার করেন ও মন্দিরের শীর্ষদেশ স্বর্ণ দিয়ে আচ্ছাদন করে দেন।

শুনি, এ-মূর্তি সাধারণ পাথরের মূর্তি নয়, শালগ্রাম-শিলা।

মূর্তির অভিষেক হয় ;—ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজলে, দুধের ধারায়ও। তারপরে আতর আদি সুগন্ধি উপচারে মার্জন হয়। রাওয়ালজি আতরের পাত্রটি বাইরে পাঠিয়ে দেন—দর্শনার্থীরা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে সেই সুগন্ধ কপালে লাগান, ঘ্রাণ করেন,—মনে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল ভাব জাগে। তারপর, গাঢ় শ্বেত-চন্দন দিয়ে নারায়ণের সারা অঙ্গ প্রলেপন করা হয়—যেন সুদক্ষ ভাস্কর চন্দনেরই এক অনুরূপ মূর্তি গড়লেন। অবশেষে বেশ-ভূষা দিয়ে, অতি মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে, বহু ফুলের ও পাহাড়ী-তুলসীর মালায় বিগ্রহের শৃঙ্গারবেশ হয়,—তারি মধ্যে ফুটে ওঠে চোখ-মুখ-নাসার আকৃতিও। প্রকৃত পাথরের শান্ত সমাহিত যোগী-মূর্তি এইভাবে অদৃশ্য হন ; উজ্জ্বল বসন-ভূষণ-ফুল-সাজে সিংহাসনে জেগে বসেন মোহন মধুর মূর্তি।—তখন শুরু হয় নানান দীপমালায় তাঁর আরতি ; ঘণ্টাধ্বনি ওঠে, স্তবগান চলে।

একবার এই মূর্তি সাজানোর মধ্যে বিশেষ এক আনন্দ অনুভব করেছিলাম।

সে বছর কলকাতা থেকে যখন যাত্রার আয়োজন করছি, মা বললেন, নারায়ণের বস্ত্র নিয়েছ ?

আমি হেসে বলি, নিজেকেই নিয়ে চলেছি—সামান্য একটা কাপড় নিয়ে কি হবে ? কত ধনীলোক যান—খুব দামী ভালো রঙ্-বেরঙের ভেলভেট, সিল্কের কাপড় দেন। তোমার নারায়ণের কি আর কাপড়ের অভাব ? না, সেই সব ফেলে আমার-নিয়ে-যাওয়া সামান্য একটা কাপড় তিনি পরবেন ?

মা ধমক দেন, ছিঃ, ওকথা বলে। একটা জোড় কিনে নিয়ে যাও—ছোট হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু রঙটা দেখে নিও—নারায়ণের সব রঙ চলে না—হলুদ রঙ হলেই ভালো।

বলেই চুপ করে অন্যমনে একদিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটে। ভাবি, বোধ হয় নিজের কল্পনায় কল্পিত কাপড়খানি পরিয়ে মূর্তিটি দেখেন!

তারপর বলেন, হ্যাঁ, তাই নিয়ে যা।

নিয়ে যাই-ও।

রাওয়ালজি মূর্তি সাজাচ্ছেন। একমনে বসে দেখছি। বেশ সাজান। এদিকে একটা কাপড় ছড়িয়ে দিয়ে, ওদিকে খানিকটা কুঁচিয়ে—একটু পেছিয়ে এসে দেখেন, ঠিক হল কিনা। নাঃ, ওদিকটা যেন একটু বেঁকে আছে, এগিয়ে গিয়ে সোজা করে দেন। ওখানটায় মানায় নি। আর একটা কাপড় তুলে নিয়ে সেইদিকে ঝুলিয়ে দেন। রত্নবেদীর উপরও এমন ভাবে কাপড় ছড়িয়ে দেন, মনে হয় যেন বিগ্রহের দেহেরই এক অংশ। সরে এসে একমনে একদৃষ্টিতে দেখা,

আবার এগিয়ে যাওয়া—অতি-সযতনে একটু অদল-বদল করা,—দেখে মনে হয় যেন, নিপুণ শিল্পী ইজেলের উপর ছবি রেখে আঁকছেন—দূরে থেকে দেখছেন, আবার এগিয়ে এসে আঁকছেন।

পাশে জড়ো করা যাত্রীদের দেওয়া কাপড়। ভালো ভালো দামী অনেকগুলি রয়েছে—তার থেকেও দু-একটা তুলে নেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, তারি মধ্যে থেকে বেরুল মা'র-পাঠানো সেই পীত-বসনটি। উঁচু করে ধরে রঙটি দেখেন। তারপর খুলে কুঁচিয়ে মূর্তির সুমুখদিকে মধ্যিখানে কোঁচার মত ঝুলিয়ে দেন—কাপড়ের নীচের দুই দিকের দুই খুঁট ধরে বেদীর উপর বিস্তার করে দেন—দেখে যেন মনে হয় একটি ফোটা কমলের আধখানা। আশ্চর্য হয়ে দেখি। ঐটুকু বস্ত্রখণ্ড, তারি মধ্যে এতখানি বিস্তৃতি ছিল! ছোট কাপড়ও বড় হয়ে চোখে পড়ে। আনন্দে মন ভরে ওঠে। মনে মনে মাকে স্মরণ করি, দেখে যাও তোমার নারায়ণের কাপড় পরা! সেই জন্যেই বুঝি হেসেছিলে!

সেইদিনই মাকে চিঠি লিখে সব জানাই। দিনের মধ্যে কয়েকবার মন্দিরে ঘুরে ঘুরে দেখেও যাই।

রাওয়ালজির মূর্তি-সাজানো, পুজো, আরতি—দেবতার সব কাজেই যেমন সৌন্দর্য বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর প্রেম-বিহ্বল তন্ময়তাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমারও ভালো লাগে। সেই বারই তাঁর সঙ্গে, তারপর, আলাপ করি তাঁর বাড়ি গিয়ে। তপ্তকুণ্ডে যাওয়ার পথে সিঁড়ির ধারেই বাড়ি। বয়স বোধ করি বছর পঁচিশ মাত্র হবে। পাতলা লম্বা গড়ন। কৃষ্ণ বরণ। মাথায় লম্বা কালো কোঁকড়ানো চুল—কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ইংরাজি বোঝেন না, হিন্দী অল্প শিখেছেন, সংস্কৃত ভালো জানেন। মাত্র দু'বছর এখানে এসেছেন। সরল মধুর ব্যবহার। অল্প কথা বলেন,—মনে হয়, মন যেন তাঁর কোন্ গভীরে ডুবে আছে। তাঁর বিগ্রহ-সাজানোর প্রশংসা করি। লজ্জা পান। শূন্য দৃষ্টিতে অন্য দিকে তাকান। অস্ফুটস্বরে বলেন, ওতে অদ্ভুত এক আনন্দ পাই। আমার তখন নিজের আর জ্ঞান থাকে না—মনে হয়, কে যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।

আমি বলি, দেখে মনে হয় বিগ্রহও আনন্দ পান আপনার হাতে সেজে ও পুজো নিয়ে।

এই ভাবেই স্বল্প পরিচয় হয়। কিন্তু তারই মধ্যে অসীম আনন্দ পাই।

পরের বছর গিয়ে দেখি, তিনি নেই। আর এক নূতন রাওয়াল। তাঁর খবর নিই। শুনি, শীতের সময় মন্দির বন্ধ হলে দক্ষিণে তাঁর দেশে যাচ্ছিলেন। পথে কাশীতে নামেন। সেখানে বসন্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মন্দিরে বসে বার বার তাঁর কথাই স্মরণ হয়। ভাবি, স্বর্গের মন্দিরে বুঝি তাঁর সাজানোর ডাক পড়েছে!

কয়েক বছর থেকে মন্দিরের ভিতর বেশী যাই না বা থাকি না। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই ঘুরি। দেবতার দর্শন মনে মনেই করি। এর এক বিশেষ কারণ আছে।

মন্দিরের গর্ভগৃহে—যেখানে বিগ্রহ আছেন—তার সামনে একটি ঘর। সব যাত্রী সেই ঘর থেকে দর্শন করেন। ঘরের মধ্যখানে একটা বড় সিন্দুক, তার উপর রুপোর প্রকাণ্ড এক থালা ও ডাবর রাখা। ডাবরের তলায় ফুটো, সিন্দুকের মাথায় গর্ত। ডাবরের মধ্যে যা পড়ে, সিন্দুকের ভিতর তা চলে যায়, সিন্দুকে তালা বন্ধ। এই পাত্রগুলিতে যা কিছু প্রণামী, দান ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। সিন্দুকটি ঘরের মাঝে থাকায় একটা বেড়ারও কাজ করে—যাত্রীদের ঐখান থেকেই দর্শন করতে হয়—আরও কাছে যাবার তাদের উপায় নেই। সিন্দুক থেকে গর্ভগৃহের দ্বার পর্যন্ত সম্মুখের যে স্থানটুকু—দর্শন পাবার সব চেয়ে ভালো ও লোভনীয় জায়গা যেটা—সেখানে শুধু ভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রবেশ করার অধিকার আছে। এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন যে-সব যাত্রী মোটা টাকা দিয়ে পুজা দেন, আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা,—সরকারী ক্ষমতাশীল অফিসাররা তো বটেই। কয়েকবার যাতায়াতের ফলে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ হয়ে গেছে, আমি গেলেই সাদরে কাছে সবাই ডেকে নেন। তাই আমারও সেখানে যাবার কোন বাধা নেই।

কিন্তু, সেখানে বসে স্বস্তি বোধ করি না। পিছনে পঁচিশ-ত্রিশের বেশী যাত্রী একসঙ্গে ধরে না। অথচ, হয়তো হাজারখানেক যাত্রী দর্শন পেতে এসেছেন;—মন্দিরের ভিতর, বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। যাতে হঠাৎ ভিড়ের চাপ ঘরের মধ্যে এসে অশান্তির সৃষ্টি না করে তাই দরজার বাইরে প্রাঙ্গণে কাঠের বেড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া আছে,—তারি মধ্যে দিয়ে সার বেঁধে যাত্রীরা ঘরে ঢোকে। দরজার মুখে মন্দিরের দ্বাররক্ষীরা থাকে,—ঘরের ভিতরের জনতা বুঝে—দরজা খোলে, যাত্রী ছাড়ে, আবার বন্ধ করে। দর্শনের পর বার হয়ে যাবার আর একটি দরজা—ঘরের আর এক দিকে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ভালোই। কিন্তু মন্দির ছোট, যাত্রী অনেক বেশী। কর্মচারীরা, সাধারণত, বিনীত ভাবেই এক মিনিট পরেই সামনের যাত্রীদের বাইরে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন, আপনাদের দেখা হয়ে গেছে—এবার এগিয়ে ঐ দরজা দিয়ে যান—পেছনের যাত্রীদের আসতে দিন—তাঁরাও দেখবেন—চলুন, এগিয়ে চলুন।

কিন্তু, আগাবেন কে? সব যাত্রীই বহু দূর দেশ থেকে কত কষ্ট স্বীকার করে—কত অর্থ ব্যয়ে—কত বুক-ভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—হিমালয়ের এই দুর্গম তীর্থে এসেছেন—ভগবান শ্রীবদরী-বিশালের দর্শন পেতে। এই কি তাঁর দর্শন? দু'দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই—বাইরের প্রখর আলো থেকে এসে মন্দিরের অভ্যন্তরের স্তিমিত আলোকে তখনও চোখের দৃষ্টি অভ্যস্ত হয় নি—বিগ্রহের দর্শন তখনও সুস্পষ্ট নয়;—বাইরের কোলাহল থেকে মন তখনও

মুক্ত হয়ে সমাহিত হয় নি—মন্দির ছেড়ে চলে যাব ?

কর্মচারী তাগাদা দেয়, বেরিয়ে চলুন, এখন বেরিয়ে যান—ইচ্ছে হয় তো আবার ঘুরে পেছন থেকে আসবেন।

যাত্রী বলে, আবার সেও তো এসে তখনি বেরিয়ে যেতে হবে ?

তা তো হবেই। উপায় কি ?

এ যেন সেই ঝাঁকি-দর্শন। বৃন্দাবনের এক মন্দিরে দেখেছিলাম। রাজপুতানার প্রসিদ্ধ নাথদ্বার মন্দিরেও সেই নিয়ম। মন্দিরের ভিতরের দরজার উপর পর্দা ফেলা। পর্দা একবার সরছে, আবার তখনি বন্ধ হচ্ছে। এরি মধ্যে বিগ্রহের দর্শন। যেন, ঝিলিক মেরে দেখা !

বদরীনাথে পর্দা সরে না। সারি সারি যাত্রী সরে। একটানা স্রোতের মত অনবরত চলেছে ;—ধীর স্থির মনে তাদের দর্শনের কোন উপায় নেই। অথচ, আমি বসে আছি—মূল দরজার কাছে—বিগ্রহের সামনে। যতক্ষণ মন্দির খোলা থাকবে—এখানে বসে দেখতে পারি। পাশে আমার বিপুলকায় কয়েকটি মারোয়াড়ী পুরুষ-মহিলা।—তাদের কোলের উপর দুটি ছোট ছেলে মেয়ে শিশু-সুলভ উৎপাত করে।

হঠাৎ কানে শুনি পিছনে জনতার মধ্যে এক নারী-কণ্ঠ।—'যাচ্ছি, বাবা, এখনি যাচ্ছি।—একটু দাঁড়িয়ে একবার দেখতে দাও। কই, নারায়ণের চরণ কই ? দেখা যায় না ? আহা, তাই তো ! বসনে মালায় ঢাকা পড়েছে যে ! মুখটি কোথায় দেখাও না, বাবা ? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি—ঐখানে হবে—কপালের ওপর ঐ না হীরে ঝকঝক করছে—মাথার ওপর মস্ত বড় মুক্তো-পান্নার মুকুট ঐ তো। আহা—কি সাজ ! চোখ সার্থক হল। ধরো—বাবা, ধরো, এই নাও।'

পিছন ফিরে তাকাই। দেখি, ছিন্ন তসর-পরা এক বৃদ্ধা। চোখের দৃষ্টি কমেছে, শরীরের শক্তি গেছে, তবু ভিড় ঠেলে সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একটি ছোট্ট পাতলা রূপার বাঁশী। তুলে ধরে কর্মচারীকে দেন, বলেন, যাচ্ছি, এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি—একবার ঠাকুরের হাতে এটি ধরিয়ে দাও বাবা—দু'চোখ ভরে দেখে যাই।

কর্মচারী মৃদু হেসে বলেন, মা, ঠিক আছে, এটা দেবেন তো ? এই সিন্দুকের মধ্যেই থাকবে এ-সবই—ঠাকুরের জিনিস আছে এতে।

বৃদ্ধা ছাড়েন না, অনুনয় করতে থাকেন, একবারটি ঠাকুরের হাতে দাও বাবা !—কর্মচারী হেসে বাঁশীটি সিন্দুকেই ফেলে দেন। বৃদ্ধার চোখে জল নামে। এক পা এগিয়ে যান। আবার ফিরে দাঁড়ান, বলেন, যাচ্ছি, দাঁড়াও, এটাও আছে যে !—একটি পুরনো রূপার টাকা অতি যত্নভরে আঁচল থেকে খুলে দেন। এ যে তাঁর লক্ষ-টাকার সমান !—সিন্দুকের রাশীকৃত প্রণামী অর্থের মধ্যে সেটিও লুপ্ত হয়।

কিসের এক লজ্জায় ও বেদনায় আমার মন ভরে যায়। আমিও উঠে চলে

আসি। তার পর থেকে, দর্শনে গেলেও আর বেশীক্ষণ ওখানে বসি না।

আর এক বারের কথা।

বাইরে মণ্ডপে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দর্শন করছি। নিকটে একজন তাঁর সঙ্গীকে বিগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন, শুনি। বিবরণের ধারা শুনে কৌতূহল হয়। তাকিয়ে দেখি, সঙ্গীটি তাঁর সম্পূর্ণ অন্ধ। অপরের মুখের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি দর্শনের আনন্দ নিচ্ছেন। মনে মনে ভাবি, এই দুর্গম পথ,—কত রকম অসুবিধা—এই অন্ধব্যক্তি অতিক্রম করে এসেছেন নিশ্চয় সঙ্গীর হাত ধরে। কিন্তু, এ-পথের একটা বিশেষ আকর্ষণ—চারিদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য। চোখে মনে আনন্দ আনে। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করে। নূতন দেশ ও দৃশ্য দেখার মনে একটা আগ্রহও থাকে। তাছাড়া মন্দিরে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা তো আছেই। কিন্তু, দৃষ্টিহীনের কাছে এ-সবই নিরর্থক, মূল্যহীন। যেখানেই তিনি থাকুন—একই কথা। তবে, কেন এই কষ্ট স্বীকার করে ব্যর্থ যাত্রা!

দর্শন-শেষে তাঁদের কাছে এগিয়ে যাই। তাঁর এই দর্শন-না-পাওয়ার দুঃখে সহানুভূতি দেখাই।

বিচিত্র মানুষ!—মুখে দেখি তাঁর পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রসন্নতা। হেসে আমায় বলেন, দর্শন আমি পাই নি, ঠিকই। আমি যে অন্ধ। কিন্তু, নারায়ণের তো চোখ আছে—তিনি আমায় দেখলেন। সেই তো আমার আনন্দ!

॥ ৭ ॥

জগতে কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে, সহজ দৃষ্টিতে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ, যুক্তিবাদ মানুষের ধর্ম। প্রাণীজগতে এই তার এক বৈশিষ্ট্য। কারণ না বার করে সে তুষ্ট হতে পারে না। কিন্তু, কারণ যদি নাই পাওয়া যায়, করাই বা যাবে কি? অগত্যা তখন কেউ বলেন, ওটা ভূতের খেলা; কেউ বা চোখ বুজে বলেন, দেবতার লীলা; আবার কেউ বা সন্দেহ পোষণ করে মন্তব্য করেন, আছে বই কি ভেতরে কিছু,—লোকে ধরতে পারে নি। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করি না।

ব্যাপারটা ঘটে বদরীনাথেই। আমারও নিজের চোখে দেখা নয়। শোনা কথা। তবে, অনেকেই যাঁরা দেখেছিলেন, গল্প করলেন। সে বছর বদরীনাথ পেঁছুতেই স্থানীয় কয়েকজন এসে দুঃখপ্রকাশ করলেন, আহা! আপনি এই ক'টা দিনের জন্যে দেখতে পেলেন না—মাত্র তিন দিন আগে হয়ে গেল। স্বামীজি যে আবার নারায়ণকে ভোগ খাওয়ালেন! এর আগের বার অনেকে দেখতে পায় নি, তাই বিশ্বাসও করে নি। এবার কারও যাতে কোন সন্দেহ না থাকে—তাই ভালোভাবে ব্যবস্থা করে ভোগ দিলেন, নারায়ণ হাতে করে খেয়ে গেলেন। কি অদ্ভুত ক্ষমতা স্বামীজির! আপনার ভাগ্যে দেখা হল না!

মনে মনে ভাবি, আমার ভাগ্যটাই ঐ রকম। একবার কলকাতা শহরে এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে ভূত দেখা গেল। ক'দিন আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। তার পর থেকে ঘরের দেওয়ালে নানা রকম ছায়া দেখা যেতে লাগল। ছায়ার মাধ্যমে ছেলে-নাতিদের সঙ্গে মৃতের সাংকেতিক কথাবার্তাও চলতে থাকে। রোজই হয়। খবর পেয়ে আমরা গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত রইলামও। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত কিছু দেখতে পেলাম না। শুনলাম ক'দিন ধরে কমে গেছে,—সবদিন হয় না।

কিন্তু, থাক সে-সব কথা।

প্রথমে স্বামীজির পরিচয় দিই, তারপর এই ভোগ-লীলা। কিন্তু, তারও আগে হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু-একটা কথা বলি।

হিমালয়ে বহু সাধু-সন্তের বাস। হিন্দুমতে হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ বা শৈব, কেউ অবধূত সন্ন্যাসী—নানান সম্প্রদায়। কারো গেরুয়াবাস, কারো বা কৌপীন সার, আবার কেউ বা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। বহু শ্রেণীর সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী। বিভিন্ন-পন্থী হলেও সকলেরই উদ্দেশ্য—ধর্ম-জীবন-যাপন, ভগবদ্-চিন্তা, সাধন-ভজন। কিন্তু, সকলের সমান শক্তি থাকে না, সমান সিদ্ধিও হয় না। তাঁদের মধ্যে কে কত উচ্চ মার্গে উঠেছেন, বাইরে থেকে দেখে বোঝা সম্ভব নয়। সে-বিচারে ভুলেরই সম্ভাবনা। তা ছাড়া, এ সব শক্তির বিচার করারও ক্ষমতা থাকা চাই।

মানুষই সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে সাধু হয়। সাধু-জীবন আদর্শ-জীবন। তাই সন্ন্যাস-জীবনে মানুষের সৎ ও মহৎ গুণগুলির বিকাশ ও প্রকাশ সকলে প্রত্যাশা করে। প্রকৃত সাধু-সমাজে, সাধারণত সেই বিকাশের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু, মানুষের মজ্জাগত দুর্বল বৃত্তিগুলিও তো আছে। চিরতরে সম্পূর্ণরূপে সেগুলি কাটানো সহজ কথা নয়, সব ক্ষেত্রে কাটানো যায়ও না। তাই কোন সময়ে হয়ত সেই সব মানুষ-স্বভাব সাধু-জীবনেও প্রকাশ পায়। তাতে ক্ষুণ্ণ বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন তাঁদের মানুষ ভাবেই মেনে নেওয়া ভালো। সে সময়ে সেই ক্ষেত্রে সাধু অক্ষম, মানুষ প্রবল।

কঠোর ব্রতী সাধুর জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতেও দেখেছি।

একবার কেদারনাথে এক নাগা মৌনী সাধুকে দেখেছিলাম। সেই প্রচণ্ড শীতেও নগ্নদেহে নিষ্পন্দভাবে বসে আছেন। শুনলাম, মস্ত বড় সাধু। তাঁর দর্শনের জন্যে যাত্রীদের কি বিপুল জনতা! সকলেই ভক্তি-গদ্‌গদ্ ভাবে প্রণাম করছেন। তিনি নিশ্চল, নির্বিকল্প। আমারও দেখে ধারণা হল, বিরাট পুরুষই হবেন।

দু'বছর পর। ঐ কেদারনাথের পথে এক চটিতে দেখি, লোকের বেশ ভিড়। কৌতূহল জাগল। কাছে গিয়ে উঁকি মারি। দেখি, জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে

একটি লোক—কোট্-প্যাণ্ট-পরা, মুখে সিগারেট, হাতে ক্যাপসটানের টিন, অনর্গল বকে চলেছে—হিন্দি, ইংরাজি-মেশানো বুলি—অসম্বন্ধ সব প্রলাপ। লোকের কাছে শুনি, আগে নাগা সাধু ছিলেন, প্রয়াগে কুম্ভে গিয়েছিলেন—হঠাৎ এই পরিবর্তন ঘটেছে। চিনতে পারি, কেদারনাথে দেখা সেই সাধুটি।

বুঝলাম, কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের দুর্বহ ভার সামলাতে পারেন নি—মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়েছেন—তাই, এই বিকৃত পরিণতি।

ভালো সাধু বলে যাঁদের মনে হয়েছে তাঁদের কথাই এখন বলি। অল্প সময়ে বাইরের আলাপে যেটুকু পরিচয় মেলে, তাই।

হিমালয়ে সাধুদের মধ্যে এক শ্রেণী আছেন যাঁরা বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী, গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী। প্রাঞ্জল ভাষায় নানান ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন, সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। নিজের মতামতও সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। শাস্ত্রচর্চার উপর তাঁদের ধর্ম-জীবনের ভিত্তি। অথচ পাণ্ডিত্যের কোন দম্ভ নেই। ছোট একটি কুটিয়াতে—অথবা কোন আশ্রমে শান্ত পরিবেশে থাকেন। শান্তিময় জীবনযাপন করেন। বেশ-ভূষা, আহার-বিহার—কোথাও কোন বিলাস নেই। হয়ত সামান্য গেরুয়া কাপড়, ফতুয়া—শীতের সময় গেরুয়া গরম গেঞ্জি, কেউ বা হয়তো এ-সবও ত্যাগ করেছেন। কেউ হয়তো গৈরিকও ধারণ করেন নি। কিন্তু, যা কিছু ব্যবহার করেন, সামান্য হলেও পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতর বা বাইরে চারিপাশ যথাসম্ভব পরিষ্কার করে রাখা। মনে হয়, এঁরা বিশ্বাস করেন মনে পবিত্রতা রাখতে হলে বাইরেও পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। এঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান ও নিরহঙ্কার আচরণ দেখে মনে শ্রদ্ধা জাগে। এঁদের সান্নিধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে। সহজ সুন্দর ব্যাখ্যার মধ্যে বুদ্ধিবাদের (Intellectualism) সুস্বাদ উপভোগ করা যায়। শ্রদ্ধেয় তপোবনস্বামী এই শ্রেণীর ছিলেন। শেষ জীবনে উত্তর কাশীতে থাকতেন। আজ বছর তিনেক হল দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর কথা এখন নয়।

আর আর শ্রেণীর সাধু আছেন, তাঁরা জপ-তপ, আরাধনা, পুজো-অর্চনা নিয়ে দিবারাত্র কাটিয়ে দেন। যে সব আচার নিয়ম ক্রিয়াদিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন সেগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন—কোথাও যেন নিয়মভঙ্গের সামান্য ত্রুটির ছিদ্রও না থাকে। নিয়মকানুনের লোহার বাঁধনে বাঁধা তাঁদের জীবন, যন্ত্রের মতো ঘোরে। এর মধ্যে কি আনন্দ পান ও আশা রাখেন, জানি না। পান সম্ভবত, নইলে করেনই বা কেন?

যোগমার্গী সাধুও আছেন।

বিভিন্ন প্রণালীর যোগাসন—নাম বর্ণনা করে, কোন্ আসনের কি বৈশিষ্ট্য, কি গুণ ও সার্থকতা, ভুল আসনেরই বা বিপদ কোথায়—দেখিয়ে দেখিয়ে বলে গেছেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছি, মেদশূন্য দেহে সুন্দর পেশীগুলির ছন্দোময় খেলা; আবার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অদ্ভুত অস্বাভাবিক পাক খাওয়ানো। কখনো বা

স্থির হয়ে বসে একদৃষ্টে চোখের দিকে তাকান—উজ্জ্বল দৃষ্টি, মনে হয় গভীর সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ নীল জলের ভিতর তাকিয়ে আছি।

আর এক শ্রেণীর সাধু, তাঁদের বহির্জীবনে কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রকাশ নেই। স্থির হয়ে একাগ্রমনে বসে থাকেন, বোধ করি যোগ-সাধনাই করেন। মনে হয় কঠোর তিতিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মৌনব্রতী। যাঁরা কথা বলেন, তাঁরাও স্বল্পভাষী। কঠোর সন্ন্যাস-জীবন। তবুও, সহজ সরল মধুর ব্যবহার। বিশেষ কিছু আলোচনা করেন না, পাণ্ডিত্যের কোন প্রচার করেন না। তাঁদের কাছে বসলে মনে একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব জাগে, জগৎ-সংসারে অশেষ সমস্যা—ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা—সব যেন ম্লান হয়ে যায়, শান্তিময় প্রসন্নতায় মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জানি, এ-সবই বাইরের দৃষ্টি দিয়ে বা আপন মনের অনুভূতি দিয়ে অপরের স্বরূপ পরিচয় নেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। সাধারণ মানুষের মন এতে তুষ্ট হয় না। প্রশ্ন করে, হিমালয়ের বড় সাধু—তার প্রমাণ কি? অলৌকিক ক্ষমতা কি দেখলেন?

এ-প্রশ্নের কারণ আছে। সাধারণত প্রসিদ্ধ সাধকদের জীবনীতে ও সাধু-সন্ন্যাসীদের কাহিনীর মধ্যে তাঁদের বিরাটত্বের পরিচয় দিতে হলেই প্রথম ও প্রধান প্রমাণ দেখানোর রীতি, তাঁদের আশ্চর্য বিভূতি—অর্থাৎ কোন দৈব বা অলৌকিক শক্তি। যেন এই শক্তির আরোপ না করলে তাঁদের মহত্ত্বের কোন প্রমাণই হয় না!

এই ধরনের শক্তি লাভ হয় কিনা, এবং হলেই বা কতখানি হয় ও কেই বা কি পরিমাণ পেয়েছেন—তার প্রমাণ আমি নিজে কিছু দেখি নি। নেবার চেষ্টাও করি নি। যোগাভ্যাসে বা কঠোর সাধনায় মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির কল্পনাতীত বিকাশ হতে পারে—এর অতি সামান্য নিদর্শন আমাদের সাধারণ জীবনেও মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে। এই সেদিন কাগজে খবর পড়লাম, একটি তেরো বছরের মেয়ে যোগ-সাধন করে স্মৃতিশক্তির এমনি উন্মেষ করেছে যে যে-কোন বক্তৃতা একবার মাত্র শুনলেও নির্ভুল পুনরাবৃত্তি করে দিতে পারে। অসাধারণ ক্ষমতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু, সাধুদের সম্পর্কে আরও নিগূঢ় কোন আধ্যাত্মিক বা ঐশী শক্তির সন্ধান করা হয়। এই সংশয়ের নিরাকরণ সাধু ছাড়া আর কেই বা করতে পারেন? অথচ, যদি কোন বড় সত্যিকার সাধু এমন কোন অজ্ঞেয় শক্তির অধিকারী হনই, তবে এই সাধনা-লব্ধ আত্মশক্তির পরীক্ষা তিনি অযথা প্রকাশ্যে দেবেনই বা কেন, এবং তাই যদি দেন তবে তখনি কি সন্দেহ জাগে না যে ইনি উচ্চস্তরের সাধু কিনা? আধ্যাত্মিক বা দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী মনের কাছে প্রমাণের প্রয়োজন নেই, তাই এই তর্কও ওঠে না। যদিও, এই বিভূতির প্রকাশ দেখার জন্য তাঁদের অসীম আগ্রহ। ঐশী শক্তিতে অবিশ্বাসী মন নিজের বিজ্ঞান-লব্ধ বিদ্যার কষ্টিপাথরে ঘষে বিচার করে এবং আপাতদৃষ্টিতে কোন

যুক্তিসম্মত কারণ না পেলে সন্দেহ আরও ঘনীভূতই হতে থাকে। সমস্যার সমাধানও হয় না।

সাধারণ মানুষের মনে সাধুদের প্রসিদ্ধির আর এক উপকরণ—তাঁদের পূর্বাশ্রম-পরিচয়। অমুক সাধু বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অমুক ডাক্তার ছিলেন বা অধ্যাপক ছিলেন কিংবা মস্ত বড় চাকরি করতেন—তা হলে তখনি তাঁর সাধারণ্যে সহজে একটা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। অবশ্য, প্রচারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই ধরনের মনোভাব আমাদের সাধারণ সমাজেও আছে। এর পিছনে যুক্তিরও কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইনি পূর্বাশ্রমে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত—অতএব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাই তাঁর কাছে প্রকৃত সাধু-জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ আশা করা যায়।

আমাদের বদরীনাথের এই স্বামীজির সেই পূর্বাশ্রমের প্রসিদ্ধি আছে, সন্ন্যাস-জীবনেও বিপুল খ্যাতি আছে। উত্তরাখণ্ডে এঁকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন।

শোনা যায়, তিনি এককালে জেলা-জজ্ ছিলেন। দায়রার বিচারে এক আসামীর মৃত্যু-দণ্ড দেন। কয়েক বছর পরে প্রকাশ পায় যে প্রকৃত দোষীর বদলে এক নির্দোষ ব্যক্তির চরম সাজা হয়ে গেছে। তার পরই তিনি চাকরি ছেড়ে দেন, সংসারও ত্যাগ করেন, সন্ন্যাস-জীবন নেন। বহু বছর হিমালয়ের নানাস্থানে কঠোর সাধনা করেছেন। কারো কারো মতে সিদ্ধিও লাভ হয়েছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে উত্তরাখণ্ডে আছেন। প্রতি বছর কয়েকমাস বদরীনাথে কাটান। আগে বিবস্ত্র ছিলেন। লোকসমাজে এলে শুধু একটা চট জড়িয়ে রাখতেন। সে অবস্থায় হৃষীকেশের কাছে এক আশ্রমে একবার তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম।

এই স্বামীজিই বদরীনাথে নারায়ণকে ভোগ খাওয়ান।

বদরীনারায়ণের প্রতিদিন ভোগ হয়। দেবতা মাত্রেরই যেমন হয়ে থাকে। ভোগের সময় চারিদিক বন্ধ রাখা হয়; দেবতার আহার মানুষের দেখা চলে না। শুনি, কয় বছর আগে একবার স্বামীজি নিজের হাতে এক ভোগের থালা রেখে দেন, ভোগ-শেষে দেখা যায় সেই থালার অন্ন কে যেন তুলে খেয়েছেন এমন চিহ্ন রয়েছে। সেবার সে ঘটনা অনেকের দেখার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয় নি। তাই, এ-বছর সকলকে জানিয়ে আবার এই ভোগ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। অনেকে এবার উপস্থিত ছিলেন। চারিধারে ভালোভাবে পরীক্ষা করে সবাই দেখেছিলেন, যাতে কেউ বা কোন কিছু ভোগের জায়গায় বা কাছাকাছিও না যেতে পারে। সুরক্ষিত ভাবে ভোগ সাজানো হল, সেক্রেটারী নিজেও একটা থালা আলাদা করে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর, সব বন্ধ করে, বাইরে থেকে স্বামীজির নারায়ণকে আরাধনা ও ভোগ-নিবেদন। অবশেষে, যখন পর্দা তোলা হল, দেখা গেল, সব পাত্র থেকেই কে যেন গ্রাস তুলে খেয়ে গেছেন।

অলৌকিক কাণ্ড—মন্তব্য করেন আমার বক্তা প্রত্যক্ষদর্শী।

কাছেই পরিচিত হিমালয়-বাসী অপর এক সাধু বসে ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করি, স্বামীজি, ব্যাপারটা কি, বলুন না একটু খুলে।

তিনি চুপ করে থাকেন। কথা বলতে চান না। বলি, আপনি বিশ্বাস করেন না নাকি—নারায়ণকে নিজে উৎসর্গ করে ভোগ খাওয়ানো?

কঠোর মন্তব্য করেন, নারায়ণের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, গেলেন অত লোকের কাছে ওঁর ভক্তের পরিচয় দিতে আর মান রাখতে!

বলি, ও-কথা বললে চলে কি করে? ভোগের থালায় চিহ্ন এল কোথা থেকে?

বলেন, যদি বলি মূষিক-জাতীয় কোন প্রাণীর দৌরাত্ম্য? এ-পাহাড়ে তাদের অভাব নেই।

আমি বলি, ওটা অচল। ইঁদুর অন্য দিন যায় কোথায়?

স্বামীজি বলেন, দেখুন, যোগের দ্বারা অনেক রকম ক্ষমতা হয়। পিশাচ-সিদ্ধ তো হয়ই—আমার নিজের দেখাও আছে। তাদের দিয়ে সুকাজ-কুকাজ করিয়ে নিতেও দেখেছি। এ-ও সেই ভাবে কোন কিছু করানো বলা যেতে পারে। তবে, নারায়ণকে এতখানি বশে আনা,—ডাকা মাত্রেই নিজের হাতে তুলে খেয়ে গেলেন—তা হলে আর ভাবনা কি? এত ঘোরাঘুরি—এমন ভাবে থাকাই বা কেন—সবই তো হয়ে গেল! ও-সব ভেল্কির কথা রেখে দিন।

মনে মনে ভাবি, ব্যাখ্যা তো হল না। ইনি পিশাচ পর্যন্ত এগোতে প্রস্তুত আছেন।

সেই বৃদ্ধ শান্ত স্বামীজিকে তারপরও প্রতি বছরই বদরীনাথে দেখতে পাই। একটা সাদা মোটা ছোট কাপড় পরে থাকেন—গান্ধীজির মতো। গায়ে একটা সামান্য চাদর। প্রতিদিন বাড়ির সামনের পথ দিয়ে ধীরপদে মন্দিরে যান, সঙ্গে জনকয়েক ভক্ত করতালি দিয়ে 'না-রা-য়-ণ' 'না-রা-য়-ণ' গাইতে গাইতে চলেন। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে সাধুদের একান্তে থাকবার জন্যে মন্দির কমিটির একটি ভালো কুটিয়া আছে। সেইখানে প্রতি বছর এসে থাকেন। বহু যাত্রী দর্শনে যান। ঘরে বসে দেখি। কিন্তু, আমার একদিনও যাওয়া হয় না। ভোগ খাওয়ানোর কাহিনী শোনার পরও। কেন জানি না, যাওয়ার প্রেরণা পাই না।

॥ ৮ ॥

মন্দিরের মধ্যেও সাধু-দর্শন হয়। তাঁরা নিজেরা দর্শনে আসেন, যাত্রীরাও তাঁদের দর্শন পায়। মন্দিরে ভোগের পর প্রসাদ পেতেও তাঁরা অনেকে আসেন। সেইখানে একবার এক বৈরাগী সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়। ঠিক পরিচয় নয়, চাক্ষুষ দুজনে দেখা। দেখামাত্রই দুজনের মুখে অকারণ মৃদু হাসির বিনিময় ঘটে। কিন্তু, তাতেই দীর্ঘ পরিচয়ের সেতু রচিত হয়।

মন্দিরে ভোগ-বিতরণ হচ্ছে। প্রাঙ্গণের এক অংশে সারি সারি ভোগের পাত্র। তার থেকে প্রথমে সাধু-সন্ন্যাসীদের দেওয়ার প্রথা। তারপরে পাবার কথা

সর্ব-তীর্থের চিরন্তন অঙ্গ—ভিক্ষুকদের। একপাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। যাত্রীদেরও জনতা জমেছে। তাদের মধ্যেও প্রসাদ পাওয়ার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু, প্রথম থেকেই ভিখারীদের সবলে প্রবেশে ও প্রবল উত্তেজনার ফলে প্রসাদ-বিতরণে বিশৃঙ্খলা এনেছে। সাধুরা পাত্র হাতে এসেছেন। দু'একজন ভিড়ের মধ্যে কোনক্রমে প্রবেশ করে প্রসাদ নিয়ে আসছেন, অনেকেই শান্তি-স্থাপনের আশায় অপেক্ষা করছেন।

কাছেই কে একজন বাংলা-মেশানো হিন্দীতে কথা বললেন। বাংলার আভাস পেয়ে আপনি দৃষ্টি গেল সেইদিকে। দেখি, একটি সাধু অপর একজন বলিষ্ঠ সাধুকে একটি পাত্র দিয়ে অনুরোধ করছেন জনতা-জাল ভেদ করে তাঁরও প্রসাদ আনার জন্যে। সাধুটি যুবক। গৌরবর্ণ সুশ্রী। কপালে মোটা করে শ্বেত-চন্দনের দীর্ঘ তিলক। মাথায় একরাশ জটা—কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে রয়েছে। অল্প দাড়ি-গোঁফ। গায়ে সাদা মোটা সুতির চাদর। পরনে কি আছে বোঝা যায় না। সন্ন্যাসীর রুক্ষ বেশ, কিন্তু মুখে-চোখে যৌবনের স্নিগ্ধ দীপ্তি। তরুণ তাপস।

আমি তাকাতেই আমার দিকে তাকান। মৃদু হাসেন। আমিও হাসি। পাত্রটিতে প্রসাদ আসে। এগিয়ে এসে বলেন, জয় সীতারাম! এমন করে ভিড় ঠেলে যেতে সঙ্কোচ লাগে। নিন—প্রসাদ নিন।

দেখি, পাত্রের ভেতর দু-হাতা অন্নপ্রসাদ ও ডাল। জানতাম—এই এঁদের সারাদিনের খাদ্য।

তাই বলি, এ আপনার জন্যে থাক। আজ আমিও প্রসাদ পাব মন্দির থেকে, বলে এসেছি।

তিনি তবুও অনুরোধ করেন। আঙুল ঠেকিয়ে একটু মুখে ফেলি, বলি, এই হয়েছে—প্রসাদ কণিকামাত্র।

মনে কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করি, দেখছি তো এখানেই থাকেন। এত গোলমালের মধ্যে ভালো লাগে? প্রকাণ্ড শহর হয়ে গেছে না?

তিনি কোন জবাব দেন না। হাসি-ভরা মুখে চলে যান: বালকের মত।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার দেখা। অতিথিশালার সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি হনহন করে হেঁটে চলেছিলেন। আমাকে দেখে দাঁড়ালেন। আবার পরস্পরে মৃদু হাস্য বিনিময়। 'জয়রাম শ্রীরাম—জয় সীতারাম!' বলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, এইখানে আছেন বুঝি? একটু আগে মন্দিরে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, উত্তর দিই নি। শহরে আমি থাকি না। থাকা চলে না। বড় হট্টগোল। আমি থাকি শহরের বাইরে। মাইলখানেক হবে। এক গুহায়। যাবেন সেখানে?

বলি, বেশ তো। কিন্তু, আপনার কোনও রকম অসুবিধা হলে—নয়। কাল আমার ঐদিকেই যাবার কথা আছে,—মানাগ্রাম হয়ে বসুধারা যাবার ইচ্ছা।

শুনে বলেন, বাঃ! তাহলে ভালোই হয়েছে। ঐ পথেই পড়বে। অবশ্য রাস্তার ওপর নয়। আধ মাইলটাক গিয়ে পথ ছেড়ে বাঁদিকে পাহাড়ের ওপর খানিকটা উঠতে হয়।

আমি রাজী হই। বলি, তাহলে এক কাজ করুন। কাল সকালে এখানে চলে আসুন। একসঙ্গে যাব। আপনার গুহা দেখে আমি বসুধারায় যাব। আর আপত্তি না থাকে—চলুন, কাল একসঙ্গে বসুধারাতেও।

তিনি উল্লসিত হয়ে বলেন, বেশ তো!—তারপর হঠাৎ কি তাঁর মনে হয়। বলেন, দাঁড়ান—কাল—কাল! কাল, নাঃ, আমার গুহা ছেড়ে বার হবার উপায় নেই। কাল সারাদিন আমার একটা ক্রিয়া আছে। তবে, আপনার গুহায় যাবার কোন বাধা নেই। আপনি সোজা চলে আসবেন—বসুধারা যাবার পথে।

আমি হেসে বলি, যাব যে, পাহাড়ের মধ্যে গুহাটি খুঁজে বার করব কি করে? রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বরটা বলে যান তাহলে?

ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠেন। বলেন, ঠিক বটে। জানা না থাকলে বার করা কঠিন। গুহাও তো একটি নয়। আশেপাশে আরও কয়টা আছে। এ-অঞ্চলে গাছপালাও নেই যে চিহ্ন বলে দেব।

অতএব, স্থির হয়, সেইদিনই তিনি বিকেলে আসবেন। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বিকেলবেলা। জুতো-জামা পরে প্রস্তুত হয়ে আছি। তিনি এলেন। বললাম, আমি তৈরি। এক মিনিট সময় নেব—ঘরের চাবিটা দিয়ে আসি।

তিনি বলেন,এক মিনিট কেন? পাঁচ মিনিটই নিন না। অত ঘড়ি ধরে এখানে কাজ হয় না। তালা দিয়ে এসে আপনি রাস্তার সামনে দাঁড়ান, আমিও এখুনি একবার ঘুরে আসছি—ওদিক থেকে।—বলে বাজারের দিকে আঙুল দেখান।

শহর ছাড়িয়ে মানাগ্রামে যাবার সোজা সমতল পথ। ডানদিকে অল্প নীচে অলকানন্দা নদী। বাঁ দিকে ধীরে ধীরে পাহাড় উঠে গেছে বহু উপরে। গাছ-পালার চিহ্ন নেই। শুধু পাথর। মাঝে মাঝে ঘাসের আচ্ছাদন। এক জায়গায় পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। এঁকে-বেঁকে উঠছি। দু-একটা জলের ধারা উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। ছোট ছোট ঝরনা। এক পাথরের উপর থেকে অন্য পাথরে পা রেখে ধারাগুলি পার হই। এক জায়গায় জলের ধারে কতকগুলি বড় কালো পাথর। কোনটি গোলাকার, কোনটি বা মসৃণ। তারি একটির উপর জটাজুট এক সাধু বসে আছেন। নগ্নদেহ। কৌপীনবাস। সঙ্গী বৈরাগীজি তাঁকে 'নমো নারায়ণ' বলে সম্ভাষণ করলেন। তিনি শুধু মৃদু হাসেন। বৈরাগী জানান, স্বামীজি মৌনী। এই ক'মাস হল এসেছেন। বড় শান্ত মিষ্ট স্বভাব। সারাক্ষণই ধ্যানে আছেন। ঐ গুহাটিতে থাকেন।

আরও একটু উঠে আর একটি গুহা। এখানকার ভাষায় গুম্ফা। পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক ছোট গুহা, তার মুখে প্রকাণ্ড বড় কতকগুলি কালো পাথর। নানান আকারের পাথরগুলি এমনভাবে সাজানো আছে যে গুহাটি ওরি মধ্যে

আরও প্রশস্ত হয়েছে। প্রবেশ-পথটি সংকীর্ণ। হাত দুই তিন মাত্র উঁচু। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঢুকতে হয়। গুহার বাইরে স্বল্প-পরিসর সমতল স্থান। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় বহু উঁচু বাড়ির খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। তারই একধারে একটি লম্বা পাথর—যেন বসবার বেঞ্চ। সেইখানে বসে জুতা বাইরে খুলে রেখে সাবধানে গুহায় প্রবেশ করি। বৈরাগীজির জুতো খোলার হাঙ্গামা নেই। খালি পা—পায়ের তলা দেখিয়ে বলেন, আমাদের জুতা পায়ের সঙ্গে সেলাই হয়ে আছে!—তাকিয়ে দেখি, শক্ত মোটা চামড়া, মাঝে মাঝে লম্বা ফাটা—দারুণ গ্রীষ্মে যেমন মাঠের মাটি ফাটে।

আমার আগে তিনি গুহায় প্রবেশ করেন—শরীরটা একটু বেঁকিয়ে—অনায়াসে। তাঁর কাছে অতি সাধারণ সহজ পথ। ভেতরে গিয়ে অতিথির প্রতি তাঁর সতর্ক-দৃষ্টি দেন। প্রবেশ করে উঠে দাঁড়াতে যাই, হাত ধরে সাহায্য করেন, বলেন, দেখবেন—সাবধানে মাথা তুলবেন, সোজা হয়ে দাঁড়াবেন না যেন—ওপরে পাথরে মাথা ঠুকে যাবে।

সত্যিই তাই। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। সামান্য উপরেই ছাদের মত পাথর ঢালুভাবে রয়েছে। মাটিতে বসতে যাই, বলে ওঠেন, বসবেন না এখন, একটু বেঁকে কষ্ট করে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন—বসবার আসন দিই।—বলে একটা কম্বল টানতে যান, আমি হাত ধরে ফেলি। তাকিয়ে দেখি, একপাশে মাটিতে শুকনো ঘাস ছড়ানো। বলি, ওর ওপর বসি।

তিনি হেসে বলেন, তাই চান, বসুন, ওই তো আমার আসন—শয্যাও বটে বসিও তাই। তাঁকেও হাত ধরে পাশে বসাই। বৈরাগী বলেন, শুকনো ঘাস, বেশ গরম হয়। জানেন নিশ্চয়।

গায়ের চাদরটা খুলে একপাশে রেখে দেন। কোমরে একটা দড়ি বাঁধা—তারি সাহায্যে শুধু একটি লেঙটি পরা। লম্বা রোগা শরীর।

গুহাটির ভেতর দিকে হাত পাঁচেকও লম্বা হবে না। মাথার উপরের ঢালু পাথর যেদিকে নেমে গেছে—সেদিকে সোজা হয়ে বসাও যায় না। পাশে যে পাথরগুলি দেওয়ালের মত আছে, তার মাঝে মাঝে ফাঁক ছিল—ছোট ছোট পাথর গুঁজে সেগুলি যথাসম্ভব বন্ধ করা হয়েছে। শুধু সামনে দরজার ফাঁকটুকু আছে। ঐ পথে আলো-বাতাসেরও গতিবিধি। মেঝেতে কোথাও পাথর, কোথাও মাটি—তবে বেশী অসমান নয়; পরিষ্কার করে রাখাও। গুহার ভেতর গরম। বৈরাগী বলেন, লোকের ধারণা—এই শীতের দেশে পাথরের গুহার মধ্যে ঠাণ্ডায় কত কষ্টে আমরা থাকি—কিন্তু দেখছেন তো গুহার মধ্যে কেমন আরাম। আর এটা যেদিকে মুখ করা, সেদিক থেকে কখনো ঠাণ্ডা বাতাস আসে না। ও-পারের ঐ পাহাড়ে হলে নীলকণ্ঠের বরফের হাওয়া একবারে শরীর নীল করে দিত। এখানে রোদ্দুর চান—বাইরে বেরিয়ে রোয়াকে বসুন—ওখানটায় সূর্য ওঠার পর থেকে রোদ আসে, সারাদিন থাকে। মানুষ দেখার

কখনো ইচ্ছে হলে তাও দেখতে পাবেন ওখানে বসে—নীচে রাস্তা দিয়ে লোক চলেছে। কিন্তু, বহু দূরে ;—তাদের কোন কলরব এখানে এসে পৌঁছয় না। মন্দিরে জিজ্ঞাসা করছিলেন, হট্টগোলের মধ্যে থাকার কথা। এবার দেখুন, সে-সব আছে এখানে কিছু? একমনে সাধন-ভজন করি। কি সুন্দর স্থান! এইখানে বসেই বাইরের দৃশ্যটি দেখুন না একবার।

এসে পর্যন্ত তাই দেখছিলামও। নীচে অলকানন্দার সর্পিল গতি-পথ, ওপরে গগন-স্পর্শী নর-পর্বত, তারি শিখরে স্থানে স্থানে এখনও সামান্য তুষার-রেখা।

চারিদিক শান্ত, শব্দহীন। গুহার মধ্যে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়—যেন দরজার-ফ্রেমে-বাঁধানো আঁকা-ছবি দেখছি।

গুহার মধ্যে কি আছে তাও দেখি। একধারে একটি পাথরের উপর নারায়ণের ছবি। খান চার-পাঁচ বই—গীতা, তুলসীদাসের রামায়ণ, পূজোপার্বণ ও স্তোত্রের হিন্দী বই। একটা ছোট্ট টর্চ। আলোর ডিবে। একটা ভুটিয়া কম্বলও আছে। বলেন, যখন এসেছিলাম কাছে একটা থালা-গেলাসও ছিল—বছর খানেক আগে সে দুটো গেছে। একদিন মন্দির থেকে ফিরে এসে দেখি—নেই!—বলে হাসতে থাকেন।

আশ্চর্য হয়ে বলি, এখান থেকে গেল কোথায়?

তিনি হাসতেই থাকেন, বলেন, নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক এসেছিল হঠাৎ কোথা থেকে। এসব এখানে হয় না—হয়ে গেছে কি ভাবে। ভালোই হয়েছে। সাধুদের ও-সব কিছু না রাখাই ভালো। কি বলেন?

বলব আর কি! অবাক হয়ে শুনি।

বৈরাগী বলেন, এবার তাহলে একটু গরম জলের ব্যবস্থা কার?

জিজ্ঞাসা করি, এখন গরম জল কি করবেন?

হেসে বলেন, গরম জল মানে চা। আপনার কাছে সেটা ঠিক চা-খাওয়া হবে না—শুধু গরম জলই হবে।

বারণ করি। বলি, কোন দরকার নেই, তাছাড়া এখুনি খেয়েও এলাম।

শোনেন না। বলেন, দেখুন না, কি রকম টি-সেট, চায়ের সব সাজ-সরঞ্জাম বার হয়।

গুহার এক কোণ থেকে বার হয় দুটি টিনের কোটা। একটাতে খানিকটা চিনি, অপরটাতে একটু চায়ের গুঁড়া। কনডেন্সড মিল্কের ডিবাও একটা বেরোয়। পেতলের একটা ছোট পাতলা ঘটি,—উপর ও ভিতর দিক মাজা ঝকঝক করছে কিন্তু তলাটা কালিতে ঝুল-কালো হয়ে আছে,—তাতে জল ভরা ছিল। হাতে নিয়ে বলেন, দেখুন তো এতখানি দরকার হবে? একটু ফেলে দিই?

আমি বলি, কেন এইভাবে জল নষ্ট করছেন।

তিনি বলেন, ঘরের কাছেই দেখলেন তো কেমন ধারা বয়ে চলেছে। জলের

অভাব কোথায় ? কোনও কিছুরই অভাব নেই এখানে—তো জল !

গুহার মধ্যিখানে তিনটে পাথর উনানের মত করে রাখা। ঘটিটায় চায়ের গুঁড়ো ফেলে তার উপর চাপান। কয়টা শুকনো সরু কাঠি ও ডাল দিয়ে আগুন জ্বালান। আগুন ধরতে চায় না। সরু বাঁশের একটা চোঙ্ মত বার করে জোরে ফুঁ দেন। দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিবে যায়। ধোঁয়া ওঠে। তখন ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকান। ব্যস্ত ও লজ্জিত হয়ে বলেন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনাকে বাইরে গিয়ে বসতে বলা উচিত ছিল—এ ধোঁয়ায় আপনি থাকবেন কি করে ? আপনি তাই করুন, আবার বেরুতে একটু কষ্ট হবে আর কি !

আমি বলি, আপনাকে তো থাকতেই হবে ভেতরে, তবে আমিও থাকি।—আপনি উনুন ধরান।

জোর করে বসে থাকি বটে, কিন্তু চোখ জ্বলতে থাকে, জল বেরিয়ে আসে। তবুও থাকি। এদিকে ছোট গুহাটি ধোঁয়া জমে ভরতে থাকে, দরজা দিয়ে বেরোয় না—অন্য নিকাশেরও পথ নেই। মাথাও ঘুরতে থাকে, মনে হয়, বুঝি দম বন্ধ হয়ে এল।

বৈরাগী বুঝতে পারেন। বলেন, এসব অভ্যেস নেই আপনাদের, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছেন ?

অগত্যা বাইরেই এসে বসি। কিছু পরে ভিতর থেকে ডাক পড়ে,—এবার চলে আসুন। জল ফুটছে।

আর হামা দিতে হয় না। কোমর বেঁকিয়ে, মাথা খুব হেঁট করে ঢুকি। বৈরাগীজি হেসে বলেন, বাঃ, দু'বার ভেতর বাইরে করেই অভ্যেস হয়ে গেল দেখছি !—এবার কাপের ব্যবস্থা করতে হবে—কি বলেন ?

বার হয় দুটি টিনের লম্বা কৌটা !—দেখিয়ে বলেন, এতে খেতে পারবেন তো, ভীষণ গরম হবে কিন্তু। রুমাল আছে নিশ্চয় পকেটে ?—বসুন একটু, বাইরে থেকে এ দুটো ভালো করে ধুয়ে আনি।

ফিরে এসে ঘটির মুখে কাপড়ের একটা ছোট টুকরো জড়ান—চা ছাঁকবার জন্যে। ন্যাকড়ার গাঢ় লাল ও কালচে রঙ দেখে বুঝতে পারি—এই জন্যেই একে রাখা।

টিনের কৌটা দুটির মধ্যে একটু করে জমা দুধ ঢালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, চিনি কতখানি খান, বলুন ?

আমি বলি, চিনি খাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছি—এক চামচেরও কম লাগবে।

মনে মনে ভাবি, মিথ্যা বললাম। না—তাই বা কেন ? আজ এখন থেকেই না হয় কমিয়েই দিলাম—মনে থাকবে আজকের এই ছোট্ট ঘটনা।

তিনি বুঝতে পারেন। হেসে বলেন, চিনি আমার রয়েছে এখন। একজন মাঝে মাঝে দেন—তাই পাবার অসুবিধে নেই। না থাকলে পেতেন না। বেশী

চিনি না হলে এখানে চা জমে কখনও? এই দেখুন, এতোখানি দিলাম।—বলে তিনি চার চামচের মত ঢালেন।

রুমাল জড়িয়ে চা-ভরা কৌটা ধরে চা-পান শুরু করি। তিনি ধরেন শুধু হাতেই। বলেন, ও আমার সহ্য হয়ে গেছে—গরম লাগে না। যেমন ধোঁয়াও চোখে লাগে না।

গায়ের চাদরটা কাছে টেনে নেন। একটা খুঁটে কি বাঁধা ছিল—গেরো খুলে বার করেন। দেখি আটটি লাড়ু। আড়চোখে আমার দিকে তাকান। মুখ খুশীতে ভরা! তখনি আবার গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে শান্ত হয়ে মিনিটখানেক বসেন। ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করেন। তারপর, অতি যত্নভরে আমার সামনে রেখে বলেন, নিন, প্রসাদ নিন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, এ-সব হচ্ছে কি? এ-খাবার আনা হয়েছে কেন? তাই বুঝি আমি ঘরে চাবি দিতে গেলাম—বললেন, আসছি ঘুরে একবার? এই জন্যেই বাজারে তখন যাওয়া হয়েছিল? পয়সা পেলেন কোথা থেকে? কাছে কত টাকা আছে শুনি একবার?

ছেলেমানুষ। অপ্রস্তুত হয়ে যান। বলেন, টাকা পাব কোথা থেকে? এক পয়সা নেই—দরকারও নেই। আজ আপনি আসবেন এখানে, ভাবছিলাম চায়ের সঙ্গে কি দেব? শুধু চা খাবেন—সেটা মনে কি রকম লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুকাল আগে এক যাত্রী প্রণাম করে একটা টাকা দিয়েছিল। আমি কিছুতেই নেব না—যত তাকে বলি টাকার কোন দরকার নেই আমার, আমি পয়সা-কড়ি নিই না, রাখিও না,—সে কোনমতেই শুনবে না, পায়ের কাছে ফেলে রেখে, হাতজোড় করে তাকিয়ে থাকে, ছলছল্ চোখে চায়। মনে কি রকম লাগল—টাকাটা তুলে রেখে দিলাম। এতকাল সেটা পাথরের পাশে গোঁজাই পড়েছিল—আজ হঠাৎ সেটার কথা মনে পড়ল—তাই দিয়ে কিনে এনেছি।

আমি রাগের ভান করে বলি, খুব অন্যায় করেছেন। আমার জন্যে এইভাবে খরচ করার কোন মানে হয় না। আর ঘরে অতিথি এলে তাকে চা-খাবার খাইয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে এই হিমালয়ের গুহাতেও? এ সবই যদি করা দরকার মনে হয়—তবে আর এখানে আছেন কেন? আসামে থাকলেই হত।

তিনি চমকে ওঠেন। বলেন, আসামের কথা আপনি জানলেন কি করে?

আমি হেসে বলি, শারলক্ হোম্‌স পড়েছিলেন তো?

তিনি বলেন, বাঃ! পড়েছি বই কি। কোনান্ ডয়েলের একটা গল্প আমাদের ইস্টার-এর পাঠ্যেও ছিল।

আমি বলি, সেই শারলক্ হোম্‌স-এরই কথা—খুবই সহজেই, ওয়াটসন্, খুব সহজে। আসামে আপনার বাড়ি বুঝতে কোন কষ্টই হয় নি—আপনার মুখের চেহারা ও বাংলা কথার টানের ও উচ্চারণের মধ্যে।

তিনি হেসে ওঠেন, ঠিকই ধরেছেন।

ভাবি কথাটা যখন উঠলই, জিজ্ঞাসা করি না ঘর-বাড়ির কথা। ছেলেমানুষ —এইভাবে চলে এলোই বা কেন?

প্রথমটা একটু সংকোচ করেন, তারপর সব বলেন।

বাবা-মা নেই। দাদা আছেন, সংশোধন করে বলেন, আছেন মানে ছ'বছর আগে ছিলেন। এখনকার খবর জানি না। কেন না, গত ছ'বছর আর খবর রাখি নি। এখানে যে এসেছি ও আছি তাঁদের আর জানাই নি। তাঁরা নিশ্চয় খোঁজখবর অনেক করেছিলেন, বার করতে পারেন নি। গুরুদেব বলেন, এ সব খবরাখবর রাখলে প্রথম দিকে কাজের বিঘ্ন ঘটায়; তাই, সে-সব সংযোগ আর রাখি নি। কিছুদিন একটু মন চঞ্চল হত—এখন সেটা কেটে গেছে।

তাঁর জীবনের ছোট্ট ইতিহাস শুনি; ইণ্টারমিডিয়েট যখন পড়েন, তখন যুদ্ধ বাধে। সেনাবিভাগে যোগ দেন। বর্মায় অনেকদিন ছিলেন। সেখানে সৈনিক জীবনের নানারকম নতুন অভিজ্ঞতা হয়। সেই সময়েই তাঁর মনের পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তারপর দেশে ফিরে ভারতের কয়েক জায়গায় ঘোরেন। তীর্থগুলিও দেখেন। শেষে সব ছেড়ে এইখানে বসে গেছেন।

বলেন, ভগবানের অশেষ কৃপা। গুরু পেয়ে গেলাম যোশীমঠে। দেখেন নি তাঁকে? এবার দর্শন করে যাবেন ফেরার পথে। আনন্দ পাবেন।—বলে হাত তুলে কপালে ঠেকান।

গুরুদেবের নাম শুনে তখনি বলি, দর্শন আমি তাঁকে করেছি।

উত্তরাখণ্ডে সেই মহাত্মার কথা সকলেই জানেন। একশো বছরের উপর বয়স, শোনা যায়। সাধুরাও সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেখলেই ভক্তি জাগে।—এর কয়েক বছর পরে ১৯৫৯ সালে যোশীমঠে তিনি দেহরক্ষা করেন।

এইভাবেই বৈরাগীর সঙ্গে পরিচয় হয়। যে দু'দিন বদরীনাথে থাকি রোজই দেখা হয়। আমার ঘরেও আসেন। ফেরার সময় আমার সঙ্গে-আনা উদ্বৃত্ত চা, দুধের গুঁড়ো, চিনি—সব তাঁকে দিয়ে আসি। বলি, এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরব—এসব সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে?

তিনি নিতে রাজী হন না। জোর করি। হেসে বলেন, আচ্ছা তবে রেখে দিই। যখনি খাব, আপনার কথা মনে হবে।

বাড়ি পেঁছানোর সংবাদ চিঠি লিখে জানাবার জন্যে বার বার বলেন। আশ্চর্য! যে কয়টি সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয় সকলেরই এই অনুরোধ।

কলকাতায় ফিরে তাঁদের একজন স্বামীজীকে পত্র লিখে খবর দিই, তাতে অন্য সকলের—বিশেষত বৈরাগীর উল্লেখ করে লিখি, যেন তাঁদেরও খবরটুকু বলে দেন।

ক'দিন পরেই বৈরাগীর এক চিঠি। অভিমানে ভরা। লিখেছেন, সেদিন

তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে আপনার নিরাপদে পৌঁছানোর খবর শুনলাম। আমাকেও নাকি জানাতে লিখেছেন। খবর শুনে খুশী হলাম। কিন্তু, তিনটি মাত্র পয়সা খরচ করে আমাকে লেখা বুঝি সম্ভব হল না?

চিঠি পড়ে ভাবি, একটা পোস্ট-কার্ড লিখলেই হত। তখনি উত্তর লিখি—তিন পয়সা বাঁচানোর কোন প্রশ্নই নেই, তাই আগেকার বাঁচানো পয়সা খরচ করে এবার খামেই লম্বা চিঠি লিখছি। আলাদা চিঠি লিখি নি, কেন না ভেবেছিলাম খবরটুকুই তো দেবার কথা। দিয়েছিলামও। শহর থেকে চিঠি লিখে আপনার সেই সুন্দর শান্ত গুহার আবহাওয়া কেন দূষিত করব!

তারপর, প্রায় প্রতি বছরেই বদরীনাথ অঞ্চলে কোথাও না কোথাও দুজনের দেখা হয়। পরিচয়ের গভীরতাও বাড়ে। শতোপন্থেও তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাই। সেই কাহিনী যথাস্থানে হবে।

এক বছর ক'দিন একসঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসছি। বৈরাগী অতি সঙ্কুচিত ভাবে এসে বলেন, দেখুন, একটা কথা বলি। নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না, জানি। যদি আপনার কোনরকম অসুবিধে না হয় আমাকে একটা ঘড়ি দিতে পারেন? একটুও অসুবিধে হলে কিন্তু কোনমতেই নেব না। হয়েছে কি জানেন? গুহায় একা থাকি। রোজই রাতে একবার ঘুম ভেঙে গেলেই তখনি জপে বসে যাই। ভোর হতেই চলে যাই তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে। এখানে আকাশের আলো দেখে সব সময় রাত্রের গভীরতা ঠিক ধরা যায় না। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে, ভোর হয়ে গেছে ভেবে স্নান করতে চলে গেছি, স্নান সেরে ফিরছি মন্দিরের ঘড়িতে বাজছে শুনি রাত দুটো! বলে হাসতে থাকেন।

প্রশ্ন করি, কিন্তু শুধু লেঙটি পরে হাতে রিস্ট-ওয়াচ বেঁধে ঘুরতে পারবেন তো?

তিনি বলেন, না, না, রিস্ট-ওয়াচ নয়, ও পরা চলবে না। পকেট-ঘড়ি এখন মেলে না?

বলি, তাই বা রাখবেন কোথায়? পকেট তো নেই। ট্যাকও নেই। কোমরে তো একটা দড়ি!

বলেন, তা বলেছেন ঠিক। কিন্তু, ঐ দড়ির সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা করে নেব।

আমি বলি, তাহলে একটা গল্প শুনুন। বিলিতি গল্প। শেষ পর্যন্ত সে-অবস্থা যেন না হয়, দেখবেন। গল্পটার নাম ছিল—All for a hat: শুধু একটা টুপির জন্যেই সব। এক সাহেবের অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু, তাঁর মতে ধনদৌলতের জাঁকজমক দেখিয়ে মানুষের বাস করা কখনই উচিত না। তিনি তাই তাঁর নিজের বাড়ি করলেন—ছোট করে, ঠিক যতটুকু একান্ত প্রয়োজন। কাজ চলার মত ছোট একটা মোটরগাড়িও কিনলেন। কিছুদিন পরে এক দোকানে বেশ

ভালো মাথা-উঁচু একটা হ্যাট—টুপি দেখে তাঁর পরবার ভারী লোভ হল। প্রথমে মনকে সংযত করবার চেষ্টা করলেন, শেষে বোঝালেন, শুধু তো একটা টুপি! ওতে আর কি হয়েছে? কিনলেন। তারপর রোজ বাড়ি ঢুকতে দরজাতে টুপি ঠেকে যায়—দরজা অগত্যা ভেঙে বড় করতে হল। নতুন দরজার আকারের সঙ্গে ঘরের আকার মেলে না। তাই ঘরও ভেঙে বড় হল। এ-দিকে টুপি-মাথায় ছোট মোটরে উঠতে পারেন না—বড় মোটর কিনতে হল। তার জন্য গ্যারেজ-ঘরও ভেঙে বাড়াতে হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই ছোট্ট বাড়ি দেখতে দেখতে বিরাট অট্টালিকা হয়ে গেল!—শুধু সেই টুপিটুকুরই জন্যে।

বৈরাগী হেসে গড়িয়ে পড়েন, বলেন, না, না—সে-সব ভয় নেই। বেশ গল্পটা কিন্তু।

কলকাতায় ফিরে ঘড়ি কিনে পাঠিয়ে দিই। খুব খুশী হয়ে চিঠি দেন।

বছরখানেক পরের কথা। হঠাৎ এক লম্বা চিঠি,—আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। হয়তো আগে না লিখে আমি অন্যায় করেছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা না করেই সে-ঘড়িটা আজই একজন পাহাড়ীকে দিয়ে দিলাম। সে লোকটি অনেকদিন ধরেই চাইছিল। কিন্তু, তার চাওয়ার জন্যেই যে দেওয়া তা ঠিক নয়। প্রকৃত কারণ, সাধুদের কোন কিছু রাখা কখনই উচিত নয়—ঘড়িও নয়। তা ছাড়া, এটি সঙ্গে রেখে মনে এক অস্বস্তি জেগেছিল,—ঠিক সময় দম্ দেওয়া চাই, কোথায় রাখি, কখন হারায়,—সব সময়েই মনের এই বিকার!—তাই, আজ ঘড়িটি দিয়ে মুক্ত হলাম। স্বকৃত ভুল—সংশোধন করলাম। ক্ষমা করবেন।

চিঠির নীচে দেখি, বৈরাগী-নাম ত্যাগ করে তিনি "ত্যাগী" হয়েছেন।

আমিও খুশী হয়ে জানাই, ঘড়ি তো আপনার। দিয়ে দিয়েছেন—খুব ভালো করেছেন।

তারপরও বৎসরান্তে যখনি দেখা হয়, চোখে পড়ে—যৌবনের সেই স্নিগ্ধ কমনীয় কান্তি, লজ্জিত-বিনম্র-স্বভাব—কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের নির্মম নিষ্পেষণে রুক্ষ শুষ্ক হয়ে এসেছে—যেমন ভোরের ফোটা রঙিন ফুল দুপুর-রোদের প্রখরতায় শুষ্ক ম্লান হয়ে আসে।

দেখে মনে মনে বলি, 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী!'

কিন্তু, তখনি আবার দৃষ্টি পড়ে, সেই দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীর উগ্র-কঠোর রূপের মধ্যেও এক সৌম্য অচঞ্চল জ্যোতির উন্মেষ। রমণীয় নয়, কমনীয় নয়—দিব্য মঙ্গলময়।

॥ ৯ ॥

আর এক বছরের কথা। সে বছর একা গিয়েছি। সাধারণত এই সব পথে একজন সঙ্গী থাকা ভালো। বিদেশ-বিভুঁই। তায় বিরাট হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চল। পাহাড়ের বুকে কোন এক সুসভ্য শহরে সুস্থির হয়ে দিন কাটানো নয়।

পথে পথে দিন কাটে। নিত্য নতুন স্থানে রাত্রিবাস। তাই, মনে ভয়-ভাবনার ছায়া পড়া অস্বাভাবিক নয়—যদি অনিয়ম অত্যাচারে অজানা দেশে হঠাৎ কখনো শরীর অসুস্থ হয়! সেক্ষেত্রে পরিচিতের বা বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্য মনে সাহস আনে। তা ছাড়া, প্রাণ খুলে দুটো মনের কথাও বলা চলে। এসব দিক থেকে দৈনন্দিন পথিক-জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দের একজন সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা কম নয়। কিন্তু, এই সঙ্গী-নির্বাচনে সতর্কতা চাই। বন্ধু হলেও সব সময়ে বা সর্ব-ক্ষেত্রে এই সব পথে যে মনের বা মতের ঠিক মিল থাকে এমন নয়। নিজের নিজের ঘরের মধ্যে বাস করে প্রতি মানুষেরই ব্যক্তিগত কতকগুলি স্বভাব গড়ে ওঠে। ঘরের বাইরে এই পাহাড়-পথে যেভাবে দিনযাপন করতে হয় তাতে এই সব মজ্জাগত অনেক অভ্যাসেরই ব্যতিক্রম ঘটে। ভেতরে ভেতরে অজানিত ভাবে মানুষের ত্যক্ত মন তিক্ত হয়ে ওঠে, অলক্ষ্যে স্বার্থপরতা উঁকি মারে—তারপর একদিন হঠাৎ সামান্য ঘটনার সূত্র ধরে বন্ধুত্বের বন্ধন খুলে লজ্জাশরমের মুখোশ ছিঁড়ে মনের দুর্বল ভাবগুলি কুৎসিত আত্মপ্রকাশ করে ফেলে। তখন, যাত্রার সব আনন্দ তো যায়ই, এইভাবে যাত্রা পণ্ড হয়ে মাঝপথ থেকে দল ভেঙে যাত্রীকে ফিরে যেতেও দেখেছি।

এই বছরেরই একটি ছোট্ট ঘটনা।

রামপুর চটি। ধর্মশালায় উঠেছি। দোতলার এক ঘরে আছি। সন্ধ্যার আগে নীচে নামতে গিয়ে সিঁড়ির উপর দেখা একজন যাত্রীর সঙ্গে। বাঙালী দেখে দুজনেই আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করলাম। কলকাতা থেকে তাঁরাও আসছেন। বড় দল। কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও আছেন। একটু পেছিয়ে পড়েছেন। এখনও সবাই এসে পৌঁছন নি, বললেন। আমাদের পাশের ঘরে উঠেছেন।

সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া শেষ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছি। সারাদিন হাঁটা, আবার শেষরাত্রে উঠে পথ চলা শুরু হয়। এ অবস্থায় এক ঘুমেই রাত কাটে। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুই বৃদ্ধের গলা। পাশের ঘর থেকেই আসছে। তুমুল বচসা চলেছে। কখন কি নিয়ে শুরু হয়েছে জানি না। আমার কানে যখন গেল, তখন বিবাদের বিষয় হচ্ছে—একজনের জিনিস আর একজন ব্যবহার করেছেন কেন? কৈফিয়ত গ্রাহ্য হচ্ছে না। অপরজনও ছাড়বার পাত্র নন—চীৎকার করে বলেন, সেদিন আপনিও তো আমার শিশি থেকে সরষের তেল নিয়ে মেখেছিলেন।

অনেক রাত পর্যন্ত ঝগড়া চলতে থাকে। যাত্রী-ভরা ধর্মশালার ঘুমন্ত পুরীর নিস্তব্ধ আবহাওয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ে—লজ্জায় আমার মন ভরে ওঠে। বেশ বুঝি, এঁদের যাত্রার আনন্দ গেছে, হয়তো অকালে মাঝপথে যাত্রা সাঙ্গ হবে।

এই সব কারণে সঙ্গে কেউ যেতে চাইলেও আমি সহজে রাজী হই না। নির্ভর-যোগ্য কাউকে না পেলে একাই বার হয়ে পড়ি।

একা ঘুরে বেড়ানোর একটা বিশিষ্ট অনুভূতি আছে। সহস্র যাত্রী, তবুও একা। যেন স্রোতে ভেসে যাওয়া ঝরা একটি পাতা। স্রোতের টানে চলে, অথচ জলের অংশ নয়। বিচ্ছিন্ন। নিজের মনে চলি। মন অজানা এক আনন্দে ভরপুর। যেখানে ভালো লাগে, থাকি। আবার চলি। আপনা হতেই সংযতবাক্। কথা বলি মনে মনে নিজেরই সঙ্গে। গহন বিজন বনের মধ্যে, অথবা আকাশ-ছোঁয়া মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের জনহীন পথ দিয়ে একা যেতেও কখনো একলা ভাব মনে জাগে নি। চারিদিকের পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে আত্মসত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। কখনো বা মনে হয়, কে যেন এক অন্তরঙ্গ সঙ্গী সঙ্গে চলেছে। মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলি। সুস্পষ্ট অনুভব করি, হাতে তার হাত ধরে এগিয়ে চলেছি। কে সে,—জানি না, জানার প্রয়াসও করি না, ইচ্ছাও হয় না। শুধু বুঝি, কে যেন চলেছে সব সব সময়ে আমারই সঙ্গে—পা ফেলি তারই পায়ের তালে তালে। এ এক অতি বিচিত্র অথচ অতি সত্য অনুভূতি।

এ শুধু আমার একারই নয়। বিদেশী তুষার-শিখর অভিযাত্রীদেব কাহিনীতেও এই ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পড়েছি। তাঁদের কেউ কেউ এই অদৃশ্য অজ্ঞাত সঙ্গীকে নিজের আহার্যেব অংশও হাত বাড়িয়ে সাদরে দিতে গেছেন,—কথা বলেছেন,—তাবপর নিজের কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙেছে, মনে পড়েছে—কোথাও কেউ নেই—তিনি একা। অথচ তাঁব সমস্ত সত্তা ও চৈতন্য দিয়ে সেই অপর কার উপস্থিতি কি স্পষ্টভাবেই না অনুভব করেছেন!

বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয় এব যুক্তিযুক্ত মনোবিজ্ঞান-সম্মত কৈফিয়ৎ দেবেন, জানি। কিন্তু তবুও, কেন জানি না, এই অদ্ভুত অনুভূতি মনে এক অভিনব আনন্দ ও অসীম সাহস আনে। একা ঘোরার এও এক অমূল্য অভিজ্ঞতা।

সেবারও এইরকম একাই গিয়েছি। বদরীনারায়ণে পেঁছেছি। সেখানে হঠাৎ দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। তাঁরও হিমালয়ে ঘোরার স্বভাব। বিশাল দেহ, বিপুল দাড়ি। মুখভরা হাসি। আমাকে দেখেই দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেন। উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বলেন, আরে! তুমিও আবার চলে এসেছ! চমৎকার হয়েছে। চলো, আজ এক সাধুর দর্শন করাতে নিয়ে যাব তোমাকে।

বন্ধুটি অদ্ভুত মানুষ। তখন প্রায় ষাট বছর বয়স। তাঁর যৌবনকালের দুটি কাহিনী শোনাই।

বিয়ে দেবার জন্যে তাঁর মার বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু বিবাহ-জীবনে যেতে বন্ধু কোনমতেই রাজী নন। মাও ছাড়েন না, পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। একদিন তিনি ছেলেকে বলেন, 'দেখ, এবার আর অমত করা চলবে না। গঙ্গার ঘাটে যেতে এক ব্রাহ্মণের একটি মেয়ে দেখে এসেছি। অতি শান্ত, সুশ্রী। কিন্তু বাপ গরীব—তাই এমন মেয়েরও বিয়ের ব্যবস্থা করতে পাচ্ছেন না।

তুমি নিশ্চয় একবার দেখে আসবে, দেখলে তোমার পছন্দ হবেই। যাবে কিন্তু নিশ্চয়,—যাবে বলে আমি তাঁদের কথা দিয়ে এসেছি।' বন্ধুটি হেসে মাকে বলেন, 'একেবারে কথা দিয়ে এলে, মা, যাব বলে! ভালো, তোমার কথা রাখব।'

তারপর, একদিন গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে তাঁদের বাড়ি গিয়ে বন্ধু উপস্থিত। পরনে ভিজে কাপড়, খালিগায়ে গামছা জড়ানো। মেয়ের বাবাকে ডেকে পরিচয় দিয়ে বলেন, 'মা বলেছেন, তাই এসেছি। মেয়েকে এখুনি নিয়ে আসুন, সাজাতে হবে না—যেমন আছে তেমনি আনুন।'

ভদ্রলোক আশ্চর্য হন। তবুও—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা—মেয়েকে তখনি ডেকে আনেন।

বন্ধু দেখামাত্রই পাত্রীকে প্রশ্ন করলেন, মা, তোমার নামটি কি? ভারী সুশ্রী মেয়েটি তো—বলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এমন সুন্দরী মেয়ে আপনার—এর বিয়ের জন্য ভাবনা? আমি নিজে দাঁড়িয়ে এঁর বিয়ের ব্যবস্থা করবো।'

যেমন কথা, তেমনি কাজও। মাকে এসে সব ঘটনা বলেন। দিন কয়েকের মধ্যে একটি ভাল পাত্র সন্ধান করে নিজের খরচায় মেয়েটির বিবাহও দেন।

মা এর পর বিবাহের কথা আর কখনো তোলেন নি।

বন্ধুর গুরুদেবের সন্ধান পাওয়ারও অদ্ভুত ঘটনা।

১৯১৫-১৬ সাল। তখন তিনি কলকাতায় কলেজে পড়েন। খিদিরপুরে থাকেন। একদিন বিকালবেলা কলেজ থেকে ফেরার পথে গড়ের মাঠে গেছেন ফুটবল খেলা দেখতে। খেলার শেষে ভাবলেন, পকেটে শুধু একটা আধুলি আছে, ওটা আজ আর ভাঙাবো না—হেঁটেই বাড়ি যাই।

রেস-কোর্স-এর বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। কোথাও জন-মানব নেই। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। হঠাৎ দেখেন, অপর দিক থেকে হন্ হন্ করে হেঁটে আসছেন আলখাল্লার মত লম্বা ঝোলা জামা গায়ে একজন সাধু। চোখে তাঁর রঙিন চশমা। কাছে আসতেই তিনি দাঁড়ালেন এবং হিন্দীতে বললেন, বদরীনাথ যাবার জন্যে খরচার কিছু পয়সা দিতে পারো?

বন্ধুর পকেটে শুধু সেই একটি মাত্র আধুলি। কিছু না ভেবে আধুলিটি বার করে তাঁর হাতে দিলেন। তিনিও নিয়ে চলতে শুরু করলেন। বন্ধুও এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, লোকটির হাতে কালো রঙের বড় লম্বা কমণ্ডলু দেখলাম না? সে তো মুসলমান ফকিররা ব্যবহার করে। ইনি তো বললেন, বদরীনাথে যাবেন। তবে কি লোকটি—ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, সাধুটি কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ও তাঁরি দিকে তাকিয়ে দেখছেন। বন্ধুকে ফিরতে দেখে বললেন, কি, সন্দেহ হল ঝুটা বলে? বলে হেসে চলে গেলেন।

বন্ধু বাড়ি ফিরে গা থেকে পাঞ্জাবি খুলে রাখছেন, ঝনাৎ করে আধুলিটি পকেট থেকে মেঝেতে পড়ল। আশ্চর্য! কোথা থেকে ফিরে এল!

এই ঘটনার বছর বারো পরের কথা। গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষায় বন্ধুর মন তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও মনোমত সন্ধান পান না। হরিদ্বারে সেবার পূর্ণকুম্ভ। সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়ার চারিধারে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এক জায়গায় একজন সাধুকে কেন্দ্র করে ভিড় জমেছে। বন্ধু গিয়ে সেখানে দাঁড়ালেন। দেখেন সৌম্যমূর্তি এক বৃদ্ধ সাধু। চোখে তাঁর রঙিন চশমা। রঙিন চশমা! বন্ধু ভাবেন, কোথায় যেন দেখেছি! সাধুজি তাঁকে সস্নেহে কাছে ডাকেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, এতদিন পরে আবার দেখা হল। তুমি আসবে জানতাম, কেননা এবার সময় হয়েছে—তোমায় দীক্ষা দেব।—তারপর একটু হেসে বলেন, কেমন যাদু দেখলে?

এই সেই বন্ধু। পরের উপকার ও সেবা করে দিন কাটান। পূজা-অর্চনায় স্তোত্রপাঠে প্রচুর উৎসাহ। সুযোগ পেলেই সাধু-সঙ্গ করেন। আমাকে বলেন, চলো সাধুটির দর্শন করে আসবে। শুনেছি উঁচুদরের। কয়েক বছর আছেন এখানে। অনেকে বলেন, বাঙালী। চলো দেখে আসি।

আমি যেতে রাজী হই না। বলি, তুমি ঘুরে এসো। তোমার কাছে গল্প শোনা যাবে।

বন্ধু ছাড়েন না। পীড়াপীড়ি করেন। অগত্যা সঙ্গ রাখি।

তপ্তকুণ্ডের একপাশে যে বাড়িগুলি, তারই নীচের একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। ঘর তো নয়, খুপরি। দরজাও তেমনি। মাথা অনেকখানি হেঁট করে, দেহ সঙ্কুচিত করে কোন রকমে ঢুকতে হয়। ঘরের বাইরে পাথর বাঁধানো চাতাল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ভেতরদিকে তাকাই। দেখি অনেক মেয়ে-পুরুষ ভেতরে বসে আছেন। একপাশে এক উলঙ্গ সাধু। বন্ধুকে বলি, ভেতরে স্থানাভাব, তুমি গিয়ে দর্শন করে এসো, আমি বাইরে এখানে অপেক্ষা করছি। কোন ক্ষতি নেই।

বন্ধু একটু ইতস্তত করে ভেতরে প্রবেশ করেন। প্রণাম করে বসেন।

সাধুটি আমায় দেখতে পান। মৃদু হেসে আমাকেও ডাকেন। হিন্দীতে বলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে চলে এসো। আর একজনের জায়গাও করে নেওয়া যাবে এখানে।

ভাবি, অযথা বাক্যব্যয় না করে বসাই ভালো। ঢুকে বসিও, কোন রকমে একটু স্থান করে।

সাধুটির চেহারা এবার ভালো করে দেখি।

বয়স বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। তাম্রবর্ণ। তপঃক্লিষ্ট দেহ। তবে শীর্ণ

নয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। মনে হয়, যোগাভ্যাসে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। অঙ্গে ভস্মাবরণও নেই। নগ্নকান্তি। যৌবনশ্রী। টানা চোখ। টিকালো নাক। মুখে অল্প দাড়ি। চোখে-মুখে প্রশান্ত ভাব। অথচ, বুদ্ধি-দীপ্ত। মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল যেন যুবক পরমহংসদেবের মত চেহারা। ঘরের ভেতর দেখি একধারে একটি ছোট্ট বেদী। তার উপর কয়েকটি দেব-দেবীর ছবি—শিব, দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও।

দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে সাধু অবধূত স্মিতমুখে আলাপ করেন। সকলে নানান বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি শান্ত কণ্ঠে অল্প কথায় উত্তর দেন। আমার সঙ্গীটির সঙ্গেও কথা বলেন। বেশীর ভাগ হিন্দীতে। কখনো বা ইংরাজিতে। বিশুদ্ধ ইংরাজি। সুস্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ।

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, তুমি চুপ করে কেন? কোন জিজ্ঞাস্য থাকে প্রশ্ন করতে পার।

বলি, আপনাদের কথা শুনছি। আমার নিজের কোন প্রশ্ন নেই।

বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে পরিচয়ের প্রয়োজন কিছুই নেই। তবুও।

হাইকোর্টের নাম শুনে অবধূত বলেন, এবার দুজন নতুন জজ হল না? তাঁদের নাম কি?

শুনে আশ্চর্য হই। সেদিনই সকালে এখানে পেঁছে কলকাতা থেকে চিঠি পেয়েছি। বাড়ির খবর আছে, দেশের বিস্তারিত সংবাদও আছে। তাতেই জেনেছি যে নতুন দুজন জজ হয়েছেন—তাঁদের নামও উল্লেখ করা ছিল।

বলি, আজই খবরটা পেয়েছি। নামও উল্লেখ করি। শুনে তাঁদের একজনের পূর্ব পরিচয় দেন, বলেন, তিনি তো সার্ভিসে ছিলেন। অপরটি কে?

জিজ্ঞাসা করি, আপনি এ সব জানলেন কি করে?

উত্তর দেন না। হাসতে থাকেন।

আমি আমার বন্ধুটির পরিচয় করিয়ে দিই। বলি, আসানসোলে থাকেন। কয়লাখনির কালো রাজ্যে বাস হলেও চেহারাটি যেমন সুশ্রী, মনটিও তেমনি নির্মল। ভক্ত সজ্জন।

বন্ধু সলজ্জ ভাবে বলেন, ওর কথা শুনবেন না।

স্বামীজি মৃদু হাসেন। বলেন, কয়লার মধ্যেও রত্ন আছে। শুধু বিজ্ঞানের কথা নয়। এই চোখ দেখেছে। তখন এই শরীর ছিল বিলেতে। লন্ডনে এক সাহেবের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়। ন্যায়নিষ্ঠ। ধার্মিক। সৎপথে থেকে দিনযাপন করেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। তাঁর হাতের রেখায় ছিল হঠাৎ ধনলাভ। তাঁকে সেকথা বললে বিশ্বাস করতেন না, হেসে উড়িয়ে দিতেন। বন্ধুরা তাঁকে উৎসাহ দিত, ডার্বিতে টিকিট কেনো। হাতের রেখায় রয়েছে যখন, পেয়ে যাবে নিশ্চয়।

তিনি বলেন, ওতে আমি বিশ্বাস করি না। ভাগ্যে যদি থাকেই, দেখা যাক —কিভাবে আসে! আমি আমারনিজের কাজ কর র যাব।

ছোট্ট একটি কয়লার দোকান। বাইরের দিকে থাকেন। পিছন দিকে অন্ধকার ঘরে কয়লার বস্তা জমানো। নিজে ঘুরে ঘুরে পরিচিত মহলে বিক্রি করেন। একদিন হঠাৎ অসময়ে এসে হাজির। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলেন, ভীষণ আশ্চর্য ব্যাপার! হাতের রেখা সত্যিই ফলেছে। কয়লার মধ্যে একটা সোনার চাঁই—স্বর্ণপিণ্ডক—নাগেট্!

সত্যিই তাই। আইনমত সেটা অবশ্য গভর্ণমেণ্টে জমা দেওয়া হল, কিন্তু তাঁরও অর্থাগম হয়েছিল। কয়লার মধ্যে সত্যি রত্নও পাওয়া যায়!

তাঁদের আলাপ-আলোচনা আবার ভগবদ্মুখী হয়। চুপ করে শুনি। তিনি আমাকে আলোচনার মধ্যে টানতে চান। আমি অনিচ্ছুক। আবার বলি, আমার প্রশ্ন কিছু নেই। তাই চুপ করে শুনছি।

হঠাৎ মনে জাগে, বিলেত-ফেরত শিক্ষিত পুরুষ, তবুও সর্বস্ব ত্যাগ করে, উলঙ্গ হয়ে এই কঠোর জীবন বরণ করলেন কেন? পেয়েছেনই বা কি? একবার আলাপ করে দেখলে হয়।

তাই বিনীতভাবে তাঁকে জানাই, যদি সত্যিই আলাপ করবার সুযোগ দিতে চান, তবে একলা আপনার সঙ্গে মিলতে চাই। কোন্ সময়ে আপনার অসুবিধে হবে না বলুন, তখন আসব। অবশ্য আপনার কোনরকম আপত্তি বা অসুবিধে থাকলে—এ প্রশ্ন ওঠে না, এবং আমিও আসতে চাই না।

তিনি হাসেন। বলেন, বেশ তো, একাই কথা হবে। কোন অসুবিধে নেই। আসতে পারবে—রাত ন'টার পর? তখন চারিদিক সব শান্ত থাকবে। কিন্তু, শীত আছে মনে রেখো।

আমিও একা থাকি। নিকটেই আছি। অতএব, আমারও কোন অসুবিধা নেই, জানাই।

সকলকে নামকীর্তন করতে বলেন। বন্ধু মুক্তকণ্ঠে মধুর সুর ধরেন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে……'

সকলে সমবেত কণ্ঠে যোগ দেন। একজন অস্ফুট স্বরে বলতে থাকেন দেখে অবধূত বলেন, দেবস্থানে দেবতার নামগান মুক্তকণ্ঠে নিতে লজ্জা কিসের? গলা ছাড়ো।

ছোট ঘর নামগানে ভরে ওঠে। তাকিয়ে দেখি, সবাই চোখ বুজে। অবধূতের ধীর স্থির নিস্পন্দ মূর্তি। বন্ধুর নিমীলিত নয়ন থেকে ধারা নেমেছে।

রাত ন'টার অনেক আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে আছি। ঠিক সময়-মত অবধূতের কাছে যেতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে আর এক সাধুর সঙ্গে আলাপের কথা। হিমালয়ে নয়।

মাকে নিয়ে ব্রজ-পরিক্রমায় চলেছি। বৃন্দাবন থেকে যাত্রা শুরু হয়। চুরাশী ক্রোশের পরিক্রমা। প্রায় মাসখানেক লাগে। তিন-চার হাজার যাত্রী একসঙ্গে চলে। কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ বা টাঙায়, অধিকাংশই পায়ে হেঁটে। দিনের পর দিন এইভাবে চলা। এক অভিনয় আনন্দময় জীবন। চারিদিকে সবারই মুখে শ্রীরাধিকার নাম। রাত্রে চৌকিদারও পাহারা দিতে ঘোরে 'রাধে' 'রাধে' ডাক দিয়ে। নিত্য নতুন জায়গায় রাত কাটানো। সঙ্গে কারো তাঁবু থাকে, নইলে অনেকে গাছতলাতেই শয্যা পাতেন, পথে বড় গ্রাম পেলে ধর্মশালা বা পাকাঘরেও আশ্রয় মেলে। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনী ঘিরে এই তীর্থযাত্রা গড়ে উঠেছে। এই পথেরই এক অঞ্চলে এক বৈষ্ণব বাবাজীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়। তিনিই নিয়ে গেলেন এক বৈষ্ণব মহাত্মার দর্শন করাতে। শ্যামকুণ্ডের এক নিভৃত অন্তরালে পাঁচিল-ঘেরা ছোট্ট কুটিয়া। সঙ্গী বাবাজীর অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সম্মুখে দাঁড়িয়ে। পরনে সামান্য এক টুকরা কাপড়। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। রুক্ষ, শুষ্ক মূর্তি। কিন্তু সুমিষ্ট হাসি। টানা চোখ দুটি ভরে প্রেমের অশ্রু টলমল করছে। তাঁর চোখের দিকে চাইতেই হঠাৎ মনে এল—কুমারিকায় যে ঘরটিতে থাকতাম তারি একটি ছোট্ট জানালা দিয়ে ভারত-মহাসাগরের সুনীল বারিরাশির দৃশ্য দেখা যেত। এঁর চোখের পাতা দুটির মধ্যে দিয়েও মনে হয় এক শান্ত গভীর প্রেম সাগরের যেন সন্ধান দেয়। নত হয়ে পায়ের ধুলা নিই। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে বুকে নিয়ে আলিঙ্গন করেন। মৌনী। একটা শ্লেট্-পেনসিল নিয়ে প্রয়োজনমত লিখে প্রশ্ন করেন, উত্তর দেন। এইভাবেই আলাপ হয়। বিদায় নেবার আগে শ্লেটে লিখে এগিয়ে দেন—নামঠিকানা দিয়ে যাও।

প্রশ্ন করি, তাতে প্রয়োজন কি ?—তিনি মধুর হাসতে থাকেন। আমি লিখে দিই।

এর কয়েক বছর পরের কথা। হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম। 'প্রীত্যাস্পদ' বলে সম্বোধন করেছেন। লিখে জানিয়েছেন—বন-যাত্রার সময় শ্রীশ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্যামকুণ্ডতীরে নিকুঞ্জ কুটিরে দীনজনকে দর্শন করে গিয়েছ। তোমার ঠিকানাটি লিখে রেখেছিলাম এই কারণে, ভবিষ্যতে যদ্যপি বিশেষ কোন সেবার দ্রব্যের এস্থানে অভাব প্রয়োজন ঘটে তা হলে পত্র দ্বারা জানাব। উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুখার্থে একটি সেবার দ্রব্যের প্রয়োজন বিধায় তোমাকে পত্র দিতে বাধ্য হলাম। যদ্যপি সেবা করতে পার তো পরমানন্দ লাভ করব। সেবাটি এই, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করকমলের একটি উৎকৃষ্ট ১নং বংশী। বংশেরই হোক কিংবা কাষ্ঠনির্মিতই হোক—মোটা সাইজের গম্ভীর সুমিষ্ট স্বরযুক্ত ও ধ্বনি সুদূরবর্তী চলে।—চিঠিতে তারপর বাঁশীটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া, কি ভাবে পাঠাতে হবে তারও নির্দেশ লেখা। শেষে লিখেছেন, 'সময় সময় রসময়ের বংশীগান করতে প্রাণে বড়ই সাধ হয়, কিন্তু উত্তম স্বরযুক্ত বংশী এস্থানে মেলা

দুর্ঘট, তন্নিমিত্তই তোমাকে শ্রীশ্রীনিবাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় প্রীতি সম্বন্ধে জানালাম।'

চিঠিখানি পেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেইদিনই কলকাতার এক প্রসিদ্ধ বাজনার দোকানে গিয়ে চিঠির বর্ণনামত বাঁশীর সন্ধান করলাম, পাঠাবারও আয়োজন করে এলাম। কিন্তু, তারপরই তাঁর এক চিঠি এল। তাতে জানিয়েছেন, বাঁশীটি ক্ল্যারিওনেট্ হলেই ভালো।

দোকানদারের কাছে আবার তখনি যাই। তাঁরা হেসে বলেন, ক্ল্যারিওনেট্ কি যে সে লোক বাজাতে পারে,—ওর রীতিমত শিক্ষা থাকা দরকার, স্বর বার কবাও শক্ত।

বলি, এক কাজ করুন। একটা ক্ল্যারিওনেট্ই পাঠান, সেই সঙ্গে একটা ভালো বাঁশের বাঁশীও দিন।

সেই মত পাঠানোও হয়। চিঠিতে দোকানদারের কথাগুলি উল্লেখ করে লিখি, ক্ল্যারিওনেট্‌টি যদি বাজাতে না পারেন আপনার বংশীধারীর কাছেই শিখে নিয়ে তাঁকে শোনাবেন।

বাঁশীগুলি পেয়ে উল্লাসভরে তিনি আনন্দ জানান। চিঠির মধ্যেও যেন তাঁর বাঁশীর সুর ভেসে আসে। চিঠিতে তাঁর আশ্রমের নামটিও বড় মধুর ছিল—'ঘন মাধবের ঘেরা'।

সেই একদিনের অল্প পরিচয়। তবুও গভীর প্রেমে ভরা, মনের নিকষে স্বর্ণরেখা রেখে গেছে, স্মৃতির আলোকে কারণে-অকারণে ঝিকমিক করে।

॥ ১০ ॥

রাত ন'টা বাজে। টর্চ হাতে বার হই। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কোটের উপরই গরম চাদর জড়াই, মাথা কান চাপা দিই। নিঝুম বদরীপুরী। জনহীন পথ। গতিহীন, শব্দহীন। শুধু অলকানন্দার নৃত্যকলরোল। অনন্ত কল্লোল।

অবধূতের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। দরজার মধ্য দিয়ে একফালি আলো বাইরে এসে পড়েছে। বাইরে থেকে দেখি, অবধূত একপাশে বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে দু'টি যুবক। বেশভূষায় বাঙালী বুঝতে পারি। একজনের হাতে রুটি। অবধূতকে খাইয়ে দিচ্ছে। তিনি চুপ করে বসে আহার করছেন। খাওয়া শেষ হল। অপর ছেলেটির হাতে ঘটি। দেখি, জল খাইয়ে দিল। একটা তোয়ালে দিয়ে মুখও মুছিয়ে দিল। অতি যত্নভরে খাওয়ানো, মোছানো। যেন, মায়ের হাতে ছোট ছেলে খাচ্ছে। তারপর, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ছেলে দুটি বার হয়ে গেল। এখন তিনি একা। হেঁট হয়ে দরজা দিয়ে আমি প্রবেশ করি। ঘরের চারিধারে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। একপাশে ছোট লম্বা একটা বেদীর মত। পাথরের উপরে কিছু শুকনো ঘাস বিছানো। একজন মানুষ কোনরকমে শুতে পারে। তারই উপর তিনি পা মুড়ে বসে আছেন। একপাশে

কাগজপত্রের বাণ্ডিল। লেখাপড়ার সরঞ্জাম। দু'তিনখানা বইও আছে মনে হল। ঘরের মাঝখানে ছোট অগ্নিকুণ্ড। একটা বড় কাঠ—আধপোড়া পড়ে আছে, আগুন নেই। আর এক দিকে সেই দেব-দেবীর ছবিগুলি।

আমাকে দেখে অবধূত মৃদু হাসেন। কাছে ডাকেন। বেদীর উপর তাঁর পাশে বসতে বলেন। বসিও তাই।

হিমালয়ের নিঃশব্দ নিভৃত রাত্রি। ক্ষুদ্র প্রদীপের স্তিমিত আলোক। পাশেই এক নগ্ন সন্ন্যাসী। মনে অস্বাভাবিক ভাব আসাই স্বাভাবিক। তবুও সাধারণ ভাবেই সব কিছু নেবার চেষ্টা করি। সহজভাবে তাঁকে বাংলায় সম্বোধন করি। বলি, দেখুন, প্রথমেই দুটো কথা আপনাকে বলে রাখি। আমি বাংলাতে কথা বলবো। হিন্দী আমার আসে না, যেটুকু বলার চেষ্টা করি—বাধ্য হয়েই বলতে হয়, ভুলও হয় প্রচুর। ইংরাজীতে তার চেয়ে কথা বলা সহজ, কিন্তু ইংরাজী বল্যার দরকার দেখি না। অবশ্য, আমাদের বাংলায় কথা বলা মানে—ইংরাজী বাংলা মেশানো। নিজের ভাষায় কথা বলাটা সহজ হবে। আপনি অবশ্য যাতে ভালো মনে করেন তাতেই বলবেন।—বলে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি হিন্দীতে বলেন, বেশ তো, বাংলাতেই বলো। তাতে বোঝার কোন অসুবিধে হবে না।

বিজ্ঞের মত বলি, তা আমি জানি।

তখনও সেই বন্ধুর দেওয়া খবর অনুযায়ী আমার ধারণা, তিনি বাঙালী। কিন্তু, তিনি সেদিন অথবা তার পরে কখনও বাংলায় কথা বলেন নি। হিন্দী বা ইংরাজীতে বলতেন। আমি বাংলাতেই অনেক সময় বলতাম—তিনি পরিষ্কার বুঝতেন দেখতাম। পরে শুনেছিলাম, তিনি সম্ভবত বাঙালী নন, দাক্ষিণ দেশীয়।

অবধূত বলেন, দ্বিতীয় কথাটি কি ?

উত্তর দিই, আপনার সঙ্গে যথোচিত আচার-ব্যবহারের কথা। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে, সুযোগ পেলেও, বেশী মিশি না। ভাবি, তাঁরা তাঁদের কাজ নিয়ে আছেন, বিরক্ত করার দরকার কি ? তাঁদের সঙ্গে ঠিক কিভাবে আচরণ করা উচিত, কেমন ভাবে কথা বলার রীতি—আমার জানা নেই। আপনার সঙ্গে তাই অতি সহজ সাধারণভাবে কথা বলব, কোন কিছু বাধা বা সংকোচ না রেখে। নিশ্চয় জানবেন তার মধ্যে এতোটুকু অশ্রদ্ধা বা অসম্মানের উদ্দেশ্য নেই। এ-ভাবে আলাপ করায় যদি আপনার আপত্তি থাকে বা অসঙ্গত মনে হয়, তবে মৌখিক পরিচয় করেই চলে যাব—তাতেও নিশ্চয় জানবেন আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

দেখি, তিনি হাসছেন। নির্মল হাসি। আমার ডান হাতটা ধরে করেরেখাগুলি দেখেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। আমার মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা। প্রশ্নোত্তর করে শিক্ষকের হাতে দিলে তিনি খাতার উপর চোখ বুলিয়ে এমনি ভাবেই তাকাতেন; মনে হত—বিদ্যের দৌড় ধরে ফেলেছেন।

অবধূতে বলেন, ঠিক আছে। নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করবে, নিঃসংকোচে কথা বলবে। কোন বাধা নেই। অনেক ঘুরেছ, নয়? এখনও ঘোরা আছে।

বলি, হাতের রেখায় লেখা আছে দেখলেন?

তিনি বলেন, প্রশ্ন থাকে করতে পার।

আমি বলি, ও-তে আমার কৌতূহল নেই। নিজের জীবনের অতীত ঘটনা জানা আছে, ভবিষ্যৎ জানায় আগ্রহ নেই। যা ঘটবার ঘটবে, নিজে সব কিছুর সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে পারলেই হল। গণনায় ভুল হলে মিথ্যা আশা বা আশঙ্কায় মনকে অযথা উদ্বিগ্ন করার সার্থকতা দেখি না। কিন্তু, আপনার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করি, আপনার হাত দুটি তো দেখছি, বেশ কর্মদক্ষ আছে,—তবে ঐ ছেলে দুটি এসে খাইয়ে দিয়ে গেল কেন? আপনি নির্জীব হয়ে ছিলেন দেখলাম।

তিনি বলেন, ওঃ! এই কথা! ওটা একটা সামান্য ব্যাপার। ভগবানই এ-শরীরের জন্যে আহার জুটিয়ে দেন। তিনি দিলে ও খায়, না দিলে ও পায় না। বলতে পার—অজগর-বৃত্তি।

অতি-সহজ কণ্ঠে কথাগুলি বলেন।

মনে পড়ে, মহাভারতে শান্তিপর্বের কথা। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে ইচ্ছা-মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির আদি উপস্থিত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম সম্বন্ধে নানান্ প্রশ্ন করছেন। পিতামহ উপদেশ দিচ্ছেন, বহু উপাখ্যান শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে মোক্ষধর্ম পর্ব অধ্যায়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন অজগর ব্রতের কাহিনী। ব্রহ্মচারী এক ব্রাহ্মণ। নির্লোভ, শুদ্ধস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় দয়ালু, মেধাবী, প্রাজ্ঞ। তবুও, শিশুর মত দিন যাপন করেন। লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না। ধর্ম, অর্থ, কামে সম্পূর্ণ উদাসীন। বলেন যদি লোকে দেয়, তবে খাই, না পেলে অভুক্ত থাকি। অজগর সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেই মত যদৃচ্ছাগত বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকি। শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই। দৈহিক সুখ অনিত্য। এই উপলব্ধি করে পবিত্র ভাবে আত্মনিষ্ঠ হয়ে অজগর ব্রত পালন করছি।

ভাবি, শুনতে তো ভালই লাগে। কিন্তু এভাবে থাকা কি সম্ভব? প্রশ্ন করি। অবধূতের উত্তরে যা জানি তা এই:

নিজের আহার্যের জন্যে তিনি নিজে কোন প্রয়াস করেন না। কয়েক বছর এমনই চলছে। কেউ খাবার নিয়ে এসে বা তৈরি করে খাইয়ে দিয়ে গেলে খান, নয়ত অভুক্ত থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে একটি দল এখানে গড়ে উঠেছে। স্থানীয় কয়েকজন তাতে আছেন, কয়েকটি সাধুও আছেন। এ ব্যাপারটি আমি নিজে পরে লক্ষ্য করি। কেননা এই বিপক্ষ দলের দু-

একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তাঁদের কারো কারো মতে অবধূতের এই নগ্ন বেশে শহরের মধ্যে, মন্দিরের এত কাছে বাস করা শোভন নয়। তাঁরা বলেন, 'বাইরে গুহায় থাকলেই তো পারেন,—যদি তিনি উলঙ্গই থাকতে চান!' অবধূত কিন্তু মন্দিরের সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে অসম্মত,—যদিও তিনি কিছুকাল থেকে মন্দিরের ভেতর যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অঙ্গে কোন আবরণ দেওয়ার প্রশ্ন তাঁর কাছে ওঠে না,—কেন না, তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের সংস্কারে বাধে। অবধূত বা পরমহংস যিনি, তিনি সমদর্শী। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। তাই বিধি-সংযমের অতীত অবস্থায় চলে যান।—তবুও ইনি সাধারণত পা দুটি মুড়ে যে-আসন করে বসে থাকতেন তাতে দর্শকের লজ্জা পাবার বা আপত্তি করার কোন কারণ থাকত না। অথচ, এই নিয়ে বিপক্ষ দল তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে, সাধু-সন্দর্শন-প্রার্থী যাত্রীদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে। ফলে, যদিও এক সময়ে অবধূতের দর্শন পেতে বহু যাত্রী যেতেন—এখন তাঁরা কমই যান। কখনো কোন যাত্রী না এলে তিনি অভুক্ত থাকেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এমন ভাবে পাঁচ-সাত দিনও যায় তো?

তিনি হেসে বলেন, পাঁচ-সাত দিন কেন? দু'তিন সপ্তাহও কখনো চলে গেছে; এই তো এইবার প্রায় সপ্তাহ দুই পরে এই ছেলে দুটি হঠাৎ একদিন এলো। তার পরদিনই এদের দেশে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু যায় নি। সপ্তাহখানেকের ওপর হল থেকে গেছে। এই বাড়িরই ওপরে একটা ঘরে থাকে। রোজ আসে। এই শরীরকে ভোজন দিয়ে চলে যায়। এরা যখন থাকবে না, আর অন্য কেউ যদি না আসে এ-শরীরও আহার পাবে না। তাতে ক্ষতি নেই। শিবের যা ইচ্ছা তাই হবে।—বলে ঊর্ধ্বপানে তাকান। নির্বিকার ভাবে কথাগুলি বলা। কারো উপর কোন আক্রোশ নেই, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগও নেই। শরীরের এত বড়ো প্রয়োজনটাও যেন তাঁর কাছে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ, দুই মুঠো উদরান্নের জন্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীময় কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা! সভ্যতার প্রগতির যুগেও—বিজ্ঞানের এত প্রসারেও—এ সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি। ভাবি, ক্ষুধা কি এমন ভাবে জয় করা যায়?—প্রশ্নও করি।

উত্তরে অবধূত শারীরতত্ত্বের নানারূপ কথা বলেন। শরীর ধারণের পক্ষে খাদ্যের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদের কি মত, তাও জানান। বলেন, বিজ্ঞানে বলে, মানুষ কোন খাদ্য না খেয়েও দু'মাসেরও বেশী বেঁচে থাকতে পারে। শরীর-রক্ষার দিক থেকে খাদ্যের চেয়েও দেহের প্রয়োজন হল জল। জল না পেলে মানুষের এক সপ্তাহ বা দশদিনের বেশী প্রাণ থাকে না। অথচ, জলের অভাবে তখনও সে তৃষ্ণায় মরে না। যদিও কথায় বলে, 'তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মারা যাচ্ছি'—তখন মৃত্যু ঘটে নিরুদনে—dehydration-এ, এ তো বিজ্ঞানের কথা। তার উপরও যোগাভ্যাসের ব্যাপার আছে। যোগসাধনায় মানুষের অনেক সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে, নতুন শক্তিও সে লাভ করে। শরীর বা জীবন-ধারণের জন্যে

সাধারণ মানুষের পক্ষে যে-সব বস্তু একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়—কিংবা মানুষের মধ্যে যে-সকল আদিম বৃত্তিও থাকে—যোগবলে সেগুলি শুধু দমন করাই সম্ভব তা নয়, সেই সব শক্তি ভগবদ্‌মুখী করে আত্মসিদ্ধির পথে প্রয়োগ করতে হয়—তার প্রভূত ফলও পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে সুপ্ত ঐশী শক্তি জাগ্রত করে নিতে পারলেই সব কিছু সম্ভবপর হয়। সাধারণ মানুষ তখন তার সামান্য বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে—এ-সব অস্বাভাবিক কিছু। সে বোঝে না যে ভগবদ্‌-দত্ত প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে সে-ই বরং অস্বাভাবিক হয়ে গেছে—তাই যা তার অন্তর্নিহিত অতি স্বাভাবিক শক্তি তাকে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ভেবে বিস্মিত হচ্ছে।

এইভাবে অবধূত বলে যান। চুপ করে শুনি। কিছু বুঝি, অনেক কিছুই বুঝি না। কিন্তু বেশ বুঝি, তাঁর জীবনে এ-শুধু তত্ত্ব-কথাই নয়।

এই দীর্ঘ-অভুক্ত থাকার সম্বন্ধে এর অনেকদিন পরে সংবাদপত্রে একটি খবর পড়ি।

সে এক মর্মান্তিক আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ। দারুণ বর্ষার সময়। আসানসোল অঞ্চলে এক কয়লার খনিতে হঠাৎ প্রবল-বন্যার এক বিপুল ধারা প্রবেশ করে। প্রায় জন চল্লিশ কর্মীর খনির গহ্বরে সলিল-সমাধি ঘটে। মাটি থেকে প্রায় ৪৫০ ফুট নীচে। এতগুলি প্রাণহানির আশঙ্কা চারিদিকে গভীর শোকের ছায়া ফেলে। জলনিকাশের ব্যবস্থা চলে। দিনের পর দিন জল তোলা হয়। কুড়িদিন পরে এগারোটি জীবন্ত মানুষ সেই খনির গহ্বর থেকে উদ্ধার পেল। মৃত্যুর দুয়ারে আঘাত করে প্রাণবন্ত মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। দীর্ঘদিন উপবাসী। বুভুক্ষু। তবুও সজীব! প্রশ্ন ওঠে, কুড়িদিন শুধু জল খেয়ে ছিল কি করে? সন্ন্যাসী নয়—যোগী নয়—তবুও অনায়াসে মানুষ এতদিন বাঁচে কি করে? শুধু তাই নয়। প্রায় দীর্ঘ তিন সপ্তাহ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কাটিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, কুড়িদিন কোথায়? মাত্র চার-পাঁচ দিন তো আমরা আটক ছিলাম!

মানুষের অন্তর্নিহিত অপরিমিত শক্তির পরিচয় দেয়। অজানা তার সীমা।

অবধূতের সঙ্গে আলাপ করি। নানান্‌ বিষয়ে কথা ওঠে। আলাপনের মধ্যে তাঁর পূর্বাশ্রমের কিছু আভাস পাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। ডিগ্রী ছিল। বিলাতেও শিক্ষা-প্রাপ্ত। আইন সম্পর্কে জ্ঞান আছে। সমাজে বিধিনিয়মের প্রয়োজনীয়তা, আইনের কল্যাণকর রূপের বর্ণনা দেন। সে বিষয়ে আলোচনা বেশী অগ্রসর হতে দিই না। বলি ও-সম্বন্ধে শুধু বইয়ের পড়া বিদ্যা নয়, ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তারই ভিত্তিতে নিজের মতামতও গড়ে উঠেছে। আইন-আদালত নিয়ে দিন কাটে। ওর মধ্যে আধ্যাত্মিক বা গভীর কোন

কিছু তত্ত্ব নেই। স্থূল জগতে বা সমাজে শুধু ওর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাই আছে। তাই হিমালয়ে এসে ও বিষয়ে আলোচনা অচল।—মন্তব্য শুনে তিনি হাসেন।

বিজ্ঞান বিষয়েও তিনি জানেন দেখি। সে-জগতেও কোথায় কি নতুন আবিষ্কার হয়েছে, কোন্ দেশে কোন্ বৈজ্ঞানিক এখন কি নিয়ে গভীর গবেষণা করছেন—এ সবের শুধু খবরই রাখেন না, বিশদভাবে বোঝেন ও আলোচনা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু আবার এ কথাও বলেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জ্ঞানের সীমা বহুদূর বিস্তারলাভ করেছে ঠিকই, তবুও স্থূল জগতের জ্ঞানের বাইরে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মলোকের বহু তত্ত্ব ও তথ্য শেখবার আছে। আধুনিক বিজ্ঞান শক্তিশালী হলেও তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যেখানে যেতে পারে না, সত্যকার সাধকদের যোগশক্তি অবলীলায় সেখানে পৌঁছুতে পারে।

সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধেও কথা বলেন। নতুন ভালো বই কোথায় কি প্রকাশিত হল তারও খবর কিছু জানেন, দেখি। বলেন, সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা—এ সবই তো সত্য-সুন্দরের সাধনা। ভগবদ্-আরাধনার আর এক রূপ।

পাশ্চাত্ত্য ভাষা, শুধু ইংরাজী নয়, অন্য কয়েকটিও জানা আছে, তার প্রমাণ পাই।

কলকাতায় অনেকদিন ছিলেন। আমার পিতৃদেবের নামের সঙ্গে পরিচিত। বলেন, বিরাট পুরুষ ছিলেন। দেশের কত বড় কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি, আজকালকার লোক তার বিশেষ খবর রাখে না। এ-শরীর তাঁকে দেখে নি, তখন ছোট ছিল। তোমার দাদার খবর এ রাখে।

আরও অনেকের নাম করেন। তাঁদের কয়েকজনকে চিনি। দু-একজনের নাম করে বলেন, এঁরা এ-শরীরের পূর্ব পরিচয় জানেন। এখনও মাঝে মাঝে খবর করেন।

ভাবি, বাড়ি ফিরে তাঁদের কাছ থেকে এঁর সঠিক পরিচয় নেব। নেবার সুযোগও পাই। তবুও নেওয়া হয় না। মনে হয়, নিরর্থক এই কৌতূহল। যে মানুষ সব কিছু মুছে ফেলে একান্তে নির্জন-বাস করছেন, যাঁর পূর্বাশ্রমের জীবন এখন বিস্মৃত অতীত মাত্র, কি প্রয়োজন আছে সেই বিগতকালের কুক্ষিগত শবদেহখানি তুলে ব্যবচ্ছেদ করার ?

এখন নৈর্ব্যক্তিক তাঁর দেহ। তাই দেখি, প্রকৃত সাধুরা নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করতে কখনও 'আমি' বলেন না। 'এই শরীর' বলেই উল্লেখ করেন। দেহস্থ 'আমি' পরমাত্মায় লীন হয়েছে, পূর্বের 'আমি' এখন পঞ্চভূতময় শরীর মাত্র।

তাই, যখন রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করেন ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেন এবং স্বাধীনতার পর দেশের কর্তৃপক্ষের কার্যবিধি সম্বন্ধেও সংবাদ রাখেন দেখি, তখন আশ্চর্য বোধ করি। ভাবি, ঈশ্বরেই যদি এখন স্থিতি

এবং নশ্বর যদি জগৎ, তবে সে-জগতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন কি ?

তাই, জিজ্ঞাসা করি, এত খবর রাখেন কি করে এবং কেনই বা ?

হেসে বলেন, সব কিছু এখানে বসেই পাওয়া যায়। যা অতীত সে তো জানা থাকে, যা ঘটছে তাও চোখের ওপর ভাসে, ভবিষ্যতের ছবিও ফুটে ওঠে। তা ছাড়া, চিঠিপত্র আসে খবরাখবর নিয়ে। দেশবিদেশ থেকে উপদেশ চায়। এই তো এই সপ্তাহেই চিঠি এসেছে জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে। দিল্লী থেকেও দেশ-নেতাদের মাঝে মাঝে চিঠি আসে।

চিঠিগুলি দেখাতে যান। আমার ভালো লাগে না। বলি, চিঠি দেখার কৌতূহল আমার নেই! কিন্তু আশ্চর্য লাগে আপনার কথাগুলি শুনে। অতো জায়গা থেকে এতো চিঠি! এতে আপনার শান্ত নিভৃত-বাসে বিঘ্ন ঘটানোর কথা, সন্ন্যাস-জীবনের এগুলি অন্তরায় বলেই তো আমাদের মনে হয়।

তারপরে, হেসে বলি, এক কাজ করুন—এখানে না থেকে কলকাতা বা দিল্লীতে সেন্টার খুলুন। লোকজনের অনেক সুবিধে হবে। আর সেখানে যদি মন্তর দিতে শুরু করেন তো দেখবেন শিষ্য-ভক্তের অভাব হবে না—বড় বড় মোটর হাঁকিয়ে সব আসতে আরম্ভ করবেন।

তিনি হেসে ফেলেন! প্রাণখোলা হাসি।

বলেন, সন্ন্যাস-জীবনের এটা একটা বিঘ্ন বই কি, তবে সেটা খুব বড় কিছু নয়। আর, লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ? যদি সন্ন্যাস-জীবনে কোন শক্তি বা জ্ঞানের সঞ্চয় হয়েই থাকে, জগতের হিত-কাজে সেটা লাগানো—সে তো কর্তব্য, তাঁরই কাজ। এতে ধর্ম-জীবনের ব্যাঘাত হবার কোনো আশঙ্কা নেই। তবে, এ-কথাও ঠিক—লোকপ্রতিষ্ঠার মোহ সাধুদের জীবনেও একটা বড় অন্তরায়। অনেকেরই এতে পতন হয়। একে বলে রুদ্রগ্রন্থি,—লোকৈষণা—এ ছেদ করা খুবই কঠিন।

নির্বাক হয়ে শুনি। জ্ঞানের দম্ভ নয়, শক্তির প্রচার নয়। নিজের সুস্পষ্ট অভিমত স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত করা। বলেন, কত লোক কত কি চাইতে আসে। ভাবে, বুঝি এখানে বসেই সব কিছু পাওয়া যায়, দেওয়া যায়। নিজের ভেতরের শক্তির সন্ধান রাখে না। ধর্ম-কথা,—তার শেষ নেই! পুরনো চিরকালের কথা—শাশ্বত সত্য—সব ধর্মেরই যে-সব মূল তত্ত্ব—আবার নতুন করে বার বার বলা—তাই শোনে। বিদেশী অভিযাত্রীদলেরও অনেকে আসেন এই শরীরের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁদের মধ্যেও দু-একজন আধ্যাত্মিক জগতের অনুসন্ধিৎসু থাকেন। হিমালয়ের হিমশিখরে উঠে তাঁরাও বিচিত্র অনুভূতির কিছু অভিজ্ঞতা পেয়ে যান। কিন্তু, তাঁরা সন্ধান জানেন না, এইসব অভিযান যোগবলের সাহায্যে কত সহজ হতে পারে। সাজ-সজ্জার বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, বহু অর্থব্যয়েরও প্রশ্ন ওঠে না।

এই সম্পর্কে যোগবলের অনন্ত মহিমার অনেক কথাই শুনি। বলেন,

সাধারণ মানুষের ধারণা, যৌগিক ক্রিয়ায় শরীরকে কষ্ট দেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল। ঠিক ভাবে যোগ অভ্যাস করলে দেহের ও মনের সমূহ শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়। যোগী মানুষ অতি সহজে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে প্রয়োজনমত মানিয়ে নিতে পারে। এমন সব আসন আছে যার সাহায্য নিলে বরফের ওপর অত শীতেও হাত পা শরীর কখনো আড়ষ্ট হয় না। প্রাণায়ামে শরীরের উত্তাপও ঠিক থাকে না। এসব যে-সাধুরা জানেন তাঁদের কাছে শীতের রাজ্যেও আগুনের অভাব বোধ হয় না, শরীর গরম করবার জন্যে উত্তেজক পানীয় বা অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

এইভাবে অবধূত কত রকম আসনের নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ করেন।

হঠাৎ বাইরে মানুষের পায়ের শব্দ শুনি। দরজার কাছে একজন পাহাড়ী এসে দাঁড়ায়। অবধূত তাকে ভেতরে ডাকেন। প্রণাম করে সে বসে। বিষণ্ণ চিন্তিত মুখ। কথার মধ্যে বুঝতে পারি, কার অসুখের ওষুধ নিতে এসেছে। অবধূত পাশ থেকে একটি কৌটা বার করেন, দুটো সাদা পিল বার করে দেন। সে ভক্তি-ভরে অঞ্জলি পেতে নেয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। দেখি, এরি মধ্যে তার মুখ থেকে উৎকণ্ঠার ছায়া সরে গেছে, বুক-ভরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে ফিরে চলে।

অবধূত আমার দিকে তাকান, বলেন, আধুনিক সাল্‌ফা-ড্রাগ-এর এই ওষুধগুলি খুব উপকার দেয়—তবে কড়া ওষুধ। এ-সব কাছে রাখতে হয়; মানুষের কাজে লাগে। এর অসুখও এতেই সারবে। পাহাড়ের গাছ-গাছড়া-শিকড়ও কিছু জানা আছে—তাতেও খুব ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এদের যাই দেওয়া যাক না কেন তাতেই ভাবে, নিশ্চয় রোগ সারবে।

আমি জানাই, আমার কাছেও কিছু ওষুধপত্র আছে। ফেরার সময় দিয়ে যাব। কাছে লাগবে।

বলেন, ভালোই তো।

দেখি, সেই যোগ-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র সন্ন্যাসী-দেহের অন্তরালে এক কল্যাণকামী দরদী হৃদয়। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রয়োজনমত সাহায্য নিতে মনের কোন সংকীর্ণতা নেই।

যে কয়দিন বদরীনাথে থাকি, তাঁর কাছে আসতে বলেন। যাই। গল্প করি। চলে আসি।

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়েছি, দেখি ঘরে নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ নজরে পড়ে, একটু নীচে অলকানন্দার বরফ-গলা জলে স্নান সেরে উঠছেন। সুমুখে এসে দাঁড়ান। সম্পূর্ণ নগ্নদেহ। দেখে মনে জাগে যেন একটি ছোট্ট ছেলে স্নান সেরে উলঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে। সারা অঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে। অথচ, শীতের অনুভূতির কোনও লক্ষণ নেই। মুখে তৃপ্তির সরল হাসি। একজন ভক্ত এসে কাপড় দিয়ে জল মুছিয়ে দেয়। শিশুর মতই আরও হাসতে থাকেন।

না মোছালে, দেহের জল নিশ্চয় দেহেই শুকাতো।

অথচ, ঘরের পাশেই প্রসিদ্ধ তপ্তকুণ্ড।

কলকাতায় ফিরে আসি। বিজয়ার পর ডাক-যোগে খামে-ভরা প্রসাদী ফুল ও সিন্দুর পাই। তার কয়েকদিন পরে তাঁর একখানা চিঠি পেলাম। শীতের সময়ও তিনি বদরীনাথে কাটাবেন। এটা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি এইভাবে সেখানে থেকে আসছেন। বদরীনাথের বহু উপরে শতোপন্থ ও স্বর্গারোহণীতে তিনি চৌদ্দবার গেছেন এবং একবার চার মাস বরফের মধ্যে সেখানে ছিলেন। তাই শীতের সময় বদরীনাথে তাঁর এবারও থাকার উদ্দেশ্য শুনে আশ্চর্য হই না। কিন্তু তিনি জানান, ইতিমধ্যে কতকগুলি বাধার সৃষ্টি হয়েছিল।

শীতকালে বদরীনাথে থাকার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ মত আছে। সাধারণ বিশ্বাস, বছরের শুধু ছয় মাসকাল নারায়ণ বদরীপুরীতে মানুষের পূজা নেন, বাকি ছয় মাস—অর্থাৎ শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ছেয়ে ফেলে—তখন সেখানে শুধু দেবতাদেরই নারায়ণের পূজার অধিকার। মন্দিরের ভোগমূর্তিটি নিয়ে পূজারী কার্তিক মাসে দীপাবলির পর যোশীমঠে নেমে আসেন—সেই-খানেই তাঁর পূজার্চনা হয় বৈশাখ মাস পর্যন্ত।

অবধূতের শীত-বাসের সংকল্পে সে বছর আপত্তিটা একটু ঘোরতর ভাবেই ওঠে। সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ও মতভেদ আছে।

অবধূত তাঁর সংকল্পের কথা চিঠিতে জানান। একদল লোকের বিরুদ্ধাচরণের বিষয়ও উল্লেখ করেন। লেখেন, তারা আদালতের সাহায্য নিয়ে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভগবানে উৎসর্গীকৃত এই শরীর এখানেই থাকবে, সব বাধা তিনিই সরিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের কথাও লেখেন। প্রয়োজন তাঁর নিজের জন্যে নয়, এক ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গে থাকবেন, তাঁর জন্যে। তাও এমন বিশেষ কিছু নয়। বৃষ্টি ও বরফের মধ্যে বাইরে যাবার সময় ব্যবহার-উপযোগী জুতা ও টুপি সমেত একটি বর্ষাতি। নিজের কথাও চিঠির শেষে একটু উল্লেখ করেন—সঙ্কুচিত ভাষায়,—যদি সহজে কখনো কোথাও পাওয়া যায়—একটি শিরসুদ্ধ পূর্ণ বাঘ-ছাল—চিতা নয়, রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

রেজেস্ট্রি ডাকে জিনিসগুলি গিয়েছিল, শুধু ব্যাঘ্র-চর্মের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। তাঁর প্রাপ্তি-স্বীকারও পেলাম। তখন ডিসেম্বরের শেষ। ইংরাজি নতুন বছরের শুভ কামনা জানিয়েছেন ইংরাজি কবিতা লিখে ঃ

Forget not the march of Time,
Forlorn in the lure of clime :
Friend or foe to thee thou art ;
Dive within and search thy heart :

Who else is there but for you
Head and tail are both untrue,
Fear not the flames of filthy senses
Fret not at the fancy glimpses.
Kill the ego, the mundane merit
Fill thyself with Divine Spirit.

তারপর লিখেছেন :

Years that have rolled on have given you an opportunity to study good and evil, to witness the pros and cons of events, major and minor, to experience pleasure and pain arising out of activities chosen purely by you through your ego, either selfishly as a man of all potence or selflessly embracing Universal Brotherhood. These locate you today, this very moment, decisively over a fulcrum leaving it all for you to sensitively balance the heavily weighing past by carefully adjusting your future. A new day is dawning fast as 1953. Let you smoothly sail towards the goal of life overcoming the surges of emotions. May you thereby enjoy peace, plenty and prosperity herein and Happiness and Bliss anon. May the Lord bless you ! OM.

১৩৫৩ সাল। সে বছরেও বদরীনাথে পেঁছে তাঁর খোঁজ নিই। দেখি অন্য আর একটি ঘরে আছেন। হঠাৎ দেখা হওয়ায় খুশী হন। আবার ক'দিন আলাপ-আলোচনায় কাটে। সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী আছেন। খাওয়ানোর আয়োজন তিনিই করেন দেখি। অবধূতের চেহারায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। মস্তক মুণ্ডন করেছেন,—কেশদামের সঙ্গে যৌবনকান্তি গেছে। কিন্তু, মুখের সেই মিষ্ট হাসি আরও মধুর হয়েছে। কথাবার্তার ফাঁকে আভাস পাই—কয়েকটি লোকের বিরুদ্ধ আচরণ দিন দিন রূঢ় হয়ে উঠছে। মৃদু হেসে বলেন, ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী সব হবে, এই শরীর শুধু তাঁরই কাজ করে যাবে।

সেই বছরে কলকাতায় ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই মেজদাদার আকস্মিক দেহাবসান হয়। সুদূর কাশ্মীরে। স্বাধীন ভারতের ভূস্বর্গ—মৃত্যুর করালছায়া নৃশংস নারকীয় রূপে দেখা দেয়। অকস্মাৎ এই অশনিপাতে ভারতবাসী বিমূঢ় বিক্ষুব্ধ হয়। দেশের বহু স্থান থেকে বহু লোকের শোকতপ্ত সান্ত্বনাবাণী আসে। হিমালয়ের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও চিঠি লেখেন : ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ মর্মন্তুদ। অতি পুণ্য দিবসে তিরোধান করায় নিজের দিক থেকে

তিনি সর্বোচ্চ লোক প্রাপ্ত হয়েছেন। তবুও, সমগ্র জাতির—বিশেষত সনাতনী হিন্দুদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব অপূরণীয় ক্ষতি এনেছে। হয়তো সময়ে সময়ে ভগবানের অভিলাষ হয় যে তাঁর নির্বাচিত বীরসন্তান ও পূজারকদের সহায়তায় বর্তমান সমাজ উন্নয়নের উপযোগী নয়। ভগবদ্ ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ উপাসনা এখানে অনুষ্ঠিত হল। ওঁ।

সে বছরও শীতকাল অবধূত বদরীনাথে কাটান।

তার কয়েক মাস পরে আবার যখন সেখানে যাই, বদরীপুরীতে প্রবেশ করেই মনে হল তাঁর কথা। আজই আবার দেখা হবে। এক বৎসর পরে।

যে ঘরটিতে থাকতেন, গেলাম। তালাবন্ধ। বাইরে গেছেন নাকি? কিন্তু, তাঁর ঘরে তো তালা লাগানো থাকত না! অন্যত্র কোথাও আছেন, ভাবি।

পরিচিত কয়েকজনের কাছে সংবাদ নিই। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছেও অনুসন্ধান করি। সকলের কাছে একই খবর পাই। অতি সঙ্গোপনে ফিস্ ফিস্ করে সকলে জানান,—তাঁর আর খবর পাবেন কি করে? তাঁর সেই সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে ও তাঁকে—দুজনকেই যে হত্যা করেছে!

হত্যা! শুনে চমকে উঠি। সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা! হিমালয়-তীর্থে। কে করলে, কে? কেনই বা করলে?

কিন্তু, প্রশ্নের সঠিক উত্তর আসে না। সন্দেহের আকারে শুধু সংকেত পাই। তাঁর বিরুদ্ধ দলের কাউকে ইঙ্গিত করে বলে, ওদেরই কারো প্ররোচনায় সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে।

আবার দু-একজন বলে, অপর আর এক সাধুরই এই অপকীর্তি। সেই যে নদীর ওপারে এক গুম্ফায় থাকতেন। দেখেছেন সম্ভবত তাঁকে। তাঁর খুব আক্রোশ ছিল এঁর ওপর। শেষ করে দিয়ে চলে গেছেন কৈলাসে!

স্তম্ভিত হয়ে শুনি।

যদিও সাধুর বিরুদ্ধে সাধুর হিংসার কাহিনী এই নতুন শুনি না।

কিছুকাল আগে রমণ মহর্ষির এক জীবনীতেও পড়েছিলাম। তিনি যখন গৃহত্যাগ করে প্রথম অরুণাচলে আসেন তখন তাঁর অল্প বয়স—বালক মাত্র। পাহাড়ের কিছু উপরে এক গুহায় আশ্রয় নেন। এক বৃদ্ধ সাধু বহুদিন থেকে সেই গুহার কাছে থাকতেন। তাঁর দর্শন পেতে নিকটস্থ গ্রামবাসীরা প্রায়ই আসত, বড় সাধু বলে শ্রদ্ধাও করত। বালক-সাধু রমণের আসার পর গ্রামবাসীরা তাঁর দিব্য রূপে ও মধুর আচরণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁবই কাছে বেশী যেতে শুরু করে। অবহেলিত বৃদ্ধ সাধুটি ক্রুদ্ধ হয়ে পাহাড়ের আরও উপরে আর এক গুহায় উঠে যান। এর পর এক-একদিন উপর থেকে বড় পাথর এসে পাহাড়ের নীচের দিকে রমণ ঋষির কাছে হঠাৎ পড়তে থাকে। ভাগ্যক্রমে কোন পাথরই তাঁকে আঘাত

করে না। তাঁর প্রথমে আশংকা হয়—প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগবশতঃই হয়তো এমন ঘটছে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ কিছুদিন পরে ধরা পড়ে। একদিন তিনি নিজেই দেখতে পান—এ সবই সেই বৃদ্ধ সাধুটিরই কীর্তি, উপর থেকে ঠেলে ঠেলে পাথর গড়িয়ে ফেলছেন, তাঁকে উদ্দেশ করে।

সাধুর বিরুদ্ধে সাধুর হিংসা!

আমার সংবাদদাতাদের জিজ্ঞাসা করি, কোন প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে?

উত্তর পাই, শীতকালের পরও লোকে তাঁদের দেখেছে। তার পরের ঘটনা কারো দেখা থাকলেও সহজে স্বীকার করবে কেন? প্রমাণ আর কি থাকবে? থাকার মধ্যে তো শরীর দুখানি? ভারী পাথর বেঁধে ঐ অলকানন্দায় ছেড়ে দিলেই—সলিল সমাধি! সাধু-দেহের যা সাধারণ অন্ত্যেষ্টি। তারপর সব নিশ্চিহ্ন! আর অনুসন্ধান করছেই বা কে? হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চল। সর্বত্যাগী নাগা সন্ন্যাসী। নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবন। এখানে ছিলেন, লোকে দেখতে পেত। এখন নেই, কেউ তাঁর খবরও নেয় না। শুধু ডাকঘরের একটা খোপের মধ্যে জমে আছে তাঁর নামে আসা অনেকগুলি চিঠি, কাগজপত্র। তার উপর ধুলো জমেছে, মাকড়সায় জাল বুনছে।

ভাবি, সর্বত্যাগী শিক্ষিত সন্ন্যাসীরও অবশেষে এই পরিণতি।

অলকানন্দার কূলে গিয়ে বসি।

মনের কোথায় যেন সূচ বেঁধে।

তাকিয়ে দেখি, নদীর কিন্তু সেই একই রূপ। সহস্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলে তেমনি ছুটে চলেছে। দলে দলে পুণ্যলোভী যাত্রী আসে জলস্পর্শ করতে। সাধু সন্ত আসেন অবগাহন স্নানে। স্নান শেষে কমণ্ডলু ভরে জল নেন। কে ভাবতে পারে, ঐ জলধারার অন্তরালে এক নিহত সন্ন্যাসীর রক্তাক্ত দেহের অংশাবশিষ্ট হয়তো এখনও পড়ে আছে। জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকমিক করে, অবধূতের মুখের সেই সরল হাসি মনে পড়ে।

মানুষের কৃত পাপ কর্ম! আবার মানুষের গড়া দেবতা। পাপ স্খালনের ভার দেয় মানুষ সেই দেবতারই উপর। তাই তো দেখি—গরল পানে নীলকণ্ঠ ঐ তুষারধবল গিরিশিখর! আবার তারই পাদমূলে কলুষহারিণী গঙ্গা—অলকানন্দা!

কিন্তু তখনি কবির সেই প্রশ্ন জাগে:

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

মনে শান্ত হবার চেষ্টা করি।

ভাবি, অবধূত ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলতেন। তিনি তাঁর দেহের এই পরিসমাপ্তি জানতেন? জানা থাকলে—এখান থেকে চলে গেলেন না কেন? হয়ত তাহলে এই বিকৃত পরিণতি ঘটত না। অথবা—এ শুধু তাঁর আত্মবলি?

এই সূত্রে মনে পড়ে আর একটি ঘটনা। ভাগ্যবিড়ম্বনার এক করুণ কাহিনী।

এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিবাহ দেবেন। বহু অনুসন্ধান করে সুপাত্র পেলেন। কিন্তু, তাঁর এক বন্ধু কোষ্ঠী বিচার করে বললেন, এ-বিবাহের এক বছরের মধ্যেই বৈধব্যযোগ আছে, তাই চলবে না।

কন্যার পিতা পাত্রটিকে হাতছাড়া করতে চান না, অথচ কোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহসও হয় না। তাই, বন্ধুকে নিয়ে কাশীধামে গেলেন। সেখানে তাঁর বন্ধুর গুরুদেব থাকেন, বিচক্ষণ কোষ্ঠী-বিচারক, তিনি যদি এ-বিবাহে সম্মতি দেন। গুরুদেব বিচার করে দেখে বিবাহ হবে বলে দিলেন। কন্যার পিতা আনন্দে উৎফুল্ল।

বন্ধু তখন সঙ্গোপনে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার গণনায় কোথায় ভুল হয়েছিল বলুন, আপনারই শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করেছিলাম বলেই তো আমার বিশ্বাস।

গুরুদেব বললেন, তোমার বিচারে ভুল হয় নি। ঠিকই বলেছিলে—এ বিবাহে এক বছরের মধ্যে বৈধব্যযোগ আছে। কিন্তু এও কি দেখ নি যে, এদের এই বিবাহ কোনমতে খণ্ডন করার উপায় নেই? এ বিবাহ হবেই, বৈধব্যও ঘটবেই।

শেষ পর্যন্ত, সেই মত ঘটেও ছিল!

ভাবি, অবধূত কি তাই জানতেন? কে জানে?

॥ ১১ ॥

শুধু বদরীনাথে আসায় আর মন ভরে না।

তাই সেবার এলাম শতোপন্থ যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বদরীনাথ ছাড়িয়ে হিমালয়ের আরও উপরে ও নিভৃত অন্দরে যেতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে যাবার একমাত্র সময়। তখন সেখানকার বরফ অনেকখানি গলে যায়, যাতায়াতও সম্ভব হয়।

১৯৫৫ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। ৮ই রাত্রে কলকাতা ছেড়েছি। ১৪ই সকালে বদরীনাথে পৌঁছেছি। ছয়দিনও পুরো লাগে নি। পিপলকুঠি পর্যন্ত বাস্ পেয়েছি। যোশীমঠ পর্যন্ত বাস্ এলে আরও একদিন কমে যাবে। এ-যুগে বদরীনাথ কত নিকটে হয়ে গেছে। ভৌগোলিক দূরত্বের বিচ্ছিন্নতা পৃথিবীর সর্বত্রই মুছে যাচ্ছে।

এ সময়ে যাত্রীর মোটেই ভিড় নেই। হনুমান চটী থেকে এখানে আসার পথে দু-জন মাত্র যাত্রীকে দেখেছি। মে-জুন মাস হলে দিনে হাজারখানেক যাত্রী যায়-ই।

যাত্রার চিরাচরিত নিয়ম, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন, তারপর বদরীনাথ। এবার কিন্তু সোজা চলে এসেছি বদরীনাথে। কেননা, প্রথমেই যেতে হবে শতোপন্থ। শতোপন্থ অর্থাৎ সত্যপদ।

শুনি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথ। কেউ দেখান বদরীনাথের উপর দিয়ে, কেউ বা দেখান কেদারনাথের মন্দিরের পিছনের বরফের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। বরফের উপর দিয়ে এই দুই মন্দিরের ব্যবধান খুব বেশী নয় —শোনা যায়, ক্রোশ তিনেক মাত্র ছিল। প্রবাদ, পুরাকালে একই পূজারী দুই মন্দিরে নিত্য সেবাপূজা করতেন। একদিন তিনি এক মন্দিরের পূজা শেষ করে আর এক মন্দিরে যাওয়ার পথে পূজার নৈবেদ্যের অংশ আহার করেন। এই দুষ্কৃতির ফলে এই মন্দিরের মধ্যে বিরাট তুষারপ্রাচীর মাথা তোলে—সেই সহজ যাতায়াতের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়।

অপর আর এক প্রবাদও আছে: সেই পূজারী প্রতিদিন দুই মন্দিরের পূজা শেষ করে গৃহে ফিরে নিত্য স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করতেন, তাঁকে প্রহারও করতেন। পূজারীর অভিযোগ ছিল, 'আমি দু'পাহাড়ে পূজা শেষ করে এলাম, তবু তোমার গৃহকর্ম শেষ হয় না!'—ব্রাহ্মণী বুদ্ধিমতী। দুই দেবতার কাছে প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা শুরু করেন, 'তোমাদেরই পূজার পূজারী আমার প্রাণ নাশ করছে। আমার মরণে স্ত্রীহত্যার ভাগী তোমাদেরই হতে হবে!'—অবশেষে হর হরি বিচলিত হলেন, বর দিলেন। একদিনে দুই মন্দিরে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে এক অত্যুচ্চ তুষারপর্বত উঠল।

মহাপ্রস্থানের পথও তাই দুই দিকের যেদিক দিয়েই যাক না কেন, পর্বতের একই অঞ্চলে গিয়ে মিশেছে। শুধু শুরু নিয়েই মতভেদ,—পথের শেষ নিয়ে নয়। বদরীনাথের চিরতুষারময় বিরাট গিরিশৃঙ্গগুলির জটাজালে সেই মহাপ্রস্থানের পথ লুপ্ত হয়েছে; মানচিত্রে এই শিখরগুলিকে চৌখাম্বা বলে অভিহিত করা হয়। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২৩,৪২০ ফুট। পর্বতের সেই শিখরদেশে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেখানে ওঠার আমার সামর্থ্য নেই, শিক্ষাও নেই—তাই সাহসও নেই। বই-এ পড়েছি, অভিযাত্রীদের কেউ কেউ ঐ শিখরগুলি আরোহণ করেছেন। মহাপ্রস্থানের পথের শেষ সীমা ঐ তুষারশৃঙ্গগুলিরই মধ্যে একটি বিশেষ অংশকে লক্ষ্য করে দেখানো হয়—ঐ স্বর্গারোহণী!

বরফের পাহাড়ের সেই অংশটির অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে। তারই দর্শন-লাভের আমাদের আকাঙ্ক্ষা। স্বর্গারোহণীর কিছু আগে একটি হ্রদ আছে—শতোপন্থ তাল। তুষার-ধবল গিরিশিখরগুলির পাদদেশে বিচিত্র সৌন্দর্যময় বারিরাশি। সেই হ্রদের তীরে কয় রাত্রি কাটানোরও ইচ্ছা আছে।

বদরীনাথে পৌঁছুতেই মন্দির-কমিটির সেক্রেটারী এসে জানালেন, যাবার সব আয়োজন তিনি করে রেখেছেন।

একটা দিন এখানে বিশ্রাম করে ১৬ই রওনা হব ঠিক হল। জিনিসপত্র এর মধ্যে গুছিয়ে নিতে হবে। যে সব বস্তুর এ পথে একান্ত দরকার—শুধু তাই সঙ্গে যাবে। বাকি বদরীনাথেই পড়ে থাকবে।

এসব পাহাড়-পথে লোমশ ঋষির উপদেশ এখনও মেনে চলতে হয়। পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় যাচ্ছেন। মহাভারতের বনপর্বে তার বর্ণনা আছে। লোমশ ঋষি এলেন—পথ-প্রদর্শক হয়ে সঙ্গে যাবেন। জিনিসপত্র, সাজ-সরঞ্জামের বহর দেখে ঋষিবর বিস্মিত হন। উপদেশ দেন,—'লঘুর্ভব মহারাজ লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি।'

যাত্রা-পথে সেই 'লঘুর্ভব' উপদেশ আজও মেনে চলতে হয়।

ট্রেন ও প্লেন যাত্রায়ও আধুনিক যুগে সেই Travel light'-এরই বিজ্ঞপ্তি।

কলকাতা থেকে এসেছি আমরা দুজন। শিশিরবাবু এবারও এসেছেন। বয়স তখন তাঁর ষাট হয়েছে। তবুও মনের উৎসাহে ও দেহের সামর্থ্যে কোথাও ভাটা লাগে নি। তিনি সঙ্গে থাকলে অনেক দুশ্চিন্তার ভার সহজেই নেমে যায়। দুর্গম পথের বহুবিধ কষ্ট ও অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নেন্। এ-পথে তাঁকে দেখলে সেই বনপর্বের কথাই আমার মনে পড়ে। হিমালয়ে দুর্গম তীর্থযাত্রার জন্যে পাণ্ডবরা প্রস্তুত হচ্ছেন। অনেকে সঙ্গী হয়ে যাবার জন্যে এসেছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁদের ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করে বলছেন, যাঁরা ক্ষুধা, পিপাসা, পথের পরিশ্রম, গ্রীষ্মের প্রখরতা, শীতের কষ্ট সহ্য করতে না পারেন, তাঁরা সকলেই নিবৃত্ত হোন।

ভোজনপ্রিয় ব্যক্তিদেরও তিনি নিবারণ করে বলেন, যে সব ব্রাহ্মণ কেবল সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করেন, যাঁরা পক্বান্ন লেহ্য পেয় ও মাংস ইত্যাদি বিবিধ বস্তু ভক্ষণ করে থাকেন, তাঁরাও সকলে ফিরে যান।

তে সর্বে বিনিবর্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ
পক্বান্নলেহ্যপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥

মহাভারতীয় যুগের কথা। তবু এখনও তেমনি প্রযোজ্য।

সেই চিরকালীন বিচার-মতে শিশিরবাবু এ-পথে আদর্শ সঙ্গী। ভোজনের বা শয্যার কোন বিলাস নেই। কম্বল পেতে আর একটা কম্বল গায়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুতে পারেন। বালিশেরও প্রয়োজন হয় না। শুলেই চোখ বোজেন। চোখ বুজলেই ঘুম আসে। তাঁর শুধু শীতের আতঙ্ক। একটু শীত বেশী হলেই গরম পুরো-হাতা সোয়েটার গায়ে, গরম মোজা পায়ে, 'মাঙ্কি ক্যাপ' মাথায়—কম্বল টেনে মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শোবেন। একটু পরেই ফুস্‌ফুস্,—ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ! খাওয়া-দাওয়া রুচি সম্পর্কেও নির্বিকার। কিছু খেতে পেলেই হল,—রান্না যেমনই হোক। বলেন, এ-পথে এসে অনেকে অভিযোগ করেন, আলু ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না—ক'দিনেই খাওয়ায় অরুচি আসে; আমার তো কিন্তু দিন দিন খিদে বেড়েই চলেছে। বাড়িতে খাই দু'খানা রুটি, এখানে পাঁচ-ছ'খানাও চলছে। শরীর মুটিয়েছে, নয়? দেখুন তো? মুখটাও তো আরশিতে দেখছি, বেশ ভারি ঠেকছে।

আমি হেসে বলি, তা দেখাবে না? বোধ হয় এক সপ্তাহ পরে দাড়ি কামাতে বসেছেন? কলকাতা ছাড়ার পর নিশ্চয় কামান নি?

তিনি বলেন, ঐখানেই আপনার সঙ্গে তাল রাখতে পারি না। রোজই বসে যান দাড়ি কামাতে।

আমি বলি, ওটা স্বভাব হয়ে গেছে। কামাতে কষ্ট হয় না—কতটুকুই বা সময় লাগে। অথচ নিয়মমত কামালে মন কেমন প্রফুল্ল থাকে দেখি। ঠিক যেমন একটা করণীয় কর্তব্য পালন করে মনের তৃপ্তি আসে। আবার হয়তো না-কামানো অভ্যেস করলে কামাতে ভালো লাগবে না। ভালো কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, কামানোর সরঞ্জাম এখানেই রেখে দিয়ে যাই। শতোপন্থে ক'দিন দাড়ির ছুটি দেওয়া যাক। ভারও তো কিছু কমবে।

শিশিরবাবু তখনি বলেন, খুব ভালো প্রস্তাব। ও-পথে যা দারুণ শীতের কথা শোনা যাচ্ছে! না কামানো দাড়িতে খানিকটা কম্ফার্টারের কমফর্ট দেবে। কিন্তু এখান থেকে ক'মাইল যেতে হবে খোঁজ নিলেন?

জিনিসপত্রের গোছগাছ করা, কেনাকাটা, বাঁধাবাঁধি—এ-সব শিশিরবাবু থাকলে তাঁরই কাজ। পথঘাট সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া, কতদূর যাওয়া যাবে, কোথায় থাকা হবে—সে-সব ভার আমার উপর।

তাই বলি, আপনি তো জানেন, পাহাড়ের অনেক জায়গা আছে যেখানে মাইল দিয়ে দূরত্ব মাপা বা বোঝা যায় না। সময় দিয়ে মাপতে হয়—অর্থাৎ যেতে কতক্ষণ লাগে। এখানেও তাই। শুনেছি, পথ নেই। যেখান দিয়ে যাওয়া যাবে, সেইটেই পথ। কেউ বলে, এখান থেকে সাড়ে পনেরো মাইল, কেউ বলে তার কম, আবার কেউ বলে তারও বেশী। যার যেমন মনে লেগেছে। সময়ও লাগে যাত্রীর সামর্থ্যের উপর। একটু বেশী কষ্ট করলে দ্বিতীয় দিনেই ওখানে পৌঁছানো সম্ভব। আমরা কিন্তু যাব ধীরেসুস্থে—তিন দিনে। আমাদের হাতে সময়ের যখন টানাটানি নেই, তাড়াতাড়ি করারও কোন সার্থকতা নেই।

সেক্রেটারী আসেন। বলেন, আপনাদের সঙ্গে মাল নিয়ে যেসব লোক যাবে, এসে গেছে। এরা সবাই মানা গ্রামে থাকে। শতোপন্থ অঞ্চল এদের জানাশুনা। অত উঁচুতে গাড়োয়ালী বা নেপালী সাধারণ কুলীরা ভার বইতে পারে না। কাল কখন যাত্রা করবেন, বলে দিন।

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে যাত্রা শুরু হবে, ঠিক হয়। তার আগে ওরা এসে মালপত্র ওদের সুবিধামত বেঁধে নেবে। কি কি জিনিস সঙ্গে যাবে এবং তার ওজনই বা কত হবে, তখনি দেখে একটা ধারণা করে নেয়।

মালপত্র বইবার জন্য চারজন লাগবে। একজন তো শুধু খাদ্যের বোঝাই বইবে। সেই সঙ্গে আধ মণ কাঠকয়লা নেবে,—কেননা, সব জায়গায় জ্বালানী কাঠ পাওয়া সম্ভব হবে না। স্টোভ নিলে রান্নার কাজ চলবে বটে, তবে পথে

তেল পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, স্টোভে তো আর আগুন পোয়ানো যাবে না। মাল বইবার জন্যে প্রতিজনে নেবে দৈনিক চার টাকা করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের।

লোকগুলির নাম জিজ্ঞেস করি।

ওদের দলপতি যে তার চেহারা দেখে মনে হয়, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হয়েছে। নাম—উদয় সিং। বাকি তিনজনের যুবা-বয়স। একজনের নাম রতন সিং, আর একজনের পান সিং। অপরটির নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না। শিশিরবাবু বলেন, বোধ হয় কথা বুঝতে পারছে না।

তার সঙ্গীরা তাকে বুঝিয়ে বলে।

সে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, আমার নামটা মনে করতে পারছি না কোনমতে। ভুলে গেছি। ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে। সবাই হেসে ওঠে। আমরা আশ্চর্য হই। মানুষ নিজের নাম ভুলে যায়। তার সঙ্গীরা বলে, ও ঐরকমই, কেমন ভোলা মন।

সেক্রেটারী জানান, মন্দিরের একজন চাপরাসীকেও সঙ্গে দিচ্ছি। করিৎকর্মা লোক। রাঁধতেও জানে। খুব হুঁশিয়ারও আছে। গত বছর ওখানে গিয়েছিল। আপনাদের খাবার তৈরি করবে। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। দুর্গম পথ। কোথায় কখন কি বিপদ আসে বলা যায় না। দু-একজন লোক বেশী থাকা ভালো। বিদ্যাদত্ত।—বলে ডাক দেন।

দরজার বাইরে জুতো খুলে রেখে, লম্বা ফর্সা এক গাড়োয়ালী সুমুখে এসে দাঁড়ায়। পরনে লম্বা কালো কোট। মাথায় কালো গোল টুপি। বুকের উপর মন্দির-কমিটির চাপরাস। সবল দেহ। দেখলেই মনে হয় নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

সেক্রেটারীকে বলি, ভালোই হয়েছে। খুচরা জিনিসের ছোট থলিটা ওর কাছে দেব, ক্যামেরা ও জলেব ফ্ল্যাস্কও ওই নেবে। সব সময়ে পথে আমাদের কাছে কাছে থাকবে।

দুপুরে বিদ্যা এসে দেখেশুনে মালপত্র গুছিয়ে নেয়। সেক্রেটারীও আসেন।

কলকাতা থেকে একটা ছোট তাঁবু এনেছি। Himalayan Club এর সম্পত্তি। সভ্য হিসাবে ভাড়া পেয়েছি। চমৎকার জিনিসটি। প্লাসটিক-এর তৈরি। উপরটা গেরুয়া রঙ্। বরফের রাজ্যে শীত ও বাতাস দুই আটকায়। সবসমেত ওজন মাত্র সের চার-পাঁচ। বাঁধা থাকলে তাঁবু বলে বোঝাই যায় না। মনে হয়, যেন একটা হ্যাণ্ডব্যাগ। দুজন থাকার পক্ষে যথেষ্ট। এ-পথে তাঁবু না আনলে গুহায় রাত্রিবাস করতে হয়। সঙ্গের অন্য সকলে তাই করবে।

বিছানার মধ্যে আছে খান দুই করে কম্বল। সেক্রেটারী তাঁদের মোটা ভুটিয়া কম্বল আরও দুখানা দিয়েছেন। বলেন, আপনাদের ওসব ভালো কম্বলের চেয়েও

এ জিনিস কাজ দেবে অনেক বেশী। যেখানকার যা। দেখবেন সেখানকার শীতের কাঁপ্‌নি। তার ওপরে যদি মেঘ করে বরফ পড়ে যায় তো কথাই নেই।

আহার্যের মধ্যে সঙ্গে চলেছে,—সকলের জন্যে আধ মণ আটা, দশ সের আলু, ঘি, লবণ, গুঁড়া মশলা।

চাল, ডাল নিয়ে লাভ নেই,—সেখানকার জলে সিদ্ধ হতে চায় না।

বিদ্যা সাবধানী লোক। বলে, আমাদের এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম হলেও আরও দু-তিন দিনের রসদ বেশী নিয়ে যেতে হবে। ওসব জায়গায় কখন কোথায় কি ঘটে বলা যায় না। যদি কোথাও আটকে যাই—দু-একদিন বেশী থাকতে হয়। তখন তো আর কোন জিনিস পাবার উপায় থাকবে না।

সেই মত ব্যবস্থাও হয়।

চা, চিনি ও গুঁড়া দুধও নেওয়া হয়েছে। বিদ্যা বলে, এটেই একটু বেশী করেই লাগবে। সকলেই হরদম খাবে। সঙ্গের সকলকেই তো দিতে হবে। ও-পথে এইটেই সবচেয়ে দরকার। শরীর গরম রাখবে, মেজাজও ঠাণ্ডা রাখবে।

পাণ্ডাজী এসে বলেন, দোকানে অর্ডার দিয়েছি—মুগের লাড়ু ও 'নিমকিন্' করে দেবে। চা-এর সঙ্গে মুখরোচক হবে। নইলে শুধু আলু ও রুটি খেয়ে অরুচি লাগবে। বেশ ভালো করে বন্ধ করে রাখবেন। ক'দিন থাকবেও ভালো—আর তাছাড়া, মানে কিনা—বলে চোখ ঘুরিয়ে অনুপস্থিত মানা-বাসীদের উদ্দেশ করেই বলেন—মানে, আরও সব থাকবে তো—একটু সাবধানে রাখাই ভালো।

তাঁর এই অহেতুক কটাক্ষ আমার ভালো লাগে না।

শিশিরবাবুর হঠাৎ কি মনে হয়। তাঁর ঝোলা থেকে দুটো কোটো বার করেন। জিজ্ঞাসা করি, ওতে কি?

বলেন, আসার সময় বাড়ি থেকে যে নিমকি ও মিষ্টি গজা তৈরি করে দিয়েছিল, মনেই ছিল না। এগুলোও নেওয়া যাক। এখানকার পাহাড়ী নিমকিন্ কেমন হবে কে জানে। আমার তো আবার পরের দাঁত। সে-সব চিবোতে পারলে হয়।

আমি বলি, সঙ্গে রাখুন। লোক তো কম যাচ্ছি না—সকলে মিলেই সব কিছু খেতে হবে। কাজে দেবে নিশ্চয়।

এ-ছাড়া বিস্কুটও কিছু সঙ্গে আছে।

ওষুধপত্র সামান্য নেওয়া হয়েছে—পেটের অসুখের ও ঠাণ্ডা-লাগার ভয়ে। আস্‌প্রোর ট্যাবলেট্‌ও আছে। একটু টিন্‌চার আইওডিন, তুলা ইত্যাদিও আছে। আসার সময় কলকাতা থেকে এক ডাক্তার বন্ধু Cardiazol একশিশি দিয়েছিলেন, পাহাড়ের অত উঁচুতে—বরফের মধ্যে যদি প্রয়োজন হয়। সেটাও সঙ্গে রাখি।

সেক্রেটারী বিদ্যাকে বলেন, দমন-পত্র কিছু নিয়ে রেখো।

শিশিরবাবু বলেন, দমন-পত্র। সে-বস্তুটা আবার কি? কাকে দমন করার চিঠি?

সেক্রেটারী জানান, নারায়ণের গলায় তুলসী-পাতার মত সবুজ পাতার মালা দেখে থাকবেন,—সেই মালা। এইসব অঞ্চলেই ঐ গাছ হয়। দুর্গম বা পাহাড়ের অনেক উপরে সূক্ষ্ম আবহাওয়ার (rarefied air) জন্যে নিশ্বাসের কষ্ট বোধ হলে—এতে খুব কাজ দেয়। জামার পকেটে রাখবেন, দরকার হলে মাঝে মাঝে হাতের আঙুলে টিপে ঘষে শুঁকলেই কষ্ট কমে যাবে। গন্ধটিও ভালো। সাধু-সন্ন্যাসীরা খুব ব্যবহার করেন।

গরম জামা-কাপড় যা কিছু সঙ্গে এসেছে, সবই চলেছে। এই পথের জন্যেই তো আনা। নইলে শুধু কেদার-বদরীর পথে ক'দিন ও কতটুকু বা গরম জামার দরকার হয়।

শিশিরবাবুকে বলি, আপনার কান-ঢাকা টুপিটা নিয়েছেন তো?

তিনি হেসে উত্তর দেন, এইখান থেকেই সেটা মাথায় লাগাব, সাতদিন পরে আবার এইখানে এসে খুলব।

বলি, মাথায় যে ক'গাছা চুল আছে, তার সঙ্গে বুনে নিন্। পথে যদি খুলে পড়ে যায়—টের না পান—তখন রিসার্চ চলবে—এটা স্নো-ম্যান্-এর মাথার খুলি কিনা।

হাস্য-পরিহাস ও আনন্দের মধ্যে আমাদের যাত্রার আয়োজন চলতে থাকে।

ঘরে প্রবেশ করেন হিমালয়বাসী পূর্ব-পরিচিত এক বৃদ্ধ সাধু। আমাদের যাবার উৎসাহ দেখে বলেন, তাই তো, আপনারা এ-পথে যাবার চেষ্টা করছেন। এ-সব গৃহীদের পথ নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরাই যেতে সাহস পান না অনেক সময়। আপনাদের একটু দুঃসাহসিকতা হচ্ছে। ভেবে দেখুন ভালো করে, যাবেন কিনা।

আমি নজির দেখিয়ে বলি, কেন? এর আগেও তো কত লোক ঘুরে এসেছেন। আর যেতে যদি আমরা নাই পারি, ফিরে আসব।

তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, ফিরে আসা কি সহজ?

আমি হেসে বলি, যাক্, তাহলে যাওয়াটা শক্ত নয়, ফেরাটাই শক্ত!

তিনি বলেন, না না, এ-সব পথ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা নয়। বড় কঠিন যাত্রা। মহাপ্রস্থানের পথ—শুধু ধর্মরাজই একমাত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিলেন।

তারপর, তাঁর কাছে গল্প শুনি, এই দুরূহ পথের নানাবিধ ভয়াবহ কাহিনী। মৃত্যুর ছায়া-মলিন। তাঁর নিজেরও সেই শতোপন্থ-তালের তীরে কাটানো দিনগুলির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একদল সাধুর বরফের মধ্যে জীবন্ত সমাধি-প্রাপ্তি। পরের বছর নাকি তাঁদের মৃতদেহগুলির উদ্ধার হয়। সারা বছর বরফে চাপা থাকায় তাঁদের ভোজন-সামগ্রী বা কোন কিছুই নষ্ট হয় নি, দেহগুলির কোন বিকৃতি ঘটে নি—শুধু প্রাণটুকু গেছে।

কোন্ এক ইউ-পি প্রদেশবাসীর সস্ত্রীক ঐ পথে যাওয়ার গল্প শুনি। স্বামীজী

বলেন, তাঁকে অনেক করে নিষেধ করেছিলাম—বিশেষতঃ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু কোনমতেই শুনলেন না, বলেন, সস্ত্রীক না গেলে পুণ্যলাভের অঙ্গহানি হবে।—মরণ টানছিল মশাই, মরণ। গেলেন জোর করে, তারপর মাঝপথে অতি দুর্গম এক জায়গায়—সেখানটায় শিরদাঁড়া পথ—যেতে পারেন তো দেখবেন, কি ভীষণ!—সে মহিলাটি ওপর থেকে পড়ে গেলেন—মৃত্যুও নিশ্চয় তখনি ঘটেছে। কিন্তু স্বামী নাকি অপেক্ষাও করেন নি, ফিরে তাকিয়েও দেখেন নি। তীর্থ সাঙ্গ করে একাই ঘুরে এলেন।

শিশিরবাবু গম্ভীর মুখে বলেন, যুধিষ্ঠিরও তো ঐ ধরনের আচরণ করে চলে গিয়েছিলেন? কিন্তু এ-ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল নাকি?

স্বামীজী বলেন, ওসব কথা রাখুন। এ-যাত্রা বড় ভীষণ পথে, মশাই। আপনারা যাবেন কিনা ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখুন।

আমি বলি, যাত্রাটা তো কাল করি। তারপর পথের কথা পথেই দেখা যাবে। তবে আশীর্বাদটা করবেন যেন যাত্রা সার্থক হয়।

আরো কত গল্পই না শুনি এই পথের।

সকলেই বলেন, অতি দুর্গম পথ। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যময় পরিবেষ্টন—এও সকলে স্বীকার করেন।

হিমশিখরগুলির জটাজাল বিস্তার করে ঐখানেই তো সত্যকার হিমালয়। দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসভূমি। তাই তো শুনি, ঐ পথে জড়দেহের অবসান সাধুসন্তরা একান্তভাবে কামনা করতেন। কেদারনাথের পিছনে বরফের পাহাড়ে অংশবিশেষে উঠে তাঁরা উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই মরণে নাকি অশেষ পুণ্য। এখন এইভাবে মৃত্যুবরণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

এই পথে যাওয়ার অধিকার-ভেদেরও কথা শুনি। পূর্বে সকলের যাওয়ার নিষেধ ছিল।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ১২৫৯ সালের মাঘ মাস থেকে ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ভারতের বহু তীর্থ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। তাঁর সেই ভ্রমণের রোজনামচা 'তীর্থভ্রমণ' নামে বই-আকারে পরে প্রকাশিত হয়। তিনি উত্তরাখণ্ডেও গিয়েছিলেন। একশো বছরেরও উপরের কথা। এই মহাপ্রস্থানের পথে তিনি নিজে না গেলেও এই পথের যাত্রী হবার অধিকার কাদের আছে সে সম্বন্ধে লিখেছিলেন। টেহেরীর রাজার কাছ থেকে তখন অনুমতি নিতে হত। অনুমতি দেওয়ার আগে যাত্রীর শক্তি-পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম ছিল। সেই পরীক্ষার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এই বলে:

"যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি অন্য অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া গোগ্রাসে ভোজন, তদনন্তরে আপন পদে বিক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন, তদনন্তরে রাজার নিকট মহাপন্থাগমনের আবেদন করিতে

হয়। রাজা শ্রুত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে রাজভবনে রাখিয়া, উত্তম উত্তম মেওয়াদি তেজস্কর দ্রব্য, দুগ্ধ (ও) ঘৃত প্রচুররূপে আহার করাইয়া, উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া, উত্তম রূপসী যুবতীগণকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া, দুই-তিন মাস একত্রে বাস করাতে যদি কিছু বিকার জন্মে তবে তাহাকে পুনর্বার পায়ের ঝিকে পাকস্থলি বসাইয়া চরু পাক করিয়া আহার করিতে পারিলে, সেই ব্যক্তিকে মহাপন্থা গমনের অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি এই স্থলে আসিয়া উলঙ্গ হইয়া সকল ত্যাগ করিয়া মহাপন্থাতে গমন করে, এক ক্রোশ পর্যন্ত তাহাকে দেখিতে পায়, তৎপরে কোথা যায়, কি হয়, কেহ দেখিতে পায় না।''

ভাবি, এখন সেই টেহেরী-রাজাও নেই, রাজাও নেই, সে-সব পরীক্ষাও নেই। কালের গতিতে এ-সব-কিছুরই প্রয়োজনীয়তা মুছে গেছে। সেকালে লোকে বদরিকাশ্রমে আসত প্রাণ হাতে নিয়ে,—বিলেতের জাহাজেও যেমন চড়ত উইল করে! অজানা দীর্ঘ দুর্গম পথের বিপদের আশংকায় প্রিয়জনের চোখে অশ্রু ঝরত। যাত্রীও কাঁদত। আর এখন যাত্রী আসে হাসিমুখে—মন্দিরের মাত্র কয় মাইল দূরে মোটর চড়ে।

কিন্তু সেই সনাতন সত্যপদের পথ এখনও কি তাই আছে?

'জয় রাম শ্রীরাম! জয় জয় রাম—জয় সীতারাম!'

আরে! এই যে বৈরাগীজি এসে গেছেন। প্রতি বছরই বদরিনাথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।

সেই মুখভরা হাসি। মাথাভরা জটা। আলিঙ্গন করে বসাই।

বলেন, এইমাত্র খবর পেলাম—আপনারা কাল এসে গেছেন। যাত্রা করছেন কবে?

বলি, কাল রওনা হব। সব গোছগাছ আজ হয়ে গেল।

বলেন, ভালোই। দর্শন করে আসুন। খুব আনন্দ পাবেন। দেখবেন কি অপূর্ব স্থান। যেমন প্রাকৃতিক শোভা, তেমনি বিচিত্র অনুভূতি। ওঃ! —বলে চোখ বোজেন। মুখ গম্ভীর হয়। ভ্রূযুগল কাঁপতে থাকে। যেন কল্পনার রথে চড়ে আবার সেখানে বিচরণ করেন।

জিজ্ঞাসা করি, আপনি গিয়েছিলেন কোন্ বছর?

বলেন, এই তো দু'বছর হল। ভাবি আবার কবে যাব।

বলি, চলুন না। যাবেন আমাদের সঙ্গে?

শুনে উৎসাহিত হন। কিন্তু তখনই সংযত হয়ে বলেন, যাওয়ার অন্য কোন বাধা নেই। আপনাদের যদি অসুবিধা হয়?

শিশিরবাবু উৎফুল্ল হয়ে বলেন, আমাদের আবার অসুবিধে কি? চলুন সঙ্গে। খুব ভালোই লাগবে।

সেইমতই স্থির হয়।

ঘণ্টাখানেক পরে বৈরাগী গম্ভীর মুখে ফিরে আসেন। বলেন, কাল তো

আপনাদের যাওয়া চলবে না। দুদিন পরে বেরুতে হবে।

আশ্চর্য হই। জিজ্ঞাসা করি, কেন, কি হয়েছে?

তিনি বলেন, এইমাত্র ওপরে গিয়েছিলাম। স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, কাল-পরশু দু-দিনই অযাত্রা। তাই তার পর যাওয়াই প্রশস্ত।

আমরা রাজী হই না। বলি, যাওয়ার আয়োজন সব হয়ে গেছে। মানাগ্রাম থেকে সে-লোকগুলিও কাল তৈরি হয়ে আসবে—এখন এ অবস্থায় আর দিন পেছুনো চলে না।

তিনি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, আপনারা বুঝি পাঁজিটাজি এসব মানেন না? তীর্থযাত্রায় এসব মেনে চলতে হয়।

আমি হেসে বলি, ওসব প্রশ্ন এখন থাক। আপাতত আমার একটা সহজ জবাব আছে। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে কলকাতা থেকে। সেদিন কি যোগ ছিল তা দেখি নি, জানিও না। ভালো-মন্দ যাই থাক—সেটা হয়ে গেছে—তার ফেরা চলবে না। বদরীনাথে থাকা, আমাদের কাছে পথে থাকা মাত্র। তাই এখান থেকে যাত্রার দিনক্ষণ দেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। ঠিক নয় কি?

তিনি হেসে বলেন, তা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে তো ওটা খাটবে না। আমার যাত্রা যে এখান থেকে শুরু।

অতএব স্থির হয়, আমরা কাল আয়োজন-মতই রওনা হব। তিনি দুদিন পরে যাত্রা করবেন এবং দুই দিনে এই পথ অতিক্রম করে আমাদের একদিন পরে শতোপন্থতালে পৌঁছুবেন। তারপর, একসঙ্গে সেখানে থাকা যাবে, ফেরা যাবে। শিশিরবাবু তাঁকে বলেন, আপনার মালপত্র আজই দিয়ে যান। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

তিনি গুহায় ফিরে গিয়ে নিয়ে আসেন।

মালপত্রের বহর দেখে আমরা হেসে উঠি। কিই বা আছে। থাকবেই বা কি?—একটি মৃগচর্ম, একটা লোটা ও দুখানা চটি বই।

বলেন, মৃগচর্মটা শোওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বেশ গরম থাকে। আর এই গায়ের চাদরটা—সেটা তো আমি সঙ্গেই নিয়ে যাব—মাঝপথে একটা রাত্রি তো আমাকে কাটাতে হবে। আর পুঁথি দুটি নিয়ে চলেছি—তুলসীদাসের 'রামায়ণ' আর 'সত্যনারায়ণের কথা'—সরোবরের কূলে সত্যনারায়ণের পূজাপাঠ করতে হয়। কেমন ঠিক না?

শিশিরবাবু বলেন, মন ঠিক থাকলে—সবই ঠিক আছে। জয় রাম শ্রীরাম—জয় সীতারাম।

॥ ১২ ॥

সকাল দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই প্রস্তুত।

মন্দির পরিক্রমার পর বদরীবিশালকে প্রণাম করে যাত্রা শুরু হল।

পাণ্ডাজি, সেক্রেটারী, স্থানীয় বন্ধুবান্ধব শহরের শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বৈরাগীজিও এসেছেন। মাইল দেড় দূরে মাতা-মন্দির—সেই পর্যন্ত তিনি যাবেন, বললেন।

সার বেঁধে আমরা চলেছি। দলের পুরোভাগে মাল নিয়ে রতন সিংরা চারজন। তাদের পিছনে আমরা দুজন ও আজকের কিছুক্ষণের সঙ্গী বৈরাগী। সকলের শেষে বিদ্যা। তার এক কাঁধের উপর থেকে ঝুলছে জলের ফ্লাস্ক, অপর কাঁধ থেকে একটি ছোট্ট ঝোলা—তাতে ক্যামেরা ও খুচরা কয়েকটা জিনিসপত্র আছে।

আপাতত সোজা পথ। পাহাড়ী ভাষায়—ময়দান। চড়াই নেই, উৎরাইও নেই। মাইল দুই এই রকমই যাবে, শুনি। বাঁ দিকে ঊর্ধ্বমুখী স্তব্ধ নারায়ণ পর্বতশ্রেণী, ডান দিকে কিছু নীচে নিম্নমুখী গতিশীলা অলকানন্দা। নদীর পরপারে নরপর্বত গিরিশ্রেণী।

সোজা সহজ পথ হলেও ধীরে ধীরে চলি। শরীরের যা কিছু শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে। সম্মুখের দুর্গম পথের কত রোমাঞ্চকর কাহিনীই শুনেছি। ভাবি, সে-সব পথের কষ্ট সইবার শক্তি যেন থাকে, বিপদ বইবার মনের জোর যেন পাই। কেন জানি না, মনে ভয়ের কোন ছায়া পড়ে না। কি এক অজানা শক্তির উপর নিশ্চিন্ত মনে সম্পূর্ণ নির্ভর করি—বিমল আনন্দে সারা মন ভরে ওঠে। চরণ চলতে থাকে। যেন, পথ-হারা পথিক বহুকাল পরে আপন ঘরের পথ খুঁজে পায়।

একটা সামান্য ব্যাপার অসামান্য রূপে হঠাৎ মনে জাগে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি—শূন্য! আজ সঙ্গে কপর্দকও নেই। পয়সাকড়ি যা কিছু ছিল—বদরীনাথে রেখে এসেছি। এ-পথে এক পয়সারও প্রয়োজন নেই। কোন কিছু কেনবার জিনিসও নেই, বেচবার দোকানও নেই। পথের উপর কোন লোকালয় বা গ্রামও নেই, টাকাকড়ি দেবার-নেবার লোকও নেই।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পথের পথিক। সাতদিন কাটবে। অথচ অর্থের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। শহরে বাড়ির বাইরে যেতে হলে পকেটে কিছু পয়সা—দরকার না হলেও—রাখতেই হয়; কে জানে, যদি হঠাৎ প্রয়োজন হয়। না রাখলে মনে একটা অসহায় ভাব আসে।

আর, এই সাত দিনের জীবনে টাকার কোন মূল্য নেই। অর্থ নিরর্থক। তাই, এই শূন্য-পকেট অভাবের অস্বস্তি জাগায় না। মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি আনে।

জীবন-পথিক। অর্থ নেই, তবুও নিঃস্ব নই।

বদরীনাথ থেকে প্রায় মাইল দেড় দুই দূরে মানাগ্রাম। শতোপন্থের পথে পড়ে না। অলকানন্দার অপর পারে। এ-পার থেকে দেখতে পাই।

ক'বছর আগে ওখানে গিয়েছিলাম। বসুধারায় যাবার সময়। নদীর উপর লোহার ঝোলা পুল। সে-বছর প্রচণ্ড তুষারপাতে পুল ভেঙে গিয়েছিল। নদীর জলস্রোতের উপর সে সময়েও বরফের প্রচণ্ড স্তূপ জমে ছিল। তারই উপর দিয়ে যাতায়াত করেছিলাম। অতি সাবধানে। বরফের সেই স্তূপের মুখে প্রকাণ্ড গহ্বর হয়েছিল, তার ভিতর থেকে নদীর জলধারা প্রখর বেগে ছুটে আসছিল, ধার থেকে বরফের চাঙড় ভেঙে ভেঙে জলে পড়ে ভেসে চলেছিল। বরফের সেতুব কোথা দিয়ে পাব হওয়া নিরাপদ, পাহাড়ী সঙ্গীরা দেখিয়ে দিয়েছিল।

মানাগ্রাম এ-অঞ্চলে বড় গ্রাম। প্রায় তিন-চারশো লোকের বসতি আছে। এরাই, শুনি, গন্ধর্বজাতি। এখন লোকে বলে, মার্চা। চাষবাস করে, ভেড়া-ছাগল পোষে; তিব্বতীদের সঙ্গে ব্যবসা করে। শীতের সময় নীচে নেমে যায়। সম্প্রতি এখানে ভারত-সীমান্তের পুলিসের ছাউনি হয়েছে। এই দিক দিয়ে মানা পাস্ হয়ে তিব্বত যাবার পথ। সেই দিক থেকে নেমে আসছে সরস্বতী নদী। পুরাণে কথিত আছে, সরস্বতী বেদের দ্রবময়ী দ্বিতীয় মূর্তি। জল-রূপিনী সরস্বতী এখানে অলক্ষ্যবাহিনী নন, লক্ষ তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলে ছুটে আসছেন। খর-ধারায় দুই দিকের পাথর কেটে। বসুধারায় যাবার পথে তারই উপর এক জায়গায় বিশালকায় পাথর পড়ে একটি প্রাকৃতিক সেতু রচিত হয়ে আছে। ভীমসেন পুল নামে এর প্রসিদ্ধি। প্রবাদ, মহাপ্রস্থানের পথে মধ্যম পাণ্ডব এই নদী পারাপারের জন্যে ভীমকায় পাথরগুলি এমনিভাবে ফেলেন। সৃষ্টির কারণ যাই হোক—স্থানটি মনোবম। বদরী-যাত্রী মাত্রেই এই পথটুকু স্বচ্ছন্দে গিয়ে উপভোগ করে আসতে পারেন। সোজা রাস্তা। চলার কষ্ট নেই। অথচ, দেখার আনন্দ আছে। মানাগ্রামও সেই সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পুরাণ কথিত এই মানসোদ্ভেদ তীর্থ। মণিভদ্রাশ্রম। এরই পশ্চিমদিকে চড়াই-পথে বসুধারা। পুরাণে তারও উল্লেখ আছে। মানাগ্রামের কাছে পাণ্ডারা অনেক কিছুই দর্শনীয় দেখান। বহু উঁচু এক পাহাড়ের গায়ে কালো রঙ-এর বিচিত্র রেখা—অনেকটা ঘোড়ার আকাবের—দেখিয়ে বলেন, ঐ শ্যাম-ঘোটক। শ্রীকৃষ্ণ কৈলাস-যাত্রা শেষ করে ফিরছেন। তিব্বতে থোলিং মঠে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সেখানে দেখেন তিব্বতীরা জম্বু-মাংস নৈবেদ্য রূপে উৎসর্গ করছে। তাই দেখতে পেয়েই তিনি উচ্চৈঃশ্রবায় চড়ে তখুনি এখানে চলে আসেন এবং নারায়ণে লুপ্ত হন। অশ্বটি লিপ্ত হয়ে থাকে ঐ হিমালয়ের গায়ে। গ্রামের একপাশে একটা বিরাট পাথরের স্তূপ, দেখলে মনে হয় স্তরে স্তরে জমে আছে। পাণ্ডারা বলেন, ব্যাস পুস্তক—ব্যাসদেবের সব পুঁথি। এই শুনি, ব্যাসভূমি। কাছেই গণেশগুম্ফা। পাণ্ডাজি হেসে বলেন, তিনি তো ব্যাসদেবের স্টেনো

ছিলেন। আরো কত কি। মনে পড়ে, কুলু উপত্যকার পথেও ঐ ধরনের একটি প্রস্তর-স্তূপ দেখিয়ে ব্যাসদেবের পুঁথির কাহিনী সেখানকার অধিবাসীরাও শুনিয়েছিল।

ভাবি, ব্যাসদেবের সঠিক ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকলেও তাঁর স্মৃতি ভারতবাসীর অন্তরে সর্বত্র জেগে আছে। যেন তাঁর রক্ত-মাংসের শরীর এই সেদিন চলে গেছে, ভূর্জপাতার পুঁথিগুলি এখন পাথর হয়ে জমে আছে। ভারতবাসী মাত্রেই ভাবতে আনন্দ পায়, ব্যাসদেব আমার স্বদেশ-বাসী, আমার ঘরের পাশেই তাঁর ঠাঁই। তাই বুঝি দেখি, ভারতের বহুস্থানে ছড়ানো—ব্যাসভূমি।

মানাগ্রামের কিছু নীচেই অলকানন্দার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম। কেশব প্রয়াগ। সরস্বতী সোজা নেমে আসছেন, অলকানন্দার ধারা বাঁ দিকের উপত্যকা দিয়ে বয়ে এসেছেন। অলকানন্দার সেই ধারা ধরে আমাদের গতিপথ। ওপারে দূরে মানাগ্রামের বাড়িগুলি আঁকা ছবির মত পড়ে থাকে। এপারে পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। চারিপাশে গমের ক্ষেত। ক্ষেত ঘিরে পাথর সাজিয়ে বুক-উঁচু পাঁচিল। দুই দিকে একটানা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। ফুট দুই মাত্র চওড়া হবে। যেন গ্রামের গলির মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছি। কখনো বা সেই পথ রোধ করে আর একটা পাঁচিল উঠেছে। সাজানো পাথরগুলি ধাপের কাজ করে; পাঁচিল ডিঙিয়ে সেখানে ক্ষেতের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়।

মানাগ্রামের প্রায় সামনাসামনি এপারে মাঠের মধ্যে ছোট একটি সাদা মন্দির। মাতা-মূর্তির। পৌরাণিক ঋষি নর-নারায়ণের জননী। ঋষিদ্বয় বিষ্ণুর অবতার। মন্দিরের কাছাকাছি কোন লোকজনের বসতি নেই। অন্য কোন মন্দিরও নেই। একান্তে একাকিনী মাতা দেবী বিরাজ করছেন।

এই সম্পর্কে এক সুন্দর উপাখ্যান আছে।

ঋষি নর-নারায়ণ দুই ভাই গৃহত্যাগ করে যখন চলে আসেন তখন তাঁদের জননীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন মধ্যে মধ্যে সংবাদ দেবেন। কিন্তু, একাগ্র তপস্যায় মগ্ন থাকায় মায়ের কাছে কোন খবর আর পাঠানো হয় না। বছরের পর বছর যায়, জনক-জননী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অবশেষে পিতা ধর্মরাজ ও মাতাদেবী তাঁদের সন্ধানে বার হন। বদরীনাথের কাছে তাঁদের আসতে দেখে নর-নারায়ণ চিন্তিত হয়ে ওঠেন—মা এসে তাঁদের তপস্যা-ক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন। তাই তাঁরা দুজনে বদরী-ভূমির দুই দিকে—অলকানন্দার দুই কূলে—দুটি পর্বতের আকার পরিগ্রহ করে রইলেন। কিন্তু পরে মায়ের দুঃখে বিচলিত হয়ে ঋষি নারায়ণ তাঁর কাছে আসেন এবং বদরিকাশ্রমের নিকট মায়ের বসবাসের সম্মতি দেন। সেই থেকে মাতা-মূর্তি জনহীন প্রান্তরে একাকিনী এই ছোট মন্দিরে

অধিষ্ঠান করছেন। দৈনন্দিন সেবা-পূজার কোন নিয়ম নেই, ব্যবস্থাও নেই। সারা বছর মন্দির বন্ধই থাকে। বছরের একদিন মাত্র—বামন দ্বাদশীর দিন—পুত্র নারায়ণ আসেন মায়ের কাছে। বদরীনাথের মন্দির থেকে নারায়ণের ভোগমূর্তি—উদ্ধবদেব বিরাট শোভাযাত্রা করে আসেন। এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে। নারায়ণেব প্রধান পূজারী রাওয়াল নিজে এসে মাতার পূজা করেন। বিশেষ ভোগ হয়। বিশ্ব-কল্যাণের জন্যে হোম-অগ্নি জ্বলে। দিনশেষে মাতা-পুত্রের একদিনের মিলন-উৎসব সাঙ্গ হয়। ভগবান নারায়ণ আবার নিজ বৃহৎ মন্দিরে অগণিত ভক্তবৃন্দ নিয়ে ফিরে যান। মাতার ক্ষুদ্র মন্দিরেব ক্ষণিক-খোলা দুয়ার আবার বন্ধ হয়। পুত্রের মংগলকামী জননী বোধ করি আবার বৎসরের নিঃসঙ্গ নিরম্বু উপবাসের দিনগুলি গুনতে বসেন।

সাধারণ বিশ্বাস, এখানে বসে ধ্যান করলে গৃহস্থের বিপথগামী সন্তান সৎপথে ফিরে আসে; সংসার-আসক্ত মন মায়ার বাঁধন কাটিয়ে বৈরাগ্যের সন্ধানও পায়।

মন্দিরের দরজার ফাঁক দিয়ে মাতার দর্শন করি। পাথরের মূর্তি। মনে হয় অধরপ্রান্তে যেন ম্লান, অথচ মধুর হাসির অস্ফুট রেখা। ভাবি, পাথর বলেই বোধ করি এত সইতে পাবেন, জননী বলেই অত স্বল্পেই তৃপ্তির হাসি ফোটে।

মন্দিরে প্রণাম করি। মন ভরে, মাথা পেতে মায়ের আশীর্বাদ নিই। আবার পথ চলি।

মনে আসে অনেক দিন আগেকার এক ঘটনা।

বাংলা দেশেব এক শহরে গিয়েছি। সেখানকার এক বড় জমিদারির মালিকদের মধ্যে মামলা শুরু হয়েছে। মাত্র দু'পুরুষ আগে এই জমিদারি গড়ে ওঠে। বিপুল সম্পত্তি। জমিদার জীবিতকালে রাজা উপাধি পান। তাঁর পুত্র, পৌত্রগণও সেই সূত্রে তখনও 'কুমার' বলে পরিচিত। নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদেব বিষে যখন জর্জরিত হয়ে উঠেছে, তখন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে দখল নিতে যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। শহরের কাজগুলি শেষ হলে এক বৃদ্ধ কর্মচারীর কাছে শুনলাম, শহর থেকে কিছু দূরে সেই রাজাবাহাদুরের সময়ের আর এক বৃহৎ অট্টালিকা আছে। সেটি দেবোত্তর, তাই এই মামলার বিষয়ীভূত নয়। সেইখানে এখনও বৃদ্ধা রাজরানী একাকিনী বাস করেন। দেবোত্তরের অবস্থা শোচনীয়। সেই রানীমাবও এখন কেউ খোঁজ-খবর নেন্ না। প্রাসাদ, মন্দির সব ভেঙে পড়ছে। অথচ, সেই প্রাসাদের কারুকার্য, রূপোর আসবাবপত্র এককালে দর্শনীয় বস্তু ছিল। এখনও অনেক কিছু পড়ে আছে, শুনি।

প্রয়োজন না থাকলেও, দেখার আগ্রহ জাগে। মনে বিশেষ করে কৌতূহল তোলে, সেই রাজরানীর নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর কাহিনী। বৃদ্ধ কর্মচারীকে নিয়ে দেখতে যাই।

শহর থেকে বেশ দূরে। দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে। বড় বড় গাছের বন

হয়ে আছে। আম কাঁঠাল ইত্যাদি নানান্ ফলের ও বহুবিধ ফুলের এককালীন সাজানো বাগান এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। তারই মধ্যে মাথা তুলে এক বিপুল অট্টালিকা এবং ঊর্ধ্বমুখী এক মন্দির-চূড়া। গাছগুলির উপরে বহু দূর থেকে দেখা যায়। দেখে মনে পড়ে, ইন্দো-চায়নায় দেখা ঘন বনের মধ্যে আঙ্কোর ভাট্-এর বিস্ময়কর মন্দির-নগরের দূর থেকে দৃশ্য। কী মহান্, অথচ কী করুণ! যেন অতীত গৌরবের নিভে-যাওয়া চিতার ঘন কালো ধূমরাশির জমাট কুণ্ডলী!

বিকেলবেলা। তবুও, মনে হয় সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে।

প্রাসাদের বাইরে ইঁটের সূক্ষ্ম কারুকার্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিস্মিত হয়ে দেখি।

কর্মচারী বলেন, উপরে চলুন। ঘরের আসবাবপত্র দেখবেন। সাবধানে দেখে উঠবেন। চারপাশে ভাঙা ইঁট, ঝোপঝাপ্। সাপের বাসা।

উপরের ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। রুপার তৈরি সোফা-সেট। ঘরের মাঝখানে রুপার পালঙ্ক। কিন্তু, ও কী! দেওয়ালের গায়ে গায়ে, খাটের রুপার ছতরী ঘিরে প্রকাণ্ড সাপ জড়িয়ে আছে!

কর্মচারী বলেন, এগিয়ে চলুন। ওগুলো সাপ নয়। দেওয়াল বেয়ে, ছাদ থেকে—ঘরের চারিদিকে ওসব বট-অশ্বত্থের ঝুরি নেমেছে। রুপোর পাকে পাকে ঝুরির পাক খেলেছে।

সত্যই তাই। কালের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিগত কালের রাজার ধন-দৌলত-সুখসম্পদের জাজ্বল্যমান প্রতীকগুলিকে মহাকাল ধ্বংসের নাগপাশে বেষ্টন করেছে। মানুষের গড়া কত আশা-আকাঙ্ক্ষার সাজানো সংসার—এই তার চিরন্তন পরিণতি। মানুষ গড়ে, কাল ভাঙে। তবু মানুষ আবার গড়ে। আবার কাল ভাঙে। ভাঙা-গড়ার নাগর-দোলায় মানব-শিশুকে বসিয়ে মহাকাল ঘোরাতে থাকেন।

কিন্তু, ভাবি, রাজরানী থাকেন কোথায়? একবার দেখা হয় না? কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করি।

দর্শনের ব্যবস্থা হয়। শুনি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। রানীর সাজ-সজ্জায় সময় নেবে।

কর্মচারী ম্লান হেসে বলেন, রাজবেশের আয়োজন নয়। একরকম বিবস্ত্রই থাকেন। কয়েক বছর আগে পক্ষাঘাত হয়েছিল। শরীরের একটা অংশ পড়ে গেছে। বয়সও হয়েছে আশীর কাছাকাছি। কাছে সব সময়ে থাকেন ওঁর এক বহুকালের পরিচারিকা। সব কাজ দেখাশুনা তিনি একাই করেন। এই দুঃখদৈন্যের দিনেও ছেড়ে যান নি। রানীমা ওঁকে মেয়ের মত মানুষ করেছিলেন, ভালো বিবাহও দিয়েছিলেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে আসেন। সেই থেকে ওঁর নিত্য সহচরী হয়ে আছেন। আমরা দু-একজন পুরানো

কর্মচারী মাঝে মাঝে আসি। রানীমা এখান থেকে কোথাও যেতে চান না।

শারীরিক অবস্থার কথা শুনে বলি, ওঁকে তবে বিরক্ত করে কাজ নেই। দেখা না করাই ভালো।

কর্মচারী জানান, দেখা করলে তিনি খুশীই হবেন। আর, এখন একবার খবর দিয়ে দেখা না করে গেলে মনে আঘাত পাবেন। কেউ তো আসে না দেখা করতে। একমাত্র ছেলে—কুমার বাহাদুর—বছর পনেরো হল হঠাৎ মারা গেলেন, আগে তাঁর কাছেই থাকতেন। এখন নাতি-নাতনীরা আছে, কলকাতাতেই থাকে। কখনো এদিকে মাড়ায় না। কোন খোঁজখবরও নেয় না। জমিদারির টাকা সেখানেই সব যাচ্ছে, খরচও হচ্ছে। শুনি, সে টাকায় রেস্-এর ঘোড়াও নাকি ছুটছে।

ভেঙে-পড়া বিরাট প্রাসাদের একপাশে একতলায় ছোট্ট দুটি ঘর। কোন-রকমে বাসের উপযোগী করে রাখা। তারই সামনে বাঁধানো রোয়াক। সেইখানে একটি চেয়ারে রানীমাকে নিয়ে এসে বসিয়েছে। পরনে গরদের থান। পায়ের কাছে সামান্য অংশ দেখতে পাওয়া যায়। মাথার উপর দিয়ে সর্বাঙ্গে জড়ানো অতি সূক্ষ্ম কাজ-করা দামী শাল। কতক অংশ পোকায় কেটেছে, কোথাও বা ছিঁড়েছে। রানীমার একটি হাত অক্ষম, অপর হাতটি থরথর করে কাঁপছে। সারা অঙ্গ শালে ঢাকা। শুধু মুখখানি খোলা। কাঁচা সোনার রঙ, শুনেছি। আজ চোখে দেখি। ভাবি, রাজরানীর রূপ এমনি তো হওয়া চাই। মুখে জরা ও বার্ধক্যের বলিরেখা। তবুও, সারা মুখ যেন জ্বল্‌জ্বল্ করে। টানা চোখ দুটিতে শান্ত-করুণ দৃষ্টি।

শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করি। আর একটা চেয়ার এনে রাখা ছিল, মৃদু কণ্ঠে বলেন, বসো। তোমার আসার কারণ সব শুনলাম। দেখো, যদি সম্পত্তি বাঁচে। এ আমার স্বামীর নিজের হাতে সব গড়া। আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলাম। মনে হয়, সেদিনের কথা। চোখের সুমুখে কি পরিবর্তনই না দেখলাম।

পুরানো দিনের গল্প করেন। কথার তুলিতে, ভাবের আবেগে যেন ছবি ফুটে ওঠে। একদিনের ঘটনা বলেন ঃ

তখন সবে নতুন মোটর আমদানি হয়েছে। রাজাবাহাদুরের কেনার শখ হল। এক মহালের প্রজাদের কাছে টাকা তোলা হল। নতুন মোটর এলো। তাতে চড়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। প্রজারা গ্রাম থেকে দলে দলে দেখতে আসে। ঘোড়া নেই, তবু গাড়ি ছোটে। আশ্চর্য ব্যাপার। আমি থাকি অন্দরমহলে। লোকের মুখে গল্প শুনি। সে-বছর পুজোর সময় আর এক বড় মহালের বহু প্রজা এসেছে। ভোগ প্রসাদ পাবে। প্রকাণ্ড উঠানে সারি বেঁধে খেতে বসেছে। পরিবেশন করতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাতা হাতে আমি বেরিয়ে এলাম। নিজের হাতে একধার থেকে দিতে শুরু করেছি। চারিদিকে চাঞ্চল্য জাগলো—'এ কী! রানীমা আপনি নিজে? এ কি করছেন?'—আমি তখনি অভিমান দেখিয়ে উত্তর দিই, 'আমি তো তোদের গরীব রানী। তোদের রাজাকে তাঁর

প্রজারা মোটর কিনে চড়তে দেয়—আমাকে কে কি দেয়? আমি তোদের গরীব মা।'—কিছুদিনের মধ্যেই সেই মহালের প্রজারা ক'হাজার টাকা তুলে আমার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে গেল। সেই টাকাতেই এই এখানকার সম্পত্তি কেনা, দেবোত্তর করা—আমার শ্যামরায়ের ঝোলা ঝোলানো।

চুপ করে শুনি। কথা বলে ক্লান্ত হন। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ভাবি, অক্টোপাস-এর মত আঁকড়ে ধরে মন্দিরের গা বেয়ে যে বিরাট অশ্বত্থ গাছটি উঠেছে—তাই কি দেখছেন?

নাতিদের কথা তুলি। শুনেই বলেন, আহা! তারা শহরে থাকে। ছেলে-মানুষ। নানা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সময় পায় না; তাই আসতে পারে না। যেখানেই থাক, ভালো থাকলেই আমি খুশী। সময় পেলে নিশ্চয় আসবে। আমি এখানে আমার শ্যামরায়কে নিয়ে আছি।

কোন অভিযোগ নেই, কথার ফাঁকে কোন অভিমানও নেই। ঠোঁটের কোণে যেন করুণ হাসির রেখা ফোটে। অথচ, কি নিঃসঙ্গ, নিদারুণ দুঃখের দিনগুলি কাটান।

বেশীক্ষণ বসি না। এমন ভাবে বসে থাকায়, কথা বলায় তিনি কষ্ট বোধ করেন, দেখি। আবার অভিবাদন করে চলে আসি। কিন্তু, স্মৃতিপটে সেই মাতৃমূর্তির ম্লান অথচ মধুর ছবিখানি চিরতরে আঁকা হয়ে থাকে।

॥ ১৩ ॥

মাতা-মূর্তির মন্দির ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছি।

ওপারে বসুধারা দেখা যায়। ওরই কাছে মাতা-মূর্তির পতি ধর্মরাজের তপস্যাভূমি। কেউ বলে, অষ্টবসুরও সাধনাস্থল। পাহাড়ের বহু উপর থেকে এক জলধারা লাফিয়ে পড়ছে। প্রায় চারশত ফুট উঁচু থেকে। নামার পথে বাতাসের বেগে জলের রাশি অসংখ্য কণায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, উড়ে যায়। সূর্যের আলো সেই বাষ্পমণ্ডলীতে প্রতিফলিত হলে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রঙের ছটা ফোটে।

মনে পড়ে, ক'বছর আগে ঐ জলধারার পাদমূলে সেই স্বর্গীয় শোভা প্রাণভরে পান করেছিলেন।

আজ এপার দিয়ে যেতে পাহাড়ের বুকে সেই ধারার উচ্ছ্বাসধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনি।

আনন্দে চমকে উঠি—যেন অতি-প্রিয়জনের হঠাৎ-শোনা কণ্ঠস্বর।

বেশী চড়াই-উৎরাই এখনো আসে নি। তবে অলকানন্দার বিস্তৃতি শীর্ণ হয়ে এসেছে। বাঁ দিকের গিরিশ্রেণীও অতি নিকটে এগিয়ে এসেছে। এবার আর মাঠ-ক্ষেতের উপর দিয়ে পথ নয়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছি। বাঁ দিকে পাহাড়ের গা উঁচু দেওয়ালের মত উঠে গেছে, ডানদিকে সোজা নেমে গেছে নদীর

জলে। প্রায় চার-পাঁচশো হাত নীচে। তবুও যাবার মত যথেষ্ট পথ আছে। তাই, নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলি। একটা মোড় ঘুরে দেখি, উয়াসিংরা চারজন দাঁড়িয়ে আছে। পিঠের উপর বোঝা নেই, কাছেও কোথাও রাখা নেই।

শিশিরবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কি? এরা এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে? মালও দেখছি না?

বিদ্যা জানায়, সামনে একটু পরেই দেখবেন, পাহাড় একেবারে ধসে পড়ে আছে। 'বহুৎ খতরনাক' জায়গা আছে। তাই, ওদের ব'লে দিয়েছিলাম, আগে গিয়ে সেই জায়গাটায় মালপত্র পার করে রেখে দিয়ে যেন ফিরে আসে। আপনাদের ওখানটায় যাবার সময় ওদের সাহায্য দরকার হতে পারে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, স্থানটা একটু বিপদসঙ্কুলই বটে।

পাহাড়ের মাথা থেকে প্রকাণ্ড একটা ধস নেমে সোজা নদীর মধ্যে পড়েছে। পার হতে হবে সোজাসুজিই। নীচে নামবার উপায় নেই, উপরে ওঠবারও পথ নেই। বিদ্যা বলে, এ-জায়গা প্রতি বছরই ভাঙে, এ বছরও ভেঙেছে। এইটুকুই সাবধানে পার হয়ে যেতে পারলে হল—তারপর আর কোন ভয় নেই।

শিশিরবাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু, এখানটা যাওয়া যাবে কি করে? পা রাখবার কোন জায়গাই তো দেখছি না। সোজা ভাঙা পাহাড়ের গা। ফসকালে একবারে ঐ তো নীচে নদীর মধ্যে। বোধ হয় সাত-আট শো ফুট হবে। কি বলেন?

বলব আর কি?

বিদ্যা সাবধান করে দেয়, ওদিকে তাকাবেন না। আসুন হাত-ধরাধরি করে পার করিয়ে দিই। শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। কোন ভয় নেই।

জানি, এটা ওর মুখের-আশ্বাস-বাণী নয়, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। বিপদ কোন কিছু ঘটবে না।

কেন জানি না, আমাদেরও মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোথা থেকে এই অগাধ নির্ভরতা আসে, কেনই বা আসে—তার উত্তর খুঁজে পাই না। মনে মনে শুধু বুঝি যত দুর্গমই হোক—সব পথ নিশ্চয়ই পার হয়ে যাব।

যাই-ও তাই। কেমন করে আসি ঠিক বুঝি না। দেখি, সেই চার-পাঁচ শত হাতের ব্যবধান যে দুর্গমতার সৃষ্টি করেছে এরা কয়জনে যেন তার পারাপারের সেতু হয়ে দাঁড়ায়—সামনে, পেছনে, পাশে হাত ধরে—একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে পার হয়ে আসি। যেন লোফালুফি করে একটা বল এধার থেকে ওধারে নিয়ে গেল। মাটিতে পা ছিল বটে, কিন্তু পায়ের তলায় জোর ছিল না, বালি-মাটি-পাথর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে যাচ্ছিল। তবুও তারা তাদের নিজেদের পা এগিয়ে দিয়ে কেমন জোর করে রেখে, বলে, এরি ওপর পা রেখে নির্ভয়ে ভর দিয়ে চলুন—, আমার পায়ে কিছু লাগবে না—চলুন আপনি।—গিয়েছিও কোথাও তাই। তারা যে কেমন ভাবে নিজেরা দাঁড়িয়ে ছিল,

বুঝলাম না।

বুঝি নি তখন। কিন্তু বুঝেছিলাম ফেরার সময়। তখন আর অমন দুর্গম মনে হয় নি, অত সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়নি। ততদিনে এ-ধরণের ভাঙা পাহাড় দিয়ে চলা অভ্যেস হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতায় ও তাদের দেখে তখন শিখেছি—সেই ঝরা বালি-মাটি ও পাথরের উপর প্রথমে পায়ের জুতোর চাপ দিয়ে কেমন পাটুকু রাখার মত নির্ভরযোগ্য স্থান করে নেওয়া যায়, এক হাতে পাহাড়ের গা ধরে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা চলে। তাই ফেরবার পথে শুধু একজনই পাশে এসেছিল সতর্কতার জন্যে। পার হতে সময়ও লেগেছিল অল্প।

বেশ বুঝি, ভয় মাত্রেই মানসিক বিকার। অন্ধকারের ভয় আলোয় কেমন কেটে যায়।

লক্ষ্মীবন।

পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। কিছু আগে ছাড়িয়ে এসেছি—চমুতোলী। সেখানেও খানিকটা সমতল ক্ষেত্র, একটি গুহা। কিন্তু আজ তাঁবু ফেলা হবে এইখানে—লক্ষ্মীবনে। বেলা থাকতে এসে পৌঁছেছি। সেই ভাঙা পথটুকু ছাড়া আর কোথাও দেরি হয় নি। চড়াইও পাই নি। শুনি, বদরীনাথ থেকে এসেছি আজ সাড়ে সাত মাইল।

লক্ষ্মীদেবী এখানে তপস্যা করেছিলেন, তাই নাম—লক্ষ্মীবন। তপস্যা এখানে করুন বা না করুন, এই নামকরণের সার্থকতা আছে। বদরীনাথ ছাড়ার পর কোথাও গাছ নেই। চারিদিকে শুধু পাহাড় ও পাথর। এইখানে এসে দেখি, অল্প নীচে—অলকানন্দার তীরে কতকগুলি গাছের ঝোপ। ভূর্জবৃক্ষের বন। সেখানটায় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। ভূর্জগাছের সাদা সাদা ডাল। এঁকে-বেঁকে ছড়িয়ে আছে। রক্তাভ বল্কলগুলি রঙিন কাগজের মত ডালে ডালে আঁকড়ে রয়েছে, কোথাও বা খুলে ঝুলছে। একটু টানলেই পরতে পরতে পাক খুলে উঠে আসে। ছালগুলির গায়ে লাল ও সাদা রঙের বিচিত্র চিত্রণ— যেন শ্বেত ও রক্তচন্দনের ফোঁটা ছড়ানো। মনে পড়ে, 'কুমারসম্ভবে'র বর্ণনা—'ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোনাঃ'। বনের ছায়া ছুঁয়ে অলকানন্দার একটি ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। জলস্রোতের কলকল ধ্বনি। গাছের শাখায় শাখায় পাখীদের কল-কাকলী। পরপারে তুষারমৌলী গিরিশ্রেণী। তারই একটির বুকে দীর্ঘ সরল শ্বেতরেখা। দূর-থেকে-দেখা বসুধারা। নীচের দিকে আবছায়া—বাতাসে উড়ে-যাওয়া জলকণার বাষ্পমণ্ডলী। যেন, শ্বেতবরণী দীর্ঘাঙ্গিনী সুর-সুন্দরী—সূক্ষ্ম-রেশমী-ঘাগরা-পরা!

চারিদিকে স্তব্ধ কঠোর গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে, চকিত চরণে নামে লক্ষ্মীশ্রী। শৈলকানন-শোভিতা।

একটা পাথরের উপর আমরা দুজনে বসি। হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ উড়ে

আসে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নামে। কন্‌কনে হাওয়া ছোটে।

শিশিরবাবু চিন্তিত হয়ে বলেন, উদয়সিংদের দেখা নেই এখনো। মাল এসে পেঁছুল না। তাঁবু খাটালে তার মধ্যে বসা যেত।

বিদ্যা ছুটে আসে। বলে, জলের মধ্যে বসে ভিজবেন না, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। উঠে চলুন। ঐ গুহার ভেতরটা পরিষ্কার করে এলাম— ঐখানে আপাতত বসবেন।

চারিদিকে বড় বড় পাথর ছড়ানো। তাদেরই ভেতর এখানে ওখানে চার-পাঁচটি গুহা। খুব বড় না হলেও দু-তিনজন করে থাকা চলে। মাথা সোজা করে ভেতরে সব জায়গায় দাঁড়ানো সম্ভব না হলেও—স্বচ্ছন্দে বসে থাকা বা শোয়া যায়। গুহার মুখগুলি খোলা। অবস্থা বুঝে গুহার ব্যবস্থা করতে হয়—কোন্ দিক দিয়ে বাতাস বইছে, কোন্ গুহায় ঠাণ্ডা বাতাস বেশী ঢোকার আশংকা, কোন্ গুহার মেঝে উঁচু-নীচু পাথরে অসমতল কম।

দেখেশুনেই একটি গুহার ভিতর বিদ্যা পরিষ্কার করেছে। আমাদের একটা বর্ষাতি পেতেছে। বলে, এখন এখানে বসুন। মালপত্র এলে তাঁবু খাটানো যাবে। উদয়সিংরা মাঝপথে নিশ্চয় কোথাও বসে গেছে, নইলে এখনো দেখা নেই কেন? এসে বলবে, জিনিসপত্র পাছে ভিজে যায় তাই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু, আসল ব্যাপারটা, ভেড়া-ছাগল চরাতে কোন গ্রামবাসীরা হয়তো এ-অঞ্চলে এসেছে—তাদেরই কোন দলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বসে গেছে ছিলিম খেতে।

আমরা বলি, তা থাক্। ঐ ভারী বোঝা নিয়ে চলা—কম কষ্ট নয় তো! আমরা খাসা আসছি খালি হাতে।

বিদ্যা ঝোলা থেকে নিমকি, গজা বার করে দেয়। ফ্ল্যাস্ক থেকে জল ঢালে। আমরা দুজনে খাই। তাকেও দিই।

শিশিরবাবু সহসা চেঁচিয়ে ওঠেন, দেখুন ভাল্লুক নাকি?

ভাল্লুকের মতই বটে, তবে ভাল্লুক নয়। গুহার মুখের কাছে এসে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড এক কুকুর। কালো রঙ। গা-ভরা ঝাঁকড়া লোম। তিব্বতী মাস্টিফ। বাইরে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দেয়, সর্বাঙ্গ থেকে ফুলঝুরির মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর, বলা-কওয়া নেই, কোন সংকোচ বা ভয় নেই, ভেতরে ঢুকে এসে বসে—একেবারে আমাদের গায়ে গা ঠেকিয়ে।

বিদ্যা একটা পাথর তুলে তাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দিতে যায়। কুকুরটির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আমাদের মায়া জাগে। অমন ভীষণ শরীর—দেখলে ভয় লাগার কথা। কিন্তু, মুখ তুলে যখন আমাদের দিকে তাকায়—দেখি, শান্ত চোখের দৃষ্টি। হিংস্রতার লেশমাত্র নেই। চোখের ভাষায় যেন মনে হয়, বলে, এই যে, তোমরা পেঁছে গেছ? এসো, একটু ঘেঁষাঘেঁষি বসা যাক—উঃ! যা শীত!

শিশিরবাবু বলেন, এ যে এসে বসল—যেন কতকালের পরিচয়। কার কুকু

এটা—কোত্থেকে এলো ? উদয়সিংদের-কারো হবে নিশ্চয় ।

বিদ্যা বলে, কই, তাদের সঙ্গে তো কোন কুকুর দেখি নি ?

শিশিরবাবু বলেন, দাঁড়া, তোকেও কিছু খেতে দিই। বলে পকেট থেকে দু'টুকরো বিস্কুট বার করে দেন। কুকুরটি তখনই খায়। লম্বা লকলকে জিব বার করে নিজের পা চাটতে থাকে। আনন্দে লেজ নাড়ে। আমাদের মুখের পানে মুখ তুলে তাকায়। আরও নিবিড় হয়ে ঘেঁষে বসে। তারপর ছড়ানো সামনের পা দুটোর মধ্যে মাথা গুঁজে আরামে চোখ বোজে।

কৈলাস-মানসসরোবরে পথের একদিনের এক ঘটনা মনে আসে। সঙ্গে এক শ্রদ্ধেয় স্বামীজী ছিলেন। তিনি তার আগেও তিনবার কৈলাস ঘুরে এসেছেন। অনেক বছর ঐ হিমালয় অঞ্চলে কাটিয়েছেন। তাঁর বহুমুখী অভিজ্ঞতা, দুর্জয় সাহস। হিমালয়ের সেই দুর্গম পথে তার প্রমাণও পাই। অবাক হয়ে দেখি, ছোট্ট এতোটুকু মানুষ, কিন্তু মনের কি জোর! হঠাৎ একদিন তাঁরই মধ্যে আর এক চেহারা দেখলাম। সেদিন পথের ধারে তিব্বতীদের একটা তাঁবুর পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের ভীষণাকার কুকুরটা চীৎকার করে ছুটে এলো। সকলেই ভয় পেলাম। পাবারই কথা। তবু, তারই মধ্যে যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে লাঠি উঁচিয়ে আমরা পার হয়ে এলাম। স্বামীজী, কিন্তু, কোনমতেই এলেন না। আমাদের তিব্বতী গাইডকে দিয়ে কুকুরটাকে পথের পাশ থেকে দূরে সরিয়ে তবে এলেন। সেদিন হঠাৎ তাঁর মুখে ভয়ের পাণ্ডুর ছায়া দেখেছিলাম—ছোট ছেলের ভয় পাওয়ার মত। আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনি, একবার তাঁকে কুকুরে কামড়েছিল ; তাই এই অতি-সতর্কতা।

ভয় জাগে এমনি ভাবেই। পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়।

বৃষ্টি থেমেছে। ফোঁটা কয়েক পড়েই বন্ধ হয়েছে। উদয়সিংরা এসে পৌঁছল। বিদ্যা এরি মধ্যে গুহার কাছে একটু জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছিল। দেখতে দেখতে সেখানে তাঁবু পড়ে। তাঁবুর তিনদিক মাটির ভেতর গুঁজে দেওয়া হয়। তারপর, তাঁবু ঘিরে চারপাশে বিঘতখানেক নীচু ছোট্ট পরিখামতো কাটা হয়। বিদ্যা বলে, এ-সব জায়গায় ঠিক নেই—যে-কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। তাঁবুর গায়ের জল এ নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হলে, শিশিরবাবুর সঙ্গে চলি রান্নামহলে। একটি স্বতন্ত্র গুহায় উনুন জ্বালার ব্যবস্থা হয়েছে। উদয়সিং কতকগুলো শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলেছে। রতনসিং এসে ঢোকে। কাঁধের উপর কেরোসিন তেলের একটা টিন। কিছুদূরের ঝরনা থেকে খাবার জল ভরে এনেছে।

শিশিরবাবু সন্দিগ্ধ হয়ে বলেন, টিন-এ তেলের গন্ধ নেই তো ?

বিদ্যা হেসে জানায়, বদরীনাথ থেকে আনার আগে ভালো করে ধুইয়ে এনেছি।

পান সিং আসে। কাঁধের উপর একরাশ শুকনো কাঠ, ডালপালা। সত্যই

তো। এখানে যখন কাঠ পাওয়া যায়, অযথা কয়লা খরচ করে লাভ কি ?

নাম-ভোলা ছোকরাটি একটা কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে আসে। উদয়সিং-এর হাতে এগিয়ে দেয়। উদয়সিং তামাকু খেতে বসে। সর্দারের হাত থেকে অন্য সকলে প্রসাদ পাবে।

উনানের উপর চায়ের প্রকাণ্ড কেটলি চাপে। চা তৈরী হলে সবাই মিলে চা খাই।—তাঁবুতে ফিরে এসে আবার এক কাপ করে চেয়ে পাঠাই। আনতে আনতে জুড়িয়ে যায়।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শিশিরবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে, তাই তো। কুকুরটার কথা জিজ্ঞাসা করা হল না ?

বিদ্যা বলে, আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওদের কারো নয়। হয়তো কাছা-কাছি ভেড়া ছাগল চরাতে কেউ এসেছে—ফিরে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণে।

সন্ধ্যার মধ্যেই খাওয়া সারা। বাইরে কন্‌কনে শীত। তাঁবুর দরজা ভালো ভাবে বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। কোনদিকে বাতাস ঢোকার যেন ছিদ্র পর্যন্ত না থাকে। দিব্য আরামে রাত কাটে। তাঁবুর মধ্যে তেমন শীতবোধ হয় না।

ভোর হয়েছে। শিশিরবাবু তাঁবুর বাইরে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, আরে! তুই এখানে শুয়ে! সারারাত এই শীতের মধ্যে!

জিজ্ঞাসা করি, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে ?

শিশিরবাবু বলেন, সেই কুকুরটা! তাঁবুর দরজার বাইরে সারারাত শুয়ে ছিল। গায়ের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো জলের কণা জমে গেছে দেখছি।

কুকুরটা গা-ঝাড়া দেয়। শব্দ পাই।

শিশিরবাবুর গলা শুনি, আরে! আবার আমার সঙ্গে চললি কোথায় এখন ? —আচ্ছা আয়।—চেঁচিয়ে আমাকে বলেন, মহাপ্রস্থানের পথ। একটা কুকুর সঙ্গে না থাকলে যাত্রা পূর্ণাঙ্গ হত না। এ চমৎকার হল।

দশটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁবু তুলে আবার যাত্রা।

এসব অঞ্চলে রোদের তত তেজ নেই। তাই, আহারের পাট চুকিয়ে সারাদিন হাঁটার নিয়ম,—তাতে যতদূর যাওয়া যায়। দিনের মধ্যে আবার জিনিসপত্র খোলা, তাঁবু খাটানো—এ সকলের হাঙ্গামা থাকে না। লম্বা একটানা সময় হাতে থাকে। যেন, ছেলেদের হাতে লাটাই-ভরা সুতো। সুতো খোলে, ঘুড়ি আকাশে উঠতে থাকে, বাতাস থাকলেই হল। এখানে চলার দম ও মনের জোর থাকলেই হল।

লক্ষ্মীবন ছাড়ার আগে একটা গুহার মধ্যে কিছু আলু ও কাঠকয়লা রেখে আসা হয়, মাটি ও পাথর চাপা দিয়ে। ফেরবার পথে এখানে কাজে লাগবে। উদয়সিং-এরই এটা পরামর্শ,—মিথ্যে কেন এ ক'দিন বয়ে নিয়ে যাওয়া, আবার এখানে ফিরিয়ে আনা ? ফেরার পথে যেখানে যা লাগবে, যাবার সময় সেখানে

তা রেখে যাব।

শিশিরবাবু ভাণ্ডারী। তাই, সতর্কতা আছে। জিজ্ঞাসা করেন, লোকসান যাবার ভয় নেই?

সকলে আশ্চর্য হয়। বলে, নেবে কে? আর অন্যের জিনিস ছোঁবেই বা কেন? অসম্ভব!

ভাবি, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সম্ভব-অসম্ভবের ধারণা কেমন গড়ে ওঠে। শহর হলে বলতে হত, এ-ভাবে ফেলে রেখে যাওয়া, ফিরে এসে পাওয়া—অসম্ভব।

অলকানন্দার কিছু উপর দিয়ে চলেছি। সামনেই দেখছি, নদী আবার বাঁ দিকে পাহাড়ের আড়ালে ঘুরে গেছে। সেইদিকে অলকানন্দার হিমবাহ (glacier) শুরু। বদরীনাথ ছাড়ার পর ঘোড়ার খুরের আকারে নদীর গতিপথ বেঁকে গেছে। বদরীনাথের নারায়ণ পর্বত ও নীলকণ্ঠ শিখর—মন্দিরের পিছনে দেখা যায়। আমাদের এখানেও যেতে হবে সেই সব পাহাড়েরই পাশ দিয়ে, তবে অপর দিকের অংশ বাঁ হাতে রেখে। অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শিখরকে অর্ধ-পরিক্রমা করা হবে।

বাঁকের কাছে সামনে থেকে আর একটি প্রশস্ত হিমবাহ এসে অলকানন্দার হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে। ভগীরথ খরগ্!

বহুদূরে সেই হিমবাহের শেষভাগে বরফের চূড়া দেখা যায়। শুনেছি, ঐ হিমবাহ ধরে গেলে পাঁচ-ছয় দিনে গোমুখে পেঁছানো যায়। দুর্গম বরফের রাজ্যের মধ্য দিয়ে সে পথ। ঐ তুষার-শিখর ও হিমবাহগুলি থেকে অপর দিকে নেমে যাওয়া ধারাগুলি ভাগীরথী-গঙ্গার উৎস, আর এদিকে নেমে আসা ধারাগুলি অলকানন্দা-গঙ্গার নদীরূপ সৃষ্টি করছে।

সেই দুই বিরাট হিমবাহের সঙ্গমস্থলে এসে পেঁছুই। নদীর স্বচ্ছ নীল জলের চিহ্ন মেলে না। দুই দিকেই ছড়ানো ভাঙা পাথর ও ধুলো-মাটি-বালি মাখা বরফের স্তূপ। হিমবাহদুটিকে দেখে মনে হয় যেন প্রাণহীন, রক্তহীন, বিবর্ণ দুই বাহুর মিলন। হাতে হাত মিলিয়ে দুই বিশাল কংকালের মত পড়ে আছে। তারি মধ্যে কোথাও বা গলে-যাওয়া বরফের ফাঁকে আঁধার-ভরা গহ্বর। যেন, কংকালের দৃষ্টিহারা চোখের শূন্য কোটর। দয়ামায়াহীন মরণোত্তর এক জগতের সংকেত দেয়।

বিদ্যার ডাকে চমক ভাঙে।

অলকানন্দার অপর পারে—হিমবাহ সঙ্গমের কিছু আগে—দুটি গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থিত একটি পার্বত্যনদীর উপত্যকার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে, ঐ ওদিকে দেখুন অলকাপুরী।

অলকাপুরী! নাম শুনেই মনে পুলক জাগে। মন-ভরা বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে উৎসুক দৃষ্টি দিই।

এপার থেকে দেখি গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে একটি ক্ষীণকায়া-নির্ঝরিণী শৈল-

সোপান বেয়ে সর্পিল গতিতে নেমে এসেছে—অলকানন্দায় আত্মবিসর্জন দিতে। বহুদূরে উপত্যকার শেষ সীমায় তুষারশীর্ষ গিরিশিখর। সুনীল আকাশের পটে শ্বেত পাথরে গড়া মন্দির-চূড়ার যেন আকৃতি আঁকা। তারই উপর একখণ্ড সাদা মেঘ যেন পতাকা উড়ায়। তখনি মনে আসে কবির বর্ণনা—

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরেষু পদং ন্যস্ত গন্তাসি যত্র।
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য॥

ভাবি, ঐ কি সেই মেঘদূত? কবির কাব্য-সুধার সিঞ্চনে অমর হয়ে এখনও ওখানে বিরাজ করে? দেখি, শিখর ঘিরে নিম্নদেশ থেকে ধোঁয়ার মত কুয়াসার কুণ্ডলী ওঠে। মনে হয়, 'বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌত হর্ম্য'গুলিতে বুঝি ধূপধুনার আরতি শুরু হল।

ঐ কি সুমুখে—হংসদ্বার?—"ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।"

ঐ পথেই কি বলাকাসারি উড়ে চলে মানসসরোবরে? প্রকৃতই তো এরই অল্প দূরে মানা-গিরিসংকট। এখনও মানসে যাবার সেও এক পথ।

ঐ ক্ষীরধারা নির্ঝরিণীর ঊর্ধ্বগতি রেখাপথ কোথায় নিয়ে যায়? সত্যই কি সেই অলকাপুরীতে?

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ।

যেখানে শুধু আনন্দেই নয়নে অশ্রু ঝরায়। অন্য কোন কারণে নয়। যেখানে কুসুম শরেই শুধু মনস্তাপ জাগায়। অন্য কোন সন্তাপে নয়।

প্রকৃতই কি ওখানেঃ

যত্রোন্মত্ত ভ্রমরনিকরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ।।

কবি কালিদাসের অমর অলকাপুরী! ধনপতি কুবেরের অক্ষয় সুখ-সম্পদ। অতুল রূপরাশি। বিরহী যক্ষের বিচ্ছেদ-ক্রন্দনের অশ্রুবাষ্পভরা।

সেই অলকাপুরীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আজ মনে মনে আবার 'মেঘদূতে'র স্তুতি করি।

অকস্মাৎ অন্তরের অন্তঃপুরে গোপন দৃষ্টি পড়ে। সাশ্চর্যে দেখি, কোথায় সেই 'মেঘদূতে'র আনন্দ-দ্যুতি! এতদিন সেই কাব্যের মধুর ঝংকার ও অমৃত রস যে-মনে অসীম আনন্দের সঞ্চার করেছে, আজ সে-মনের সন্ধান পাই না।

সেই মহাকাব্যের 'নবঘনস্নিগ্ধছায়া' আজ মনে কোন মায়ার জাল বোনে না। অন্তরে সেখানে মাথা তুলে বসে এক গৃহত্যাগী মন। সম্মুখে শিবসুন্দরের শ্মশানক্ষেত্রের দিকে সে উন্মুখ নয়নে চেয়ে আছে। পাষাণ-হৃদয় হিমালয়ের কঠিন-কঠোর রূপ তাকে আকৃষ্ট করে। কামনার মোক্ষধাম—সৌন্দর্যের

আদিসৃষ্টি—সেই অলকাপুরী এখন তার নয়নে কবিকল্পনার অঞ্জন মাখায় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভোগ, মণি-মাণিক্যের চাকচিক্য—ক্ষুদ্রমানবের বিরহমিলনের মহান গীতিকাব্য,—সে যে 'শুধু স্বপ্ন ক্ষণপ্রভ'।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ আজ মহাপ্রস্থানের পথ। সেই হিমবাহের শ্মশানভূমির দিকে ধীরে ধীরে মন এগিয়ে চলে। 'মেঘদূতে'র মধুর সুর আজ আমার জীবনে প্রথম সুর হারায়।

॥ ১৪ ॥

অলকানন্দার হিমবাহে এসে পেঁছেছি।

পথের উপরের বরফ এখন এখানে অনেক জায়গায় গলে গেছে। তবে চারিদিকে বরফের পাহাড়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন, এখনি তুষার-স্তূপ নামিয়ে দিয়ে আবার সব ভরিয়ে দিতে পারে—এমনি উদ্ধত রুদ্রভাব।

বরফের খোলস ছেড়ে এখানে-ওখানে চারপাশে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি পাথর। নানান্ আকারের। বিচিত্র বর্ণের।

এখানকার পাথরগুলির আকার, রঙ ও রেখার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশের পাথরগুলির মত এদের চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা নেই ;—নিষ্প্রভ রুক্ষ শুষ্ক। দেখেই বোঝা যায়, তুষার-আবরণ এদের অভ্যস্ত জীবন। হিমরাজ্যের অধিবাসী বলে যেন আভিজাত্য প্রকাশ করে। মুক্ত রৌদ্র-বাতাসের স্পর্শ তাদের চমক লাগায়! আশেপাশে বরফ-গলা জলের ধারা কল্‌কল্ রবে হেসে ওঠে। তাদের ঘিরে ঘিরে জলের স্রোত ছুটে চলে। এঁকেবেঁকে—ছলছল শব্দ তুলে—পাথরের উপর থেকে পাথরে লাফিয়ে।

আমরাও চলি পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, ধারাগুলির পাশ দিয়ে। পায়ের জুতো যথাসম্ভব জল থেকে বাঁচিয়ে।

পথ-রেখা নেই। যেখান দিয়ে কোন রকমে যাওয়া যায়—সেইখান দিয়ে যাই, সেই আমাদের পথ। শুধু গন্তব্য-স্থানের দিকে দৃষ্টি আছে। বিদ্যা আঙুল দিয়ে দেখায়, ওই! ঐদিকে আজ আমাদের তাঁবু পড়বে।

কিন্তু পথ-দেখানোর অন্য লোকের আমাদের প্রয়োজন নেই।

সেই কুকুরটিই এগিয়ে চলেছে। পথ দেখিয়ে। খানিকটা ছুটে যায়। দাঁড়ায়। পিছনে ফিরে তাকায়। ঠিক আসছি দেখে আনন্দে লেজ নাড়ে। আবার এগিয়ে চলে। আবার দাঁড়ায়। ফিরে তাকায়। পেছিয়ে পড়েছি দেখে ছুটে ফিরে আসে কাছে। কিছুক্ষণ সঙ্গে চলে। আবার এগিয়ে যায়।

পথ জুড়ে বড় বড় পাথর পড়ে। হাতে ভর দিয়ে একটা পাথরের উপর উঠে আর একটা পাথরে ডিঙিয়ে চলি।

কুকুরটা অক্লেশে পাশের একটা বড় পাথরের উপর উঠে মাথা বেঁকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা নির্বিঘ্নে পার হলে সে ছুটে নেমে আসে। লেজ

নাড়তে নাড়তে হেলে দুলে আবার এগিয়ে চলে।

শিশিরবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, সাধে কি আর অত ওকে খাওয়াচ্ছি। ধর্ম! চলে আয়, দুটো বিস্কুট খেয়ে যা।

হেসে বলি, ঘুষ দিয়ে ধর্ম রাখার চেষ্টা হচ্ছে তো? কিন্তু আশ্চর্য! কুকুরটা এল কোত্থেকে? আমাদের সঙ্গেই তো চলল দেখছি।

ধর্ম কিন্তু বিস্কুটের লোভে আসে না। চুপ করে দাঁড়িয়েছে। কান খাড়া। একদৃষ্টে একটা পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে।

শিশিরবাবু বলেন, হল কি ওর? অমন করে দেখছে কি?

হঠাৎ তীরবেগে কুকুরটা ছুটে যায়।

ওর গতিপথ লক্ষ্য করে দেখি, অনতিদূরে ধূসর রঙের খরগোশ। মানস-সরোবরের পথেও ঐ ধরণের দেখেছিলাম। পর্বত-মূষিক শ্রেণীর। হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু লেজ নেই। কুকুরটার দিকে সেও মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। লম্বা দু' কান সোজা করে। অবাক দৃষ্টিতে। কুকুরটাকে হঠাৎ ছুটতে দেখে তার একাগ্রতা ভাঙে। স্প্রিং-এর মত লাফাতে লাফাতে সেও ছোটে, দুটো পাথরের মাঝখানে একটা গর্তে ঢুকে যায়। কুকুরটা সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক শুঁকতে থাকে, সামনের পা দুটো দিয়ে মাটি-বালি খোঁড়ে।

শিশিরবাবু ডাক দেন, ধর্ম! খুব হয়েছে, চলে আয় এদিকে। নিরীহ নিরামিষাশী একটি প্রাণী—আর তাকেই তুমি গেলে তাড়া করে। তোমার এখানেও সেই স্বভাব!

হেসে বলি, ভুলে গেলেন হিতোপদেশের শ্লোকটা—'শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা সঃ কিং নাশ্নাদুপানহম্।'

কুকুরটা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ফিরে আসে। লজ্জায় নয়, বোধ করি বিফলতার বিষন্নতায়। আবার পথ দেখিয়ে চলে। আমরাও এগিয়ে চলি। ফিরে দেখি, সেই পাথরটার কাছে খরগোশটা আবার বেরিয়েছে, পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসেছে, সামনের পা দুটো তুলে নাড়ছে, কানও নাচছে।

শিশরবাবু বলেন, কুকুরটাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে!

কিছুক্ষণ থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ পাচ্ছিলাম। এবার তার কারণ বুঝলাম।

বাঁদিকে নীলকণ্ঠ পর্বত। তারই অঙ্গ বেয়ে বহু ধারা নেমেছে। দীর্ঘদিন যে তুষাররাশি পর্বতের অঙ্গীভূত হয়ে স্থির ও স্তব্ধ ছিল, গ্রীষ্মের খরতাপ সূর্যের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে সেই নির্ঝরিণীদের নিদ্রা ভেঙেছে।

আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের মাথা থেকে ধারাগুলি ধেয়ে নামে ধরণীর বুকে। মুক্তির উচ্ছ্বাস নিয়ে। স্তব্ধতার পাষাণ হৃদয় শতভাগে বিদীর্ণ করে তারা ছুটে চলে শ্যামল ধরিত্রীর দিকে, পৃথিবীর মানুষের আশা মেটাতে—ক্ষুধার অন্নের ভাণ্ডার ভরাতে, তৃষ্ণার সুশীতল বারিপাত্র হাতে।

পথে দেখে এসেছি বসুধারা, একটি ধারামাত্র। তারই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। এখানে দেখি বহুধারা।

নামও শুনি—সহস্রধারা।

সামনেই পাঁচটি বড় বড় প্রপাত চোখে পড়ে। ভাবি, পুরাণ-কথিত এই কি পঞ্চধারা তীর্থ? বদরীনারায়ণ তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনায় হিমগিরির নৈঋত দিগ্‌ভাগে অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে। তীর্থগুলির নামকরণ আছে—প্রভাস, পুষ্কর, গয়া, নৈমিষ ও কুরুক্ষেত্র। ভগবানের আদেশে এই পঞ্চতীর্থের দেবতারা এইখানে তপস্যা করেন, শুনি।

সেই ধারাগুলি নেমে যেখানে নদীর আকারে বয়ে চলেছে, সেখানে পৌঁছুলাম। ওপারে যেতে হবে। পুল নেই। প্রয়োজনও নেই। কেন না, জলের গভীরতা নেই। সমতলভূমিতে জলস্রোতগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ছোটায় খুব বেশী টানও নেই। তবে, তুষারগলা জল,—মনে হয়, বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা। যেমন রৌদ্রের চেয়ে রৌদ্রতপ্ত বালির তাপ অসহ্য মনে হয়।

জুতো মোজা খুলে পার হই। শিশিরবাবুও প্রস্তুত হন। রতনসিং ছুটে আসে। বলে, আপনার ওসব খুলতে হবে না—পিঠে করে পার করিয়ে দিচ্ছি।

শিশিরবাবু আপত্তি করেন। বলেন, দরকার নেই কোন।

রতনসিং শোনে না। উদয়সিং ও পানসিং আসে। রতনসিং ও পানসিং-এর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়—কে বয়ে নিয়ে যাবে। উদয়সিং হুকুম দেয়, রতনসিং নিয়ে যাবে, ওই প্রথম এসেছে। শিশিরবাবুকে বলে, আপনি চুপ করে বসুন, কষ্ট করবেন না। এরা রয়েছে কিসের জন্যে?

রতনসিং টপ করে তাঁকে তুলে নেয়। যেন ছোট একটা ছেলেকে নিচ্ছে। পিঠে নিয়ে জলের উপর দিয়ে ছপছপ করে চলে। শিশিরবাবু হেসে চেঁচাতে থাকেন, আরে বাবা! ফেলে দিবি ফেলে দিবি! করছিস কি?

সবাই হেসে ওঠে।

নাম-ভোলা সে-ছেলেটি ওপারে একটা পাথরের উপর বসে পা দোলাচ্ছে। ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে জলে ফেলছে। সেও এদিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

ওপারে গিয়ে সামান্য চড়াই। তারপর আবার উঁচুনীচু পথ-চলা। অল্প বৃষ্টি নামে। তার মধ্যেই বর্ষাতি-কোট-গায়ে চলি। দেখতে দেখতে কোথা থেকে ঘনঘটা করে মেঘ আসে। জোরে জল নামে। পথের পাশে ছোট্ট এক গুহায় আশ্রয় নিই। হু-হু করে বাতাস ঢোকে। কনকনে শীত। পা নাচাই. হাতে হাত ঘষি। পকেট থেকে দস্তানা বার করে হাতে লাগাই। বিদ্যাকে বলেছিলাম, বদরীনাথ থেকে কয়েক প্যাকেট বিড়ি সিগারেট যেন সঙ্গে আনে। জানি, পথের মধ্যে পেলে উদয়সিংরা খুব খুশী হবে।

বিদ্যা বার করে তাদের দেয়। আনন্দে তাদের মুখ ভরে ওঠে। যেন, কি অমূল্য সম্পদ পেল। তখনি ধরিয়ে টানতে থাকে। আমাদের সঙ্গে এ-পথের

সম্বন্ধে নানান গল্প করে। প্রাণ খুলে কথা কয়। নিঃসঙ্কোচে। যেন কত দিনের বন্ধু সব।

বিদ্যাও সিগারেট ধরায়। সঙ্কোচভরে। ওরই মধ্যে যথাসম্ভব আড়াল রেখে টানে।

মানুষে মানুষে সরল মিলনের যে সহজ সুন্দর রূপ, পাহাড়ী হলেও চাপরাসের চাপে সে তা হারিয়ে ফেলেছে।

এইবার সেই শিরদাঁড়া পথ শুরু হল। ইংরাজি ভাষায় Razor-edged ridge।

মানুষের শিরদাঁড়ার মত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অতিকায় যে-সব জীবজন্তু ছিল—যাদের কঙ্কাল এখন যাদুঘরে রক্ষিত হয়ে বিস্ময় জাগায়—তাদেরই মধ্যে ডাইনোস্যার (Dinosaur)-এর শিরদাঁড়ার মত। সেই বিরাটকায় জীবের আকার বহু সহস্র গুণ করলে যত প্রকাণ্ড হয়—সেই রকমই এক প্রাণীর কঙ্কাল যেন দুই দিকের গিরিশ্রেণীর মাঝখানে দীর্ঘাকারে শায়িত আছে। তারি উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। একটা সরু লাইনের উপর দিয়ে চলা। দুই দিকেই পাহাড়ের ঢালু গা। নীচে তিন-চারশ ফুট সোজা নেমে গেছে। কোন রকমে ভার সামলে চলি। কোথাও সামনে পথ জুড়ে পাথরের স্তূপ—এগিয়ে যাবার উপায় দেখি না। বিদ্যার হাত ধরে এক পাশের সেই ঢালু গায়ের উপর কোন রকমে পা-রেখে পার হই। যদি হঠাৎ পদস্খলন হয়—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি। বিদ্যা বলে উঠে, ওদিকে তাকাবেন না—শুধু পা-টুকুর ওপরই নজর রেখে পা ফেলুন।

ভাবি, এ কি অর্জুনের অস্ত্র-শিক্ষার একাগ্রতার কথা। গাছ নয়, ডাল নয়, পাতা নয়—শুধু পাখী; তারও আবার কেবল চোখটুকু দেখা! 'অন্য দিকে দেখো না'—কথাগুলি বলা তো সহজ। কিন্তু না তাকিয়ে উপায় কই? চোখের দৃষ্টি কে যেন সজোরে টেনে নিয়ে যায়। দেখি, বহু নীচে মাটি বালি—ছোট বড় পাথরে-ভরা রুক্ষ কর্কশ ধরিত্রীর দেহ। মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, উপরের মাটির ও বালির আস্তরণের অভ্যন্তরে সাদা বরফের স্তর,— কোথাও বা সেই সব তুষার গলে জলের ধারা বার হচ্ছে। সুন্দরী প্রকৃতির স্নিগ্ধ শোভা নয়—মৃত্যু-মলিন হিমশীতল শ্মশানক্ষেত্রে যেন এক বিকৃত শবদেহ পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শাণিত অস্ত্রে কে যেন কেটে রেখে গেছে —ক্ষতদেহের অভ্যন্তরে বিবর্ণ সাদা সাদা মেদ-মজ্জার কদর্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে!

মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। কিন্তু তবুও এই ভয়াবহ পথে, কেন জানি না, মনে মরণের ভয় জাগে না। কেমন এক নির্বিকার নিশ্চিন্ত অনুভূতি। দয়া মায়া স্নেহ—মানব-মনের কোমল বৃত্তিগুলি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। চারিদিকের আকাশচুম্বী তুষার-শিখরগুলির মহান সৌম্য দ্যুতি,

জটাধারী নগাধিরাজের ধ্যানগম্ভীর বিরাট স্তব্ধ মূর্তি মনের ভিতর এক অপার্থিব ভাব আনে। জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ মনে হয়। আত্ম-পরের ভেদ ঘোচে। মনে ভয়-ভাবনার লেশ থাকে না। অন্তরে বাইরে যেদিকে তাকাই সবই মনে হয় বিরাট এক শক্তির অংশমাত্র। ক্ষুদ্র মানব সেখানে অতি নগণ্য অণু-পরমাণু মাত্র। তার বাঁচা-মরা—হিমালয়ের অঙ্গে ধূলিকণার থাকা না-থাকার মতই—অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

মনে পড়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা। কারও কারও মতে এই পথেই নাকি গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানে। মহাভারতকারের বর্ণনা—"দুঃসহোগ্রদুঃখগ্রস্ত" পান্ডবগণ। "ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ।" মহাগিরি হিমবন্তের এই তুষার-রাজ্যে এসে তাঁরা দেখেন "মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্।" দুর্গম পথে সবাই চলেছিলেন সারি বেঁধে—'যোগযুক্তা'—'যোগধর্মী'। অকস্মাৎ পশ্চাতে দ্রৌপদীর পতন ঘটল। ধ্যান থেকে স্খলিতমানস হয়ে। "যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে।"

বিমর্ষ সন্ত্রস্ত মধ্যম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ধর্মরাজ দৃক্‌পাত না করে এগিয়ে চলেন। একে একে প্রিয় ভ্রাতাদেরও পতন হয়। তবুও যুধিষ্ঠির নির্বিকার। পিছন ফিরে তাকান না। ফিরে তাকানো? সে তো স্বর্গান্তরায়রূপ স্নেহেরই নিদর্শন! সে-স্নেহের বন্ধন মুক্ত হয়েই তো স্বর্গপথে তিনি চলেছেন।

রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষের মনে যে এই নির্বিকার স্নেহ-শূন্য ভাবের আবির্ভাব অসম্ভব নয়—মনে মনে আজ স্পষ্ট অনুভব করি।

শুধু সেই মহাভারতীয় যুগের কাহিনীই নয়; মনে পড়ে বদরীনাথের সেই বৃদ্ধ স্বামীজীর মুখে শোনা গল্প—উত্তরপ্রদেশবাসী সেই যাত্রীটির কথা। এই-খানেই না তাঁর সহধর্মিণীর পতন সত্ত্বেও ফিরে তাকান নি! এখন ভাবি, হয়তো সেও সত্য হবে।

এই সূত্রে আর একটি আধুনিক ঘটনাও মনে আসে।

হিমালয় নয়। হাওড়া স্টেশনে। একটি পশ্চিমগামী ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। তারই এক কামরায় বসে এক সাধু-যাত্রী। দুটি যুবক তাঁর দর্শনে এসেছে। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে থেকে সহযাত্রীরা বুঝতে পারেন, ছেলে দুটি দূর থেকে স্টেশনে এসেছে শুধু তাঁরই সঙ্গে, তাঁর যাবার পথে দেখা করতে। শেষ সময় পর্যন্ত তারা বসে থাকে,—যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকা যায়। ঘণ্টা বাজে। ট্রেন ছাড়ে। অন্য যাত্রীরা তাদের নেমে যেতে তাগাদা দেয়। চলন্ত গাড়ি থেকে তারা লাফিয়ে নামে। তাদেরই একজনের অকস্মাৎ বিপদ ঘটে। নামতে গিয়ে পড়ে যায়। চারিদিকে আতঙ্কিত রব ওঠে। যাত্রীরা চেন টেনে ট্রেন থামায়। লোকজন ছোটে। ভিড় জমে। যে যেমন পারে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। স্ট্রেচার আসে। তার অচৈতন্য দেহখানি নিয়ে চলে যায়। আবার ট্রেন ছাড়ে।

সকলের এত উত্তেজনা, এত করুণ কলরব,—কিন্তু সাধুটির অদ্ভুত আচরণ। সম্পূর্ণ নির্বিকার,—নীরব, নিশ্চল। একবারও নিজের স্থান ছেড়ে নড়েন নি—জানালা দিয়ে তাকিয়েও দেখেন নি। সারাক্ষণই স্থির হয়ে বসে ছিলেন। ট্রেন ছাড়লে বিক্ষুব্ধ সহযাত্রীরা তাঁকে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করতে থাকে। তাঁকেই দেখতে আসার জন্যে ছেলেটির এই বিপত্তি, অথচ এ কী তাঁর অমানুষিক আচরণ। গেরুয়াধারী ভণ্ড সন্ন্যাসী।

সাধু তাতেও নির্বিকার। প্রতিবাদ করেন না। কোন কথাও বলেন না। মুখমণ্ডলে অন্য কোন ভাবও প্রকাশ পায় না। প্রশান্ত আত্মভোলা মূর্তি।

মহাপ্রস্থানের পথের সেই কাহিনীর ও আধুনিক যুগের এই ঘটনাগুলির উপর নূতন আলোকপাত হয়।

এই আলোকের প্রকৃত স্বরূপ কি, কোথা থেকে আসে, কেনই বা আসে—সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। শুধু বুঝি, জগতের সব কিছু দেখার গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে। মনে হয় যেন এতদিন সিনেমা-হল-এর অন্ধকার ঘরে কৃত্রিম আলোকে রূপালী পর্দার উপর মানুষের চলন্ত ছবি দেখছিলাম। হঠাৎ যেন চারিদিকের বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়ে দিনের শুভ্র আলোক ঘর ভরিয়ে দিল। সিনেমার সেই সব উজ্জ্বল জীবন্তপ্রায় মূর্তিগুলি সে-আলোয় বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেল, পটের উপর সুন্দর দৃশ্যাবলী তাদের পরিপ্রেক্ষিত (perspective) হারিয়ে ফেলল। যাদের মনে হচ্ছিল যেন সজীব মানুষ—এখন দিনের তীব্র আলোক নির্মমভাবে প্রকাশ করে তাদের অলীক রূপ, মিথ্যা পরিবেশ। শুধু চিত্র মাত্র,—মায়ায় রচিত সংসার-মঞ্চে সুসজ্জিত নট-নটীর অভিনয়। ক্ষণিকের কপট মান-অভিমান, দুদিনের অলীক স্নেহ-ভালবাসা।

এ কার আলো ? কিসের আলো ?—তাই ভাবি।

॥ ১৫ ॥

বিকেলে এসে পেঁছুলাম চক্রতীর্থে।

ঘণ্টা পাঁচ-ছয় চলেছি। ভাবলাম, কয়েক মাইল নিশ্চয় এগিয়েছি। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হই,—লক্ষ্মীবন থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। এত ধীরে ধীরে সাবধানে চলা! অলক্ষ্যে সময় কেটেছে, পথ এগোয় নি। তাতে ক্ষতি নেই। ধীরে-সুস্থে যাব, ঠিক আছে। হাতে সময়ের টানাটানি নেই।

সার্ভে ম্যাপ্-এ এ-স্থানটির নাম লেখা আছে মাজ্না। গ্রাম নেই, কোন বসতিও নেই। মাজ্না নামের অর্থ জানি না। কিন্তু চক্রতীর্থ-নামকরণের ব্যাখ্যা শুনি।

চারিদিকে আকাশচুম্বী তুষার-কিরীট গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে প্রায় চক্রাকারে বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। মনে হয়, পাহাড়ে ঘেরা যেন গোলাকার বৃহৎ হ্রদ ছিল—এখন শুকিয়ে গিয়ে পাথর-বিছানো ময়দান-রূপে পড়ে আছে। তারই বুকে দু-একটা ঝরনার ধারা এখনও এঁকে-বেঁকে চলেছে।

চক্রতীর্থ নামের পৌরাণিক কাহিনীরও প্রচলন আছে। নারায়ণ যখন যোগাসনে বসেন, এইখানে তাঁর সুদর্শন চক্রটি রেখেছিলেন। আবার শুনি, অর্জুন এই পুণ্যতীর্থে তপস্যা করে শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন।

প্রান্তরের একটু উপরে রাশীকৃত পাথরের মধ্যে কয়েকটি গুহা। তারই কাছে তাঁবু ফেলা হয়। একটা পাথরের উপর বসে গরম চা পান করি। তুষার-শিখরগুলির উপর অস্তগামী সূর্যের রশ্মি পড়ে। বিচিত্র বর্ণের ছটা ফোটে। দেখে মনে রঙের পরশ লাগে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। আকাশের লাল আলো ম্লান হয়। বাতাসের হিমস্পর্শ শিহরণ জাগায়। তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি। ভিতরে ছোট লণ্ঠন জ্বলে। সেই লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলো তাঁবুর ছোট দরজার মুখে দিনের নিবে-আসা শেষ আলোটুকুকে বাইরে ঠেলে দেয়। বাইরে মনে হয় গাঢ় আঁধার, তারই মধ্যে পাহাড়ের আরো কালো বিকট বিশাল দেহ। হঠাৎ সেই পাহাড়ের মাথায় ফুটে ওঠে সাথী-হারা একটি মাত্র তারা। জ্বল্‌জ্বল্‌ করে কাঁপতে থাকে। মনে করিয়ে দেয় একচক্ষু দানব সাইক্লোপের ভয়াবহ দৃষ্টি।

তাঁবুর বাইরে ও ভিতরে বসে মনের এ কি পরিবর্তন!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কম্বল-শয্যা নিই।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ শুনি। শিশিরবাবু বলে ওঠেন, তাই তো! বৃষ্টি শুরু হবে নাকি? সন্ধ্যেবেলায় আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল—এত মেঘ এরই মধ্যে জমল কোত্থেকে?

কিন্তু, আশ্চর্য! তাঁবুর উপর বৃষ্টি পড়ার কোন রকম শব্দ শুনি না। অথচ আবার বাজ পড়ার শব্দ ওঠে। দু'জনে কৌতূহলে মুড়িসুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসি। দেখি, মেঘহীন সুনীল আকাশ। তারার আলোয় ফুটফুট করছে। যেন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। তবে শব্দ ওঠে কোথায়? বিনা মেঘে সত্যই কি এদেশে বজ্রপাত হয়?

এই অশনি-নিনাদের কারণ বুঝি পরের দিন।

চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে চলেছি। অল্প চড়াই। সামান্য হলেও পাহাড়ের এই চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে সহজেই ক্লান্তি আসে। গলার ভিতরে কেমন শুষ্ক ভাব। জল খেলে ক্ষণিকের জন্যে ভেজে বটে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। আবার তখনই শুকিয়ে ওঠে। যেন, তপ্ত বালির উপর দু' ফোঁটা জল পড়েই খট্‌খটে হয়ে যাওয়া। মাথাও একটু ভার হয়ে থাকে। ন্যাক্কার-বোধও কখনো জাগে। চোখে রঙিন চশমা। কনকনে বাতাস যাতে না লাগে: বরফের উপর রোদের প্রখর আলোর কঠোর দীপ্তি চোখে আঘাত না করে। সারা শরীরে ও মাথার ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি ভাব। চশমা খুললেই বুঝতে পারি—চোখের পাতাও ভারী মনে হয়, দৃষ্টিশক্তি কিসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে হয় যেন গাঢ় নিদ্রা থেকে এইমাত্র উঠেছি—ঘুমঘোর এখনও কাটে নি।

বেশ বুঝি, হিমালয়ের এই উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম বিশুষ্ক আবহাওয়া অনভ্যস্ত শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দু-এক দিনের পরিচয়েই এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর হবে। হয়ও তাই দেখি।

চড়াই-শেষে পাহাড়ের অপরদিকে নামা। পায়ের তলায় বালি-মাটি-পাথরের কুচি ঝুরঝুর করে ঝরতে থাকে। বিদ্যার হাত ধরি। লাঠিতে ভর দিই। লম্বা লাঠির এখানেই প্রয়োজনীয়তা বুঝি।

তারপর আবার উঁচুনীচু পথ। ছড়ানো পাথরের উপর থেকে আর এক পাথরের উপর পা ফেলে ফেলে চলা। পায়ের তলায় দেহের ভারে পাথর টল্‌মল্‌ করে ওঠে। যেমন গোমুখের পথে। কখনো বা আবার সেই শিরদাঁড়া পথ।

চারিদিক রৌদ্রে ঝলমল করছে। হঠাৎ আবার শুনি গতরাত্রির সেই প্রচণ্ড বজ্রপাতের মত শব্দ। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখি।

দূরে নীলকণ্ঠ পর্বতের গা থেকে বরফের স্তূপ ভেঙে পড়ছে। হিমানী-সম্প্রপাত—Avalanche!

যেখানে বরফ ভাঙছে তারই আশেপাশে বাষ্প ও তুষারকণা পুঞ্জীভূত হয়ে সাদা মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। যেন নিদ্রিত বিশালকায় এক পশুরাজ হঠাৎ জেগে হুংকার রবে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পাহাড়ের নীচের অংশ ধূসর ও পিঙ্গলবর্ণ। তুষারশূন্য। চক্ষের পলকে দেখি উপরের সেই শুভ্র বাষ্পমণ্ডলী ভেদ করে সাদা বরফের লেলিহান জিহ্বা নীচে সেই পাহাড়ের গায়ে এঁকে-বেঁকে বিদ্যুৎবেগে নামতে থাকে। চারিদিকে ছোট বড় শব্দ ওঠে। এপারের পাহাড়গুলি সেই শব্দ লোফালুফি করে প্রতিধ্বনি তোলে।

তারপর হঠাৎ আবার সব শান্ত। শব্দহীন, গতিহীন। যেন, স্বপ্ন;—কোথাও কিছু ঘটে নি।

অথচ দূরে দেখি—এই ক্ষণিক প্রলয়ের রেখে-যাওয়া সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি। এই কিছু আগে যেখানে বরফ ছিল না, সেখানে বরফ ছেয়ে গেছে। যে তুষারস্তূপ থেকে হিমানী-সম্প্রপাত হল—সেখানে অবশিষ্ট তুষার-অঙ্গে অপূর্ব বর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বরফের সাদা ধবধবে রূপ আর সেখানে নেই—ভেঙে যাওয়া অংশে নীল সবুজ স্বচ্ছ শক্ত তুষার দেখা যায়—যেন ভাঙা নীল কাঁচের বোতল। তারই উপর সূর্যের কিরণ বর্ণ-বিন্যাস জাগায়।

স্তম্ভিত হয়ে দেখি। ভাবি, অকস্মাৎ ধ্যান ভেঙে নটরাজ বুঝি তাঁর প্রলয় নাচন শুরু করেছিলেন। নৃত্যের তাণ্ডব তালে ধূর্জটির শুভ্র জটাভারের কয়েকটি বাঁধন খুলে তাঁর ভস্ম-ধূসর অঙ্গে ছড়িয়ে গেল। নৃত্যশেষে এখন আবার যোগী-রাজের সেই চিরন্তন ধ্যানস্তব্ধ শান্ত মূর্তি।

আশঙ্কাহীন ব্যবধান রেখে সব কিছু দেখা। তাই নিঃশঙ্ক চিত্তে নিশ্চিন্ত মনে হিমালয়ের এই প্রলয়ঙ্কর রূপের বিরাট সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি।

কিন্তু জানি, তুষার-শিখর-অভিযানকারীদের কাছে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়। সেই ধ্বংসোন্মুখ তুষার-স্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাছে এই হিমানী-প্রপাত মঙ্গলময় সৌন্দর্যের বার্তা আনে না,—ভ্রূকুটি-কুটিল নিশ্চিত-মরণের দূত মাত্র। তবু অজানা কিসের এক আকর্ষণে তাঁরা দুর্জয় সাহস সঞ্চয় ক'রে সেই মৃত্যুসঙ্কুল তুষার-রাজ্যে এগিয়ে যান—কোন্ বরফের স্তূপে avalanche-এর কতখানি আশঙ্কা আছে—কোন্ সময়েই বা ঘটতে পারে—কি উপায়েই বা সেই বিপদ কাটানো সম্ভব—এ সবই তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় জানা থাকে,—তবুও কখনও কখনও রুদ্র হিমালয়ের এই আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাত ধূলিকণার মত তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মরণের মধ্যে অমর জীবন লাভ করে তাঁরা হিমালয়ের বুকে বিরাজ করতে থাকেন।

শিশিরবাবু বলেন, এতক্ষণে বেশ বোঝা গেল গতকাল রাত্রের বিনা মেঘে বজ্রঘাতের শব্দের কারণ। ভীষণ-সুন্দর একেই বলে। সুরম্য-দারুণ।

একটু পরের ঘটনা।

শিরদাঁড়া পথ দিয়ে চলেছি। অতি সাবধানে। কোন রকমে পায়ের উপর ভর রেখে শরীরের ভার সামলে। ডাইনে বাঁয়ে—দু'পাশেই গভীর খাদ। পথ আগেও ছিল না, এখানেও নেই। উদয়সিংরা এগিয়ে চলেছে। তাদের অনুসরণ করে আমরাও চলেছি। কুকুরটা, কিন্তু, দেখি এক জায়গায় নীচের দিকে নেমে গেল। যাবার আগে ক'বার ডাকাডাকি করল। তারপর নীচে দিয়ে সোজা এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে আবার ছুটে উপরের দিকে উঠে আসে—মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়ের নীচের অংশ দেখায়, ছুটে নীচে সেদিকে নেমে যায়—আবার উপরে উঠে আসে। ওঠা-নামার ক্লান্তিতে লম্বা লকলকে জিব্ ব... হয়। বেশ বোঝা যায়, সে আমাদের নীচের দিকে যাবার জন্যেই বার বার সঙ্কেত করছে। বিদ্যাকে সে-কথা বলি। জিজ্ঞাসা করি, ঠিক পথে চলেছি তো?

বিদ্যা বলে, ঠিকই যাচ্ছি। ঐ তো উদয়সিংরাও এই দিক দিয়েই চলেছে। যেতে হবে ঐ যে দূরে কালো পাথরগুলি দেখছেন—তারই পাশ দিয়ে।

এ-সব পথে ঐ রকমই পথ-চিহ্ন। আবার বছর বছর বদলেও যায়। বেশী বরফ পড়লে, পাহাড় ভাঙলে নতুন দিক দিয়ে তখন যেতে হয়। পূর্বগামী যাত্রীরা—কদাচিৎ কখনো যাঁরা আসেন—পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে রেখে যান, মানুষের হাতে সাজানো বোঝা যায়। পথ-সঙ্কেতের কাজ করে। পুরনো বছরের সাজানো পাথরগুলি কখনো কখনো দিগ্‌ভ্রমও করায়।

বিদ্যার কথামত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। অনেকখানি নীচে কুকুরটিও এগিয়ে চলে—মাথা তুলে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকায়, কখনো বা ডাক ছাড়ে।

অনেকখানি আসার পর দেখি, উদয়সিংরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। কাছে গিয়ে নজর করি সামনেই পাহাড় সোজা হয়ে ধসে গেছে। এগোবার উপায় নেই,

নামবারও পথ নেই।

নীচে কুকুরটার দিকে তাকাই। মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আমাদের দিকে। ভাবটা, যেন—এ দুক্ষণ ধরে বলছি না!

অনেকখানি পথ আবার ফিরতে হয়, তবে নীচে নামার মত পথ পাই। কুকুরটা ছুটে আমাদের কাছে ফিরে আসে। আমাদের ফিরতে দেখে স্ফূর্তিতে লেজ নাড়তে থাকে, তার আনন্দ উছলে পড়ে। আবার পথ দেখাতে দেখাতে হেলে-দুলে এগিয়ে চলে।

মনে কিসের এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করি।

ধীরে ধীরে পথ চলি।

ছড়ানো বড় বড় পাথরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া কতকগুলি ঝরনা-ধারা পাই। জমির উপরে পাথরের আশেপাশে এখানে এখনও সাদা বরফ জমে রয়েছে। কোথাও বা বরফ গলে জলের স্রোত নামছে। জলে বরফের টুকরাও ভেসে চলেছে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ধারাগুলি পার হই। বরফের উপর অতি সাবধানে পা ফেলি। চামড়ার জুতার সাধারণ তলা পিছলে যায়। লাঠিতে ভর দিই, কখনো বা বিদ্যার হাত ধরি।

অনেকক্ষণ ধরেই বিদ্যা সামনে দেখাচ্ছিল,—ঐ যে উঁচু জায়গাটা দেখছেন —ছোট পাহাড়ের মত—ওর উপর যেতে হবে। ওখানে উঠলেই 'শতোপন্থ তাল'ও দেখতে পাবেন।

শিশিরবাবু একটু দাঁড়াবার সুযোগ পান। দম নিয়ে বলেন,—দেখতে তো পাব—কিন্তু তারপর ওখান থেকে আরও কত দূর?

বিদ্যা হাসিমুখে আশ্বাস দেয়, ওখানে উঠলেই তো পেঁছে গেলেন, উঠেই অপর দিকে অল্প একটু নামতে হবে।

শিশিরবাবু হাঁফ ছেড়ে বলেন, যাক্ তাহলে আসা গেল। ওখানে তো এখনই পেঁছে যাব।

কিন্তু দেখতে অতি-নিকটে হলেও পেঁছতে বেশ সময় লাগে। হিমালয়ের উচ্চস্তরে শুষ্ক, ধূলিশূন্য, নির্মল পরিবেশ—বহুদূরের জিনিসও সন্নিকটে মনে হয়,—দূরত্বে ভ্রম জাগায়। পাহাড়ের উপরে দূরে ঐ যে কালো পাথরটি—তার গায়ের প্রতি রেখাটি পর্যন্ত এখান থেকে সুস্পষ্ট নজরে পড়ে—যেন পাশে এসে দেখা। এখানকার সূক্ষ্ম আবহাওয়ায় মনে হয় যেন অলক্ষ্যে বসে কোন এক যাদুকর আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ চির-পরিচিত ধ্যান-ধারণাগুলি ভেঙে দিচ্ছে।

দূরের সেই উঁচু লম্বা জায়গাটি একটা বাঁধের মত। শেষ চড়াই জেনে সেটুকু উঠতে নতুন উৎসাহ আসে।

বিদ্যা ঠিকই বলেছে। ঐ তো শতোপন্থ তাল! নীচে দেখা যায়।

ততঃ সত্যপদন্নাম তীর্থং সর্বমনোহরম্।
ত্রিকোণাকারমেবৈতৎ কুণ্ডং কল্মষনাশনম্ ॥

স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের বর্ণনা।

বিস্মিত হয়ে দেখি, সত্যই তো পুরাণকারের নিখুঁত বিবরণ—ত্রিকোণ আকার। যেন ধরিত্রীর বুকে আঁকা ভারতের মানচিত্র।

শুনি, তিন কোণে তিন দেবতার অধিষ্ঠান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁরা সেখানে ধ্যানরত। 'ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিকোণস্থাঃ সমাহিতাঃ।' শ্রেষ্ঠ দেবতার তপস্যাক্ষেত্র। মানুষের গড়া কোথাও কোন মন্দির নেই। প্রকৃতির প্রাকৃতিক দেবায়তন। ঊর্ধ্বে সুনীল আকাশ। চারিপাশে অমলধবল তুষার-প্রাকার। যেন শ্বেত-পাথরের গড়া। নিম্নতলে বিস্তীর্ণ বারিরাশি। নিস্তরঙ্গ স্ফটিকস্বচ্ছ, প্রশান্ত সরোবর। সর্ব-মনোহর। যেন নীলকণ্ঠের কণ্ঠে দোলে নীলকান্ত মণি।

ত্রিকোণমণ্ডিতং তীর্থং নাম্না সত্যপদপ্রদম্।
দর্শনীয়ং প্রযত্নেন সর্বৈঃ পাপমুমুক্ষুভিঃ॥

দুর্গম পথের অশেষ ক্লান্তি কোথায় নিমেষে অন্তর্ধান করে। তবুও গতিবেগ সংযত করি। মাথা নত করে ধীরপদে হ্রদের তীরে নেমে চলি। প্রাণভরা অসীম আনন্দ। আঁখি-ভরা জল। ভক্তি-নত শিরে নামে দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে মানুষ-ভিখারী।

॥ ১৬ ॥

হ্রদের তীরে তাঁবু পড়ে।

সাগরবক্ষ থেকে এখানকার উচ্চতা—১৪.৪৪০ ফুট। মনে পড়ে, মানস-সরোবরের উচ্চতাও ১৪,৯৫০ ফুট। তবে সেই বিরাট হ্রদের বিস্তৃতি ২০০ বর্গ মাইল। ছোটখাটো সমুদ্রের মত। শতোপন্থ সে তুলনায় ক্ষুদ্র জলাশয়। এই হ্রদের পরিসীমা ছয় ফার্লঙ্ মাত্র। এক কোণ থেকে অপর কোণের দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লঙ্। চওড়া—এক ফার্লঙ্ ৬৪০ ফুট। বদরীনাথ থেকে সাড়ে পনেরো মাইল, চক্রতীর্থ থেকে তিন মাইল মাত্র।

শিশিরবাবু চেয়েছিলেন, তাঁবুর মুখ হ্রদের দিকে থাকবে। তাঁবুর ভিতরে বসে বা শুয়ে থাকলেও যাতে সারাক্ষণই হ্রদের দৃশ্য চোখে পড়ে।

বিদ্যা জানায়, তা তো হতে পারে না। বাতাস উঠলে ঐ দিক দিয়েই আসবে,—বরফের পাহাড়ের মাথা থেকে নামবে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া, তখন ভারী তক্‌লিফ্ হবে। সারাদিন বাইরে রোদে কাটবে। রাত্তিরের জন্য তো তাঁবু। তখন তাঁবুর চারিদিক বন্ধ থাকবে।

তার উপদেশ আদেশ ভাবেই মানতে হয়।

শিশিরবাবু জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে তাঁবুর মধ্যে ঢোকেন। আমি যাই উদয়সিংদের থাকবার কি ব্যবস্থা হল দেখতে।

তারা থাকবে কাছেই দুটা গুহায়। শুনি, নিকটে আরও গুহা আছে। দু-একটা বেশ বড়ও। দশ-বারো হাত লম্বা হবে। উদয়সিং হুঁকা হাতে এসে

দাঁড়ায়। এরি মধ্যে নতুন করে কল্কে ধরিয়েছে। পথ হাঁটেও সে অনেক সময় হুঁকা হাতে। হাসিভরা মুখে বলে, তাঁবুর চেয়ে এ-সব গুম্ফা ভালো। এখানে এসে রাত্তিরে থাক। এখানে ঠাণ্ডা কম। শীতে গুম্ফার ভেতর গরম থাকে। আবার ধূপের সময় ঠাণ্ডা রাখে।

এ কি! গুহার মুখে সেই চলমান 'বার্ণাম উড'! একরাশ শুকনো ডাল-পালা নিয়ে কে ঢোকে? ডালগুলির ফাঁকে দেখি সেই আপন-নাম-ভোলা ছেলেটি। শব্দ করে মাথার ও হাতের বোঝা গুহার একপাশে নামায়। ক্লান্তিভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দিনশেষে নিজের কর্তব্য শেষ হওয়ায় স্বস্তিবোধের আনন্দ ফুটে ওঠে। পকেট থেকে কি একটা বার করে হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই শুনতে পাই দূর থেকে ভেসে আসা তার বাঁশীর সুর।

উদয়সিং-এর কাছে শুনি, হ্রদের তীরের এক অঞ্চলে কয়েকটা ঝোপ আছে। সেখান থেকে এই কাঠ-সংগ্রহ। সারারাত আগুন জ্বলবে। গুহা গরম থাকবে। দেখি, জুনিপার-এর ডালপালা। কৈলাসের পথেও পেয়েছিলাম।

গুহার একপাশে ছড়ানো কাপড়ের টুকরা, ছেঁড়া কাগজপত্র—চিত্র-বিচিত্র। দেখে মনে হয় যেন ছিন্ন কোষ্ঠীপত্র। জিজ্ঞাসা করে জানি, ঠিক তাই। মানা প্রভৃতি গ্রামের মার্চা অধিবাসীরা এখানে প্রতি বছর শ্রাদ্ধ করতে আসে, মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। বদরীনাথে ব্রহ্মকপালে যেমন হিন্দুযাত্রীদের পিণ্ডদানের বিধি আছে, এই অঞ্চলের পাহাড়ীদেরও তেমনি শতোপন্থে পিণ্ডদানের প্রথা। বদরীনাথে তারা দেয় না। বোধ করি তাঁদের ঘরের অতি নিকটে বলে তাদের চোখে সেখানকার ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য এর তুলনায় কম। গ্রামের যে-কোন লোকের মৃত্যু হলে সকলেই মাথা মুণ্ডন করে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব শতোপন্থে আসে শ্রাদ্ধ করতে। ছিন্ন কোষ্ঠীপত্রগুলি তারই নিদর্শন।

তাঁবুতে ফিরে আসি।

শিশিরবাবু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছেন। ছোট্ট তাঁবু। আমাদের দু'জনের জন্যে যথেষ্ট। তাঁবুর মুখে রাখা হয়েছে আমাদের বাক্স। টেবিলের কাজ করবে। খুচরা জিনিসপত্র তার উপরে সাজানো। খাওয়ার সময় থালাও বসবে ঐখানে। তাঁবুর সঙ্গে জোড়া দেওয়া মাটির উপর বিছানো water-proof ground sheet। তার উপর আমাদের দু'জনের পাশাপাশি কম্বল-শয্যা পড়েছে। কলকাতা থেকে আনা একজোড়া কম্বলের উপর বদরীনাথের সেক্রেটারীর দেওয়া একটি তিব্বতী কম্বলও পাতা হয়েছে। গায়ে দেবার জন্যেও তিনি সেই ধরনের আরও একটা কম্বল দিয়েছেন। যেমন মোটা তেমনি গরম। ভারীও কম নয়। গায়ের উপর চাপা থাকলে দু-হাত তুলে তবে পাশ ফিরতে হয়। মনে হয় যেন একপাল জীবন্ত ভেড়া বুকের উপর চেপে বসেছে। গন্ধেও সে কথা স্মরণ করায়। শরীর গরম রাখার এত আয়োজন, তবুও শিশিরবাবু বলেন, রাতে শুতে হবে কিন্তু এইসব সোয়েটার, পুলওভার, গরম আণ্ডারওয়্যার, ফুল মোজা পরে—এমন কি

মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপ দিয়ে।

করাও হয় তাই। তবুও মনে হয় যেন গায়ে সামান্য কি আছে—কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে, কনকনে শীত ঢুকছে। পাশ ফিরলেই চমকে উঠি, বিছানার উপর বাইরের জমা-বরফ গলে জল গড়িয়ে এসেছে নাকি? এত হাওয়াই বা ঢোকে কোথা থেকে? মাথার কাছে তাঁবু কি খুলে গেল?

সবই ঠিক আছে। তবুও, প্রচণ্ড শীতে এমনি মনে হয়।

খালি হোল্ড-অলটা টেনে শিশিরবাবু দুজনের মাথার কাছে দেওয়াল করে রাখেন। তারপর, মাথা মুড়ি দেন। মুখ চাপা দিয়ে শোয়া আমার অভ্যাস নয়। দম আটকে আসে। নাকটুকু বার করে রাখি। একটু পরে নাকের ডগায় হাত দিয়ে দেখি যেন বরফের কুচি। অসাড়। তাড়াতাড়ি আবার চাপা দিই। হাঁটু দুটি গুটিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে একটু আয়েস পাই।

সকালে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, বালতিতে রাখা জল জমে বরফ হয়ে আছে। হ্রদের জলেব উপরও পাতলা বরফের একটা আচ্ছাদন পড়েছে—তা থেকে ধোঁয়ার মতন উঠছে,—ঠিক যেন কড়া-ভরা গরম দুধে সর পড়েছে।

এত শীত; তবুও আশ্চর্য। কুকুরটা সারারাত তাঁবুর বাইরে দরজার কাছে শুয়ে ছিল, সর্বাঙ্গে লোমের উপর তুহিন-আবরণ! আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়, গা ঝাড়ে, সামনের পা দুটা বিছিয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙে, তার পর লেজ নেড়ে কাছে আসে, পায়ের জুতার কাছে নাক এনে শোঁকে, লেজ নাড়তে নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে চলে।

একটু বেলা হলে বাঁধের উপর থেকে আচম্বিতে ডাক শুনি—'জয় রাম শ্রীরাম জয় সীতারাম!'

সকলে মুখ তুলে তাকাই। আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুত্তর দিই। বৈরাগীজি ছুটতে ছুটতে নেমে আসেন। সকলকে প্রেম-ভরা আলিঙ্গন করেন। খালি পা, শুধু গা—তার উপর সেই সাদা মোটা চাদর জড়ানো। মাথার দু'পাশ থেকে জটা নেমে দুই কাঁধের উপর পড়েছে,—যেন বটগাছের ঝুরি নেমেছে। মুখ-ভরা আনন্দের হাসি নিয়ে বলেন, কাল আপনারা ঠিকমত পৌঁছেছিলেন তো? পথে খুব বেশী কষ্ট হয় নি? আমি কাল যাত্রা করে পথে এক জায়গায় গুম্ফায় রাত কাটিয়েছিলাম—ভোরে উঠে চলে এসেছি।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করেন, শীতে কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয় খুব? একটা কম্বলও তো ছিল না?

তিনি হেসে বলেন, কষ্ট মোটেই না। সীতারাম কষ্ট পেতে দেন কই? হঠাৎ কোত্থেকে দুটো ভুটিয়া এসে হাজির—সারারাত একই গুম্ফায় ছিলাম। আগুন জেলেছিল—বড় আরামে কেটেছে। কষ্ট পাবার উপায় কই? ঐ দেখুন না—আসতে-না-আসতেই বিদ্যা গরম চা আনছে!

বলি, চলুন তা হলে ঐখানে ওই পাথরটার উপর উদয়সিংদের কাছে—ওরাই

চা করে পাঠিয়েছে, সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া যাক।

মাত্র দুদিন পরে দেখা। তবুও স্থান-কাল-ভেদে এমনি মনে হয় যেন কত কাল পরে হঠাৎ সকলে মিলিত হয়েছি। রোদে বসে গল্প করে আনন্দে সময় কাটে। বৈরাগীজি গায়ের চাদর ফেলে উঠে পড়েন। বলেন, এবার স্নান সেরে পুজোপাঠ করে নিই।

শিশিরবাবু বলেন, চলুন, আমিও হ্রদে একটা ডুব দিয়ে আসি, আর যখন এলামই এখানে তর্পণটাও করে নিই।—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি আর এখন স্নান করবেন কেন?—আর একটু বেলা হোক—রোদের আরও তেজ বাড়ুক।

নির্মল নীল হ্রদের জল। কোথাও কোন লতাপাতা সামান্য কুটি পর্যন্ত নেই। কিছু উড়ে পড়লে বা ভেসে এলে তখনি কোথা থেকে পাখী উড়ে আসে, ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে চলে যায়। ছোট ও বড় পাখী। বেশীর ভাগ ধূসর বরণ, কারো বা কালো রঙ্। মন্দিরের গৃহতল যেমন পূজারীরা ধূলিহীন ও মার্জিত করে রাখেন—এই হ্রদের জলরাশিও তেমনি সুপরিস্কৃত। মলিনতাশূন্য। দর্পণের মত ঝক্‌ঝক্ করে। হ্রদের তীরের বিক্ষিপ্ত পাথরগুলির—এমন কি দূরের তুষার-কিরীট শিখরশ্রেণীর প্রতিবিম্ব জলে জলছবি তোলে। বাতাসে মৃদু কম্পনে ঢেউ-এর বুকে ছায়াগুলি কাঁপতে থাকে।

বৈরাগীজি বলেন, ঐসব পাখীগুলিও শাপভ্রষ্ট দেবতা। ভাগ্যবান, তাই তাঁরা এমন স্থানে আছেন। ভগবানের সরোবর মার্জন করে রাখা ওঁদের পক্ষীজন্মের নিত্য করণীয় কাজ। একাদশীর দিন হরি স্বয়ং আসেন এখানে স্নান করতে। 'একাদশ্যাং হরিস্তত্র স্নয়মায়াতি পাবনে।' পড়েন নি পুরাণে? তাঁর পদানুসরণ করে মুনিগণও আসেন। দেবতাত্মা হিমালয়ের এই তো প্রকৃত দেবভূমি। থাকুন এখানে কিছুদিন—ভাগ্যে থাকে তো অনেক কিছু দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন। হরিবাসরের মধ্যাহ্ন-সময়ে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সুমধুর গীতধ্বনি এখানে শোনা যায়। কত বিচিত্র শঙ্খ-ঘণ্টার রোল—যেন বিশ্বজোড়া বিরাট মন্দিরে পূজারতির ধুম লাগে।

মনে পড়ে হেমকুণ্ডের কথা। সেই শিখ সাধুটিরও কাছে এই ধরণেরই বর্ণনা শুনেছিলাম।

সর্বাধিকারী মহাশয়ের সেই একশো বছর আগেকার ভ্রমণ-কাহিনীতেও এই ধরনের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে। হিমালয়ের গভীর অঞ্চলে নয়। লছমনঝোলার উপর দিয়ে গঙ্গার পরপারে যাওয়ার সময়। সে-কালে লছমনঝোলার পুল ছিল না। সত্যকার ঝোলাই ছিল। সেই দড়ির ঝোলার সাহায্যে গঙ্গার বেগবতী স্রোতধারা পার হওয়া স্বভাবতই তখন অতি কঠিন ও বিপদসঙ্কুল ছিল। যাত্রীরা প্রাণ হাতে করে পার হতেন। সর্বাধিকারী মহাশয় তার বর্ণনা লিখেছেন এইভাবে:

"ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞান হত হইল, তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচশত হাত রশি বিপরীত পাবে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। এইমত তিন রশি দেওয়া আছে। তিন রশিতে দেড় হাত প্রস্থ; ঐ রশিতে অর্ধ হস্ত অন্তর এক এক খাদি কাষ্ঠের থাক বান্ধা, যেমন সিঁড় মই এইমত থাক থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেল বন্ধ কোমর পর্যন্ত উচ্চ। তাহার উপরে দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া ঐ খাদি কাষ্ঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া, ভীত ব্যক্তি উপরের রজ্জু ধরিয়া গঙ্গা পার হইতে হয়।......ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আইলে প্রাণ সশঙ্কিত তাহার কারণ যে, ভাগীরথী গঙ্গা আছেন—তাঁহার জল এমত স্রোতবতী যে, দশ বার শত মণ যে প্রস্তর তাহাকে ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া, আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল দন্ত-কাষ্ঠের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশ-দেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল তথাচ তাহার কলকল শব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত নীচে এই বিকটরূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছুদূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আইলে অতিশয় আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য এই যে, পূর্ব পূর্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমনঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায় যে পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে, 'পান্থ! সাবধান পগধ্যান, মুখে বল রামনাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপনা!' এই শব্দ শূন্য-পথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোনক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে—দৈববাণী তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল।"

এখন লছমনঝোলার সেই ঝোলাও নেই, পারাপারের কোন ভয়ও নেই। এ-যুগে লছমনঝোলার লোহার শক্ত সেতু। মোটর চড়ে দলে দলে লোক পুলের কাছে নামে! নির্ভয়ে গঙ্গার সেই চিরন্তন উদ্দামধারা পার হয়। আধুনিক আবেষ্টনীর মধ্যে সেই একশো বছর আগেকার দৈববাণীর কাহিনী কোথায় মিলিয়ে গেছে!

কিন্তু শতোপন্থের দুর্গমতা তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে এখনও প্রকট আছে। তাই, সেখানে বসে শোনা অলৌকিক কাহিনী এখনও রোমাঞ্চ জাগায়। সেই জনমানবহীন তুষারময় হিমালয়ের নিস্তব্ধ প্রদেশে অনভ্যস্ত কর্ণকুহরে নানারূপ

শব্দের রেশ যে না বাজে এমন নয়। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক শব্দও প্রকৃতই শোনা যায়। সেই সব শব্দের প্রাকৃতিক কারণ নির্ণয় করাও হয়তো অসম্ভব নয়। তবুও বিশ্বাসী মনের কল্পনার তুলিতে সেই শব্দগুলিই দিব্য-রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

বিশ্বাসী মন আপন মনের মাধুরী নিয়ে কেমনভাবে আত্মজগৎ রচনা করতে পারে তা দেখেছিলাম বৃন্দাবনের চুরাশি ক্রোশ বন-পরিক্রমার পথে একটি ছোট্ট ঘটনায়।

সেদিন সকালের হাঁটা শেষ করে বনের প্রান্তে এক গ্রামে এসে পেঁছিলাম। সারাদিন এখানেই থাকা। রাত্রিবাসও। মা এসে বললেন, শুনছি এখান থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে এক বালক-সাধু থাকেন। মস্ত বড় ভক্ত। রোজই নাকি সাক্ষাৎ দর্শন পান। আমরা সবাই দেখতে যাচ্ছি। চল্, দেখে আসবি।

কেন জানি না, আমার তেমন কৌতূহল জাগে না। তাই যাইও না।

দর্শন করে মা ফিরে আসেন। মুখ-ভরা তৃপ্তির হাসি। উৎসাহভরে বলেন, গেলি না কেন? যা, এই তো অল্প দূরেই। দেখে আয়। খুব ভালো লাগল। ছেলেটি কি অদ্ভুত গল্প করলেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের।

মার কাছে তার গল্প শুনি।

মাত্র বছর চোদ্দ-পনেরো বালকটির বয়স। পিতা জেলা-জজ্। মা-বাপের একমাত্র সন্তান। আদরে যত্নে লালিত পালিত হলেও ছোট বয়স থেকেই গৃহত্যাগী মন। বছর তিন-চার আগে বাড়ি থেকে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পিতা তার সন্ধান পান, বাড়িতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু আবার সে গৃহত্যাগী হয়। পিতাও আবার জোর করে তাকে নিয়ে যান। সে আবার চলে আসে। এইভাবে কয়েকবার ঘটবার পর এখন সে এইখানেই থেকে গেছে। মাঝে মাঝে বাপ-মা এসে এখানে দেখা করে যান। বনের মধ্যে একটি গুহায় থাকে। কাছেই আর এক সাধু থাকেন। বালকটি জপতপ আরাধনা করে।

তার একখানি রামায়ণ পাওয়া সম্বন্ধেও অদ্ভুত গল্প শুনি। মা বলেন, গিয়ে তাঁর নিজের মুখেই শুনবি। আশ্চর্য।

দেখতে যাই।

বনের মধ্যে শান্ত স্থান। চারিদিকে বড় বড় গাছ। বিকেলের হেলে পড়া সূর্যে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। গাছের ডালে পাখীর মধুর কাকলী। ইতস্তত কয়েকটি শিলাখণ্ড পড়ে আছে। তারি একটির উপর বালক সাধুটি বসে এক মনে সুর করে কি পড়ছে। পিছন দিক থেকে এসেছি। সে জানতে পারে নি।

তার পরনে ছোট কাপড়। খালি গা। বুকের ও পিঠের উপর দিয়ে কাপড়ের একটা অংশ পাকিয়ে পৈতার মত ঘুরিয়ে দিয়ে কোমরে জড়ানো। শ্যাম বর্ণ।

চওড়া বুক। সরু কোমর। মাথার উপর চুলের জটা পাকিয়ে কুণ্ডলী করে রাখা। শরীর অল্প দুলিয়ে একমনে পড়ছে। সামনে খোলা পুঁথি। একটু শুনেই বুঝলাম—তুলসীদাসের রামায়ণ। আমাকে দেখতে পেয়ে মুখ তুলে তাকায়। টানা চোখ, লম্বা নাক। মুখে স্নিগ্ধ সরলতা। হঠাৎ মনে পড়ে একটি প্রাচীন চিত্র। বাল্মীকির আশ্রম। লবকুশ পাথরের উপর বসে রামায়ণ গান করছেন। অদূরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সীতা দেবী। কিছু দূরে একটি হরিণ। ঘাস ফেলে মুখ তুলে গান শুনছে। আরও দূরে গাছের ফাঁকে দেখা যায় গঙ্গার প্রশান্ত ধারা। সেই চিত্র থেকে এই বালকটি যেন একাকী জীবন্ত বার হয়ে এসেছে আজ এই বাস্তব জগতে।

পাশে বসে স্নেহভরে আলাপ করি। তার বালকসুলভ-সঙ্কোচ কাটে। তারপর মায়ের কাছে শোনা কাহিনীর জের টেনে তাকে প্রশ্ন করিঃ এ রামায়ণটি পেলে কোথা থেকে?

সে বলে, গ্রামের দোকান থেকে কিনেছি।

বলি, দাম নিয়েছিল কত? টাকা পেলে কোথায়?

সে উত্তর দেয়, একদিন গ্রামের দোকানে দেখে কিনতে ইচ্ছে হল। দাম চাইল দশ টাকা। ফিরে এসে বুড়ো সাধুর কাছে টাকা চাইলাম। তাঁর কাছে মাত্র পাঁচ টাকা ছিল। তিনি দিয়ে বললেন, 'আর টাকা তো আমার কাছে নেই। পারো তো তোমার কৃষ্ণজীর কাছে চেয়ে নিও।' তাই করলামও। রাতে কৃষ্ণজী এলে চাইলাম। সকালে উঠে দেখি, পুরো টাকা এসে গেছে। কিনে নিয়ে এলাম।

জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণজীকে তুমি দেখেছ? কবে শেষ দেখা হয়েছে?

বড় বড় চোখ দুটি তুলে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তাঁকে তো রোজই দেখি। এই তো তিনি এখনই আসবেন। বনের মধ্যে বাঁশী বেজে উঠবে। আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন ঐ গাছের তলায়। ডালে বাঁধা ঐ ঝোলায় আমায় বসাবেন, দোল দেবেন। তারপর তিনি নিজে বসবেন। আমি দোল দেব। কত খেলা দুজনে খেলব, বাঁশী বাজাব। সন্ধ্যা কেটে যাবে—রাত্রি এলে পাশে বসে তিনি গল্প করবেন—চোখে আমার ঘুম নামবে।

হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করে, কেন? তুমি দেখ নি তাঁকে। শোনো নি তাঁর বাঁশী? শুনবে আজ? চুপ করে থাক তবে আমার পাশে। একটু পরেই ঐ দিক দিয়ে আসবে সেই বাঁশীর ধ্বনি—তারপর ঐ হেলানো গাছের পাশ থেকে বার হবেন—মাথায় চূড়া বাঁধা—হাতে বাঁশী, মুখে হাসি—আমার কৃষ্ণজী!

আঙুল তুলে দেখায়, বনের মধ্যে গোধূলির আবছায়া আঁধারের দিকে। একটা গাছের ডালে মৃদু হাওয়ায় দুলছে শিকড় দিয়ে বোনা একটি ঝোলা।

তাকিয়ে থাকি। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিশ্বাসে-ভরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার সঙ্কোচবিহীন কথাগুলি শুনে আমার যুক্তিবাদী মনের সব কিছু অবিশ্বাস কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

ভাবি, সত্য মিথ্যা এও তো মানুষেরই সৃষ্টি। প্রয়োজনমত আমরাই গড়ি, আমরাই ভাঙি। এই ভক্ত বালকের কাছে—এই তো অতি-বড় সত্য। যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ম বিচারের শরাঘাতে নাই বা তার সেই আনন্দ-জগৎ জর্জরিত হল।

কিন্তু যুক্তিবাদী মানুষ তবু ছাড়ে না। বিচার করতে বসে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে।

মনে পড়ে, Aldous Huxley-র Devils of Loudon গ্রন্থে এই মনস্তত্ত্বেরই সূক্ষ্ম বিচারের কথা। এ-সবই বুঝি মনের ফাঁক বা মস্তিষ্কের বিকার। Psychic ব্যাপার।

William Blake-এর জড়াতীত জগতের বিচিত্র অনুভূতির কাহিনীও মনে আসে। দিব্যদৃষ্টিতে দিব্যদর্শনের (vision) বর্ণনা। সাধারণের ধারণা, তাঁর কাব্যে ছায়া পড়েছে তাঁর মানসিক বিকৃতির। কিন্তু তাঁর Spiritual Portraits-এ তিনি অতি সহজ ভাবেই প্রচার করেন: "You can see what I do if you choose. Work up imagination to the state of vision, and the thing is done.

ধর্ম সম্পর্কে আত্ম মত ও আত্ম-অভিজ্ঞতা একান্ত স্বকীয়। Cardinal Newman-এর অভিমতে—"In matters religious, egotism is true modesty. In religious enquiry, each of us can speak only for himself. His own experiences are enough for himself, but he cannot speak for others ; he cannot lay down the law, he can only bring his own experiences to the common stock of psychological facts."

কিন্তু ভারতীয় সাধু-মহাত্মাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনীর যথাযথ বিচার বা বিশ্লেষণ করা অত সহজ নয়। তাঁরা বলেন, এ-সবই দেহনির্মুক্ত আত্মার সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতির বিকাশ মাত্র। প্রকৃত সাধু স্থূল দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম দেহে বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করতে পারেন। এই অলৌকিক দর্শন সেই অভিজ্ঞতারই নিদর্শন।

সাধুরা আরও বলেন, এ আর অমন বিচিত্র কি ? সাধনার বলে সাধকের উন্নতি হয়। প্রথমে তৃতীয় নেত্র খোলে। তারপর খোলে দিব্যনেত্র। তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হলে ধ্যানাবস্থায় ভাবানুরূপ দেবতার দর্শন হয়। কিন্তু, দিব চক্ষু যখন খোলে তখন আর ধ্যানের প্রয়োজন হয় না, সাধক তখন যে কোন সময়ে যে কোন দেবতার দর্শন পেতে পারেন।

এ-সবই সাধুদের উক্তি। সাধুদের যুক্তি। সত্যকার সাধুরাই এর বিচার করতে পারেন।

জানি না, সেই বালক-সাধু কোন্ স্তরের ?

॥ ১৭ ॥

কিন্তু, থাক্ ওসব সাধু-সন্তদের অলৌকিক কাহিনী।

হিমালয়ের এই সকল দুর্গম নিভৃত অঞ্চল সাধারণ মানুষেরও প্রাণে যে বিচিত্র অনুভূতি জাগায়, সেই কথা বলি।

নিদারুণ গ্রীষ্মে রৌদ্রের রুদ্রতাপে মানুষের দেহে যখন জ্বালা ওঠে, সরোবরের শান্ত শীতল জলে অবগাহন স্নানে দেহ-মন স্নিগ্ধ হয়। তেমনি আবার অতি-অপরিচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় স্থানে ক্ষণিকের অবস্থানও দেহ-মনকে সঙ্কুচিত করে তোলে। মানুষের মনের উপর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর এই বিভিন্ন প্রভাব সকলেই সাধারণ জীবনে অনুভব করি। এর বৈজ্ঞানিক কারণও নিশ্চয় আছে। সেই কারণ বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু মর্মে মর্মে বোধ করি, হিমালয়ের এই শান্ত প্রদেশ মনে শান্তিময় অসামান্য এক অনুভূতি আনে।

বৈরাগীজি বলেন, এই তো এখানে স্বাভাবিক। কত প্রাচীন সিদ্ধ যোগী মহর্ষিদের তপস্যার ক্ষেত্র এসব। মহাত্মাদের আত্মার সংযোগে এখানকার আলো-বাতাস জলস্থল চারিদিক এক পবিত্র ভাবে সারাক্ষণই সঞ্জীবিত হয়ে থাকে, যেমন তোরঙ্গে ফুল রাখলে ভেতরের সব কিছু সুবাসিত হয়ে ওঠে। ঋষিদের যোগ-সিদ্ধির প্রভাবে এখানকার বায়ুমণ্ডল বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত একপ্রকার শক্তি বিকীরণ করে। প্রাণে আধ্যাত্মিক শিহরণ জাগায়। তাই তো সাধু-সন্তেরা সাধনার জন্যে এসব স্থানে আসন পাতেন। সিদ্ধির অতি অনুকূল পরিবেশ।

হ্রদের তীরে কালো মসৃণ একটি পাথরের উপর বসে সেই কথাই ভাবি। হবেও বা। নিজে সেই ভাবে বিভোর হয়ে সাধনা করতে না বসলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কি করে? কিন্তু তবুও মনে মনে বেশ অনুভব করি যে চারিদিকের আবহাওয়া এক অভূতপূর্ব প্রভাব মনের উপর বিস্তার করে। শহর-সভ্যতার মধ্যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে মনে যেসব সাধারণ ভাবের উদয় হয়, এখানে এখন অন্তরের নিভৃত কোণেও তাদের সন্ধান মেলে না। কোথায় যেন হারিয়ে যায়। প্রকৃতির বিরাট রূপরাজির মধ্যে নিজেকে নগণ্য, অতি সামান্য মনে হয়। দৈত্যাকার গিরিরাজ্যের অঙ্গে যেন 'গ্যালিভারস্ ট্রাভেলস্'-এর সেই লিলিপুটিয়ানরা! মহাকালের অসীম সাগর-তরঙ্গে জলবুদ্বুদ মাত্র। জাগতিক জীবনে বা সভ্যজগতে যেসব গুণের ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এতকাল স্বীকার করে এসেছি, এখন মনে হয় সে-সবই নিরর্থক। জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভেদ হারায়। জানি শুধু, এইটুকু,—কিছুই জানি না। মনের গভীরতম প্রদেশে তাকিয়ে দেখি, ভয়-ভাবনা-চিন্তা, স্নেহ-ভালবাসা মায়া-মমতা কোন কিছুরই রেশমাত্রও নেই। লোভ-মোহ-দ্বন্দ্ব সংকোচের অতীত। বাসনার শিকল ছিন্ন হয়েছে। নির্বিকার চিত্ত। যেমন উচ্ছ্বাসবিহীন ঐ নিস্তরঙ্গ হ্রদের জল। সুনীল সুনির্মল। শিশুর চোখে টানা কালো কাজল। ছলছল জলভরা। সরল শান্ত দৃষ্টি।

মাথার উপর আকাশ। গাঢ় নীল। চারিদিকে গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণীর প্রাচীর বেষ্টন। 'নিভৃতির দুর্গ সুদুর্গম'। সেই পর্বতকারার মধ্যে আকাশের নীলে মুক্তির আহ্বান শোনায়। অজানা ভাষাহীন গানে দূরের পানে টানে। বিরাট ব্যোম। শব্দহীন। গীতহীন। অসীম নির্জন। 'অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল' সেই সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে প্রাণে নিবিড় শান্তি পাই।

আজ সভ্যজগতের শহরে বসে লিখতে গিয়ে ভাবি, সেই সীমাহীন শূন্যের নীরশব্দতা নিস্তব্ধতা Pascal-এর মনে এককালে ভীতিরই সঞ্চার করেছিল। আজ সেখানে বিজ্ঞানের দম্ভ নিয়ে রকেট ছোটে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। জ্ঞানের সীমা আরও বাড়ে। বিশ্বের মানুষের গড়া যন্ত্রদানবের হুঙ্কারে নভোমণ্ডলের বিরাট স্তব্ধতা ভেঙে পড়ে। তবুও মানুষ শান্তির সন্ধান পায় না।

সন্ধ্যার ছায়া নামে।

বৈরাগীজি এসে জানান, আজ সত্যনারায়ণ পাঠ। তীর্থে এসে বিশেষ করে করা উচিত। কি বলেন?

তাঁবুর ভিতর এক পাশে তিনি মৃগচর্ম বিছিয়ে বসেন। সামনে একটা বাক্সের উপর পুঁথি খোলা। একধারে ছোট রেকাবিতে পূজার নৈবেদ্য—এক মুঠো শুকনো ভাজা আটা চিনি দিয়ে মাখা, উপরে দুটো কিশমিশ। হেসে বলেন, যেমন দেশ, তেমনি দেবতার ভোগ। ঠিক না? ভক্তিভরে দিলে দেবতার কাছে অল্প-বেশী ছোট-বড়র তফাত নেই। শিশিরবাবুকে বলেন, দিন দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে।

তাঁবুর আর এক পাশে শিশিরবাবু ও আমি বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপ লাগিয়ে বসে আছি। তাঁবুর মুখে বিদ্যা ও উদয়সিংরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছে। শিশিরবাবু একটা কম্বল এগিয়ে দিয়ে বসতে বলেন। সবাই বসে। উবু হয়ে। ঐ তাদের অভ্যাস। হ্রদের তীর থেকে তুলে আনা ফুল অঞ্জলি ভরে ধরে রেখেছে। কুকুরটাও বাইরে স্থির হয়ে বসে আছে।

বৈরাগীজির সামনে ছোট লণ্ঠন। তাঁর ছোট দেহ। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় তাঁবুর গায়ে তারই প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে,—মসীকালো বিরাট আকার।

সুর করে বৈরাগীজি সংস্কৃত শ্লোক পড়েন। শরীর একটু দুলতে থাকে। মুখ ফিরিয়ে বিদ্যাদের দিকে তাকান। হিন্দীতে ব্যাখ্যা করেন। কেমন করে সত্যনারায়ণের পূজো করে, ভক্তিভরে ভোগ দিয়ে দীনহীন মানুষ অতি সুখে দিন কাটায়। ধনী সওদাগর বাণিজ্যে চলে। ধন-দৌলতের মোহে সত্যনারায়ণের পূজো ভোলে। দেবতার রোষ জাগে। প্রবাসে বিপদ আসে। রাজরোষে লাঞ্ছিত হয়। চুরির দায়ে দণ্ড পায়। ঘোর দুর্বিপাকে আবার দেবতার শরণ নেয়। সত্যনারায়ণের পূজো করে। পুনর্বার দেবতার কৃপাদৃষ্টি নামে। প্রিয়জনের সহিত মিলন ঘটে। বাণিজ্যে লক্ষ্মীশ্রী ফেরে। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের পূজার প্রথা চলে। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন প্রভেদ নেই। পূজার সামান্য উপচার। সওয়া পাঁচ

পোয়া দুধ, আটা, শর্করা, কলা মিশ্রিত শিরনি।

নিবিষ্টমনে বিদ্যারা কথা শোনে। দেবতার অসীম ক্ষমতার ও অশেষ করুণার কাহিনী—ভক্তের রক্ষা, দুর্জনের শাসন, অনুতাপীকে ক্ষমা, আবার স্বল্পেই তুষ্টি। কৃপার সিন্ধু ভগবান এমনি ভাবেই প্রেমে ধরা দেন। বিদ্যারা থেকে থেকে মাথা নেড়ে সায় দেয়, চোখ মোছে। কপালে জোড় হাতে প্রণাম করে।

মনে পড়ে, বাড়িতেও ছেলেবেলা থেকে দেখছি সত্যনারায়ণের পুজা। পুরুত-ঠাকুর আসেন। সত্যনারায়ণের কথা শোনান। মেয়েরা জোড়-হাতে বসে শোনেন। প্রণাম করেন। পুজোশেষে শিরনি বিতরণ হয়। বাতাসা মাখিয়ে মুখে ফেলা। এখনও কণিকামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করলে সেই অমৃত-স্বাদের স্মৃতি জেগে ওঠে।

দেশ-কাল অতিক্রম করে এই সুদূর হিমালয়ে আজও সেই সনাতন প্রথারই প্রকাশ দেখি।

রাত্রে পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘ জমে। গুরু গুরু গর্জন ওঠে। আশ্চর্য হয়ে দেখি বিদ্যুতের অপরূপ খেলা। ছেদহীন। অবিরাম। তড়িতের ত্বরিতগতি নয়। হঠাৎ-আলোর ঝলকানি নয়। একের আলো নিভে যাবার আগেই অপরের চমক ওঠে। একটানা কম্পমান বৈদ্যুতিক দীপ্তি। তাঁবুর বাইরে চারদিকে,—ভিতরে ছোটখাটো সব জিনিস—সুস্পষ্ট দেখা যায়।

শিশিরবাবু উঠে বসেন। বলেন, এত তীক্ষ্ম আলোয় কখনো ঘুম আসে। আকাশেও যে নিঅন্-লাইট্-এর চলন দেখি। বসে বসে বই পড়লে হয়।

ভাবি, রাত্রে তুষারপাত হবে।

কিন্তু কিছুই হয় না। শুধু শীতই বাড়ে। হি-হি করে কাঁপতে থাকি, থুল্মার মধ্যে আরও কুঁকড়ে শুই।

পরের দিন চলি শতোপন্থ ছাড়িয়ে আরও দূরে সোমকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ডের দিকে। আজও সেই শিরদাঁড়া পথ। তেমনি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে চলা।

হ্রদের জলের কাছে পাথরের আশেপাশে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। পাড়ের এক জায়গায় কয়েকটা পাখী ঘুরছে। সর্বাঙ্গে বড় পালক। তুষাররাজ্যে স্বভাবজাত শীতবস্ত্র। ধূসর রঙ্—যেন ধূলি-ধূসরিত গৈরিক বসন। হাঁসের মত আকার। কুকুরটা ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ধরে একটাকে। পাখীটা ডানা মেলে ঝট্পট্ করে। সবাই চেঁচিয়ে উঠি। বিদ্যা ছুটে যায়। পাথর ছুঁড়ে কুকুরটাকে মারে।

পাখীটা ছাড়া পায়। খুঁড়িয়ে দু'পা চলে অল্প উড়ে জলের উপর পড়ে। সকলে নিশ্চিন্ত হই।

এই শান্ত প্রদেশে হিংসা ও লোভের অকস্মাৎ প্রকাশ। মনে কোথায় ব্যথা জাগে।

বৈরাগীজি হঠাৎ প্রশ্ন করেন, আপনি কৈলাস গেছেন, তাই না? অতি শান্তিময় স্থান শুনেছি। আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছে। কিন্তু এখনো ভাগ্যে হয় নি।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

উত্তর দিই, চলে যান না। যাওয়ার আপনার বাধা কোথায় ? নিজে গিয়েই দেখে আসবেন।

বৈরাগীর প্রফুল্ল বদন ম্লান হয়। গভীর কণ্ঠে বলেন, যাব। সেখানে গিয়েও দেখব। শুধু চোখে দেখা নয়; দীর্ঘদিন থাকব। নিশ্চয় মনে সেখানে নিরঙ্কুশ গভীর শান্তি মিলবে।

কথা শুনে চমকে উঠি। জিজ্ঞাসা করি, কেন ? বদরীনাথে আপনার অমন গুহায় শান্তি পাচ্ছেন না ?

বলেন, সেখানে আর মন বসছে না। তাই ভাবছি, কৈলাস যাই। কি বলেন ?

বলি না কিছুই। মনে মনে ভাবি, বৈরাগীর মনের এই অশান্তির অস্পষ্ট ইঙ্গিতও তো কোনদিন পাই নি !

বিধাতার বিচিত্র সৃজন মানুষের মন। সব কিছু পেলেও কোথায় যেন কিসের অভাব। বাইরে আনন্দের প্রকাশ, অন্তরে অতৃপ্তির অতল গহ্বর। যেন, আপাত শান্ত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে অনির্বাণ-অগ্নিদাহ।

হ্রদের তীরে কয়েকটি গুহা। ভিতরে উঁকি মেরে দেখি। বন্য জীবজন্তুর গুহার ভিতর তাদের গন্ধ থাকে। মানুষ সে ঘ্রাণ পায়। বনের পশুও, শুনি, মানুষের গায়ের গন্ধ পায়। বহুদূর থেকেও। কিন্তু, মানুষ মানুষের গন্ধ সেভাবে অনুভব করে না। গুহার ভিতর এককালে মনুষ্য-বাসের সাক্ষ্য দেয় চারিদিকে ফেলে যাওয়া ছোটখাটো জিনিসগুলি। টুকরা কাগজ। কাপড়ের ফালি। ভাঙা টিনের কৌটা। সাজানো পাথর। একপাশে বেদী। মাঝখানে ধুনি—এখনো আগুনের কালি মাখা। আধপোড়া কাঠ। রৌদ্র বৃষ্টি শীতের প্রকোপ থেকে মানুষের আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থল। সাধু-সন্তদের প্রস্তর-প্রাসাদ। আজ দেখি,—সবই পরিত্যক্ত।

শূন্য গুহা মনে প্রশ্ন তোলে,—এলেনই বা কেন ? পেলেনই বা কি ? গেলেনই বা কোথায় ?

মনে পড়ে সেই সাধুগুলির কথা। শতোপন্থে এসেছিলেন কয়েক মাস কাটাতে। তারপর তুষারপাতে মৃত্যু ঘটে। পরের বছর তাঁদের শবদেহগুলি লোকে দেখতে পায়। সাধুদের সৎকার করে। এখানে কি ভাবে তাঁরা মৃত্যু-বরণ করেছিলেন কেউ তা জানে না। সাধারণ মানুষের মত তাঁরাও কি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিলেন ?

মৃত্যু-পথ-যাত্রী অপর এক সাধুর শেষ দিনগুলির কথা মনে আসে।

সে বছর কলকাতা থেকে রওনা হচ্ছি আবার হিমালয়-পথে। তারই ক'দিন আগে এক বন্ধু দেখা করতে এলেন। হিমালয়ের এক প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে নিরালায় দিনকয়েক কাটানো তাঁর উদ্দেশ্য। তাই খোঁজ নিলেন, কোথায় থাকার

ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে এক স্বামীজীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। নির্জন আশ্রমে তিনি একাকী থাকতেন। গঙ্গার উপকূলে। শান্ত, মনোরম স্থান। ফলফুলের ছোট বাগান। আশ্রমের একটি কাঠের সুন্দর বাড়িও ছিল। গঙ্গার দিকে বারান্দা ও ঘরগুলিতে কাচ বসানো। ছিল স্টেশনের শৌখিন বাড়ির মতো। কিন্তু স্বামীজী নিজে থাকতেন পাশে এক ছোট্ট কুটিরে। বাড়ি খালি পড়ে থাকত। আমায় অনেকবার বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্যে। কিন্তু, গিয়েছিলাম বটে, থাকা হয় নি। বন্ধুবান্ধব কদাচিৎ কেউ ঐ অঞ্চলে গেলে স্বামীজীর কাছে পরিচয়-পত্র দিতাম। তিনি সানন্দে তাঁদের গ্রহণ করতেন। স্বামীজী শিক্ষিত ব্যক্তি। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে, সদ্-আলাপ-আলোচনায় ও জপ-তপে দিন কাটাতেন। ত্রিশ বছরের উপর হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিলেন। তারই মধ্যে কয়েক জায়গায় তাঁর সাক্ষাৎ পাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ষাট-এর কোঠায় বয়স হলেও অটুট স্বাস্থ্য। বিধিনিয়মে বাঁধা জীবনধারা। আহার-বিহারে কঠিন-সংযম। পত্রযোগেও আমার সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। বছরখানেক আগে লিখেছিলেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। ফলে শহরের হাসপাতালেও যেতে হয়েছে। কাঁপা হাতের হরফে ছোট্ট চিঠির মধ্যে তাঁর রোগের গুরুত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেতাম, কিন্তু রোগের স্বরূপ জানতে পারি নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে লিখলেন, স্বাস্থ্য ভেঙেছে। রোগভোগের উপশম হলেও নিরসন হয় নি। যতদিন এ দেহ থাকবে দুর্ভোগও চলবে। দেহের এই-ই তো ধর্ম।

বন্ধু যখন সেখানে যাবার কথা বললেন, স্বামীজীর উল্লেখ করলাম। বললাম, কয়েক মাস তাঁর খবর পাই নি। হিমালয়ের যে সব অঞ্চলে ছিলাম, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সুবিধে ছিল না। আবার শীঘ্রই বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমার নাম করে লিখে দিন, ওঁর ওখানে আপনার থাকা সম্ভব হবে কিনা। শরীর তাঁর এখন কেমন আছে বিশেষ করে জেনে নেবেন। বেশী অসুস্থ থাকলে তাঁর কাছে থাকবেন না, তাও জানাবেন। ওষুধপত্র বা অন্য কোন পথ্য এখান থেকে নিয়ে যাবার থাকলে আপনাকে নিঃসংকোচে জানাতে লিখবেন।

বন্ধু সাধু-সেবার সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, নিশ্চয়। সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

কয়দিন পরের কথা। সেইদিনই হিমালয়-যাত্রা করছি। বন্ধু টেলিফোন করলেন। স্বামীজীর চিঠির উত্তর এসেছে। তাঁর থাকার সম্বন্ধে লিখেছেন, উমাপ্রসাদবাবুর বন্ধু আপনি, আপনার নিজের যদি এখানে অসুবিধা বোধ না হয় —আশ্রমের দ্বার অবারিত। শরীরের বিষয়ে জানিয়েছেন সেই সংক্ষিপ্ত এক কথা, মানুষ দেহ যতদিন আছে, রোগভোগও ততদিন থাকবে।—প্রয়োজনীয় কোন কিছু দ্রব্যের আবশ্যকতা থাকার কথা নয়। নেই-ও। তবে যখন এ-বিষয় লিখেছেনই, একটা কথা লিখি। সম্ভব হলে সঙ্গে আনবেন আপনার বন্ধুকে,

বহুদিন দেখি নি। আনতে পারেন তাঁকে?

চিঠির কথাগুলি শুনে মনটা কেমন করে উঠল।

সেইদিনই ট্রেনে উঠেছি। গন্তব্যস্থল হিমালয়ের অন্যত্র। কিন্তু ভাবলাম, দু'দিন পরেই না হয় সেদিকে যাব। স্বামীজীর কথাগুলি যেন টানতে থাকে।

গেলামও তাঁরই আশ্রমে।

বিকেল বেলা। ভাগীরথী তীরে। হিমালয়ের এককালের নিভৃত শান্ত অঞ্চল। সাধু-সন্তদের বহুবাঞ্ছিত তপোভূমি। আধুনিক সভ্য যুগে বাসপথ সেই শান্ত আবহাওয়ার বুক চিরে চলেছে। উদ্ধত ভাবে। নবীন সমৃদ্ধ শহর উঠছে। ধর্মশালায় সরকারের দপ্তর বসেছে। বুভুক্ষিত সভ্যতা সাধুদেব আশ্রম গ্রাস করতে চলেছে।

আশ্রমের সদর দরজা বন্ধ। মৃদু আঘাতেই খুলে গেল। বাগানে জঙ্গল ভরা। তবুও ফুল ফুটেছে। মানুষের বিনা যত্নেও। চারিদিকে নীরব। কেমন একটা ছম্‌ছমে ভাব। সন্তর্পণে স্বামীজীর কুটিরের দিকে এগিয়ে যাই। দরজার সামনে চিক্ ফেলা। ভিতরে কে যেন কি পড়ছেন। চাপা গলায়। অস্ফুট শব্দ করি। অপরিচিত কণ্ঠে মৃদু আহ্বান পাই, আসুন!

চিক্ তুলে দরজার সামনে দাঁড়াই।

ছোট ঘর। বাঁ দিকে একটা চৌকি পাতা। উপরে কম্বল-শয্যা। দেওয়ালের তাকের উপর কতকগুলি বই, কাগজপত্র, লেখবার সাজ-সরঞ্জাম, কয়েকটি ওষুধের শিশি। চৌকির পায়ের কাছে ছোট জানালা। তারি খুপরিতে একটা লণ্ঠন ও পাথরের বাটি। ঘরের অপর কোণে নর্দমার কাছে এক বাল্‌তি জল, একটি কমণ্ডলু। আর এক কোণায় দণ্ডীধারীর দণ্ড। গেরুয়া কাপড় জড়ানো। তারই কাছে মাটিতে কুশাসনে বসে আছেন এক ব্রহ্মচারী। চৌকির উপর একজন গেরুয়াবাস সাধু বসে। তাঁর হাতে খোলা একখানি গ্রন্থ। বুঝলাম, ইনিই পাঠ করছিলেন। যাঁকে শোনাবার জন্য পাঠ,—তিনি বসে আছেন সামনে এক চেয়ারে। দরজার দিকে মুখ করে।

ইনিই কি স্বামীজী? আশ্চর্য হয়ে তাকাই। বহুবার তাঁকে দেখেছি। একসঙ্গে থেকেছি। দেখেই না-চেনবার কথা নয়। তবুও প্রথম দর্শনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু তখনি মনে হয়, নিশ্চয় ইনিই হবেন, এ যে তাঁরই আশ্রম। আকৃতির প্রভূত পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর প্রচ্ছন্ন পরিচয় তখন প্রকাশ পায়।

স্বামীজীকে এর মাত্র বছর দুই আগেও দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গ। সবল সুস্থ। লম্বা মুখ। মাথা, দাড়ি, গোঁফ—কামানো।

কিন্তু এখন চেয়ারে বসে আছেন দেখি, স্থূলকায় এক বিপুল দেহ। প্রকাণ্ড চেয়ারখানি জুড়ে আছে গেরুয়া চাদরে জড়ানো এক মাংসপিণ্ড। হাতলের উপর হাত রাখা,—আঙুলগুলি বেরিয়ে আছে, অসম্ভব ফোলা। মাথা থেকে লম্বা সাদা চুলের জট নেমেছে। প্রকাণ্ড গোলাকার মুখ। বুক অবধি দাড়ি ঝুলছে।

সেই দাড়ি-গোঁফ-ভরা ফোলা গালের উপরে চোখ দুটি কোন রকমে খোলা। আবিল দৃষ্টি।

আমার দিকে স্তম্ভিতভাবে ক্ষণিক তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে টেনে টেনে বললেন, উ-মা প্র-সা-দ ! আ-স-বে আ-স-বে, দে-খা হ-বে-ই জা-ন-তা-ম।

আর কথা ফুটল না। দু'চোখের বাঁধ ভেঙে ঝর্‌ঝর্‌ করে ধারা নামল। কখনো তাঁর অঙ্গস্পর্শ করি নি। তবু কিসের এক টানে এগিয়ে গেলাম। মাথাটি কোলের কাছে নিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়ালাম।

হিমালয়বাসী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তবুও দেখি, রোগীর দেহের মাঝে চিরন্তন শিশু।

আশ্রমে উঠব ভেবেছিলাম। তিনি বলেন। তবুও থাকি না। কেন না, দেখি, তিনি উত্থানশক্তিরহিত। তাঁরই আশ্রমে তাঁরই কাছে থাকব, অথচ তিনি অসহায়-ভাবে পড়ে থাকবেন,—আমার উপস্থিতি তাঁর এই অবস্থায় নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাবে। অতএব নিকটে অন্যত্র থাকি। যখন-তখন তাঁর কাছে আসি।

স্থানীয় ডাক্তারটি বাঙালী। তাঁরই চিকিৎসাধীনে প্রথম ছিলেন। এখন চিকিৎসার বাইরে। তবুও ডাক্তারবাবু রোজই এসে দেখে যান। খোঁজখবর নেন।

ডাক্তারের কাছে তাঁর অসুখের ইতিবৃত্ত শুনি।

বছরখানেক আগে রোগ ধরা পড়ে। ক্যান্সার। মূত্রনালীতে। ডাক্তারেরই উপদেশ ও ব্যবস্থামত শহরে হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হয়। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। নালীটি বাদ দিয়ে এখন পাইপ লাগানো আছে। ফিরে এসে কিছুকাল শরীর অনেকটা সুস্থ ছিল, দেহে বলও পাচ্ছিলেন। মাসাবধি আবার হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সারা অঙ্গ অতিমাত্রায় ফুলে গেছে। কোন ওষুধেই সাড়া দিচ্ছে না। ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ হয়েছে। স্থানীয় এক স্বামীজী কবিরাজী ওষুধ জানেন। দিচ্ছেন। এক ব্রহ্মচারী এখন কাছে থেকে সেবা করেন। কতদিন করবেন জানা নেই। কেউই দু-চার দিনের বেশী থাকতে পারেন না। এমন রোগীর বেশীদিন একটানা শুশ্রূষা করা কঠিন। টাকা দিয়েও এখানে লোক মেলে না। অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু মন্তব্য করেন, দেখেছি তো মশাই, কিছুদিন পরে পরম আত্মীয়স্বজনই ছেড়ে চলে যায় এসব রোগীকে। নেহাত না যেতে পারলে মনে মনে ভাবে, রোগীর রোগভোগের মুক্তি হবে কবে,—তারও আপদের শান্তি ! এ স্বামীজীর এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি। চিকিৎসায় যে আর কিছু হবার নেই এবং রোগভোগের তাঁর শীঘ্রই শেষ হবে—এ সবই তিনি জানেন। নির্বিকার হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। স্বামীজীর রোগের যা অবস্থা তাতে অন্য যে কোন রোগীই দু-এক দিনে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এঁর হৃদ্‌যন্ত্র এখনও এত সক্ষম ও সতেজ যে মাস-দুইয়ের মধ্যে এঁর শান্তি মিলবে না।

ডাক্তারের কথা শুনি আর ভাবি, ব্যাধির গতিবিধি কি সর্বত্রই। যতদিন মানুষদেহ, ততকালই নিগ্রহ। হিমালয়ের শান্ত আশ্রমে দীর্ঘ তপস্যায় কাটিয়েও

রোগভোগের অন্ত কই!

ডাক্তার বলতে থাকেন, কি অসীম সহ্যগুণ স্বামীজীর! হবার কথাই। বছর দুই এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেক অবস্থাতেই দেখছি। যেমন বিদ্বান, তেমনি মধুর ব্যবহার! যদিও কঠোর জীবনযাপন করতেন। এই তো সত্যিকারের সাধু। সাধারণ লোকের কাছে তো বটেই, সাধু-সমাজেও দেখেছি এঁর প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান। অথচ কি ভোগটাই না ভুগছেন! আমার কিছু করবার নেই, তবু যাই রোজ দেখতে। না গিয়ে পারি না।

আমি বলি, সাধুরাও আসেন দেখলাম।

ডাক্তার বলেন, তা তো আসবেই। কিন্তু ওঁদের কথা না বলাই ভালো। আছেন বটে কয়েকজন সত্যিকার ভালো লোক। রোজ এসে ওঁর কাছে বসেনও। কিন্তু—তারপর চাপা গলায় বলেন, অনেক কিছুই দেখলাম এইসব পুণ্যতীর্থেও। এখানে তো চারিদিকেই সাধু। অথচ এখন বেশ জেনেছি, গেরুয়া পরলেই সাধু হয় না। হিমালয়েও নয়। এঁর অসুখের মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম। ইনি তখন এখানে আমার হাসপাতালে। রোগের কঠিন অবস্থা। অনেকেই আসেন খোঁজখবর নিতে। রোগনির্ণয়ও হয়েছে। সকলে জেনেছেও। সাধারণ লোক শুনে চিন্তিত হয়ে বলে, 'আহা, এত বড় সাধু, তাঁর এমন অসুখ! ভালোয় ভালোয় সেরে উঠুন। যতদিন থাকেন, আমাদেরই সৌভাগ্য।'—কেউ বা গিয়ে মন্দিরে পুজো দেয়। সাধুরাও আসতেন খবর নিতে। কিন্তু অবাক হয়ে যাই, যখন তাঁদেরই মধ্যে দু-একজন আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে যান, চুপিচুপি বলেন, 'কুৎসিত কোন রোগ নাকি ডাক্তারবাবু? লুকোবার দরকার নেই। আমার কাছে বলবেন তার আর ক্ষতি কি? কারো কাছে তো প্রচার করছি না।' আমি যত তাঁদের জানাই সে ধরনের কোন কিছুই নয়, তবুও তাঁরা পীড়াপীড়ি করেন। স্তম্ভিত হয়ে দেখি মশাই, আমার উত্তর তাঁদের মনোমত হয় না।—অথচ তাঁরাও গেরুয়াধারী। এখানে তাঁদেরও নাম-ডাক আছে।

আমিও স্তব্ধ হয়ে শুনি।

স্বামীজীর কাছে গিয়ে বসি। আমিই কখনো-সখনো কথা বলি। তাঁকে বলতে দিই না। কথা বলায় কষ্ট হয় দেখি। কাসির দমক আসে। গাঢ় শ্লেষ্মা ওঠে। পাশেই মরচে-পড়া টিনের একটা কৌটা। তাতে ফেলেন। ফেলে ধুঁকতে থাকেন। চোখ দিয়ে জল ঝরে। এ জগতে মুছে দেবার কেউ নেই। নিজেও মোছেন না। তবুও মুখে কাতরতা-জ্ঞাপক কোন ধ্বনি ওঠে না। শান্তভাবে বসে থাকেন।

সেই প্রথম দিন অকস্মাৎ দেখা হওয়ার সময়ে একবার মাত্রই ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল। তার পর কয়েকদিনের মধ্যে কখনো কোন ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখি নি। সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত, নির্বিকার। অথচ, বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র হ্রাস নেই। স্মৃতিশক্তিও প্রখর আছে। সামান্য কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে

তার প্রমাণ পাই। আমার বন্ধুটির চিঠির কথা বলেন। আশ্চর্য হয়ে বলি, আপনার এই অবস্থা, তবুও তাঁকে এখানে উঠতে নিষেধ করেন নি। আমি এসেই তাঁকে খবর দিয়েছি, এখানে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আশ্রমে ওঠা কোন রকমেই চলবে না।

ফোলা মুখে তাঁর হাসির রেখা ফোটে। চোখ দুটি আরও কুঁচকে যায়। অদ্ভুত দেখায়। বলেন, উঠতেন না হয় এখানে। থাকতেন ওদিকের ঘরগুলিতে। এ শরীরের মাস দুয়েকের মধ্যে হবার তো কিছু নয়, ডাক্তারই বলেছেন। তবে তাঁদের নিশ্চয় অস্বস্তি বোধ হত। তা ভালোই করেছেন।

আমাকে চিরকাল 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সেদিন প্রথম দেখার সময় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলাম। এখন আবার 'আপনি' বলায় হেসে বললাম, কি হল ? আজ আবার 'আপনি'তে ফিরে গেছেন ?

আবার মৃদু হাসলেন। বললেন, কি জান ? ওটা স্বভাব হয়ে গেছে। একবার এক ভক্তের সঙ্গে একটি যুবক এসেছিলেন। স্নেহভরে তাঁকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলাম। শিক্ষিত পুরুষ। তাঁর সম্মানে আঘাত লাগল। কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর থেকে সবাইকে আপনি বলাই অভ্যাস হয়ে গেছে। সামান্য সম্বোধনের মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিতে কাজ কি ? এই তো ক'দিনের পরিচয় !

চুপ করেন। একদৃষ্টে দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকেন। কোন কিছুর প্রতি নয়। উদার নীল আকাশের পানে নয়, বিরাট হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরের দিকেও নয়। লক্ষ্যবিহীন দৃষ্টি। এই পঞ্চভূতময় জগতের সবকিছুর মূল্য যেন তাঁর কাছে নিঃশেষ হয়েছে। জাগ্রত সজীব জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। পৃথিবীর কেউ তিনি নন। মৃত্যুর রহস্যময় গুহা অতিক্রম করে জীবনোত্তর অজানা এক লোকের সন্ধান যেন তিনি পেয়েছেন। সেখানে শোক নেই, দুঃখ নেই, রোগভোগের গ্লানি নেই,—শুধু এক অপার প্রশান্ত আনন্দ মনে হয়, জীবনের প্রান্তদেশে নবতর বিজয়যাত্রার যাত্রী পরপারের জ্যোতির্ময় রাজ্যের রূপ দেখছেন !

তাই কাছে বসে দেখি, শান্তভাবে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করার তাঁর অসীম ক্ষমতা, শান্তিপ্রদ আসন্ন মরণের জন্য তাঁর নীরব প্রতীক্ষা।

মনে আসে War and Peace এর একটি চরিত্র-চিত্র। Prince Andrew র জীবনের শেষ দিনগুলির কথা। গুণী, জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত পুরুষ। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়েছেন। পশ্চাৎপদ সৈন্যদল তাঁকে শহরে এনেছে। চিকিৎসার সব কিছু সত্ত্বেও জীবনের আশা নেই। আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তাঁর দিন কাটে। পরম আত্মীয়স্বজন কাছে আসেন। অতি প্রিয়জন সেবা করেন। কিন্তু তিনি বন্ধনমুক্ত, নির্লিপ্ত। ঋষি টলস্টয় বর্ণনা দিয়েছেন :

"It seemed that he did not understand what was living, not

because he had lost the power of understanding, but because he understood something else that the living did not and could not understand, and that entirely absorbed him ······He experienced a sense of aloofness from everything earthly, and a strange and joyous lightness in his being. Neither impatient, nor troubled, he lay awaiting what was before him······The menacing, the eternal, the unknown, and remote, the presence of which he had never ceased to feel during the whole course of his life, was now close to him, and···from that strange lightness of being, that he experienced—almost comprehensible and palpable."

॥ ১৮ ॥

এগিয়ে চলি মহাপ্রস্থানের পথে। সামনে রেখে স্বর্গারোহণী।

সত্যপদ হ্রদ থেকে ঘণ্টাখানেক গিয়ে সোমকুণ্ড। মাইল দেড় হবে, শুনি। সেই শতোপন্থ গ্লেসিয়ারের চাপা-পড়া তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে চলা। কোথাও বা সেই শিরদাঁড়া পথ। কুণ্ডটি ছোট। হাত কুড়ি-পঁচিশ মাত্র পরিধি। তুষার-তরলিত স্বল্প জল। যেন বৃহৎ এক শ্বেতপাথরের পাত্রে নির্মল সুনীল বারি সঞ্চয় করে রাখা। গরলপায়ী নীলকণ্ঠ পান করবেন। শোনা যায় চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে কুণ্ডে জলের পরিমাণও কমে, বাড়ে। অমাবস্যায় সম্পূর্ণ জলশূন্য হয়। হয়তো সব জল জমে যায়। এখান থেকে আরও ঘণ্টাখানেকের পথ সূর্যকুণ্ড। এই ধরনের ছোট ছোট কুণ্ড এসব তুষাররাজ্যে আরও আছে। রুদ্রকঠোর হিমাঞ্চলে স্ফটিকস্বচ্ছ সুনীল জলে স্নিগ্ধতার ইঙ্গিত পাই। যেন যোগীবর গিরিরাজের আবেশ-বিভোর নয়নে শান্ত মধুর দৃষ্টি।

সামনে কিছুদূরে গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণী। হিমবান্ মহাশৈল। বিরাট আকার। যাত্রাপথে প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরই নাম বদরীনাথ পর্বত। সার্ভের ম্যাপ-এ বলে চৌখাম্বা। ঐদিক থেকে নেমে এসেছে এই শতোপন্থের হিমবাহ, অপরদিকে নেমে গেছে গঙ্গোত্রী-গ্লেসিয়ার। ঐ পর্বতের গিরিসঙ্কট দিয়ে যেতে পারলে মদমহেশ্বরেও নামা যায়। কেদারনাথেও পৌঁছানো চলে। তবে সাধারণ যাত্রীর পক্ষে এসব সম্ভব নয়। পর্বত-আরোহণের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা চাই, সাজসরঞ্জাম চাই, দেহের বল এবং অন্তরের সাহস ও সংকল্প চাই। যোগী-ঋষিদের কথা স্বতন্ত্র। অভিযাত্রী দল দু-একটা গিয়েছে শোনা যায়। চৌখাম্বা শিখরেও উঠেছেন। বিদেশীও, ভারতবাসীও। সেসব হল ভৌগোলিক হিমালয়ে দুঃসাহসী মানুষের পর্বত অভিযানের অতি-আধুনিক রোমাঞ্চকর কৃতিত্ব। বিপদবহুল শৈলশিখরের অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। সে আহ্বান যার

প্রাণে বাজে, ঘর-ছাড়া করে তাকে পাহাড়ে টানে। সে ডাকে সাড়া দিয়ে তার অপূর্ব আনন্দ।

কিন্তু আজ এখানে মনে আবেশ মাখায় পৌরাণিক কাহিনী। কল্পনার রথে বসে মন ছুটে চলে কোন্ এক অতীত যুগে। 'মহাভারতে'র মহাপ্রস্থানের যাত্রীদের সঙ্গে।

বৈরাগীজি শ্রদ্ধাভরে দেখান, দেখুন সামনে স্বর্গারোহণী!—স্বর্গের সোপান।

তাকিয়ে দেখি, প্রকৃতই দূরে হিমগিরির অঙ্গে তুষার-সোপান উঠেছে। পর্বতের শিখরদেশ থেকে ভেঙে-পড়া বরফের স্তূপ স্তরে স্তরে নেমে এসেছে। বোঝা যায় হিমানী সম্প্রপাতের—avalanche-এর ফল। কোথাও বা হিমবাহের—glacier-এর স্বাভাবিক নিম্নমুখ জমাট তুষারের গতিপথ। দূর থেকে দেখায় সোপানশ্রেণীর ধাপ নেমেছে।

বাস্তববুদ্ধি সবই বোঝায়। তবুও নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কানে আসে বৈরাগীজির কথা—মহাভারতের কাহিনী। প্রাণে পুলক জাগায়। যুধিষ্ঠির নাকি স্বর্গে গেছেন ঐ পথ ধরে। সোপান-শ্রেণীর ধাপে ধাপে উঠে। পিছনে ফেলে গেছেন জীবনসঙ্গিনী দ্রৌপদীকে, চির সহচর চার সহোদরকে। সঙ্গে আছে তখনও পথের সঙ্গী সামান্য সারমেয়—পথের কুকুর।

বৈরাগী অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখান, ঐ স্বর্গের সিঁড়ির উপর এসে নেমেছিল স্বর্গের রথ। রথ থামিয়ে ইন্দ্র আবাহন করলেন, মহারাজ, স্বর্গের যান এসেছে আপনাকে নিয়ে যেতে। যুধিষ্ঠির যেতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন—পিছনে যে পড়ে আছেন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ। দেবরাজ আশ্বাস দেন, তাঁরা সকলেই মানুষদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গী কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির রথে যেতে চান। ইন্দ্রদেব জানান, কুকুর অপবিত্র, তার সঙ্গ ত্যাগ করতে। বলেন, এতে নিষ্ঠুরতা নেই।—'ত্যজ শ্বানং নাত্র নৃশংসমস্তি'।—কুকুর ত্যাগ করে স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হোন—'শুনস্ত্যাগাৎ প্রাপ্যসে দেবলোকম্'। কিন্তু ধর্মপুত্রের ধর্মবুদ্ধি। স্বর্গের দ্বারে এসেও ধর্মত্যাগে আপত্তি। স্বর্গলাভের আশাও তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত, ভক্তত্যাগে তিনি অসম্মত। বলেন, ও যে আমার আশ্রয়প্রার্থী, পথের সাথী। ওকে ত্যাগ? সে যে ব্রহ্মবধের সমতুল্য। ইন্দ্রদেব স্বর্গের লোভ দেখান। যুধিষ্ঠির অটল। বলেন, স্বর্গসুখের লোভেও ভক্তকে ত্যাগ করে ধর্মের হানি করব না।

বৈরাগী মন্তব্য করেন, দেখুন, স্বর্গের দ্বারে এসেও ধর্মের পরীক্ষার বহর।

শিশিরবাবু আমাদের সঙ্গী কুকুরটির দিকে তাকাতে থাকেন।

বৈরাগী হাসেন। বলেন, যুধিষ্ঠিরের কুকুর—মূর্তিমান ধর্মরাজ—নিজমূর্তি প্রকাশ করলেন। তারপর—

স তং রথং সমাস্থায় রাজা কুরুকুলোদ্বহঃ।
ঊর্ধ্বমাচক্রমে শীঘ্রং তেজসাবৃত্য রোদসী॥

যুধিষ্ঠির ঐ সোপান-শেষে রথে বসে সশরীরে স্বর্গের পথে ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগলেন। তাঁর তেজঃপুঞ্জে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হল।

সেইদিকে তাকিয়ে থাকি। তুষার-শিখর থেকে সাদা মেঘের পুঞ্জ বাতাসে ভেসে ভেসে নীল আকাশে উঠতে থাকে। ভাবি, ঐরকমই মেঘের অন্তরালে বুঝি অন্তর্হিত হয়েছিল স্বর্গের রথ।

মনে পড়ে যায়, শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ'র শেষ দৃশ্য। মায়ের শ্মশানশয্যার পাশে বসে কাঙালীর স্বপ্ন দেখা।

"সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী উর্ধ্বদৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।"

কাঙালী অভাগা। দীন-দরিদ্র। বিদ্যাবুদ্ধিহীন। তাই সরল বিশ্বাসী। স্বর্গের রথে মায়ের স্বর্গযাত্রা চোখে দেখে।

মহাভারতের অমর কবিও মহাকাব্যে স্বর্গ রচনা করেন। বিশ্বাসী মানুষের মন বাস্তব জগতে হিমালয়ের হিম-শিখরে সেই স্বর্গের সোপান গড়ে। মানসচক্ষে স্বর্গের রথ নামায়, ওঠায়—

'সহজ বিশ্বাসে,
যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে।'

সেই স্বর্গের সোপানতল থেকে দেহধারী ধরার মানুষ ফিরে চলে।

পথপাশে পড়ে থাকে হিমালয়ে সাধুদের জনহীন গুহাগুলি। আলো আঁধারে ভরা। অনন্তকালের প্রহেলিকা-প্রচ্ছন্ন। জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার চিহ্নরূপে।

ভাবি, এই গুহাগুলিই ছিল এককালে আদিম মানুষের আশ্রয়স্থল। বর্বর অসভ্য মানুষ তখন বনচর। গৃহনির্মাণ অজানা কঠিন কর্ম। রৌদ্র-বৃষ্টিতে রাত্রের অন্ধকারে আশ্রয় নেয় প্রকৃতির স্বাভাবিক গুহার ভিতর। সেইখানেই সংসার পাতে। পাষাণ-শয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে। পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে ছবি আঁকে। জীবজন্তুর আকার। প্রকৃতির নিপুণ নকল। সতেজ, বেগময়, প্রাণবন্ত রেখা। মানুষের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার প্রথম প্রকাশ। অরণ্য-বাসী মানুষ আহারের সন্ধানে বনে বনে ঘোরে। গাছের ফলমূল খায়। নদীর মাছ ধরে। বনের পশুপাখী শিকার করে। চকমকির আঘাতে আগুন জ্বালায়। চাকার আবিষ্কার করে। মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তির প্রথম উন্মেষ হয়। জাগ্রত প্রাণে আলোকের দ্যুতি দেখে। বিজ্ঞানের বুদ্ধি জাগে। জ্ঞানের স্পৃহা আনে। সুদূরের ডাক শোনে। গিরিগুহা ছেড়ে বনপ্রান্তরে নেমে আসে। অরণ্য কেটে

শহর তোলে। এককালের গুহাবাসী মানুষ পৃথিবী জুড়ে সুসভ্য মানবজাতির প্রতিষ্ঠা করে। পরিশ্রমে, যত্নে, চেষ্টায়, শিক্ষার গুণে, বুদ্ধির বলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখায়। নিখিল বিশ্বের অসীম রহস্য মনে তার কুহক জাগায়। তারই উন্মাদনায় মানুষ মত্ত হয়। পৃথিবী ছেড়ে গ্রহলোকে ছুটে চলে। আদিম কালের সেই গুহাবাসী মানুষ সভ্যতার আস্তরণে লুপ্ত হয়। আত্মসুখ-সমৃদ্ধির শিখরে ওঠে। কিন্তু কুসুমেও কণ্টক থাকে, কীটে বাসা বাঁধে। বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানের গরিমা, ধন-সম্পদের দম্ভ মানুষের মনে স্পর্ধা জাগায়। রিপুর দংশন ফোটে। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা আসে। দ্বন্দ্ব বাধে। ভোগের লিপ্সা, রাজ্য-বিস্তারের লালসা, শক্তির দুর্জয় প্রতাপ ধ্বংসের মুখে টানে। কত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, কত সভ্যতার বিলোপ হয়।

'ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।'

নিমেষে সব ভেঙে পড়ে। তবুও আশাবাদী মানুষ আবার ওঠে। নতুন স্বপ্ন দেখে। জীবনের শুষ্ক বালুচরে আবার স্ফটিকের প্রাসাদ তোলে। ভাবে, জীবনের এই সত্য, এতে পাব সুখ।

কিন্তু প্রকৃত শান্তির তথাপি সন্ধান মেলে না। অতৃপ্ত বাসনা, অনন্ত কামনা অন্তর আকুল করে। যেন, বিধাতার অভিশাপ। 'নিসর্গের নিষ্ঠুর নিয়ম'।

অপরদিকে জেগে ওঠেন আর একদল মানুষ। ভিন্ন গোত্র। ভিন্ন দৃষ্টি। বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর দল। জাগতিক সভ্যতার সব কিছু দান হেলায় ফেলে দেন। ধীরপদে দৃঢ়মনে ফিরে চলেন হিমালয়ের গুহামুখে। সংসারের শতকর্ম থেকে ভীরু পলায়ন নয়। জীবন-যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার নয়। কঠিন কর্তব্যের গুরুভার বহন করে, অনিত্য জগতে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে! মুক্তির জয়যাত্রায়। নিখিলের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয়; অন্তর্মুখী অভিযানে। সসীম থেকে অসীম অনন্তে। আত্মা থেকে পরমাত্মায়। অন্তরের ক্ষীণদীপ জ্বেলে চির-জ্যোতির্ময়ের মিলন সন্ধানে।

তাঁরা আশ্রয় করেন ভাগীরথী-তীরে। শিবজলা, পুণ্যা, সৌম্যা, মহানদী, দেবর্ষিগণসেবিতা দেবনদীর উপকূলে। ধ্যানে বসেন তাঁরা একান্তে নিভৃত গিরি-গুহায়। দেবতাত্মা হিমালয়ে।

এইরূপেই ঘটে, সত্যসন্ধানী মানুষের হিমালয়ে পুনরাবর্তন।

এইভাবেই বইতে থাকে চির-মানবের ইতিহাসের অনন্ত প্রবাহ। আঁধার-ঘেরা গিরি-কন্দর থেকে মানব-সভ্যতার নীল-সাগরে। তারপর আবার ফিরে আসা হিমাচলের গুপ্ত-গুহায় লুপ্তরত্নের আশায়।

সত্যের অমৃতরূপের সন্ধানে ফেরে অতৃপ্ত মানুষ।

সেই-যে আমার নানারঙের দিনগুলি

॥ ১ ॥

শীতের শেষ ভাগ। হিমালয়ের সিংহদ্বারে এসে অপেক্ষা করি। যেন বন্ধ দুয়ার মন্দির। দ্বার খোলার আশায় উন্মুখ যাত্রী।

হৃষীকেশ। তবুও শহরের আবহাওয়া। বাস, মোটর, দোকানপাট, লোকের ভিড়, সদাব্যস্ত চঞ্চল জীবন। শহর ছাড়িয়ে দু'মাইল দূরে আশ্রয় নিই।

এককালে সাধুদের নিভৃত আশ্রম। এখন এদিকেও কল-কারখানা এগিয়ে আসে। হিংস্র যন্ত্রদানব যেন তাড়া করে। ভয় পেয়ে ছুটে পালায় কোমলপ্রাণা বালিকার মত তপোবনের শান্তি। জননী জাহ্নবীর কোলে এসে মুখ গুঁজে লুকায়। দূরে দানবরা থমকে দাঁড়ায়। রাগে গর্জন করে।

গঙ্গার ধারে এদিকে এখনও শান্ত পরিবেশ। আম, জাম, কাঁঠাল, বেল নানান ফলের বড় বড় গাছের নিবিড় ছায়া। মাঝে মাঝে মাঠ। চাষের ক্ষেত। কোথাও বা সবুজ ঘাসে ভরা। পথের পাশে ফুলের গাছ। ছোট ছোট কুটিয়া। সাধুদের বাস। গঙ্গার ধারে বাঁধানো বিস্তীর্ণ আঙিনা। সেখানেও বিরাট গাছের স্নিগ্ধ ছায়া। বাঁধানো ঘাটের ধাপ। গঙ্গার বুকে নেমে যায়। শীতের পর নদীর শীর্ণ কায়। স্বচ্ছ নীল জল। চারিপাশে নানা রঙের বহু আকারের ছোট-বড় পাথর। কল কল স্বরে জলের ধারা নীচে নেমে চলে। ওপারে গঙ্গার তীর থেকেই ওঠে পাহাড়ের শ্রেণী। সামনে ছোট পাহাড়। ঘন বনে ঘেরা। তারও পিছনে হিমালয়ের বিশাল শৈলমালা। যতো দূরে যায়, বনের সবুজ রঙ ক্রমে নীল হয়,—যেন 'আকাশের নীল বনের শ্যামলে চায়'।

গঙ্গার বাঁধানো ঘাটের পাশে দুখানা দোতলা পাকা বাড়ি। এদেরও গেরুয়া রঙ। সৎসঙ্গের আকাঙ্ক্ষায় যাঁরা আসেন তাঁদের থাকবার সুব্যবস্থা। সেখানেই উঠি। দোতলার উপর দু'খানা ঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রকাণ্ড ছাদ। প্রয়োজনীয় সব কিছুর আয়োজন উপরেই পাই। তাই নীচে নামি না। ছাদে বেড়াই। সারাক্ষণই গঙ্গাদর্শন। ঘর তো নয়, যেন জাহাজের ডেক। জানলা খুললেই সামনে গঙ্গা, আকাশে মাথা তুলে হিমালয়। গাছে গাছে পাখী ডাকে। এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে যায়—বিদ্যুৎ-চমকের মত। হলুদ, লাল, সবুজ বরণ। সামনের পাতা-ঝরা গাছটায় টিয়ার ঝাঁক বসে, দেখায় যেন যাদুবলে হঠাৎ সবুজ পাতায় ছেয়ে যায় ডালগুলি। ঘাটের পাশে সাদা মন্দির। সকাল-সন্ধ্যায় আরতির শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি ওঠে। বিদ্যার্থী ছাত্রদের মধুর কণ্ঠে স্তোত্রপাঠের সমবেত সুর ভেসে আসে।

গঙ্গার তীরে নিবিড় শান্তির কোলে মধুময় দিনগুলি কাটে।

॥ ২ ॥

একাই থাকি। একটি পাহাড়ী জল তুলে রেখে যায়। দু'মাইল দূরে বাজার।

কদাচিৎ কখনো কিছু কেনার প্রয়োজন হলে কিনে আনে। লোকটির একটা চোখ অন্ধ। কথা বলে না বেশি। বিশেষ দরকার না হলে আমিও বলি না। আসে, যায়, কাজ করে নিঃশব্দে। ঘড়ির কাঁটা ধরে। অথচ ঘড়ি রাখে না। আশ্চর্য হই সময়জ্ঞান দেখে। কিন্তু এই যেন এখানে প্রাকৃতিক সহজ ধর্ম। পাখীগুলিও যায়, আসে, ডাকে রোজই ঠিক একই সময়ে। ইঁদুরগুলিও। এমন কি দুটো কাঠবিড়ালীও গাছ বেয়ে ছাদের উপর আসে, ঘোরাফেরা করে একই সময়ে। ভাব হয়ে যায় এদের সবারই সঙ্গে। খাবার ছড়িয়ে দিই। প্রথমে দূর থেকে দেখে এগিয়ে আসে, ভয়ে আবার ফিরে যায়, থমকে দাঁড়ায়, আবার এগিয়ে আসে, ক্রমে ভয় ভাঙে, কাছে এসে খেয়ে যায়। পিছনের দু'পায়ে ভর দেয়, সামনের দু'পা তুলে খাবার ধরে খায়। নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। ফোলা লেজ বেঁকে থাকে পিঠের দিকে।—আমার নির্বাক সঙ্গীর দল।

মানুষ দেখি দূরে থেকে। সাধুরা চলেন গঙ্গাস্নানে। বিদ্যার্থীরা নদীর ধারে বেড়ায়, পাথরের উপর বসে বই পড়ে।

ঘাটে নৌকা বাঁধা। ছোট মোটর বোট। গভর্ণমেণ্টের লোক নদীর জলের মাপ নেয়। শব্দ তুলে এধারে ওধারে নৌকা ঘোরাফেরা করে।

মানুষের সঙ্গ,—সে-ও এক অদ্ভুত আকর্ষণ। দু'একজন সাধু আসেন একে একে আলাপ করতে।

তাঁদের মধ্যেও কতো বিচিত্র চরিত্র।

এক বৃদ্ধ স্বামীজী এলেন। হাতে দুটি পাকা বেল। বলেন, কুটিয়ার সামনেই গাছ। এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ফল দেয়। নিয়ে এলাম আপনার জন্যে।

বলি, আপনি খাবেন, রেখে দিন।

কোনমতেই শোনেন না। বন্ধুর মত পীড়াপীড়ি করেন,—প্রচুর হয়েছে, সবাই পাড়ছে, খাচ্ছে। আমিও ভাগ পাচ্ছি। বাড়ি থেকে আপনি তো নামেনই না দেখি, খবরও রাখেন না, তাই নিয়ে এলাম। শ্রীফল—রেখে দিন।

নিঃস্বার্থ স্নেহের দান। অগত্যা নিতেই হয়।

আর একজন আসেন। গেরুয়া চাদরের কোণে বাঁধা—বড় বড় লাল টমাটো, সবুজ কাঁচা লংকা, দুটো অল্প হলদে পাক-ধরা পেঁপে।

তিনিও জোর করেন। কুণ্ঠিত হয়ে প্রত্যাখ্যান করি। হাত ধরেন। স্নেহভরে অনুরোধ করেন। বলেন, কুটিয়ার আশপাশের জমিটাতে নিজের হাতেই ক্ষেত করেছি। পাশেই কুয়ো, জলের অভাব নেই। গঙ্গার ধারের মাটি। সোনা ফলতে পারে এখানে। সময়ও অফুরন্ত। সামান্য খেটে যত্ন নিতেই কেমন ফলেছে, দেখুন। সব বিলিয়ে দিই। যে চায়, নিয়ে যায়। একা আর কতো খাব! নিজের হাতে তৈরী জিনিস, দিয়েও আনন্দ।

বাধ্য হয়ে নিতেই হয়।

ক'দিন পরে আর এক সাধু আসেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেন, সেদিন সবজি, ফল নিয়ে ঐ স্বামীজী এসেছিলেন বুঝি?

আমি তাঁর সস্নেহ আচরণের প্রশংসা করি। নতুন সাধুজীর মুখে ব্যঙ্গ-সূচক হাসি ফোটে। আশ্চর্য হই। মুখ বেঁকিয়ে জানান, আশ্রমবাসী হলে আর হবে কি মশাই, উনি ব্যবসাদার সাধু। সন্ন্যাস নিয়ে অতো শাকসবজি করবার লোভ কেন? খবর রাখি আমরাও। তলায় তলায় গোপনে বিক্রী চলেছে। বেশ ব্যবসা চালাচ্ছেন। টাকাও জমাচ্ছেন।

কথা শুনে চমকে উঠি। খবরটায় তত নয়। এঁর বলার ধরন দেখে। নিজেই যুক্তি দেখান, লাভ না থাকলে কষ্ট করে এসব করেন কেন? এ তো সহজ প্রমাণ!

নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। ভাবি, সন্দেহের বিষ গেরুয়ার অন্তরালে এখনও কতো উগ্র!

॥ ৩ ॥

অন্ধ এক স্বামীজীও আসেন। লাঠি ঠকঠক করে রাস্তা দিয়ে চলে এলেন। হাত ধরে নিয়ে এলে সুবিধা, কিন্তু কে আর নিয়ে আসে? জানা-পথে একা চলাফেরায় অভ্যাস হয়ে যায়।

আগেই পরিচয় ছিল। তাই খবর পেয়ে দেখা করতে আসেন। নীচের উঠান থেকে চেঁচিয়ে ডাকেন। হাত ধরে উপরে নিয়ে আসি। বলি, কেন কষ্ট করে এলেন, আমিই পরে একদিন দেখা করতাম।

অন্ধ মানুষের আশ্রমে থাকার নানান অসুবিধা। অভিযোগ জানান। আমার থাকার সুবিধা-অসুবিধার খবর নেন। নিঃসঙ্কোচে জানাই, চমৎকার আছি। কোনই অসুবিধে নেই।

তবুও খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এটা পাচ্ছি কিনা, ওটার ব্যবস্থা কি হয়েছে ইত্যাদি।

হেসে বলি, যা পাই তাতেই পরম আনন্দে মন ভরে থাকে, যা নেই তার কথা ভাবিও না। শান্তিতে খাসা দিন কাটছে।

কে জল তুলে দেয় শুনে চমকে উঠে বলেন, সে কী! সেই বদমায়েস চোরটা আপনার কাজ করছে। খুব সাবধান। ও ডাকাত। ডাকাতি করতে গিয়েই তো ওর একটা চোখ যায়। জানেন না বুঝি? জেল থেকে খালাস পাবার পরই এসে এখানে চাকরি নিয়েছে। সবাই জানে। তাকে কালই বিদায় করে দেবেন।

আমি হেসে বলি, সবাই জানে জানুক, আমি যা জানি, লোকটা খুব কাজের, সময়মত সব করে। ঘরদোর আমার খোলা—ওর অবাধ গতিবিধি, কোনদিনই কিছু হারায়নি, সন্দেহ করার কোন কারণও ঘটেনি। হারাবার আছেই বা কি?

ভালই হয়েছে, সাধুর আশ্রমে এসে আপনাদের সেবার কাজ নিয়েছে, নতুন জীবন ওর শুরু হোল।

তিনি তবুও গম্ভীর মুখে সাবধান করেন।

মানুষের মন। তারপর থেকে সে লোকটিকে দেখলেই স্বামীজীর সতর্কবাণী আপনা থেকেই মনে আসে। কিন্তু, সে বছর তো নয়ই, তার পরের বছরও ঐখানে দিনের পর দিন ঐ লোকটিকে বিশ্বাস করেও কখনও ঠকিনি, এমন কি ঘরের চাবি তারই কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে হরিদ্বারেও দু'দিন কাটিয়ে আসি।

চুরি-ডাকাতির দায়ে তার জেল খাটার খবরটা অন্য লোকের মুখেও শুনি। তবুও ভাবি, মানুষ-চরিত্রের বিচার কতো কঠিন!

কিন্তু, অন্ধ স্বামীজীর সাবধানতার কারণও বুঝতে পারি।

ফিসফিস করে জানান, দেখুন তো ব্যাঙ্কের এই কাগজটা। হাজার টাকা সেখানে জমা রেখেছি, রসিদটা ঠিক দিয়েছে কিনা।

গেরুয়া জামার পকেট থেকে কাগজটা বার করে দেন। দেখি এক বছরের Fixed Deposit Receipt স্বামীজীর নামে। বলি, ঠিকই তো আছে। কিন্তু আবার টাকা জমাবার কারণ কি হলো? মানুষের শরীর, এই এক বছরের মধ্যে হঠাৎ কিছু ঘটে গেল—এ টাকা হয়ত গভর্ণমেণ্ট পেয়ে যাবে।

তিনি আশ্চর্য হন। চিন্তিত হয়ে বলেন, সে কি কথা? আমার টাকা গভর্ণমেণ্ট নেবে কেন? কোন সেবা-প্রতিষ্ঠানে যাবে।

আপনি তো তার ব্যবস্থা করেননি? আপনার ওয়ারিশও নেই।

কেন? তবে আমার ছেলে পাবে।

হেসে বলি, আপনার ছেলে? পূর্বাশ্রমের সে-আপনি তো আর নেই। এখন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস-নামে এ রসিদও।

স্বামীজী বিমর্ষ হয়ে প্রশ্ন করেন, তাহলে এখন কি করা যায়?

বলি, অতি সহজ উপায়। এখন এ এক বছর বেঁচে থাকুন, তারপর এমনভাবে আর সঞ্চয় করবেন না।

তাই তো! বড় ভাবিয়ে দিলেন। বাঁচা মরা—সে কি আমার হাতে?—বলে খুটখুট করে লাঠি হাতে পথ খুঁজে ফিরে চলেন।

ভাবি, পথের সন্ধান কি সাধুবেশ নিলেই সহজে মেলে!

॥ ৪ ॥

পাশের বাড়ির সামনে দুখানা মোটর এসে দাঁড়ায়। লোকজন মালপত্র নামে। দেখি, শিষ্য-ভক্তদের নিয়ে এক সাধুজীর আগমন হয়। লোকজনের আনাগোনায় পাশের বাড়ি সজাগ হয়ে ওঠে। অতো লোক, তবু হট্টগোল নেই। কর্মব্যস্ততা আছে।

ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পাই স্বামীজীর বিশাল কলেবর। গেরুয়াবাস। মাথামুখ কামানো। ফর্সা রং। দণ্ডীধারী। দু'বেলা গঙ্গার ধারে বাঁধানো চক্-এ গাছের ছায়ায় শিষ্যদের নিয়ে বসেন, ভাষণ দেন, প্রশ্নোত্তর চলে, কখনো বা ভজনও হয়। তাঁর সৌম্যমূর্তি, সদাপ্রসন্ন মুখের ভাব, শিষ্যদের ভক্তিপ্লুত বিনম্র আচরণ দূরে থেকে দেখেও আনন্দ পাই। পরিচয় জানি না, জানার কৌতূহলও হয় না। তবুও, হঠাৎ একদিন পেয়ে যাই।

পিরান ও পাজামা পরা এক ভদ্রলোক উপরে এসে হাজির হন। অভিবাদন করে বলেন, রোজ দেখি ছাদে বেড়ান, আজই হঠাৎ স্থানীয় একজনের কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে চলে এলাম আলাপ করতে। এই আকর্ষণের বিশেষ একটা কারণও আছে। আমি কাশ্মীরী, আপনার মেজদাদার সঙ্গে আলাপেরও সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর অমূল্য জীবনদান আমরা কাশ্মীরবাসীরা কখনো ভুলতে পারি না—

চোখ তাঁর সজল হয় দেখি।

ধীরে ধীরে কথা ঘোরে। তাঁরই মুখে শুনি স্বামীজীর পরিচয়।

পরিচয় ..সে—কিন্তু স্বামীজীর নাম জানেন না। তিনিও নয়, আর কেউও নয়। বলেন, নাম ওঁর নেই। মধ্যপ্রদেশে এক শহরের কিছু দূরে মঠ। অল্প কয়েকটি ভক্তকে নিয়ে থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি। শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য। অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছেন। কোথাও নাম প্রকাশ করেন নি। শুধু তাতে মঠের নাম। উচ্চকোটির সাধকও। হিমালয়ে বহু বছর কঠোর তপস্যা করেছেন। মহাশক্তিশালী সাধু। কিন্তু কোনও প্রচার নেই। যাঁরা জানেন, তাঁরাই শুধু আসেন, সঙ্গেও হয়ত থাকেন। শঙ্করাচার্যের এক মঠে গদী নেওয়ার অনুরোধ একবার আসে। কোনমতেই রাজি হন না।

ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কেও ধীরে ধীরে বলেন, এই দেখুন না, আমার জীবনেও ওঁর কি আশ্চর্য প্রভাব দেখেছি। নতুন জীবনদান করেছেন। আমি মিলিটারী অফিসার। ছেলেবেলায় দুর্দান্ত দুরন্ত ছিলাম। আর্মিতে যোগ দিয়ে সেখানে যা কিছু খারাপ তাই শিখলাম। কোন কুকর্মেই লজ্জা নেই। কাজে দুর্নাম রটলো, উন্নতিও বন্ধ হোল। তাতেও দুঃখ নেই। বোঝবার শক্তি থাকলে তো? সারাক্ষণই বুঁদ হয়ে আছি। ছুটিতে বাড়ি এসেও সেই এক ভাব। স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের যত্ন নেওয়া তো দূরের কথা, দুর্ব্যবহার করতাম। লোকের নিষেধ উপদেশ কিছুতেই কান দিতাম না। একবার গেলাম রাণীক্ষেতে এক বন্ধুর কাছে। আমারই মত তার হালচাল, স্বভাব। তাই দুজনে জমতো ভাল। কিন্তু গিয়ে তাকে দেখে অবাক হই, সেই মানুষই আর নেই, সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মদ মাংস ছোঁয় না। ধীরস্থির শা.ত মানুষ। সবারই মুখে তার প্রশংসা। সে-ই প্রথম গল্প করে এই স্বামীজীর সম্বন্ধে। কি করে হঠাৎ তাঁর সংস্পর্শে এসে তার এই পরিবর্তন ঘটে। আমাকেও বলে, এঁর কাছে যেতে।

আমি হো হো করে হেসে উঠি। তাকে বিদ্রূপ করি। বোতলের পর বোতল কিনে এনে ওড়াই। বেশিদিন থাকতে পারি না তার নতুন আবহাওয়ায়। ঝগড়া করে চলে আসি। স্বামীজীর কথা কিছুই মনে রাখি না।

কয়েক বছর পরে। মধ্যপ্রদেশের সেই জায়গায় হঠাৎ এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে হাজির হই। স্ফূর্তিতে দিন কাটাই। একদিন মনে পড়ে যায় এই স্বামীজীর কথা। রাণীক্ষেতের বন্ধু বলেছিল না এইখানেই কোথায় আশ্রম? খোঁজ নিই, খবরও সহজেই পাই। বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়ি আশ্রমে। স্বামীজী একটু ঘুরতে বেরিয়েছেন শুনি। পুকুরের ধারে বসে ধূমপান করি। কিছু পরে দেখি তিনি আসেন—প্রকাণ্ড লাঠির মত কি একটা হাতে, গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো। কাছে আসতে উঠে দাঁড়াই। দেখি, তাঁর মুখে অদ্ভুত এক আনন্দের দীপ্তি। যেন মুচকে হাসেন, অতি পরিচিতের মত স্নেহভরা কণ্ঠে স্বাগত জানান। বলেন, তুমি এসে গেছ? এখনও তো তিনদিন ছুটি রয়েছে. আশ্রমে এবার চলে এসো—একদিন এখানেই কাটিয়ে যাও।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাই। জানেন নাকি আমার বিষয়ে সব? চিনলেন কি করে আমাকে? কথা বলেন যেন আজন্ম পরিচয়। পরম আত্মীয়! কেন জানি না, চোখে জল ভরে আসে—আমার মত পাষণ্ডেরও। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিই। মনে হয়, কিসের যেন একটা মস্ত বোঝা ঘাড় থেকে নেমে যায়।

চলে আসি আশ্রমে। তিনদিন পরে বাড়ি ফিরি। সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। স্ত্রী পর্যন্ত দেখে বিশ্বাস করতে চান না,—মাছ-মাংস-ডিম—যা না হলে আমার মুখে খাওয়াই রোচে না—টেবিলে পড়ে থাকে, ছুঁই না। মদের সব বোতল বন্ধুদের বিলিয়ে দিই। লোকের সঙ্গে ব্যবহার মধুর হয়ে ওঠে। চাকরিতেও উন্নতি—এতকাল আটকে ছিল—এবার হতে থাকে। ভাঙা স্বাস্থ্যও সুস্থ হয়ে ওঠে। আনন্দময় এক নতুন জগতে যেন এসে পড়ি। জানি, এসব ঘটনা লোকে সহজে বিশ্বাস করবে না—আমিও আগে নিশ্চয় করতাম না,—কিন্তু এ তো আমারই নিজের জীবনের ঘটনা। আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি এই মহাপুরুষের অসীম কৃপা।—এই তো দশ বছরের ওপর হয়ে গেল—এখন ছুটি পেলেই চলে আসি এঁর কাছে, যতদিন পারি সঙ্গেও থাকি।

ভদ্রলোকের মন-ভরা অনাবিল আনন্দ যেন কথার মধ্যে দিয়ে ঝরে পড়ে।

দূরে থেকে দেখি, আশ্রমের শান্তির মধ্যে এঁরাও কেমন শান্ত-সুন্দর দিনগুলি কাটান। একদিন হঠাৎ স্বামীজীর সঙ্গে ক্ষণিক পরিচয়ের সুযোগও আসে। পথে দাঁড়িয়ে সামান্য কয়েকটি কথা। তবু মনের মাঝে চিরভাস্বর হয়ে থাকে। ভাবি, এঁরাই তো আশ্রম-জীবনের মুকুট-মণি।

কিন্তু, ফুলগাছেও কাঁটা থাকে, সরোবরেও পাঁক জমে। শান্তিভঙ্গকারী মানুষও দেখি। শান্ত নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ ওঠে। তাকিয়ে

দেখি, গঙ্গার ধারে কয়েকটি লোক। জলে হাত-বোমা ছোঁড়ে। বড় বড় মাছ মারা পড়ে। স্রোতে ভেসে চলে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে মাছগুলি ধরে তোলে লোকগুলি। বিপুল উল্লাস। উন্মত্ত হাসি। অথচ, হরিদ্বার-হৃষীকেশ অঞ্চলে জীবহত্যা আইনবিরুদ্ধ। মাছ-মাংসও খাওয়ার সম্পূর্ণ নিষেধ। শুনি, এ সব ফ্যাক্টরীর লোক, আইন ভাঙতে সাহস যোগায় মিলিটারীর লোকেরা—তারাও এতে যোগ দেয়।

ভাবি, স্বাধীনতার এ কী নির্মম পরিণতি! লোকগুলি আইনও মানে না, আশ্রমের শান্তিও জানে না।

॥ ৫ ॥

আমার হিমালয়-যাত্রার সঙ্গী শেষকিরণ হঠাৎ এসে হাজির হয়। বলে, চলে এলাম। এবারও যাব সঙ্গে। কবে রওনা হব ঠিক করুন।

বলি, কদিন এখন কাটাও তো এখানে সুস্থির হয়ে। শীতটা কাটুক, তারপর যাত্রা করা যাবে।

শান্ত পরিবেশের মধ্যে সে-ও আনন্দে দিন কাটায়। কিন্তু তরুণের ধর্ম,—ঘরের মধ্যে সারাদিন বসে থেকে প্রাণ উতলা হয়ে ওঠে। এখানে ওখানে ঘুরে আসে। কোথায় দূরে সুন্দর মন্দির, গঙ্গার ধারে কোথায় নিবিড় বনের স্তব্ধ নির্জনতা,—বেড়িয়ে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প করে। দু'বেলা গঙ্গায় স্নানে ছোটে, সাঁতার কাটে, পাথর থেকে জলে ঝাঁপ দেয়, ভেসে-যাওয়া কাঠ ধরে, জড়িয়ে ধরে স্রোতে ভেসে চলে, মোটরবোটের মাঝির সঙ্গে ভাব জমায়, নৌকায় ঘোরে, ওপারে যায়। সেদিকে এখনও ঘন বন, তারই মাঝ দিয়ে বনবিভাগের মোটর-পথ। মাঝে মাঝে কাঠ বোঝাই লরী চলে। ফিরে এসে বলে, রোজ যে ময়ুরগুলোর ডাক শুনি, আজ সেগুলো দেখে এলাম; হরিণও কয়েকটা ঘুরছে, বনের মধ্যে বেড়াতে চমৎকার লাগে। চলুন না, সারাবেলা একদিন ওপারে বেশ কাটিয়ে আসা যাক।

রাজি হই না। বলি, অনেক ঘুরেছি, আর এখন নয়। এখানে বসেই বেশ বেড়ানোর কাজ হচ্ছে। তুমি ঘুরে দেখে এস। গল্প শোনা যাবে।

হঠাৎ দেরাদুন থেকে স্বামী আনন্দও এসে উপস্থিত হন। দুদিন কাটিয়ে যান। পরম আনন্দ পাই তাঁর স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধ সৎসঙ্গে। রাত্রে ছাদে বসে গল্প শোনান, এসব অঞ্চল আমার পরিচিত। এই তো বছর দশেক আগে এখানে কাটিয়ে গেছি। স্বাধীনতা লাভের পর। ঐ যে ওপাশের জমিগুলো—গভর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর এক বিদেশিনী শিষ্যাকে বন্দোবস্ত দেন—আদর্শগ্রাম ও ক্ষেতখামার গড়বার জন্যে। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলুম। তখনও এসব দিকে বেশ বন-জঙ্গল। হাতির উৎপাতও ছিল ভীষণ। গঙ্গার ওপর থেকে দল বেঁধে রাত্রে আসত। তাদের অত্যাচারের ভয়ে চারিদিকে কাঁটা তার ও কাঠের মোটা খুঁটি দিয়ে জোর

বেড়া লাগানো গেল। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। রোজই আসে। ডাক শুনি। দেখি, বেড়ার বাইরে ঘোরাফেরা করে। একদিন রাত্রে অনেকগুলোর গর্জন শুনে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, চক্ষুস্থির! বেড়ার বাইরে বিরাট আকার সারি সারি দাঁড়িয়ে। ছোট বাচ্চাও আছে। হয়ত পিঠে বসিয়ে এনেছে। রাশি রাশি ঘাসেরও যোগাড় করেছে। তারপর সার বেঁধে একসঙ্গে পাশাপাশি কয়েকটা খুঁটি পায়ের চাপ দিয়ে নড়াতে থাকে। কতোক্ষণ আর হাতির ভার সয়? পর পর কয়টা খুঁটি হেলে পড়ে, কাঁটা তারও কাত হয়। তারপর সেই তারের ওপর ঘাস ডালপালা ফেলে প্রথমে পা দিয়ে দুরমুসের মত চাপে, পরে কয়টা হাতি তার ওপর শুয়ে বারকয়েক গড়াগড়ি দেয়—আর কি! মাটির মধ্যে বেড়া মিশে যায়,—যেন রোলার দিয়ে রাস্তা সমান করা। এরপর সোজা কাজ—ক্ষেতের মধ্যে সবাই ঢুকে খুশিমত ভরপেট খেয়ে, শস্য নষ্ট করে—আবার আনন্দে চীৎকার রব তুলে ফিরে যায়। চোখের সামনে চুপ করে বসে দেখা—করবার তখন আর কিছু থাকে না। পরে জল্পনা-কল্পনা চলে—কিভাবে এ অত্যাচার বন্ধ করা যায়। জন্তু হলে হবে কি, তাদের বুদ্ধি ও কাজের শৃঙ্খলা দেখে অবাক হয়েছিলাম। এখন তো ফ্যাক্টরী এত কাছে চলে এসেছে, হাতিও অদৃশ্য হয়েছে। সে-সব দিনের কথা এখন গল্পের মতই শোনায়।

পরের দিন। স্বামী আনন্দ ফিরে গেছেন। শেষকিরণ ও আমি সন্ধ্যায় ছাদে বসে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ আগে কাটলেও মনে হয় এই যেন সবে সন্ধ্যা নামে। গঙ্গার বুকে চাঁদের রুপালি আলো ঝিকমিক করে। ওপারে পাহাড়গুলি ঘোলাটে দেখায়। গাছগুলি ঘিরে ঘন অন্ধকার। ফাঁকা জায়গাগুলিতে চাঁদের আলো। আলোছায়ার রহস্য-ভরা।

শেষকিরণ বলে, স্বামীজীর হাতির গল্প মনে পড়ছে। দশ বছরের মধ্যে কত বদলে গেল! সে-সব হাতির পাল এখন কোথায় চলে গেছে, কে জানে!

বলি, তা হবে না? ১৯৬৫ সাল। এখন বন কেটে শহর বসা তো স্বাভাবিকই। এখানে গভীর বন আমিও দেখেছি, কিন্তু হাতির দল দেখা আমার ভাগ্যে হয় নি। ঐ যে ওপারে গঙ্গার ধারে ছোট পাহাড়, আর তার পেছনে হিমালয়ের প্রকাণ্ড পাহাড়—মনে হয় যেন ঠিক পেছনেই আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে—শুনেছি, এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে অনেকখানি খোলা মাঠ—সেইখানেই হাতিদের আস্তানা ছিল।

শেষকিরণ বলে, এখন তারা গেল কোথায়?

আরও বনের মধ্যে ঐ বড় পাহাড়ে কোথাও—

কথা শেষ হয়নি। দুজনেই চমকে উঠি দূরে গুরুগম্ভীর শব্দ শুনে।

আমি বলি, ঐ তো হাতির ডাক! চিনি আমি।

শেষকিরণ বলে, তা কখনও হতে পারে? অসম্ভব! ও হয় তো—

আবার শব্দ ওঠে। এবার যেন আরও একটু নিকটে।

আবার শব্দ! আরও কাছে। শব্দ যেন গড়িয়ে আসে। মনে হয়, মেঘ ডাকে, বাজ পড়ে। অনেকগুলি পশুর একসঙ্গে ডাক।

দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াই ছাদের রেলিং ধরে। ওপারের পাহাড়গুলো যেন সহসা জেগে ওঠে, আলোছায়ার জালি-কাটা কম্বল গায়ে বিরাট দৈত্য হুংকার তুলে নিজের অস্তিত্ব জানায়।

আর সন্দেহ নেই। গঙ্গার ঐ পারে হাতির দল এসেছে! জলের ধারে এসে এখন ডাক ছাড়ে।

এপারের গঙ্গার তীর ধরে কজন লোক ছোটে। নৌকার মাঝিরা। শেষাকিরণ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি?

নেমে আসুন, নেমে আসুন, হাতির দল নেমেছে ওপারে—দেখতে আসুন—জল্দি—

শেষাকিরণ লাফিয়ে ওঠে—শীগ্গীর, শীগ্গীর চলুন, গায়ে আর কিছু দিতে হবে না—ঐ যা পরে আছেন—শুধু জুতোটা পরে নিন্, নইলে পায়ে পাথর ফুটবে—তাড়াতাড়ি চলুন—

শান্ত হয়ে বলি, এখান থেকেই দেখা যাক না,—ঐ তো ওপার, সবই দেখা যাচ্ছে।

রাজি হয় না। বলে, সে কি হয়? একেবারে জলের ধারে গিয়ে দেখতেই হবে—শীগ্গির চলুন।

যেতেই হয়। জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াই। আরও কয়েকজন লোক জড়ো হয়। স্থানীয় এক স্বামীজীও আসেন। তাঁরই কাছে শুনি, এখনও মাঝে মাঝে এখানে হাতি দেখা যায়, এপারেও আসে। তবে আজকের দলটা বেশ ভারি। মনে হয়, ত্রিশ-চল্লিশের কম হবে না। হেসে বলি, বোধ হয় পূর্ণিমার স্নানে এসেছে।

পাথরের ওপর বসে তাদের জলকেলি দেখি।

বিরাটকায় একটা হাতি জলের ধারে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ে। স্বামীজী বলেন, ঐটে দলপতি,—বোধ হয় সেই এক-দেঁতোটা, যাকে আগে দেখেছি।—চেঁচিয়ে সর্দার সবাইকে নির্দেশ দেয়। জলের মধ্যে অনেকগুলো হাতি, ভেসে-থাকা ভিঙ্গা। গায়ের অংশ চাঁদের আলোয় ঝকমক করে, নড়ে-চড়ে। শুঁড় তুলে আকাশে জলের ফোয়ারা ছিটায়—হুস্ হুস্ অদ্ভুত শব্দ ওঠে।

বাচ্চাগুলোর স্বর সরু—বেশ পার্থক্য বোঝা যায়।

শেষাকিরণ চেঁচিয়ে ওঠে, দেখুন দেখুন—ওদিকে চড়ায় দুটো হাতি গড়াগড়ি খাচ্ছে!

কয়েকটা হাতি স্নান সেরে ওঠে। গাছের ডালপালা ভেঙে আহারের আয়োজন করে। মড়্মড়্ শব্দ ওঠে। দু-একটা সাঁতার কেটে যেন এপারের

দিকে আসে মনে হয়।

স্বামীজী বলেন, আসা বিচিত্র নয়। এইভাবেই তো আসে। তবে আসবে না মনে হয়। ক্ষেতে এখন তো কিছু নেই—ওরা খবর রাখে সবই।

পাথরের উপর বসে অনেকক্ষণ খেলা দেখি। চাঁদের আলোর মায়ায় মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখি।

অনেক রাতে ঘরে ফিরি। ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত হাতির ডাক, গাছ ভাঙার শব্দ ওপারে থেকে-থেকে চলতে থাকে।

শব্দ যেন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়—কাছে, দূরে। ক্রমে ক্রমে মিলিয়েও যায়।

সকালে উঠে শেষকিরণের উত্তেজনা ও আগ্রহ আরও বাড়ে। বলে, এখুনি তৈরি হয়ে নিন, ওপারে যাব। সার্ভে করে আসা যাক—সার্কাসটা কাল কেমন হোল।

সহজে রাজি হতে চাই না। অথচ, তাকে একলা ছাড়তেও ভরসা পাই না। অগত্যা দুজনে চলি। কালকের রাত্রের পরিচিত সেই স্বামীজীও দেখতে পেয়ে এসে যোগ দেন। নৌকা ওপারে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। ঘণ্টা তিনেক পরে আবার গিয়ে নিয়ে আসবে।

ওপারে নদীর ধারে গত রাত্রে হাতিদের প্রলয় কাণ্ডের ছড়ানো চিহ্ন। ভাঙা গাছপালা ডাল, সর্বত্র থালার মত পায়ের ছাপ—ছোট বড় মাঝারি। বালির উপর গড়াগড়ি দেওয়ার প্রমাণ—যেন রোলার টেনে দাগ করা।

শেষকিরণের মন ভরে না। বলে, না, হোল না,—চলুন বনের মধ্যে একটু ঢোকা যাক—ঐ দুটো পাহাড়ের মাঝখানে সেই মাঠটায় একবার উঁকি দিয়ে দেখাই যাক না, এখনও আছে কিনা।

আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আর্মড—Armed হয়ে এসেছি, সঙ্গে আমার স্কাউটের বড় ছোরাটা—এই দেখুন না।

স্বামীজী হেসে ওঠেন। আমিও হেসে বলি, হাতির কানে সুড়সুড়ি দিতে এনেছ বুঝি? দল বেঁধে তাড়া করলে তখন করবে কি?

এগিয়ে চলে। আমরাও সঙ্গে চলি। চারিপাশে হাতির ফেলে যাওয়া টাটকা চিহ্ন। সদ্যভাঙা কাঁচা ডালপালা। লম্বা বাঁশ ভেঙে চিবিয়ে ফেলা—যেন আখের ছিবড়া। পায়ের কাঁচা ছাপ।

স্বামীজী বলেন, অল্প আগেই এদিক দিয়ে গেছে; সাবধানে চলুন।

সামনের গাছগুলো দেখে হঠাৎ মনে হয় ঐ বুঝি দাঁড়িয়ে। বাতাসে বড় পাতা নড়ে, ঠিক যেন হাতির কান দোলে।

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলি। ছোট পাহাড় শেষ হয়। সামনের বাঁকের কোণে বড় মাঠের সামান্য অংশ দেখা যায়। স্বামীজী বলেন, ঐ বাঁকটা ঘুরলেই দেখতে পাওয়া—

মুখের কথা মুখেই থাকে। বিরাট হুঙ্কার ওঠে কানের পাশেই,—একটার নয়, কয়েকটার একই সঙ্গে। পাহাড়গুলো যেন কেঁপে ওঠে, গাছগুলোও শিউরে ওঠে। সন্দেহ থাকে না,—ঐ কয় হাত দূরে সামনের বাঁকের পাশেই মহাত্মারা বিরাজ করেন।

শেষকিরণকে বলি, আর কথা নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এখনি ফেরো।

ফিরি বটে। কিন্তু মন যেন টানতে থাকে ঐ দিকেই। চলি, ফিরে ফিরে তাকাই, মাঝে মাঝে ডাকও শুনি।

এর কয়েকদিন পরেই রাত্রে বন্দুকের শব্দ পাই। পরে খবর শুনি, ওপারে পাহাড়ের ঐ অঞ্চলেই একটা বড় ডোরাকাটা বাঘ দেখা দেয়, কয়জন শিকারী এসে মেরে নিয়ে যান।

শেষকিরণ সারাদিনই মুখ গম্ভীর করে কাটায়। বলে, ভাল লাগে না মোটেই—এমন করে মারা!

॥ ৬ ॥

কয়েক পশলা বৃষ্টি নামে। দুদিনের জন্যে আবার শীত ফিরে আসে। তারপর, যেন সজল নয়নে বিদায় চায়।

হিমালয় যাত্রার দিন স্থিরও হয়। শেষকিরণের মনও আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সঙ্কোচ করে একদিন বলে, "যাত্রার দিন তো এগিয়ে আসছে। তার আগে একটা কথা রাখবেন বলুন। না করবেন না কিন্তু। সব ঠিকঠাক করেছি, আপনি রাজি হলেই—হবেন নিশ্চয়—কালই প্রোগ্রামটা করা যাক।"

"বল আগে শুনি। মাথায় আবার কি পোকা নড়ল, দেখি।"

প্ল্যান শুনে স্তম্ভিত হই। মনে মনে খুশিও হই। গঙ্গার স্রোতে তখন কাটা-কাঠের—Logs-এর সারি বেঁধে ভেলা ভেসে চলে হৃষীকেশ থেকে হরিদ্বারে। তারই কোনটার উপর বসে হরিদ্বার যেতে হবে—নদীপথে বোধ করি মাইল কুড়ি দূরত্ব।

অনন্ত-রত্ন-ভাণ্ডার হিমালয়। দুর্গম পাহাড়ের সুদূর অঞ্চলে জঙ্গল জমা নেয় কনট্রাকটাররা। লোকজন নিয়ে বনের গাছ কাটে। কাঠ চিরে লম্বা লম্বা তক্তা তৈরি করে। পাহাড়ের বহু উপরে নদীর জলে সেগুলি ভাসিয়ে দেয়। স্রোতের টানে নেমে আসে তক্তার সারি। পাহাড়ী নদীর প্রচণ্ড বেগ। বড় বড় কাঠ ভেসে চলে, যেন খড়ের টুকরা। পাথরের আঘাত পেয়ে জলের ঘূর্ণিতে ঘুরে ছুটে চলে। হয়ত কোথাও নদীর চড়ায় আটকে থাকে। কনট্রাকটারের লোক খবর রাখে। বাঁশ দিয়ে আবার স্রোতের মুখে ঠেলে দেয়। হাজার হাজার গুঁড়ি এইভাবে ভেসে এসে জমা হয় হৃষীকেশে ত্রিবেণী ঘাটের কাছে। সেখানে দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঠের ভেলা সাজানো হয়। সারি সারি তক্তা—৬।৭ হাত লম্বা। পাশাপাশি রেখে দড়ি দিয়ে বাঁধা। হয়ত উপর উপর

সাজিয়ে দু-তিন থাকও হয়। লম্বা ভেলা—চার-পাঁচ হাত থেকে শুরু করে কুড়ি-পঁচিশ, এমন কি পঞ্চাশ হাতও। এই ভেলাগুলি আবার ভাসিয়ে নিয়ে চলে হরিদ্বারে। ভেলার আকার অনুযায়ী লোক থাকে—দুজন চারজন করে। স্রোতের টানেই ভেসে যায়, তবু মাঝির হাতে লগি থাকে, হালের মত কাঠও ধরে,—প্রয়োজনমত ভেলার গতিমুখ ও গতিবেগ সংযত করে।

ঘরে বসে রোজই দেখি, এইভাবে ভেলা ভেসে চলে—স্রোতের প্রচণ্ড বেগে, তীরের মত।

নৌকায় চড়ে মাঝগঙ্গায় তারই একটিতে উঠি। জলের টানে ভেলা মুহূর্তের জন্যও দাঁড়ায় না। পাশাপাশি নৌকা চলে সম-গতিবেগে। লাফিয়ে ভেলার কাঠের উপর দাঁড়াই। ভার পেয়ে পায়ের তলায় তক্তা ক্ষণিকের জন্য জলে ডোবে, পায়ের জুতো ভেজে, দেহের টাল সামলাই, তাড়াতাড়ি আর একটার উপর পা রাখি, আগেরটা ভেসে ওঠে, এটা জলে ডোবে। মাঝির নির্দেশে তখনি মাঝখানে তিন-থাকে-সাজানো তক্তার উপর উঠে বসে পড়ি। Seesaw বা ঢেঁকিকলের মত ভেলা ওঠানামা করে ছুটে চলে। ফিরে তাকিয়ে দেখি, কোথায় দূরে পেছিয়ে পড়ে থাকে আমাদের ঘাট। নক্ষত্রবেগে ভেলা ছোটে। প্রকাণ্ড লম্বা ভেলা। গঙ্গার একটানা ঢেউ-এর দোলায় ভেলার তক্তাগুলিও উঁচুনীচু ঢেউ খেলে অনবরত দুলতে থাকে। দেহের মধ্যেও সেই তরঙ্গ-হিল্লোলের এক অদ্ভুত ঢেউ-খেলানো কাঁপন শিরশির করে। ডোববার ভয় নেই, তাই ভাবনাও নেই,—অপরূপ এক আনন্দ-দোল। মায়ের কোলে বা দোলনাতে শুয়ে শিশুকালের আনন্দ উপভোগ বা গভীর শান্তিতে শিশুর চোখে ঘুম নেমে আসা, মানুষের মনে থাকার কথা নয়; হারিয়ে যাওয়া সে মধুর স্মৃতি আজ যেন মনে ভেসে ওঠে।

নদীর বুকে ছড়ানো—কোথাও বা মাথা তুলে—রাশীকৃত শিলাখণ্ড। যেন, কচ্ছপের দল জলে ভাসে। নদীর ধারা বাধা পেয়ে এঁকে-বেঁকে ঘুরে চলে, স্রোতের বেগও বাড়ে, কোথাও বা অল্প ধারা, কখনও বা গভীর জল। মাঝি কেমন করে পাথরের আঘাত বাঁচিয়ে বালুময় চড়া পাশে রেখে, স্রোতমুখে ভেলা ঠিক নিয়ে চলে—দেখে আশ্চর্য লাগে। কখনও বা সহসা তিন-চার হাত নীচে নদীর জল ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভেলাও তেমনি সেখানে লাফিয়ে নামে। মনে হয়, এই বুঝিবা বাঁধনগুলো ছিঁড়ে গিয়ে তক্তাগুলি ছড়িয়ে পড়ে! কিন্তু অঘটন কিছুই ঘটে না, ঢেউ-এরই শুধু প্রচণ্ড দোলা। কাঠের আসনের উপর দেহ ছিটকে ওঠে, মাঝির সতর্কবাণী আগেই শুনি—দু'হাতে ভেলার দড়ি সজোরে আঁকড়ে থাকি—মুখে চোখে গায়ে জলের ঝাপটা লাগে। আবার জলে বিস্তীর্ণ হয়ে ভেলা ছুটতে থাকে।

মনে হয়, আকাশপথে উড়ে চলি ম্যাজিক কার্পেটে বসে, বাতাসের ঢেউ-এ কার্পেট দোলে।

বিচিত্র আনন্দ জাগে মনে।

শেষাকিরণ নিষেধ মানে না, ভেলার উপর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, ফটো তোলে, স্রোতের ঝাঁকুনিতে দেহের টাল সামলায়।

আবেগ-ভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করে—

ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা রাত্রিবেলা।
ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল!
দে দোল দোল্।

*　　*　　*

যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল।

*　　*　　*

দে দোল দোল্॥

কবির কল্পনাচিত্র চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের কোল ছেড়ে নদী ছড়িয়ে পড়ে উন্মুক্ত সমতলভূমিতে। দুরন্ত স্রোতের গতিবেগে ক্লান্তি নামে। জলের ধারা বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে যায়, যেন বিশ্রাম খোঁজে, ধীরে এগিয়ে চলে। গঙ্গার এখানে নামকরণও হয়,—সপ্তধারা। মনোরম এক পুরাণ-কাহিনীও গড়ে ওঠে।

হিমালয়ে মহাদেবের জটার জালে পথ হারান ভাগীরথী। আবার মুক্তিও পান। পর্বতপথ ছেড়ে সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হন। সাগরপানে এগিয়ে চলেন। দূরে সম্মুখে দেখেন, বনের ধারে সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্যানে বসে। সাত ঋষি—সাত জায়গায়। থমকে দাঁড়ান পুণ্যবতী ভাগীরথী। সমস্যা জাগে মনে, কোন্ ঋষির আশ্রমের সামনে দিয়ে যাই? অপর মুনিরা যদি কুপিত হন্! —সুবুদ্ধি যোগায়। সাত ধারায় বিভক্ত হয়ে সাত ঋষির চরণ-পুজা করে স্বর্গনদী এগিয়ে চলেন।

কিন্তু এখন আমরা ধরি কোন্ ধারা? কাণ্ডারী হাল ধরে নিয়ে চলে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্ত মনে।

ছোট ছোট দ্বীপ। গাছের ঝোপ। মাঝে মাঝে কুটিরা। শান্ত-সুন্দর তপোবন। গঙ্গাস্নান করেন কৌপীনধারী সাধু। কোথাও বা পাথরের উপর গঙ্গার ধারেই ধ্যানে বসে মধুর স্থিরমূর্তি। পাথরে খোদাই করা অপূর্ব রূপ। ভাবি, আকাশ ছেড়ে সপ্তর্ষিগণ কি আবার নেমে এলেন ধরাধামে।

বনের ধারে হরিণ চরে। মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে ভেসে-যাওয়া ভেলার দিকে।

চারিপাশে সুগভীর মহান্ শান্তি। নদীর ধারাই শুধু সরবে ছুটে চলে, পৃথিবী যেন গতিহীন, নিস্পন্দ, নীরব।

হৃষীকেশ থেকে দু-ঘণ্টা লাগে এইভাবে হরিদ্বার পৌঁছুতে।

কতবার হৃষীকেশ-হরিদ্বার যাতায়াত করেছি। ট্রেনে, বাস-এ, মোটরে, টাঙায়। সে-পথে মাইল পনেরো মাত্র দূর। শহরে ঢুকতে প্রতিবারই টোল-ট্যাক্স দিতে হয়। বার বার টোল দিতে গায়ে লাগে। নদীপথে এসে সেই টোল-না-দেওয়ার অদ্ভুত এক ক্ষুদ্র তৃপ্তি মনের কোণে উঁকি মারে।

হরিদ্বারে নদীর মুখে পাকা বাঁধ। এইখানেই কাঠ জমা হয়। তীরে উঠিয়ে ট্রাক-এ, ট্রেনে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা।

আবার লোকালয়ের কলকোলাহল। কর্মচঞ্চলতা।

শেষ হয় নদীপথে কুড়ি মাইল ভেলায় ভেসে আসা। মনের মধ্যে সোনার খাঁচায় সুখস্মৃতি চিরতরে ধরা থাকে।

আফ্রিদি-মুল্লুকে

॥ ১ ॥

বদরীনাথ থেকে খাইবার গিরিপথে।

একই যাত্রায় নয়। তবে, একই বছরে। তাও, সাম্প্রতিক কালে নয়,—সেই ১৯২৮ সালে।

মে-মাসে চলি কেদার-বদরী। হিমালয়ের সেকালের দুর্গম তীর্থ। হৃষীকেশ থেকে পায়ে-হাঁটা দীর্ঘ পথ। যুগ-যুগান্তর ধরে এরই বুকে চরণচিহ্ন আঁকা লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর। সেই অন্তহীন নিরন্তর যাত্রার ধারা এখনও বয়ে চলে। সারি সারি যাত্রীদল। মুক্তিকামী সাধুসন্ত। পুণ্যলোভী নরনারী। হিমালয়-প্রেমিক পরিব্রাজক। সারা ভারতের সর্ব প্রদেশ থেকে তাঁরা আসেন। এই প্রাচীন তীর্থপথে তাঁদের পদধ্বনি যেন জাগিয়ে রাখে শাশ্বত ভারতের চিরন্তন হৃৎস্পন্দন। বোঝা যায়, অদৃশ্য কোন্ এক স্বর্ণসূত্রে গাঁথা থাকে ভারতবাসীর অন্তরাত্মা।

চারিপাশে হিমালয়ের উত্তরাপথের উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। যেন, জটাজুটধারী ধ্যানরত প্রাচীন ঋষিবৃন্দের সমাবেশ। তাঁদের উন্নত শিরে হংসশুভ্র তুষার-স্তবক। করপুটে নদী জপমালা। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী, স্বর্গসুতা অলকানন্দা, নৃত্যপরা মন্দাকিনী। শ্যামল অরণ্যানীর স্নিগ্ধছায়াঘন তটভূমি।

আর, সেকালের গাড়োয়ালবাসী? কপর্দকশূন্য দৈন্যের মাঝেও মুখভরা প্রসন্ন হাসি, বুকভরা সুখ, সুগভীর প্রশান্তি। তীর্থযাত্রীর নিঃস্বার্থ-সেবারত। নিরীহ, নির্লোভ, সরল মানুষের দল। মারামারি, কাটাকাটি, চুরি-ডাকাতি— এ-সব তাদের স্বপ্নেরও অতীত। সেখানে হিমালয়ে সাধুর আশ্রম, তপস্বীর তপোভূমি,—পাহাড়ের চূড়ায়, নদীর তীরে দেবদেবীর দেবায়তন।

নৈসর্গিক শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে চলে ভক্ত তীর্থযাত্রী,—ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ, তবু মন-ভরা আনন্দ ও শান্তি।

অপর দিকে,—

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য প্রদেশ,—পেশোয়ার, খাইবার,— আফ্রিদিদের দেশ। সেখানেও পাহাড়ের বুকে আঁকা ভারতের বহু যুগের ইতিহাসের পদচিহ্ন। কিন্তু, সম্পূর্ণ ভিন্ন তার রূপরেখা। রুক্ষ রুদ্র তরুলতা-শূন্য পাহাড়। দুর্ধর্ষ সেখানকার মানুষ। যুদ্ধ তাদের খেলা। বীরত্বব্যঞ্জক তাদের জীবনধারা। শান্তি শৃঙ্খলার ধার ধারে না।

সেখানে গিরিশিরে মন্দিরের শান্ত শোভা নয়,—উগ্রমূর্তি পাথর-গাঁথা দুর্গ। মানুষের হাতে সেখানে জপের মালা নয়,—রাইফেল বন্দুক আগ্নেয়াস্ত্র।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সেখানে রচিত হয় রক্তাক্ষরে, রণাঙ্গনে।—তার কারণও থাকে।

হিন্দুকুশের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপ্রাচীর ভেদ করে—আরও নেমে এসে—উত্তর-পশ্চিম

ভারত ভূমিতে প্রবেশের সেকালে সেই ছিল সিংহদ্বার। অতিকায় অজগরের মতন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে আসে সর্পিল গিরিবর্ত্ম, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খাইবার পাশ্।

এখন আর ভারতের প্রবেশদ্বার নয়। নতুন দেশ পাকিস্তানের।

কিন্তু, যে-সময়কার এ কাহিনী, তখন ছিল ভারতেরই অন্তর্গত। তবে, ভারত তখন পরাধীন। বৃটিশ শাসনে শৃঙ্খলিত। ঐ অঞ্চল তখনকার ভারতের সীমান্ত প্রদেশ। অতএব, বিদেশী সরকারের ছিল কড়া পাহারা। দেশের মধ্যে হলেও যাতায়াতের স্বাধীনতা ছিল না। এখন ভারত স্বাধীন, কিন্তু সে দেশ ভারতের বহির্ভূত।

সেই অধুনা-হারিয়ে-যাওয়া দেশে গিয়েছিলাম সেই সেকালে। তারই এই ক্ষুদ্র কাহিনী।

১৯২৮ সালের নভেম্বর মাস। ক'মাস আগে ঘুরে এসেছি কেদার-বদরী। এখন পূজার ছুটি কাটে শৈল-শহর সিমলাতে। কলকাতায় ফেরার দিন এগিয়ে আসে। হঠাৎ ঠিক করি, হাতে এখনও তো কদিন সময়,—যাই না কেন পেশোয়ার, খাইবার পাশ্ দেখে আসি।

সঙ্গীও পেয়ে যাই। অতি নিকট আত্মীয়-বন্ধু এবং তার বৃদ্ধ পিতা। ঠিক হয়, যাবার পথে অমৃতসর, লাহোর, তক্ষশিলাও দেখে যেতে হবে।

৯ই নভেম্বর যাত্রা শুরু। কালকায় নেমে রাত্রের ট্রেন ধরা হয়। পরের দিন সকালে অমৃতসরে নামি। একটা পাঞ্জাবী হোটেলে একবেলার জন্যে আশ্রয় নেওয়া হয়।

শিখেদের বিশ্ববিখ্যাত স্বর্ণমন্দির মনে ভক্তি ও আনন্দ জাগায়। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের বুকে মদোন্মত্ত বৃটিশরাজের চিরকলঙ্কময় কুকীর্তির লাঞ্ছন ভৃগুপদচিহ্নের মত ভারতমাতা ধারণ করেন, দেখি। পরাধীনতার গ্লানি অন্তরে বৃটিশ-বিদ্বেষের ইন্ধন যোগায়। আবার, শহরের আর এক প্রান্তে শিখবীর রণজিৎ সিংহের দুর্গ দেশজননীর ভক্ত সন্তানের গৌরব-কাহিনী প্রচার করে। শিখেদের খালসা কলেজেও যাই। শহরের জনতাবহুল বাজারেও ঘুরি। বেলা বাড়ে। শহর দেখার বাসনাতৃপ্ত মন ও ঘোরাঘুরিতে-ক্লান্ত-দেহ নিয়ে হোটেলে ফিরি। কিন্তু, দ্বিপ্রহরের ভোজনে তৃপ্তি দেয় না। আমিষ-প্রধান মশলা-বহুল পাঞ্জাবী খাদ্য। নিরামিষাশী বাঙালী যাত্রী। পিতৃতুল্য বৃদ্ধ সঙ্গী সহাস্যে অনুযোগ করেন, বাপু, হোটেলে কদিন এভাবে খাওয়া চললে হয়েছে আর কি!

বলি, ঠিকই বলেছেন। আর এ ধরনের পাঞ্জাবী হোটেলে খাওয়া নয়। ভিন্ন ব্যবস্থার চেষ্টা করা যাবে।

দুপুরের ট্রেন ধরে লাহোরে চলি। দেড় ঘণ্টার মধ্যে পেঁছে যাই। লাহোরে রাত কাটানোর উদ্দেশ্য নেই। শহর দেখে রাত্রে রাওয়ালপিণ্ডির ট্রেন ধরতে

হবে। সেইমত স্টেশনে নেমেই রাত্রের ট্রেনে তিনটে বার্থ রিজার্ভ করা হয়। মালপত্রও স্টেশনেই থাকে—'লেফ্‌ট্‌ লাগেজে'। হালকা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অনেক সুবিধে। কিন্তু ঘোরা-শেষে রাত্রের আহার? মতলব আঁটি মনে মনে। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিই। বলি, চলো, 'ট্রিবিউন' দপ্তরে।

লাহোরের দৈনিক সংবাদপত্র—ট্রিবিউন। খ্যাতনামা বাঙালী সম্পাদক। শ্রদ্ধেয় কালিনাথ রায়। সাত বছর আগে—১৯২১ সালে—বাবার সঙ্গে যখন প্রথমে লাহোরে আসি, দেখেছি, কালিনাথবাবু প্রায়ই আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

পত্রিকার অফিসের সামনে গাড়ি থামে। সঙ্গীদের বলি, একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসছি।

সম্পাদকের ঘরে ঢুকি। দেখে চিনতে পারেন না, পারার কথাও নয়। পরিচয় পেতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সস্নেহে বসতে বলেন। জানাই, এখন বসা নয়। গাড়িতে দুজন সঙ্গী রয়েছেন। তাঁদের পরিচয় দিই। আমাদের প্রোগ্রামও বলি, এখনি শহর ঘুরতে যাব। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ডেকে আনি, তাকে বলে দিন, এই একবেলার মধ্যে কোথায় কি দেখা যেতে পারে। ঘোরা সেরে আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবে। তখন সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা। রাত্রে রাওয়ালপিণ্ডির ট্রেন ধরা।

তিনি হাসেন। বলেন, একেবারে ঘোড়ায় চড়ে আসা দেখছি। কিন্তু এইটুকু সময়ে লাহোরের আর দেখবে কি? আজ শুধু সালিমারবাগ, শাহাদারা দেখে শহরের মধ্যে একটা চক্কর দিয়ে চলে এস। পেশোয়ার থেকে ফেরবার পথে এখানে অন্ততঃ একদিন কি দুদিন কাটিয়ে যেও,—তখন ফোর্ট, মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখবে,—সব ব্যবস্থা করে রাখব।

সেই মতই তখনি ঘুরতে চলি।

দেখে আসি, শাহাদারার সুরম্য উদ্যানের মধ্যে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কারুকার্যময় শ্বেতপাথরের সুদৃশ্য সমাধি-সৌধ। সদর্পে ও সগৌরবে মাথা তুলে।

আর,—তারই অদূরে—তাঁরই প্রিয়তমা মহিষী, মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত সর্বময়ী সম্রাজ্ঞী, অশেষ রূপগুণবতী যশস্বিনী নূরজাহানের নগণ্য সমাধিক্ষেত্র। পাথরের অতি সাধারণ সামান্য একটুকরা গাঁথনি। নিরলঙ্কার, নিরাভরণ, প্রভাহীন। সেই মনস্বিনী রমণীর দুঃখময় শেষজীবনের যেন বিষাদ-ছায়ামলিন। সমাধির বুকেও তাই উৎকীর্ণ করা এই শায়েরী :

বর্‌মজার-ই-মা ঘরীবান্‌ নই চিরাঘী নই ঘুলী,
নই পর-ই-পরওয়ানা সুজদ নই সদা-ই বুলবুলী।
["গরীব গোরে দীপ জেবলো না ফুল দিও না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।"—
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)]

ভাবি, ভাগ্যবিধাতার কী সকরুণ বিধান!

শহর ঘুরে কালিনাথবাবুর আবাসস্থলে আসি। ভারত-বিলডিংস্-এ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সান্ধ্য আহার হয়। কালিবাবু সুপরামর্শ দেন, ও-সব পাঞ্জাবী হোটেলে তোমাদের পোষাবে না। রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার—দু'জায়গাতেই কালীবাড়ি রয়েছে,—থাকা, খাওয়ার ভাবনা নেই। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি এ সব,—বিদেশে বাঙালির কতো বড় আশ্রয় দেখবে।

॥ দুই ॥

রাত্রে ট্রেনে শুয়ে শুয়ে ভাবি, বাংলার বাইরে বাঙালীদের কথা। সেকালে তাঁদের অনেকেরই বিদেশে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দেশব্যাপী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। আগন্তুক অপরিচিত বাঙালীদের সাদরে ডেকে এনে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। প্রবাসে কালীবাড়ি স্থাপনা করে বাঙালীদের সাময়িক থাকবার পাকা ব্যবস্থা করেন, আশ্চর্য কি? তা ছাড়া, বাঙালীরা তো অনেকেই মায়ের ভক্ত। আমারও জন্ম কালীমাতার খাস এলাকার মধ্যে,—ভবানীপুরে। ছেলেবেলায় দেখেছি, দোকানে বিক্রী-করা মাংস বাড়িতে ঢুকতে পেত না। কালীঘাটে মায়ের কাছে বলি দেওয়া ছাগমাংসই শুধু আনা চলতো। সে-সব প্রথা কোন্ কালে লোপ পেয়ে গেছে। মায়ের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনও কতো বিচিত্র ভাবে রূপ নিত। মনে পড়ে, এক বন্ধুর কাছে শোনা এই লাহোরেরই প্রবাসী এক বাঙালীর অতি-অদ্ভুত জীবন ও কালী-ভক্তির কাহিনী। বন্ধুর ভাষাতেই বলি: "সে বছর কাজে লাহোর যেতে হোল। সপ্তাহ তিনেক থাকতে হবে। কর্মস্থলের নিকটে বড় রাস্তার ওপর একটা সস্তা বাঙালী হোটেলের সন্ধান পেয়ে সেইখানেই উঠলাম। নাম শুনি, ডাক্তারবাবুর হোটেল। তিনতলা বাড়ি। একতলায় খানকয়েক দোকান-ঘর। দোতলায় মালিক ডাক্তারবাবু নিজেই থাকেন,—একা। তিনতলায় কাঠের পার্টিশন দেওয়া ক'টা একানে ঘর,—বোর্ডারদের জন্যে। আমার ঘরের পাশে দুটি মাত্র বোর্ডার। অনেক দিন আছেন শুনলাম। তিনতলাতেই হোটেলের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা। রান্নার লোক আছে, দুজন চাকরও আছে। দু'বেলা চা-জলখাবার, দুপুরে ও রাতের আহার, ঘরভাড়া, ইলেক্‌ট্রিক খরচা,—সব কিছুর বাবদ মোট দৈনিক চার্জ দেড় টাকা। মালিকের চলে কি করে, অবাক্ হই। শুনতে পাই, লোকটি নাকি অদ্ভুত। লোকে তাঁর নাম দিয়েছে,—'মা-খাই'। কথাটার মানে বুঝি না, তবে বুঝতে পারি, ব্যবসার গরজে হোটেল চালানো নয়। হয়ত প্রবাসী বাঙালীদের সস্তায় থাকবার একটা ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য, আর তাই থেকে নিজের খরচেরও যৎটুকু সাশ্রয় হয়। অথচ, লোকটি নাকি অসামাজিক, তাঁর সঙ্গে বিশেষ কেউ মেশেন না, খদ্দের এল-না-এল তারও তোয়াক্কা করেন না। আমাকে কিন্তু প্রথম দিন বেশ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। প্রতিদিন আসা-যাওয়ার পথে দোতলায় সিঁড়ির পাশে দেখিও, তাঁর আধা-অন্ধকার বড় ঘরে, একলাই সেখানে বসে আছেন; চোখাচোখি হলেই একটু মৃদু হাসির বিনিময় হয়,—অসামাজিক

বলে মনে হয় না। দিন তিন-চার পরে বিকাল পাঁচটা নাগাদ ফিরছি, তাঁর ঘরে হঠাৎ উঁকি মারতে দেখি, একটা দড়ির খাটিয়াতে একলা চুপচাপ বসে। চোখাচোখি হতেই সাদরে বলে উঠলেন, "আসুন না—আসুন না!"

'জামাকাপড় বদলে আসছি এখনি—' বলে উপরে চলে গেলাম। চা-জলযোগ সেরে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলাম।

ডাক্তারবাবু আদর করে কাছে ডেকে তাঁর গায়ে-গা-লাগিয়ে সেই দড়ির খাটিয়াতেই বসালেন। ডাক্তারবাবুর পরনের বেশবাস অত্যন্ত মলিন,—খাটো ধুতি আর গেঞ্জি। ঘরে কোন জানলা নেই। ঘুপসি অন্ধকার। ঘরের আসবাব দীন, অগোছালো। খাটিয়ার পাশেই একটা টিপাই। তার ওপর আধ-খালি বিয়ারের বোতল। প্রথম অভ্যর্থনায় বোতলটা দেখিয়ে বললেন, "আসুন,—একটু—"

করজোড়ে নিবেদন জানালাম, আমি ও-রসে বঞ্চিত।

তিনি বললেন, "খুব ভালো! খুব ভালো!"

ঘরের অন্ধকার ভাবটা ক্রমশঃ খানিক কেটে আসে। তখন নজর পড়ে, খাটিয়ার পাশে দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গী। তার তাকে এটা-সেটা টুকিটাকি জিনিস। তারই মাঝে ন-দশ ইঞ্চি লম্বা একটা মাটির কালীমূর্তি। কালীঘাটে যেমন খেলনা বিক্রি হয়। লক্ষ্য করি, মূর্তিটির আশেপাশে দু-একটা শুকনো জবাফুল ছড়ানো,—যেন বেশ কিছুদিন আগে কেউ নিবেদন করেছে।

ঘরভরা মূর্তিমান তামসিকতা।

কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা আভা ছড়িয়ে বসে আছেন ডাক্তারবাবু। বয়স তখন তাঁর ষাটের ওপর, তবুও অত বয়সের শরীরের বাঁধুনি অটুট। বয়সকালে অসাধারণ স্বাস্থ্যবান ছিলেন, ব্যায়ামপুষ্ট পেশীগুলি স্পষ্ট তার সাক্ষ্য দেয়। অত্যন্ত সুপুরুষ। নাতিদীর্ঘ দেহ। সাহেবদের মত ধবধবে রঙ। মাথাভরা কালো কুচকুচে কোঁকড়া চুল। চোখ দুটা করমচার মত টকটকে লাল,—মনে হয়, অতিরিক্ত বিয়ার পানের ফল। তবে, কথায় জড়তা বা মত্ততা কিছু ছিল না। যদিও আমি তাঁর চেয়ে অনেক ছোট, তবু বেশ অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করলেন, বয়সের ব্যবধানটা কোন অন্তরায় হোল না।

আমার পরিচয় সম্বন্ধে দু-একটা মামুলী প্রশ্নোত্তরের পর আমি তাঁর পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি খাস মধ্য-কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। শুনে কৌতূহল বাড়ল। প্রশ্ন করলাম, এইভাবে স্থায়ী লাহোরবাসী হলেন কি করে?

তাঁর রক্তবরণ চোখ দুটি আমার দিকে ঘুরিয়ে বললেন, সে অনেক কথা। আপনার কি বসে শোনবার ধৈর্য হবে?

আমি বললাম, বলুন না—শোনাই যাক। এই তো সবে বিকেল! আর আমার কাজই বা কি আছে এখানে?

হঠাৎ—আমাকে চমকে দিয়ে, বিয়ারের বোতলটা তুলে নিয়ে, সেই কালীমূর্তির

দিকে তাকিয়ে "মা-আ খা-ই !" বলে মুখ উঁচু করে সোজা বোতল থেকে গলায় এক ঢোক ঢেলে পান করলেন, বোতলটা পূর্বস্থানে রাখলেন, মুখটা কাপড়ে মুছে নিলেন। তারপর আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে প্রতি পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর "মা-খাই" বলে মাকে নিবেদন করে কারণ-বারি পান চলতে লাগল। শুনলাম, মাকে নিবেদন না করে কখনও তিনি পান করেন না।

আমিও এবার বুঝলাম, তাঁর 'মা-খাই' নাম হওয়ার কারণ।

ডাক্তারবাবুর জীবনে বেশ বৈচিত্র্য আছে।

বললেন, "আজ তিরিশ বছর হল লাহোরে আছি। লেখাপড়া বেশী শিখিনি। কলকাতার একটা বৃটিশ ফার্মে সামান্য একটা চাকরি পেয়েছিলাম। চেহারাটা বিশেষ ভাল ছিল, তার ওপর কুস্তি-টুস্তি করে শরীরটাও গড়েছিলাম, এখনও বোধ হয় তার চিহ্ন কিছু রয়েছে,—" বলে নিজের হাতের পেশীগুলির দিকে একবার তাকিয়ে একটু শক্ত করে ফুলোলেন। তারপর একটু মুচকে হেসে বললেন, "কিন্তু, এই শরীর আর স্বাস্থ্যই যে আমার কাল হবে, কে জানতো ?"

ডাক্তারবাবুর জীবনের পরের অধ্যায় শুনি। তিনি বদলি হলেন ফার্মের লাহোর ব্রাঞ্চে। প্রথম দু-চার বছর ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। একটি ছেলেও হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী ও ছেলেকে লাহোরে আনতে পারেননি। ঘটনা-বিপর্যয়ে প্রথম যৌবনেই নিজের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ছেলেটি মামার বাড়িতে মানুষ হয়ে বি. এ. পাস করেছে, তিনি শুনেছেন। কিন্তু আজ দেখা হলে বাপ-ছেলে কেউ কাউকে চিনতে পারবে না। স্ত্রীও গত হয়েছেন।

বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ এই। তিনি লাহোরের এক অভিজাত মুসলমান পরিবারের সুন্দরী বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ে পড়েন। সেই মহিলাই নাকি এঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে এঁকে আকর্ষণ করেন।

প্রেম-চর্চা গোপনে চললেও, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় একদিকে বাঙালী মহলে, অপরদিকে সেই মহিলাটিরও গৃহে। স্থানীয় অফিসের বর্ষীয়ান বাঙালী ম্যানেজার তাঁকে বলেন, "তোমার সম্বন্ধে যা শুনছি তাতে এখানে বিপদে পড়ে যাবে। তোমাকে এখনি কলকাতায় বদলি করে দিচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু তখন অনেক দূর এগিয়েছেন, মহিলাটিও তাঁকে ছাড়তে রাজী নন। এমন কি প্রস্তাব করলেন, স্বামীকে ছেড়ে ডাক্তারকেই বিয়ে করবেন। অগত্যা বড়বাবুর কাছে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লাহোরেই রয়ে গেলেন। পরে সামাজিক গোলযোগের সম্ভাবনা কাটাবার জন্যে ওখানকার হিতৈষী মুসলমান বন্ধুদের পরামর্শে, কলমা পড়ে মুসলমান হলেন, নাম নিলেন, গোলাম হোসেন। সেই মহিলাকে বিয়ে করে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়ে বিলাসে দিন কাটাতে লাগলেন। সেই থেকে সুরাপানেরও নেশা।

কিছুদিন পরে সেই মহিলার মৃত্যু হওয়ায় ডাক্তারবাবু মুশকিলে পড়লেন।

মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ বাধল, সম্পত্তিও হারালেন। নামটাই শুধু পালটে আবার স্বধর্মে ফিরে এলেন এবং "মা-খাই" হয়ে উঠলেন। তারপর জীবিকার জন্যে নানান চেষ্টার মধ্যে হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা একটা। সেই কারণে 'ডাক্তারবাবু' নামও। কিন্তু মেয়েদের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। পর-পর আরও কয়েকটি 'অ্যাফেয়ারস্' (affairs)-এ জড়িয়ে পড়লেন, কলকাতায় আর ফেরা হোল না। একরকম সমাজচ্যুত হয়ে এখানে থেকে গেছেন। বুঝলাম, তাঁর হোটেলে লোকজন কম আসে কেন। সেদিন বিদায় নিলাম। এই confessions শোনবার পরও মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। প্রতিবারই 'মা-খাই' শুনেছি।

একটি বর্ষীয়সী ভদ্র পাঞ্জাবী মহিলাকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দেখেছি। তাঁর কোন গোপনতা ছিল না। ফুটফুটে একটি ছোট ছেলে—তাঁর পৌত্র বলেই শুনতাম—সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সহজ বন্ধুতা ছাড়া অন্য কোন রকম সম্বন্ধের সন্দেহ হোত না। কিন্তু মনে হোত, তিনিই অর্থ-সাহায্য করে হোটেলটি ও 'মা-খাই'কে বজায় রেখেছিলেন।

এবারের মত আমার লাহোর বাস শেষ হয়। জিনিসপত্র গুছিয়ে টাঙ্গায় ওঠার আগে ডাক্তারবাবুর কাছে বিদায় নিতে যাই। তাঁর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিই। ডাক্তারবাবু খুব সৌজন্য সহকারে আমার করমর্দন করে বিদায় জানান। হঠাৎ আমার মনে প্রবল বাসনা জাগে,—ডাক্তারবাবুকে কিছু oblige করি। তাঁকে মৃদুস্বরে বলি, ডাক্তারবাবু, আপনার আদর-যত্ন অনেকদিন মনে থাকবে। যদি অনুমতি দেন, আপনাকে এক বোতল বিয়ার-এর দাম উপহার দিই।

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলেন, "না,—না,—আমাকে নয়—আমাকে নয়। যা দেবার ঐ মার কাছে রেখে দিন,—মা-ই আমার সব, সবই তাঁর।"

মূর্তির সামনে টাকাটা রেখে নমস্কার করে চলে আসি।

আজ লাহোর-প্রবাসী সেই বিচিত্র-চরিত্র 'মা-খাই'-এর কাহিনী মনে পড়ে যায়।

॥ ৩ ॥

পরের দিন সকালে রাওয়ালপিণ্ডি পেঁছুই। এখানে নামার কারণ, তক্ষশিলার ট্রেন ধরতে হবে। ঘণ্টা চারেক হাতে সময় আছে। স্টেশনের অল্পদূরে কালী-বাড়ি। কালিবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী সেইখানে চলি।

এখানকার পোর্টারদের মাল বইবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হই। এ কয়দিন আমাদের তিনজনের বেডিং-ব্যাগ ইত্যাদি বইতে দুজন পোর্টার হিমশিম খাচ্ছিল। এখানে একজনই স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে সব মাল নিয়ে চলে,—মাথায়, কাঁধে, পিঠে, দুই বগলের তলায়,—আবার হাতে ঝুলিয়েও কেমন গুছিয়ে নিয়ে। দেখায় যেন চলন্ত মালগাড়ি। রূপকথার দৈত্যের মত বিশাল দেহ। কলকাতার নিউ মার্কেটের সেই সব মেওয়া ও ফলের স্টলের পেশোয়ারী দোকানদারের জাতভাই,

দেখেই বোঝা যায়।

স্টেশনের বাইরে আসতেই এক ট্যাক্সিওলা ধরে। ভাবে, কাশ্মীর-যাত্রী। দূরে দেখা যায়, হিমালয়-শৈলশ্রেণী। মন যেন টানতে থাকে। কৌতূহলী হয়ে শ্রীনগরের ভাড়া জিজ্ঞাসা করি।—মাথাপিছু দশ টাকা। কথা না বলে এগিয়ে যাই। সে সঙ্গ ছাড়ে না। মনে করে, খদ্দের ফসকায়। বলে, পুরো ট্যাক্সি ত্রিশ টাকায় দেবো।—শুনে লোভ জাগে আমাদের। মুখ-চাওয়াচাওয়ি করি। সবারই ইচ্ছা, থাকুক পেশোয়ার। ভূস্বর্গ দেখে আসা যাক। এতো সস্তায় মোটর!

কিন্তু, সঙ্গীদের লাহোর থেকে কলকাতায় ফেরবার দিন নির্দিষ্ট হয়ে আছে, ট্রেনের বার্থ রিজার্ভেসনও হয়েছে। তিনদিনে কাশ্মীর—শুধু নামেই ঘুরে আসা হবে। তাই, লোভ সংবরণ করতে হয়। কালীবাড়ির দিকে এগিয়ে চলি।

সেই কাশ্মীর ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ফলে আরও আট বছর পরে,—এই রাওয়ালপিণ্ডি থেকেই।

কালীবাড়িতে প্রবেশ করি। একতলা বাড়ি। লম্বা দালানের একপাশে মন্দির ঘর। জুতো খুলে সামনে দাঁড়াই। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। সেকালে তখন চালু ছিল রূপার টাকা,—কাগজের নয়। তাই একটা বার করে প্রণামী দিই। পূজারী এসে দাঁড়ান। টাকাটা তুলে রাখেন। ভাবি, মায়ের সেবক বোধ হয় তুষ্ট হলেন। প্রসাদ পেয়ে যাবার সময় আরও সন্তুষ্ট করা যাবে।

পূজারী দালানের অপর দিকে একটা ঘর খুলে দেন। তাঁকে জানাই, বেলা এগারোটায় ট্যাক্‌শিলার ট্রেন ধরব,—এখনও তিন ঘণ্টার ওপর দেরি—এর মধ্যে কোথায় আহারের কিছু ব্যবস্থা হোতে পারে, বলুন তো? এখঁন তো আটটাও বাজেনি! তিনি শুনে ঘাড় নেড়ে বলেন, আরে মশাই! বাঙ্‌লাদেশ ছেড়ে পশ্চিমের এ কোন্ মুলুকে এসেছেন জানেন? সে-কথা বলবেন না,—এখানে দিনে দুবার আটটা বাজে, মশাই! এ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল নয়,—খাস পশ্চিম প্রান্ত। একেবারে উল্টো দিক। কোথাও কোন ব্যবস্থা পাবেন না। পেশোয়ারী সরাইখানা বলে যা আছে, সেখানে কি আর আপনাদের চলবে? তবে, নিজেরাই যদি করে নিতে পারেন, এই দালানের কোণায় রেঁধে নিন। উনুন পাতার ভাবনা কী? বাগানে ঐ কতো বড় পাথর পড়ে,—গোটা তিনেক তুলে এনে সাজিয়ে ফেলুন। কতো সুবিধে বলুন তো!

বলি, তা ঠিক। রান্নার দুটো পাত্র—

তিনি অমায়িক হাসি হেসে বলেন, পাবেন বইকি, মশাই, পাবেন। বাজারে মাটির হাঁড়ি পাবেন, চাল, ডাল, সব্‌জিও মিলবে, কোন কিছুর অভাব হবে না,—মায়ের বাড়িতে এসেছেন, ভাবনা কিসের?

বলি, তা তো বটেই। তবে, বাজারটা কোন্ দিকে? দূরে নাকি?

বছর সাত-আষ্টেকের শ্যামবর্ণ নাদুসনুদুস একটি বালক ইতিমধ্যে পূজারীর

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একমনে আমাদের কথাগুলো গিলছিল। উৎসুক হয়ে সে-ই বলে, বাবা, সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে দেবো—বাজার কোথায়?—চলুন না, এই তো এইখানে।

তাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুই বন্ধু তখনি বেরিয়ে পড়ি। বন্ধুর বাবাকে বলি, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, মুখ হাত পা ধুয়ে নিন।

বড় রাস্তা ধরে বাজারের দিকে চলি। ছেলেটি সরল। বালকসুলভ কৌতূহলও আছে। নিজে থেকেই অনর্গল কথা বলে, প্রশ্ন করে। ভাষা,—বাঙলা। কিন্তু হিন্দী, উর্দু মেশানো। কথায় অদ্ভুত টানও। কলকাতা কখনও দেখেনি। বলে, দেখব কি করে? এইখানেই তো জন্মেছি। আর কি কোথাও গিয়েছি!

নিজেদের সংসারের খবর দেয়, মা রয়েছেন, দিদি আছে। দিদি সারাক্ষণই শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। কোন কাজ করতে চায় না। মা বকেন। ঝগড়া হয়। আর, মা খাটছেন দিনরাত। মায়েব সঙ্গে বাবারও কেবলি বকাবকি চলে। কেন জানেন?—বলে, বড় বড় চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকায়। একগাল হেসে বলে, দিদির বিয়ের কথা নিয়ে!—সে যদি শোনেন ভারী মজা।—ঐ তো বাজার চলে এলাম। কতো নজদিগ্‌ দেখলেন?

চাল ডাল আলু কপি মটরশুঁটি, হাঁড়ি, কাঠ, মশলাদি কিনে ফেরা হয়। তখনও এ সব কাজে তেমন হাত পাকেনি। তবুও, নিজেদের হাতে রান্না খিচুড়ি, ক্ষুধার্ত মুখে সুস্বাদু লাগে। খাবার সময় পূজারীর ছেলে একটা পাত্রে লঙ্কার আচার এনে সামনে রাখে। বলে, ভেতর থেকে মা পাঠিয়ে দিলেন—খিচুড়ির সঙ্গে খাবেন বলে।

খেতে প্রকৃতই মুখরোচক লাগে। বন্ধু চুপিচুপি বলে, হ্যাঁরে! আড়াল থেকে তাহলে দেখছিলেন নাকি?

যাবার আগে মন্দিরে আবার প্রণাম করে যাই। এবার আর টাকার প্রণামী নয়। নিছক ভক্তিভরে মায়ের কাছে বিদায় নেওয়া।

পূজারী সদর রাস্তা পর্যন্ত এসে এগিয়ে দেন। করুণামিশ্রিত উদ্বেগ দেখিয়ে বলেন, তাই তো মশাই! আপনারা আবার পেশোয়ার চলেছেন! সেখানেও কালীবাড়িতেই উঠবেন নিশ্চয়? থাকবেনও তো দু-তিন দিন? একটু সাবধান করে দিই,—আমার ভাগ্‌নে হোল সেখানকার পূজারী। সে আবার কীরকম অসভ্য রকমের। বৌমাও বদরাগী। সে কি আপনাদের তেমন যত্ন নেবে?—এক কাজ করবেন বরং, ওখানে নেত্যবাবু থাকেন, আমার নাম করে তাঁর কাছে যাবেন, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এই দূর বিদেশে আপনারা আমাদের আপন দেশের লোক্ মশাই, এখানে তো এসেই চলে গেলেন, রইলেনই না।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিই। স্টেশনের পথে যেতে যেতে হাসাহাসি করি। বন্ধুর বাবা বলেন, মামা দেখা গেল, এবার চল ভাগ্‌নে দেখা যাক্‌।

॥ চার ॥

ট্যাক্‌শিলা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মাত্র মাইল কুড়ি দূরে। রেলওয়ে টাইম টেবিলে ছোট হরফে ছাপা নাম। ছোট স্টেশন বলেই। দ্রুতগামী ট্রেন ধরে রাখার তার মর্যাদা নেই। সেই কারণেই আমাদের রাওয়ালপিণ্ডিতে নামা। ট্রেন বদল করা। মন্থরগতি ট্রেন ধরা। কুড়ি মাইল পথ যেতে দু'ঘণ্টা নেয়। জানলার ধারে বসে দেখতে থাকি। দুপুর বেলা। বাইরে কার্তিক মাসের নতুন-পড়া শীতের দিনের রূপালী রোদ। দূরে আকাশের গায়ে হিমালয়ের সুদীর্ঘ নীলাভ ছায়া। নিকটে ছোটখাটো পাহাড়, টিলা। জনপ্রাণহীন প্রান্তর। হঠাৎ দু'একটা গ্রাম। রেলের গতির তালে মনও ছুটে চলে। হারিয়ে যায় চোখের-দেখা দৃশ্য। স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে সুদূর অতীত।

ভাবি, চলেছি ট্যাক্‌শিলায়! এ তো বিদেশী গ্রীক্‌ ও রোমানদের মুখে উচ্চারিত প্রাচীন ভারতীয় নাম তক্ষশিলার বিকৃতি। আজ নিষ্প্রাণ নগণ্য এক ক্ষুদ্র রেল স্টেশন। চারিদিকে ধূ ধূ করে যেন শ্মশানভূমি। মাটি খুঁড়ে বার করা ধ্বংসস্তূপ। অথচ, বহুশতাব্দী ধরে এইখানেই ছিল প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিখ্যাত নগর তক্ষশিলা। আড়াই হাজার বছর পূর্বে গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। গান্ধার। নামের মধ্যেই কতো স্মৃতিভরা সৌরভ। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে—ভারতীয় প্রাচীন বহু গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ। রামায়ণের মতে, ভরত এই নগর স্থাপনা করে পুত্র তক্ষকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। সেই তক্ষের নামানুসারে নামকরণ হয় তক্ষশিলা। কালিদাসও রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে এই ঘটনার বর্ণনা দেন ঃ স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়োঃ। অভিষিচ্যাভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ ॥ (৮৯)

আবার, কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত, তক্ষণ-শিল্পের এখানে উৎকর্ষ সাধিত হয় বলে তক্ষশিলা নাম।

মহাভারতে দেখা যায়, ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী মহীয়সী গান্ধারী ছিলেন এই গান্ধারেরই রাজকন্যা। অর্জুনের প্রপৌত্র দিগ্বিজয়ী নরপতি জনমেজয় গান্ধার অন্তর্ভুক্ত তক্ষশিলা জয় করেন। জনমেজয়ের সর্পমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান এইখানেই।

আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সেই গান্ধারের অন্তর্গত সালাতুরে পাণিনির জন্ম।

বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনীতেও প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে তক্ষশিলার খ্যাতি। দূরদূরান্ত থেকে রাজন্যবর্গের ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানগণ এই নগরে আসতেন গুরুগৃহে বা বৌদ্ধ মঠে বাস করে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ নিতে।

আর, আজ আমি চলি ট্রেনে চেপে সেই নগরের নব-আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের

কঙ্কাল দেখতে !

ভাবি, শুধু কি শিক্ষাকেন্দ্র ? ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক বিপর্যয়-বহুল অধ্যায়ও রচিত হয় এই প্রদেশে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে গান্ধার পারস্যের অ্যাকামিনীয় সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। তৃতীয় দরেইওস্ (Darius)-এর (খৃঃ পূঃ ৩৩৫-৩৩০ অব্দ) রাজ্যকালে গান্ধার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হলে তক্ষশিলাও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে দেখা যায়, তক্ষশিলার রাজা আম্ভি আলেকসান্দরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কূট রাজনীতিবিশারদ চাণক্য,—এই তক্ষশিলারই অধিবাসী। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের তিনিই ছিলেন পরামর্শদাতা। তাঁর মন্ত্রণা ও স্বীয় বাহুবলের প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ থেকে গ্রীক শাসকদের বিদূরিত করেন। তক্ষশিলা তাঁর রাজপ্রতিভূর প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়।

ভারতের মানচিত্রে তক্ষশিলার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের বহুযুগের যোগসূত্র। তারই মুখ্য বাণিজ্য-পথগুলির সংগমস্থলে তক্ষশিলার অধিষ্ঠান। সেই কারণে এর সমৃদ্ধি। সেই কারণেই বিপত্তিও। এই বিখ্যাত নগরকে বহুবার বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরই বহ্লীক দেশ থেকে আসে ইন্দোগ্রীকরা।

তারপর, কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণস্থ ভূভাগ থেকে পহ্লব,—পার্থিয়ানরা।

অবশেষে, মধ্য এশিয়া থেকে প্রথমে শক ও পরে কুষাণগণ।

একের পর আরেক বিদেশী রাজশক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, উত্তরপশ্চিমে রাজ্য স্থাপনা করে।

সেই সকল ইন্দো-গ্রীক, শক পহ্লব রাজ্যের রাজধানী ছিল এই তক্ষশিলাতে। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজ্যকালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পুরুষপুরে—বর্তমান পেশোয়ারে। তবুও, খৃষ্টীয় চতুর্থ দশক পর্যন্ত তক্ষশিলার গৌরব ও সমৃদ্ধি অম্লান থাকে। বিশিষ্ট বৌদ্ধকেন্দ্র রূপে তখনও তার বিপুল খ্যাতি। খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধবিদ্বেষী হূনদের আক্রমণ তক্ষশিলা ধ্বংস করে। সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাঙ্ এসে দেখেন, এই অঞ্চল তখন কাশ্মীর-রাজ্যভুক্ত, বৌদ্ধমঠ আদি অধিকাংশই ভগ্নস্তূপে পরিণত ও পরিত্যক্ত-প্রায়। অধিবাসীদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিরল।

এইভাবেই কালক্রমে প্রাচীন তক্ষশিলার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে,—বিগত যুগের কীর্তিকলাপ ভূগর্ভে বিলীন হয়।

সুদীর্ঘকাল পরে—প্রায় একশ' বছর আগে—ইংরেজ রাজত্বকালে শাহ্‌ডেরির নিকটস্থ ঢিবিগুলিকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব সেই লুপ্ত তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ বলে প্রথম প্রতিপন্ন করেন। ১৯১৩ সালে এইসব অঞ্চলে খননকার্য়ও শুরু হয়। আবরণমুক্ত তক্ষশিলার নাম জগতে আবার প্রচার পায়—প্রাণচঞ্চল-সমৃদ্ধ শহর নয়, প্রত্নতত্ত্বের রত্নভাণ্ডার রূপে।

হাজার হাজার বছরের ইতিহাস মানসরথে বসে দেড়ঘণ্টায় অতিক্রম করে চলে আসি আধুনিককালের ট্যাক্শিলায়।

স্টেশন ছেড়ে খননকার্যাদির স্থানের দিকে এগিয়ে চলি। ভাবাই যায় না, এইখানেই এককালে ছিল প্রাচীন সেই বিখ্যাত নগর। এখন জনহীন প্রাণশূন্য বিরস পরিবেশ। বালি, কাঁকর, শিলাস্তূপে আচ্ছন্ন চারিপাশ। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ এখনও প্রচ্ছন্ন মরুবালুকার মধ্যে।

প্রথমে যাই মিউজিয়ামে—সংগ্রহালয়ে। বাঙালী কিউরেটর। শ্রীমণীন্দ্র সেনগুপ্ত। উৎসাহ সহকারে দেখান। বলেন, বিরাট ব্যাপার, এই তো সবে কাজ শুরু। এ মিউজিয়ামও হালে খোলা। সেই সম্রাট অশোকের সময় থেকে শুরু করে হূণদের আক্রমণ পর্যন্ত সাতশ' বছরেরও ওপর এই তক্ষশিলা ছিল ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র। এখন মাটি খুঁড়তে গিয়ে কতো বৌদ্ধস্তূপ, ঘরবাড়ি, মঠ-মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদির ভগ্নাংশ আবিষ্কার হচ্ছে। অসংখ্য ও বহু ধরনের প্রত্নবস্তুাদিরও উদ্ধার চলেছে। তারই কিছু কিছু মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি এখানে এনে সাজিয়ে রাখার কাজ আরম্ভ করা গেছে। এখনও বাইরে বহু জিনিস পড়ে আছে, নিত্য বারও হচ্ছে,—সেখানে দেখতে পাবেন।

ঘুরে ঘুরে দেখান,—গান্ধার ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন। প্রথম আমলের মূর্তিগুলিতে হেলেনিস্টিক কলাশৈলীর নিবিড় প্রভাব। বুঝিয়ে বলেন, এখানে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাজাদের রাজধানী থাকায় শিল্পকলায় তাদের স্বকীয় অবদানও যেমন দেখা যায়, ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় প্রভাবও মূর্তিগুলিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্থাপত্যের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করবেন।

খননকার্যের কোথায় কি দর্শনীয় স্থান বলতে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন, আপনাদের সঙ্গে একজন ভাল গাইড দিচ্ছি, নিজেই সঙ্গে গিয়ে দেখাতে পারলে আনন্দ পেতাম, কিন্তু আজ মহা বিব্রত হয়ে রয়েছি। বাচ্চা ছেলেটির হঠাৎ প্রবল জ্বর—ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা তো এখানে নেই,—এখনি বাংলোয় আমাকে একবার যেতেই হবে,—জ্বর না কমলে কি করব ভেবেই পাচ্ছি না,—মহা মুশকিলে পড়া গেছে।

সহানুভূতি জানিয়ে আমাদের চলে আসা ছাড়া করার কিছু থাকে না। ভাবি, কালের কি বিচিত্র গতি! এই তক্ষশিলাতেই এককালে ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র-শিক্ষণেরও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। রাজগীরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক এই কেন্দ্রেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন,—আর এখন?

ভগ্নস্তূপের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে দেখি, মাটি খুঁড়ে প্রাচীন শহরের ভাঙা ঘরবাড়ির দেওয়াল, ভিত ইত্যাদি বার হয়েছে। সেকালের পয়ঃপ্রণালী, নগরের পথ, ঘরবাড়ির পরিপাটি নক্শা নগর স্থাপনায় সুচিন্তিত পরিকল্পনা,—অনেক কিছুই তৎকালীন সভ্যতার উচ্চমানের পরিচয় দেয়। বিভিন্ন সময়ে নির্মাণ-করা

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নগরের ধ্বংসাবশেষ আত্মপ্রকাশ করেছে। সবচেয়ে প্রাচীন ভির্-এ, দ্বিতীয় শিরকাপ-এ, তৃতীয় শিরসুখ-এ। এ ছাড়াও ভগ্নস্তূপ ছড়ানো বহু স্থানেই। করিন্থীয় গাত্রস্তম্ভ, গ্রীক আদর্শানুগ মোল্ডিং ও ও অলংকরণ পাশ্চাত্য কলাশৈলীর বহু উদাহরণ চোখে পড়ে।

—তক্ষশিলার মুখ্য স্তূপ ধর্মরাজিকা। তারই চারিদিক ঘিরে ছোট ছোট স্তূপ, সঙ্ঘারাম ইত্যাদি। কোথাও সারি সারি বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী খোদিত।

হঠাৎ নজরে পড়ে, ধ্বংসস্তূপের মাঝে বুদ্ধদেবের ভেঙে-পড়া মূর্তির একটা ছিন্ন মস্তক। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখি, সেই কোন্ যুগে শিল্পীর হাতের ছেনির আঘাতে পাথরের বুকে ফুটে উঠেছিল ধ্যানরত বুদ্ধের শান্ত সুন্দর ভাবের অপূর্ব অভিব্যক্তি,—সৌম্যদর্শন, প্রশান্তআনন, আয়ত লোচন। সম্রাট-স্থাপিত নগর ধ্বংস পেয়েছে, মূর্তিও ধরাশায়ী,—কিন্তু দেহচ্যুত মুখমণ্ডলে এখনও সেই প্রশান্ত দিব্যভাব। চারিদিকের ভগ্নস্তূপের শ্মশানে নির্বিকার, নিরাসক্ত, আপন মহিমায়, অপূর্ব মনোহর,—শিল্পীর অক্ষয় কীর্তি।

গাইড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চলে। জোলিয়া গ্রামের পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ভগ্নাংশ, ইন্দোগ্রীকদের প্রতিষ্ঠিত সিরকাপের ধ্বংসাবশেষ। তারই দক্ষিণ অংশে কুণালের স্তূপ।

কুণাল ছিলেন মহারাজ অশোকের পুত্র। রাণী পদ্মাবতীর গর্ভে তাঁর জন্ম। হিউ-এন-সাঙ্ এই স্তূপ দেখে রাজপুত্র কুণালের অপাপবিদ্ধ করুণ জীবন-কাহিনীর উল্লেখ করেন। বিদ্বান, রূপবান্, সচ্চরিত্র কুণালের বিবাহ হয় সুন্দরী কাঞ্চনমালার সঙ্গে। কিন্তু রাজপুত্রের দুর্ভাগ্য,—তাঁর বিমাতা প্রধান রাজমহিষী তিষ্যরক্ষিতার কামবাসনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হওয়ায় তাঁরই চক্রান্তে রাজাজ্ঞায় কুণালকে এই তক্ষশিলায় পাঠানো হয়—বিদ্রোহদমনের অজুহাতে। বিদ্রোহী প্রজারা তাঁর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ[illegible]য়। কুণাল এই তক্ষশিলার রাজ্যপাল হন। ব্যর্থমনোরথ, নিষ্ঠুর তিষ্যরক্ষিতা তখন চতুরতা করে এক সুযোগে সম্রাটের নামাঙ্কিত আদেশ পাঠান, অবিলম্বে যেন কুণালের দুই চক্ষু উৎপাটন করে তক্ষশিলা থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়। পিতৃ-আজ্ঞা ভেবে কুণাল তখনি চণ্ডালকে ডেকে পাঠান, আপন দুই চক্ষু তুলে ফেলান, দীন-হীন বেশে স্ত্রী কাঞ্চনমালার হাত ধরে পথে বার হন। অন্ধ রাজপুত্র বীণা বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে চলেন—দেশ থেকে দেশান্তরে। পাটলীপুত্রে এলে রাজা অশোক তাঁদের দেখতে পান। প্রাসাদে ডেকে পাঠান। সমস্ত ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হন। তিষ্যরক্ষিতার প্রাণবধের আদেশ দেন। কুণাল পিতাকে মৈত্রীভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেন। এক অর্হৎ এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে [illegible]দের হৃত-দৃষ্টি ফিরে পান।

সেই ঘটনারই স্মারক তক্ষশিলায় এই কুণাল-স্তূপ।

হিউ-এন-সাঙ্ খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকেও লিখে যান, এই স্তূপের সান্নিধ্যে

একাগ্রচিত্তে আরাধনার ফলে অনেক অন্ধজনই পুনদৃষ্টি প্রাপ্ত হন।

সেই কুণাল-স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি, কী বিচিত্র কুণালের এই জীবনী।

মনে পড়ে, অংশতঃ অনুরূপ প্রাচীন গ্রীক উপকথার Hippolytus ও Phoedraর কাহিনী। সেখানেও বিমাতা Phoedraর প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন তাঁর সপত্নীপুত্র সংযতচরিত্র হিপোলাইটাস্।

ব্যর্থকাম Phoedra হিপোলাইটাসের নামে মিথ্যা কলঙ্কের দোষারোপ করে আত্মহত্যা করেন। সম্রাট Theseus নির্দোষ আপন সন্তানের প্রাণবধ করেন।

সেই কাহিনীরই ছায়া অবলম্বনে রচিত Euripides-এর প্রসিদ্ধ নাটক Hippolytus,—সেই কোন্ অতীত কালে,—খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। আর, কুণালের ঘটনা,—খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে।

ভাবি, অত্যাশ্চর্য মানুষের মনের বিকার,—জগতের সর্বত্রই,—স্থান কালের সীমা মানে না।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। সিরকাপের অদূরে জণ্ডিয়ালে মাটির ঢিপির উপর অদ্ভুত আকার এক মন্দির। ভারতে এ ধরনের মন্দির আর কোথাও দেখা যায় না। গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরের সঙ্গে খানিক সাদৃশ্য আছে। কিউরেটার জানিয়েছিলেন, এ মন্দির জরথুস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে জড়িত বলে অনুমান করা হয়।

আমাদের এই ভ্রমণের পর ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ও ১৯৪৪-৪৫ সালে সীমিতরূপে—যথাক্রমে জন্ মার্শাল ও মার্টিমার হুইলারের নেতৃত্বে খননকার্য চলতে থাকে এবং প্রভূত প্রত্নদ্রব্যরাজির উদ্ধার হয়। মার্শালের গ্রন্থে তক্ষশিলার ইতিবৃত্ত বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়।

ঘোরা শেষে স্টেশনে ফেরবার পথে কিউরেটরের ছেলের খবর নিই। জ্বর কমতে শুরু হয়েছে। ভদ্রলোক লজ্জা প্রকাশ করেন, তাঁর বাংলোতে নিয়ে গিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করা তাঁর সম্ভব হোল না।

ট্যাক্শিলা স্টেশনের ছোট ওয়েটিং রুম—বিশ্রাম-গৃহ। সেখানেই রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেওয়া হয়। সে-সময়ে কলকাতায় শোনা যেত,—পেশোয়ার অতি ভয়াবহ শহর। রাত্রে সেখানে পথে বার হওয়া বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে আততায়ীর হাতে প্রাণ যেতে পারে,—লুঠতরাজ তো আছেই। তাই এখানে রাত কাটিয়ে সকালের ট্রেন ধরে পেশোয়ার পৌছানো যুক্তিযুক্ত।

তখনও প্রচুর বেলা। মাত্র পাঁচটা বেজেছে। এমন সময় প্ল্যাট্ফর্মে পেশোয়ারগামী এক ট্রেন এসে দাঁড়ায়। শুনি, রাত ন'টায় সেখানে পৌঁছুবে। আমাদের প্রোগ্রামেরও তখনি পরিবর্তন ঘটে। ওয়েটিং রুমে রাত যদি কাটাতেই হয় তবে এখানে কেন? পেশোয়ার নিশ্চয় বড় স্টেশন,—সেখানেই কাটানো যাবে। অমনি মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেনে চাপা।

ট্রেনে ভিড় নেই। কামরায় আর দুজন মাত্র যাত্রী। দেখেই বোঝা যায়, পেশোয়ারী। পরনে সালোয়ার, গায়ে ঝোলা পাঞ্জাবি, ওয়েস্ট কোট, মাথায় বিপুল পাগড়ি।

একপাশের খালি বেঞ্চ আমরা তিনজন অধিকার করি। বেলা এখন সাড়ে পাঁচটা। বলি, কোথা দিয়ে ট্রেন চলেছে, এখনও অনেকক্ষণ দেখা যাবে। ইন্ডাস্ নদীও তো এইবার পথে পড়বে।

বন্ধুর বাবা হেসে মনে করিয়ে দেন, রাওয়ালপিণ্ডির সেই পুরুতঠাকুরের বাণী,—সে কথা বলবেন না, এখানে দিনে দুবার আটটা বাজে, মশাই!

কিন্তু, আটটার আগেই সন্ধ্যার ছায়া নামে। ইন্ডাস্-এর উপর বিরাট সেতু আসে। ১৮৮৫ সালে বৃটিশদের তৈরি। ইন্ডাস্-এর ভারতীয় প্রকৃত নাম সিন্ধু। নদীর ধারে আধুনিক রেল স্টেশনের নাম—অ্যাটক্ ব্রীজ। অ্যাটক্ সংস্কৃত হাটকের অপভ্রংশ। লোহসেতু। সশব্দে ট্রেন উঠে চলে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বিশাল নদী নেমে আসে। আবছা আলোয় বিচিত্র দেখায়। আঁধার ঘেরা পাহাড়গুলি। নদীর স্বচ্ছ চিকণ জলে ক্ষীণ আলোর ঝিকিমিকি। যেন সুদূর অতীত অন্ধকারের অন্তরালে বসে অস্ফুটে নদীর স্রোতে কথা কয়। প্রাচীন আর্য সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধুনদের নাড়ির টান। বহু পণ্ডিতের মতে এককালে এই সিন্ধু নদের তট পর্যন্ত ছিল হিন্দুরাজ্যের বিস্তার,—ভারতের সীমানা। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে সব প্রাচীন গ্রন্থে, বৌদ্ধ জৈন ধর্মপুস্তকে সিন্ধু নামের উল্লেখ। সুদূর তিব্বতে কৈলাস পর্বতের উত্তরে এই নদের উৎপত্তি, দীর্ঘ ১৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করে আরব সাগরে বিলুপ্তি।

আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যরাজ প্রথম দরেইওস—Darius-এর কৌতূহল জাগে, এই বিরাট নদ কোথায় গিয়ে সাগরে মেশে? কেমনই বা সে-সব দেশ? তাঁর তখন ধারণা, নীল নদ ছাড়া এই আর একমাত্র নদী যার জলে কুমীরের বাস। Caryanda-বাসী গ্রীক্ Scylax-এর সত্যানুসন্ধানের উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাই তাঁরই নেতৃত্বে অসমসাহসী এক অভিযাত্রী দল এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। Scylax কাবুল নদের বুকে নৌকা ভাসিয়ে এই অ্যাটক-এ আসেন, তারপর এই সিন্ধু নদীপথে সুদূর সাগর-সঙ্গমে চলে যান। Scylaxই, যতদূর জানা যায়, প্রথম ইউরোপবাসী যিনি ভারতের প্রকৃত অবস্থার পর্যবেক্ষণে এই অঞ্চলে অভিযানে আসেন। অথচ, Herodotus-এর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সামান্য এক বাক্যাংশ মাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একমাত্র ঐতিহাসিক দলিল।

এব প্রায় দুইশত বৎসর পরে আলেকসান্দরও এরই নিকটে কোথায় এই সিন্ধুনদ পার হন,—নৌকার সেতু সাজিয়ে।

আজ দু হাজার দু'শ চুয়ান্ন বছর পরে আমরাও সেই নদী পার হই অনায়াসে

আরামে ট্রেনে চেপে।

এই অ্যাটক-এ, নদীর পূর্বতটে, সম্রাট আকবর রচিত দুর্গ। তারই অপর দিকে সিন্ধুনদের সঙ্গে কাবুল নদের সঙ্গম। কাবুলও প্রাচীন নদী,—বৈদিক যুগের কুভা। কোন কোন ঐতিহাসিকদের অভিমত,—এই কুভাই ছিল ভারতের পশ্চিম সীমানা। কুভার জন্ম আফগানিস্তানের উত্তরে। কাবুল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে আসে। আফগানিস্তানের সমুচ্চ প্রদেশ থেকে কাবুল ও তার শাখা-নদীগুলি পূর্বমুখী নেমে আসে, ঐ অঞ্চলে সুলাইমান-সফেদকোহ গিরিশ্রেণী ভেদ করে, ক্রমনিম্নভূমি ভারতে প্রবেশ করে ও এই অ্যাটকের নিকটে সিন্ধুনদের সঙ্গে মিলিত হয়। আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যবর্তী এ সফেদকোহ-র গিরি-রাজির পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তার। কাবুল ও তার শাখানদীগুলিরও তাই সেই পার্বত্য উপত্যকায় গিরিখাত কেটে ভারতবর্ষে নেমে আসা। এবং এ নদী-গুলির গতিপথ ধরে খাইবার পাশও সফেদকোহ শৈলশ্রেণী অতিক্রম করে যায়।

সেই খাইবার পাশ্ দেখার উদ্দেশ্যে আমাদের এই যাত্রা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

দুজন সহযাত্রীর একজন নেমে যান নৌসেরা স্টেশনে। বড় স্টেশন। অপর সহযাত্রীর সঙ্গে এইবার আলাপ করি। এখানে শুনি বড় সেনাবাস আছে। কাবুল নদীর নিকটেই। পেশোয়ার আর মাত্র ২৭ মাইল দূর। পেশোয়ার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিই। বলেন, 'সিটি' স্টেশনে নামবেন না, একেবারে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে গিয়ে নামবেন।

ভদ্রলোকের নাম—মিঃ বিরি। পেশোয়ারে ইলেক্ট্রিক মালপত্রের দোকান।

জিজ্ঞাসা করি, স্টেশন থেকে কালীবাড়ি কতোদূর? রাত্রিবেলা সেখানে যাওয়া নিরাপদ হবে.?

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্য হন্। বলেন, ভয়টা কীসের? এ-শহর সম্পর্কে যতো সব বাজে গল্প বাড়িয়ে প্রচার হয়। দুর্বৃত্ত লোক কোন্ শহরে নেই? এখানেও আছে। আমরা তো পৌঁছচ্ছি রাত নটায়। কোন দুশ্চিন্তা নেই আপনাদের। স্টেশন থেকে কালীবাড়ি দূর নয়। আমিও যাব ঐ পথ দিয়ে। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে যাব যাবার পথে।

মন থেকে ভাবনার বোঝা নামে। বন্ধু কিন্তু চাপাগলায় মন্তব্য করে, এই লোকটাই পথ ভুলিয়ে আর কোথাও নিয়ে যাবে না তো? যা অসুরের মত চেহারা!

তার বাবা হেসে ওঠেন। বলেন, তা' যায়, যাবে। আজ রাত্তিরেই কালীবাড়ি পৌঁছনো দরকার। চলো গিয়ে দেখি, রাওয়ালপিণ্ডির মামার গুণধর ভাগ্নেটি কেমন?

কালীবাড়ি পৌঁছে দেখি, অবাক কাণ্ড! কোথায় পেশোয়ার! কোথায় তার

ভয়ংকরী নিশীথিনীর রূপকাহিনী! এ যে অলোঝলমল খাঁটি বাঙলাপল্লীর উৎসব-রজনী। বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা। একতলা লম্বা বাড়ি। চারিপাশে তীব্র বিজলি বাতির শোভা। ব্যস্তসমস্ত লোকজন। দালানে বড় বড় বঁটি পাতা। স্তূপাকার শাক-সবজি। শাড়িপরা বাঙালী মেয়েরা কুটনা কোটেন। বাইরে সামিয়ানার নীচে বড় বড় উনান। গমগম করে আগুন। প্রকাণ্ড হাঁড়ি কড়া চাপানো। যজ্ঞিবাড়ির ভিয়েনের আয়োজন। মেয়েরাই সব কাজকর্ম করছেন। পুরুষেরা দু-চারজন হন্তদন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করেন।

সামনে মন্দিরকক্ষে পুজোর সাজসরঞ্জাম। নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থাতেও ব্যস্ত বাঙালী দুই প্রৌঢ়া। লাল টকটকে-পাড়-শাড়ি পরা।

আজ যে কালীপুজো, জানাই ছিল না।

বন্ধুর বাবা হেসে বলেন, তোমাদের হিসেব ছিল না, আমার মনে ছিল।

অপরিচিত অতিথি দেখে একজন এগিয়ে আসেন। সাদর অভ্যর্থনা জানান। কালীবাড়ির পুরুতঠাকুরকে ডাক দেন, অ বিধুবাবু, এদিকে একবার আসুন। কারা সব এসেছেন।

বিধুবাবু হাতের কোন কাজ ফেলে ব্যস্ত হয়ে আসেন, আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, আসুন, আসুন,—কোথা থেকে আসা হোল? অতি শুভদিনে এলেন —মায়ের পুজো—মা কেমন টেনে আনলেন—এখন বারান্দার ঐ কোণে মালপত্রগুলো রাখান—একটু পরে একটা ঘর খুলে দিচ্ছি—থাকবেন,—কোন কিছু অসুবিধে হবে না—আজ অবশ্য প্রসাদ পেতে একটু রাত হবে—বসুন আপনারা—হাতের কাজটা সেরে এখুনি আসছি—এখনি পেশোয়ারের বাঙালীরা সবাই এসে যাবেন—আলাপ পরিচয় হবে,—বসুন।

একে একে অনেকেই আসতে থাকেন। কিন্তু সবাই দেখি, কার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করেন।—'কই! ডাক্তারবাবু এলেন না এখনও?'—'আসবেন নিশ্চয়, —কোথায় কাজে আটকে পড়েছেন,'—'ওঁর তো আর দিন-রাত্তির,—সময়-অসময় বলে কিছু নেই,'—ঐ, ঐ তো এসে গেলেন!'

গলাবন্ধ লম্বা গরম কোট গায়ে। স্বাস্থ্যবান দেহ। প্রৌঢ় বয়স। রাশভারী চেহারা। সম্মান দেখিয়ে কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ান। 'ব্যবস্থাদি কতোদূর' —'পুজো বসবে কখন'—এক ঝলকে আগন্তুক সব খোঁজ নেন। এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেন। তাঁকে ঘিরে মজলিস জমে ওঠে। নবাগত আমাদের সঙ্গেও আলাপ করেন। তাঁকে এই প্রথম দেখলেও তাঁর পরিচয় আমাদের অজানা নয়।

সেকালের পেশোয়ারের স্বনামধন্য ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ। ডাক্তার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তো আছেই, কিন্তু বাঙলা দেশেও তাঁর নামের প্রচার থাকার কারণ, সেযুগের তিনি এক প্রখ্যাত স্বদেশী নেতা, জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্য, পেশোয়ার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

বন্ধুর বাবার সঙ্গে ডাক্তার ঘোষের এক ভাই-এর পরিচয় থাকার কথাও প্রকাশ পায়।

খাইবার পাশ্ দেখতে আসা আমাদের উদ্দেশ্য শুনে তিনি বলেন, সে তো যাবেনই। এদিকে যাঁরা বেড়াতে আসেন, সবাই যান্ ওদিকটা দেখতে। দেশের বাইরের রূপটা দেখেন,—এখানকার অধিবাসী—আফ্রিদি—তাদেরও দূর থেকে দেখে যান্। কিন্তু খাস আফ্রিদিদের গ্রাম দেখবার সুযোগ পান কজন? চলুন, আপনাদের দেখিয়ে আনি,—ধারণাও করতে পারবেন না, লোকগুলোই বা কেমন, তাদের গ্রামই বা কীরকম। কিন্তু যেতে হলে কালই যেতে হয়। তারপর পরশু সকালের ট্রেনে খাইবার যাবেন,—লাণ্ডিকোটালে তো আর রাত কাটাতে পারবেন না,—ঐ ট্রেনেই আবার পেশোয়ারে ফিরবেন বিকেল পাঁচটায়,—আপনাদের লাহোরের ট্রেন ছাড়ে ছ'টা চল্লিশে।

উৎসাহিত হয়ে বলি, সে যা হবার হবে পরশু,—চলুন কাল আফ্রিদি গ্রাম দেখিয়ে দিন। এ-সুযোগ জীবনে আর আসবে না,—আর আপনি না নিয়ে গেলে আর কারও দেখানোরও সাধ্য নেই।

নিকটের এক চেয়ার ছেড়ে এক তরুণ ভদ্রলোকও প্রবল উৎসাহে এগিয়ে এসে বলেন, ডাক্তারবাবু, তাহলে আমিই বা বাদ পড়ি কেন? এতদিন কাটালাম এখানে, তবু আমার ভাগ্যে এমন সুযোগ আসেনি।

তাঁকে দেখিয়ে ডাক্তারবাবু আমাদের বলেন, এটি সহজ লোক নয়,—বাঙালী ছেলে—কার্নিভ্যাল পার্টি গড়ে দেশবিদেশে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে,—এই পেশোয়ারে কিছুকাল দেখালো,—নাম করেছে খুব—ভিক্টোরিয়া কার্নিভ্যাল।—ও' সেন, তুমি তো তাঁবুটাবু গুটিয়ে এখন আবার কোন্ দিকে পাড়ি দিচ্ছ শুনেছি?

সেন বলেন, হাঁ স্যার,—এবার দলবল নিয়ে করাচী চলেছি। তবু, যত কাজই আমার থাকুক, আপনাদের কালকের প্রোগ্রামে আমি আছি,—আমার স্পোর্টস্ কার্টা নিয়ে আপনার গাড়ির পিছু পিছু চলব,—রিয়ার গার্ড হয়ে।

ডাক্তার বলেন, ঠিক আছে। বেলা একটায় রওনা হওয়া।

তারপর আমাদের বলেন, গ্রাম দেখে ফিরে এসে কাল রাত্রের খাওয়াটা আমার ওখানেই হবে—পেশোয়ারী রোটি!

নানান্ গল্পে সময় কেটে যায়।

রাত্রে প্রসাদ পেতে দেরি হয়। কালীপুজা,—হবার কথাই। লম্বা দালানে পাতা পেতে পংক্তি ভোজন। মেয়েরাই পরিবেশন করেন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন-পর্ব সমাপ্ত হয়।

সুখনিদ্রায় রাতও কাটে।

॥ ৬ ॥

পরদিন। সকালে পূজারীর অন্দরমহল থেকে চা ও প্রাতরাশ আসে। বশ্বুর বাবা বলেন, ভাগ্নে ভাগ্নেবৌ অতি সজ্জনই তো দেখা যাচ্ছে!

একটা টাঙ্গা নিয়ে পেশোয়ার দেখতে বার হই। এই ছিল কণিষ্কের প্রতিষ্ঠিত গান্ধারের রাজধানী—পুরুষপুর। পেশোয়ার—অর্থাৎ 'সীমান্ত শহর' নামকরণ হয় আকবরের আমলে।

পাঁচিল-ঘেরা শহরের বাইরে ক্যানটনমেণ্ট—সেনানিবেশ। ইংরেজ সরকারের স্থাপিত শহরের নতুন অংশ,—সরকারী দপ্তর, ঘরবাড়ি। পরিচ্ছন্ন পথঘাট। পুরানো শহরের বাইরে সাহ্‌জি-কী-ধেরীতে এক বিরাট বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ। পেশোয়ার দুর্গও বাইরে থেকে দেখি।

তারপর ঢুকি খাস পেশোয়ার শহরের ভিতর। সেও এক দুর্গ। বিরাট পাঁচিল দিয়ে চারিপাশ ঘেরা। শুনি, কুড়িটা গেট আছে শহরে ঢোকবার। রাত্রে এ-সব গেট্‌ বন্ধ থাকে। তখন আর কারও শহরে ঢোকা বা বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। শহর শুধু পাঁচিল-ঘেরাই নয়,—কাঁটাতার—barbed wire দিয়েও সুরক্ষিত। ঘরবাড়ি ছোট ছোট ইট বা কাদার গাঁথনি ও কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরি। পথ বেশির ভাগই সংকীর্ণ।

বাঙালীর চোখে পাহাড়ে-ঘেরা এ এক আজব শহর। মনে হয় ছবিতে-দেখা মধ্য-এশিয়ার কোন্ এক নগরে ঘুরি। সমতল ছাদ-দেওয়া শ্রীহীন চেপটা বাড়িগুলি। মাঝে মাঝে মসজিদ আদির স্থূলে কলেবর, গম্বুজের সুগোল মাথা তুলে যেন উবু হয়ে বসে। পাথরের উঁচু মিনারগুলি তাদের ঊর্ধ্ববাহু,—আকাশপানে আঙুল তুলে কি যেন দেখায়!

বাজারে লোকজনের ভিড়। বিচিত্র সব পোশাক। সবই প্রায় মুসলমান। বড় বড় পাজামা। ঢলঢলে পাঞ্জাবি। মাথায় সবারই বিপুল পাগ্‌ড়ি বা পেশোয়ারী জমকালো টুপি। কাবুল-বোখারা-মধ্য এসিয়ার সঙ্গে এদের নিয়মিত বাণিজ্য চলে,—তাই সেসব বিদেশী লোকজনও দেখি।

বাজারে নেমে এখানকার স্মারক স্বরূপ সামান্য সওদা করা হয়,—পেশোয়ারী শুঁড়তোলা লপেটা-জুতা। পেশোয়ারী টুপি। দুটো সালোয়ারের কাপড় কিনে সেলাই করার অর্ডার দেওয়া হয়,—বিকেলে দেবে। পেটের ঘেরের মাপ অদ্ভুত,—প্রায় হাত পাঁচ-ছয় লম্বা। তাই গুটিয়ে পড়লে দু'পায়ের ওপর বেলুনের মত ফুলে থাকে। কাবুলীদের মতন। তবু, কত সস্তা ছিল সেকালে,—অতখানি কাপড়—দুটো সালোয়ারের ভাল লঙ্‌ক্লথ—দাম পড়ল মাত্র পাঁচ টাকা।

শহরের মধ্যে উঁচু ঘণ্টাঘর। তারই নিকট ডাঃ ঘোষের আস্তানা। গিয়ে একবার দেখা করে যাই। রোগী দেখতে ব্যস্ত। রাস্তায় বেরিয়ে টাঙ্গায় উঠব,

—পুলিস সি. আই. ডি-র আবির্ভাব। নামধাম, কোথা থেকে আসছি—কোথায় যাব—সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

দুপুরে ভাগ্নে-বৌ ঝোলভাত রেঁধে সযত্নে খাওয়ান। অন্তরাল থেকে খোঁজ-খবর নেন।

বেলা একটায় ডাক্তারবাবু আসেন তাঁর মোটর নিয়ে। সেনও পিছু পিছু তাঁর নিজের গাড়িতে হাজির। তখনি যাত্রা শুরুও হয়। পেশোয়ার ছেড়ে গাড়ি ছুটে চলে। মনে অসীম কৌতূহল। পরাধীন ভারতের উপান্তে স্বাধীন আফ্রিদিদের গ্রাম দেখতে চলেছি। এমন অপূর্ব সুযোগ এমনি আকস্মিকভাবে আসবে ভাবতেই পারিনি।

প্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ। দু পাশে ধু-ধু করে শুষ্ক বালু-কাঁকরময় দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেন মরুপ্রদেশ। তারই বুকে মাঝে মাঝে পাহাড়।

ডাক্তার ঘোষ বলেন, এটা কোহাটের সড়ক। কোহাট পেশোয়ার থেকে ৩৭ মাইল। বহুদূরে ঐ যে রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, ওরই মাথায় কোহাট পাশ—২৮০ ফুট উঁচু, তাই পার হয়ে যেতে হয়। আমাদের গন্তব্য গ্রাম পাহাড়ের এদিকে,—পেশোয়ার থেকে মাইল ২৪ দূরে। একটু নজর রাখুন—এখনি পথের দু পাশে দেখবেন শুরু হবে কাঁটাতারের বেড়া—barbed wire—

বন্ধু উৎসাহিত হয়ে বলে, ঐ দূরে পথের ধারে একটা নোটিশ বোর্ড যেন দেখা যাচ্ছে—

গাড়ি হু-হু করে এগিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু ড্রাইভারকে গাড়ি একটু থামাতে আদেশ করে আমাদের বলেন, এইবার পড়ে দেখুন—বোর্ডে কি লেখা,—আর কোথায় এলেন! ঐ আরম্ভ হোল কাঁটাতার।

বোর্ডে বড় বড় করে লেখা বিজ্ঞপ্তি,—এইখানে শুরু হোল স্বাধীন উপজাতি অঞ্চল—independent tribal territories—কাঁটাতার অতিক্রম করে গেলে নিজেরই দায়িত্ব।

মোটর আবার চলতে থাকে। ডাক্তার বলেন, যে রাস্তা দিয়ে চলেছি এইটুকুই ইংরেজদের,—আর দুপাশে আফ্রিদিঅঞ্চল। ওরা কারও বশ্যতা স্বীকার করে না—বন্য হিংস্র পশুর মতন। আফগানিস্তানের আমীরকেও মানে না, বৃটিশদেরও নয়। ঐ দেখুন, মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে বড় বড় পাঁচিল-ঘেরা দুর্গের মত,—ঐ হোল আফ্রিদিদের এক একটা গ্রাম। ঐ ধরনের একটাতে আপনাদের নিয়ে চলেছি। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে থেকে মাথা তুলে চিলে-ঘর বা টাওয়ার মত দেখছেন, ওগুলো ওয়াচ্ টাওয়ার বা "সুটিং বক্স্"। ঐখানে রাইফেল নিয়ে বসে পাহারা দেয়। দরকার বুঝলেই শত্রুর ওপর গুলি চালায় দেওয়ালের ফোকরের মধ্যে দিয়ে,—নিজে অলক্ষ্যে থেকে। রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে যাওয়া,—মানেই ওদের নিশানার খাদ্য হওয়া। এদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি

হলে তখন পথ দিয়ে বড় কেউ যায় না, বাধ্য হয়ে যেতে হলে পথের মাঝ দিয়ে তো নয়ই, ঐ টাওয়ারের তলা দিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে চলা। এমন কি, এদের গরু-ভেড়াও এ সম্পর্কে সতর্ক থাকে, কেন না ঝগড়া বেধে গেলে তখন শত্রুপক্ষের গরু বাছুর মুরগি কোন কিছুই গুলির হাত থেকে রক্ষা পায় না।

পথের একেবারে ধারেই একটা দুর্গের মতন। ডাক্তার হেসে বলেন, এটা তা বলে গ্রাম ভাববেন না। এটা ইংরেজদের থানা—পুলিশ স্টেশন—সশস্ত্র আরক্ষী নিরীক্ষাকেন্দ্র। মাঝে মাঝে এরকমও দেখতে পাবেন। পথের শান্তিরক্ষার জন্যে এসব পুলিস বাহিনী। এখন পথ দিয়ে যাতায়াত অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। তবুও, হঠাৎ এরা কোন কারণে ক্ষেপে গেলেই বিপদ। তখন আর এদের হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই কোহাটের রাস্তায় এখনও রাত্রে যান-চলাচল বন্ধ থাকে। এই তো কদিন আগে এই পথের কোন্ এক জায়গায় একটা সেনা-ছাউনিতে রাত্রে আফ্রিদিরা হামলা করে, যতগুলো বন্দুক-রাইফেল ছিল লুঠ করে নিয়ে পালায়। আগে ও-ধরনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটত,—এখনো মাঝে মাঝে একটু হয়ত হয়। এর কারণ কি, তা জানেন? টাকাকড়ির লোভ নয়। আগ্নেয়াস্ত্র এদের কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। যে করে পারে, সংগ্রহ করে। প্রত্যেকের অন্ততঃ একটা করে থাকা চাই-ই। নইলে যেন আত্মমর্যাদা থাকে না, মনের আনন্দও নয়। নিজেরাও গ্রামে গ্রামে তৈরি করে। কিন্তু অতো লোহা পাবে কোথায়? —ঐ দেখুন, পথের ওপর একটা ছোট নদীর পুল আসছে,—নজর রাখুন,—পুলের সবটাই কন্‌ক্রিট্ সিমেন্টের। কোথাও এক কণা লোহার কোনকিছু পাবেন না। একটা পেরেক পর্যন্ত নয়। আগে সে-ধরনের পুল ছিল। ভেঙেচুরে সব লোহা আফ্রিদিরা খুলে নিয়ে যায়। অগত্যা ইংরেজ সরকার এখন এই প্রথা ধরেছে, কাজও হয়েছে। লোহার তৈরি কোথাও কিছুর সন্ধান পেলে আর রক্ষে নেই, —তখনি তার অন্তর্ধান! ওরা মনে করে, এর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের কথা ওঠে না। অদ্ভুত সব মানুষ, মশাই,—যাকে বলে খাঁটি বীরের জাত,—যেমন এখানকার রুক্ষ পাহাড়পর্বত দেখছেন—মানুষগুলোও তেমনি, কারো বশ্যতা স্বীকার করবে না। পরাধীন দেশের বাসিন্দা হয়ে তাই তো এদের আমার এতো ভালো লাগে, —চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে এদের যেটুকু সেবা ও সাহায্য করতে পারি, আনন্দ পাই। ওরাও আমাকে আপন বলে ভাবে।

বন্ধু বলে ওঠে, ওধারে দূরে ঐ গ্রামটা,—আগুন লেগেছিল ওতে নাকি? সারা পাঁচিলের গায়ে কালো কালো দাগ—ভাঙাচোরাও।

ডাক্তার বলেন, অগ্নিকাণ্ডই বটে। তবে যা মনে করছেন, তা' নয়। দুই গ্রামবাসীদের মধ্যে হয়ত কোন কারণে ঝগড়া হয়,—এরা কথা-কাটাকাটি গালা-গালির ধার ধারে না। বিবাদ হয়েছে,—চলে এস, হয়ে যাক লড়াই। অমনি দু দলে বন্দুক রাইফেল নিয়ে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হয়। যতক্ষণ না এক পক্ষ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে,—বা হার স্বীকার করে—তা' বড় কেউ করতে চায় না,—লড়াই

চলবে ততোদিন ধরে। এইভাবে এক একটা গ্রাম ছারখার হয়ে যায়। এ-সব ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি ওদের কাছে কিছুই নয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি লেগেই আছে। অতি ছোট কারণেই আরম্ভ হয়ে যায়,—এমন কি হয়ত কোন কল্পিত কারণ থেকেই শুরু। ভাবলে হয়ত, আমাকে অপমান করেছে,—প্রতিশোধ নেওয়া চাই-ই। হয়ত তার নিজের সম্বন্ধেও নয়—তার পরিবারের কিংবা তার স্বজাতির কারও ক্ষতি হয়েছে বা মানহানি ঘটেছে, অমনি রাইফেল-কাঁধে চলে তার শোধ নিতে। তখনি সুযোগ সুবিধে হলো না?—বেশ, মনে রইল, এক মাস দু মাস—এক বছর দু বছর পরে—যখন হয় সুযোগ পাবই—তখন এর প্রতিশোধও নেব;—এই প্রবৃত্তি হোল ওদের রক্তে লেখা। এই জন্যে খুনজখম এদের লেগেই থাকে। প্রাণ নেওয়া বা দেওয়ায় এদের লেশমাত্রও কুণ্ঠা নেই,—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'—এরা হোল ঠিক সেই জাতের। কিন্তু, আশ্চর্য! এর মধ্যেও একটা সীমা আছে।

বন্ধুর বাবা প্রশ্ন করেন, এরা এল এখানে কোথা থেকে? এরাই কি এখান-কার আদিবাসী?

ডাক্তার বলেন, ভারতবর্ষ আর আফগানিস্তানের মাঝখানে এই যে পাহাড় অঞ্চল,—সুলাইমান-সফেদকোহ রেঞ্জ—এইটেরই এখন নাম হয়েছে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ বা ট্রাইবাল টেরিটারি। চল্লিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। এরা আফগানদের মত জাতে—পাঠান। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদের বলে—পুখতুন্-অলা,—অর্থাৎ যাদের ভাষা, পুস্তু। এদের মধ্যে আবার বারোটা উপজাতি—আফ্রিদি, ওয়াজির, মাসুদ, মোহমন্দ ইত্যাদি। আমরা এখন চলেছি—আফ্রিদিদের অঞ্চল দিয়ে। খাইবার পাশেও এই আফ্রিদিদের দেখবেন। প্রতিটি উপজাতি আবার কয়েকটা গোষ্ঠীতে ভেঙে ভেঙে থাকে,—তাকে বলে 'খেল্'। এই খেল্‌ই হোল এদের একাত্মবোধের দৃঢ় বাঁধন। প্রত্যেককে নিজের খেল্‌কে মেনে চলতেই হবে। বলছিলাম এদের মারামারি, ঝগড়াঝাঁটির সীমানার কথা। সেটা হোল ঐ নিজেদের খেল্ পর্যন্ত,—অর্থাৎ আপন পরিবারের মধ্যে চলবে, গ্রামের মধ্যেও পরস্পরে হবে, এমন কি একই খেল্-ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মধ্যে বড় একটা মারামারি কাটাকাটি দেখা যায় না। আবার একটা চমৎকার প্রথা আছে,—যদি বাইরের শত্রু এসে পড়ে, তখন যতো ঝগড়া-বিবাদ নিজেদের মধ্যে বা গ্রামে গ্রামে থাক না কেন, আপাততঃ সে-সব রইল তোলা। গ্রামের সর্দাররা—এদের ভাষায় 'মালিক'—সভা বা জিরগা ডাকবেন, মোল্লাদের মধ্যস্থতায় বিবাদ মেটাবেন, প্রত্যেকে এক একটা পাথর তুলে এনে একটার ওপর আর একটা বসিয়ে সাজিয়ে রাখবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন, যতোদিন না বাইরের শত্রুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বা তার উচ্ছেদ হয়, নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি থাকবে না, আর এই পাথরের

স্ত্পও এমনি থাকবে। এ-চুক্তির কথনো খেলাপও হয় না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার একবার দেখে নেন,—বলেন, আর বেশি দূর নয়, ঐ পাহাড়টা দেখছেন, ওরই নিকটে আমাদের যেতে হবে। এই উপজাতিদের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, এর মধ্যে সেটুকু শুনিয়ে রাখি। পাঠানরা মনে করে, তারা ইহুদীদের বংশধর। রাজা সল্—Saul—তাদের আদি পূর্বপুরুষ। কিন্তু, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অভিমত, শুনি এরা তুর্কো-ইরানীয়ান জাতীয় পর্যায়, তবে বহু লোকের মধ্যে ভারতীয় ও অন্য জাতির রক্তেরও সংমিশ্রণ দেখা যায়। হবার কথাও। বহু যুগ থেকেই তো এইসব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় আক্রমণকারীরা ভারতে যাতায়াত করেছে—বিরাট সেনাদল নিয়ে। এরাও লড়েছে তাদের বিরুদ্ধে। হেরোডোটাস্ এদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন: **The most warlike of all the Indians, who live around the city of Kaspaturos**—অর্থাৎ পেশোয়ার!—এইবার দেখবেন তাদের গ্রাম,—কোন গ্রামের কিন্তু নিজস্ব নাম নেই,—সর্দার বা মালিকের নামে গ্রামের পরিচয়,—যে গ্রামে এখনি ঢুকব—এর নাম উলিয়াস্ খাঁ কিলি।

ভাবি, কেল্লাই বটে! গ্রাম তো নয়। উলিয়াস্ খাঁর কেল্লা।

কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোটর মাঠের মধ্যে ঢোকে। একটু এগিয়ে গ্রামের সুমুখে দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচিল। পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি। বাইরে থেকে গ্রামের ভিতর কোন কিছু দেখা যায় না। প্রবেশপথও মাত্র একটি। সিংহ দরজার মত। ডাক্তারবাবু ড্রাইভারকে তিনবার হর্ন বাজাতে বলেন।

বলি, ঐটে সংকেত নাকি? আলিবাবার চিচিং ফাঁক?

ডাক্তার বলেন, দেখুন না, এখনি দরজা খুলে যাবে। ওরা ওপরের ওয়াচ্ টাওয়ার থেকে দেখে নিয়েছে আগেই।

দরজা ভেতর থেকে খুলে যায়। জন পাঁচেক আফ্রিদি বেরিয়ে আসেন। সামনেই সর্দার—মালিক। দেখেই বোঝা যায়। সকলেরই লম্বা দোহারা শরীর। অ্যাথ্‌লেটের মত সুগঠন। সুপুরুষও। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। লম্বা ধরনের মুখাকৃতি। টানা বড় বড় চোখ—নীলাভ ভাব। তীক্ষ্ন ফলার মত নাক। মুখে দাড়িগোঁফ। মাথায় পাগড়ি। পরনে ঝলঝলে সালোয়ার। গায়ে ঝোলা পাঞ্জাবি,—আলখাল্লার মত, কারও বা তার ওপর কোট বা ওয়েস্ট কোট। সবারই কাঁধে রাইফেল বা বন্দুক। সর্দার বৃদ্ধ। সৌম্য হাবভাব। বয়সের ভারে দেহ নুয়ে পড়েনি। ধনুকের ছিলার মত টানটান লম্বা। দীর্ঘ পদক্ষেপে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসেন মোটরের দিকে। আমরাও নেমে

দাঁড়াই। ডাক্তার ঘোষ কয়েক পা এগিয়ে যান। তাঁকে দেখে সর্দারের মুখে আনন্দোজ্জ্বল হাসি ফোটে। সরল শিশুর হাসির মত স্বচ্ছ। দুজনেই হাত বাড়ান। পরস্পরের করমর্দন চলে সোৎসাহে ও প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে। আর দুজনেরই মুখে একই কথা খই ফোটার মত ফুটতে থাকে। বাক্যস্রোতের বেগ ক্রমশই দ্রুততর হয়, হাতের ঝাঁকুনিও ঝড়ের মুখে গাছের ডালের মত প্রবল ভাবে নাচতে থাকে।

অবাক হয়ে দেখি, বন্ধুমিলনের ও অভ্যর্থনার এই অদ্ভূত দৃশ্য। কথাগুলি শুনতে এই ধরনের—

স্তড়ে মসে? জোড়ে? তক্‌ড়ে? খ-জোড়ে? খ-তক্‌ড়ে? খুশিয়াল্ দে? খ-খুশিয়াল্ দে? ঢের্ খুশিয়াল্ দে? খ-খ-খ খুশিয়াল্ দে?—তারপর যেন কেবল মাত্র খ-খ-খ—এইভাবেই কিছুক্ষণ চলে।

বাড়ি ফিরে পরে ডাক্তারবাবুর কাছে কথাগুলির অর্থ জানতে চই। তিনি জানান, আমাদের যেমন প্রথা, নমস্কার বা প্রণাম; ইংরেজদের যেমন গুড্-মর্ণিং, গুড্-ইভনিং ইত্যাদি, মুসলমানদের যেমন সেলাম আলায়কুম,—আফ্রিদিদের তেমনি এই হোল অভিবাদন। এর ভাবার্থ হোলঃ জীবন-যুদ্ধে আপনার যেন ক্লান্তি না নামে। গায়ের জোর ঠিক আছে? সব রকমে কর্মক্ষম? খুব শক্তি আছে? খুব কর্মক্ষম? দিল্ খুশি? খুব খুশি? ঢের খুশি? খুব খুব খুব খুশি?—খ মানে খুব এবং শেষ পর্যন্ত খ-খ-খ এই খ-এর খেলাই চলতে থাকে।

যেমন বীরের জাত, তেমনি ভীম আকৃতি, তেমনি বীরত্বব্যঞ্জক অভিবাদন পদ্ধতি।

সকলকে সমাদরে গ্রামের মধ্যে নিয়ে চলে।

ভিতরে মাঝখানে চতুষ্কোণ বিশাল প্রাঙ্গণ। শুক্‌নো, খট্‌খটে। বালি কাঁকর ভরা। বাইরে যে দিগন্তজোড়া মরুপ্রান্তর, তারই একটা সামান্য ফালি যেন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা। সেই খোলা জায়গায় এখানে-ওখানে খাটিয়া পাতা, কোথাও অতি সাধারণ কাঠের দু-একটা চেয়ার টেবিল। প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘিরে পাঁচিলের গায়ে সারি সারি ঘর,—একতলা, দোতলা। কোন বাড়ির নীচের তলায় খোলা দালান। মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি। কেমন যেন নীরস, কর্কশ, রুক্ষ। যেমন অধিবাসী, তেমনি তাদের বাসস্থানও। যেন, ধারালো তরোয়াল, আর তার খাপ।

ডাক্তার পুস্তু ভাষায় মালিকের সঙ্গে কথা বলেন। কি কথা চলে, কিছুই বুঝি না। সর্দার হেসে একবার কি যেন অনুমোদন করেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়েন। সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলেন, একটা একতলার খোলা দালানে। দেখে মনে হয়, কামারখানা। ক'জন আফ্রিদি লোহার লম্বা নল নিয়ে একটা

যন্ত্রের সাহায্যে 'বোর্'—অর্থাৎ ছেঁদা করছে। পাশে লোহার কুচি জমছে। ডাক্তার দেখিয়ে বলেন, দেখছেন? কী তৈরি হচ্ছে?—রাইফেল!—এই ভাবেই প্রত্যেক গ্রামে নিজেরা তৈরি করে। মান্ধাতা আমলের গ্রাম্য পদ্ধতি—অতি crude method। আধুনিক যন্ত্রপাতি আর পাচ্ছে কোথায়? অসীম পরিশ্রম করে তবু হাতে তৈরি করছে। সময় লাগে বেশি, সংখ্যায় হয়ও কম। কিন্তু জিনিস যা করে, আশ্চর্য রকম ভাল। কিছুদিন আগে এক রাশিয়ান এসেছিলেন, তিনি পরীক্ষা করে বলে গেলেন, তাঁদের দেশের ফ্যাক্টরীতে তৈরি ভাল রাইফেলের চেয়ে এগুলি কোন অংশে খারাপ নয়।

সর্দারি কথাগুলির হয়ত মর্ম বোঝেন। সগর্বে ঘাড় নাড়েন। দেওয়ালে টাঙানো পাঁচ-ছটা রাইফেল, তারই একটা টেনে নামান। আমাদের হাতে দেন। স্বাধীন মুলুকে দাঁড়িয়ে রাইফেলের সামান্য স্পর্শও মনে অজানা এক আনন্দ দেয়, দেহে রোমাঞ্চ জাগায়। দুর্লভ রত্নের মত সযত্নে হাতে ধরে দেখতে থাকি। কিন্তু, এ কী! নলের উপর খুঁদে লেখা—ইংরেজি হরফে—ইংলণ্ডে তৈরি—manufactured in England! তার আবার বানান ভুল! ডাক্তারকে দেখাই। তিনি হেসে বলেন, জানেন না বুঝি? বিলাতি মাল বলে এরা দু-একটা বিক্রী করে,—দাম বেশি পায়।

মালিককে দেখান। সর্দারও হেসে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করেন।

স্মারক স্বরূপ রাইফেল তৈরির লোহার কুচি কতকগুলো পকেটে পুরি। তাতেও খানিক আনন্দ!

অঙিনায় ফিরে, টেবিল ঘিরে, চেয়ারে ও খাটিয়ায় সকলে বসি। সর্দারের কি এক কথায় ডাক্তার সম্মতি জানান। সর্দার উঠে যান। ডাক্তার বলেন, উনি বলছিলেন, গ্রামে আপনারা অতিথি এসেছেন, চায়ের ব্যবস্থা করছেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, এরা সবাই মুসলমান, তাই খেতে যেন আপত্তি করবেন না। তাহলে অপমান বোধ করবে।

আমরা বলি, স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসীর আতিথেয়তা,—এর মধ্যে ধর্মের কথা উঠবে কেন? আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে খাব। তাছাড়া, অপমান করব, এমন সাহসই বা কোথায়? যা এদের মজ্জাগত প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি শুনলাম, আর বন্দুক রাইফেল দেখলাম।

ডাক্তার বলেন, কিন্তু আর একটা বিষয় এখনও শোনেননি। এদের হিংসা-বৃত্তি ও প্রতিশোধ নেবার দুর্দম স্বভাব থাকলেও তার ওপর এরা একটা অতি শান্তশিষ্ট সামাজিক আচরণকে স্থান দেয়, সেটা হোল এদের অকুণ্ঠ আতিথেয়তা। অতিথি এলে তার আদর যত্ন আপ্যায়ন তো করবেই, যে কেউ এসে আশ্রয় চাইলেও তাকে আশ্রয় দেবে। এমন কি পরমশত্রু এসেও আশ্রয় ভিক্ষা করলে তাকে সাদরে রাখবে এবং যতক্ষণ আশ্রয়ে থাকবে তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগে তা

দেখবে।

সর্দার ফিরে আসেন। সঙ্গে আর একজন লোক। হাতে তার থালা ভরতি আঙুর, বাদাম, আখরোট—শুকনো মেওয়া। টেবিলের উপর রাখে। সর্দার লজ্জিত মুখে সংকোচভরে ডাক্তারবাবুকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলেন। ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন, জবাবে কি যেন তাঁকে জানান। তারপর হাসতে হাসতে আমাদের বলেন, ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলেন? মালিক ভীষণ লজ্জায় পড়েছেন। এখানে গোরু মোষ কম,—এঁদের সব ভেড়া-ভেড়ী। দিনের বেলা বাইরে চরতে গেছে। ঘরে দুধ নেই। অতিথিদের বিনা দুধে চা খেতে দেন্‌ কী করে,—এই হয়েছে দুর্ভাবনা। এদের অবশ্য দুধ মিশিয়ে চা খাওয়া রীতি নয়,—'গ্রীন্‌-র-টি' খায়। আমি তাই বললাম, আমরাও সেই চা খাব,—এতে লজ্জা কীসের? কিন্তু দেখুন মজা,—বাইরে থেকে দেখতে এমন কাঠখোট্টা নীরস লোক,—দুর্ধর্ষ প্রকৃতি,—দয়ামায়া লজ্জাসরমের বুঝি বালাই নেই—অথচ এই সামান্য ব্যাপারেই কী রকম লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন! পাছে অতিথিসেবার কোন ত্রুটি ঘটে যায়!

চা খাবার সময় আর একজন আফ্রিদি আসে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খানিক কথা বলে চলে যায়। ডাক্তারবাবু মুচকে হেসে আমাদের বলেন, লোকটা ইংরেজের মাইনে-খাওয়া পুলিশের লোক। এসেছিল খোঁজখবর নিতে। আমাকে অবশ্য চেনে। দেখছেন তো আফ্রিদিদের মধ্যেও টাকা বিলিয়ে কি রকম গুপ্তচরেরও ব্যবস্থা ইংরেজ করেছে!

কয়েকটি রোগী দেখতে হয় ডাক্তারবাবুকে। এঁর উপর আফ্রিদিদের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি।

বিকেলে পেশোয়ারে ফেরা হয়। রোমাঞ্চময় তৃপ্ত মনে। মোটরে ডাক্তারবাবু আরও গল্প করেন আফ্রিদিদের সম্পর্কে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা এতক্ষণ ওদের গ্রামে ছিলাম, কোন মেয়েছেলে দেখলাম না তো?

ডাক্তার বলেন, দেখবেন কি করে? গ্রামের মধ্যে ওরা কড়া পর্দানশিন। এই আফ্রিদিদের নিয়ে কতো মিথ্যে কাহিনীর প্রচার হয়, তারই একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বছর পাঁচেক আগে—১৯২৩ সালে মিস্‌ এলিশ্‌ নামে সতেরো বছর বয়সের এক ইংরেজ মেয়েকে এক আফ্রিদি অপহরণ করে নিয়ে যায়—

উৎসাহিত হয়ে বলি, খুব মনে আছে ঘটনাটা। মেয়েটির নাম ছিল, মলি এলিশ্‌। সে-সময়ে এ নিয়ে মহা হৈ-চৈ পড়ে, এ দেশের কাগজে তো বটেই, বিলেতের কাগজেও ফলাও করে প্রচার হয়—আফ্রিদিদের কী ভীষণ অত্যাচার আর জঘন্য বর্বরতা! তারপর হেসে বলি, অবশ্য সীতা হরণের মত রাম-রাবণের যুদ্ধ এতে হয়নি, হেলেন হরণের মত ট্রয়ও ধ্বংস হয়নি। তবে কাগজে তখন

পড়েছিলাম বেশ মনে আছে, মেয়েটিকে নিয়ে পালাবার সময় তার মাকে হত্যা করা হয়। তারপর, আর এক ইংরেজ মহিলা অসীম সাহসিকতা দেখান, আফ্রিদিদের বেশ ধরে তাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে মলিকে উদ্ধার করেন—খবরের কাগজে তাদের দুজনের ছবিও ছাপা হয়। আরও একটা কথা তখন কাগজে লেখে, মলি ফিরে এসে বলে, তার বন্দিদশায় তার প্রতি কোন অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করা হয়নি। আফ্রিদিরা কি রকম অসভ্য, অত্যাচারী ও দুর্ধর্ষ জাত—আর মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণের দাবী পাঠায়—এটা নাকি তারি একটা প্রমাণ। তবে এর আগে কোন ইংরেজ মেয়ে হরণ হয়নি—তাই বৃটিশ মহলে অত হৈ-চৈ পড়ে।

ডাক্তারবাবু চুপ করে শোনেন, তারপর বলেন, হ্যাঁ, আপনি যা বললেন, ঐ হোল ইংরেজের দেওয়া বিবরণ। আর আফ্রিদিদের দিক থেকে ঘটনাটা বলি,—যারা এতে জড়িত তাদের মুখেই শোনা। এদের চরিত্রগত যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলাম—এই ঘটনার মধ্যেও তা দেখতে পাবেন। যেমন করে হোক রাইফেল সংগ্রহ করায় আফ্রিদিদের প্রচণ্ড উৎসাহ। মলি-হরণ ঘটনার শুরুও তাই নিয়ে। আজব খাঁ ও শাহজাদা—দুই ভাই। যেমন তাদের সাহস, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি দুর্ধর্ষও। এক রাত্রে তারা সুযোগ পেয়ে, সীমান্তরক্ষী পুলিস বাহিনীর তাঁবু থেকে কতকগুলো রাইফেল দলবল নিয়ে লুঠ করে আনে। পুলিসের রাইফেল লুঠ? ইংরেজ সরকার ক্ষেপে লাল। চারদিকে চর পাঠায়। খবরও এসে যায়। এই কোহাটের পথ থেকে কিছুদূরে ঐ সব পাহাড়ের মাঝখানে আফ্রিদিদের গ্রাম—বস্তি খেল্—সেইখানে আজব খাঁদের ঘর,—রাইফেলও সেখানে লুকানো আছে। আজব খাঁদের উপর আগে থেকে ইংরেজদের বিশেষ ছিল। তাই বড় সেনাদল নিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তখনি সেখানে হানা দেয়। গ্রাম ঘেরাও করে। অস্ত্রগুলিও পাওয়া যায়। দুপুর বেলা। গ্রামে তখন দুজন মাত্র আফ্রিদি পুরুষ,—তাদের গ্রেপ্তার করা হোল। আজব খাঁ ও শাহজাদাকে দেখতে পাওয়া গেল না। সাহেব কর্তারা ভাবলেন, নিশ্চয় মেয়ে সেজে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে। অমনি হুকুম হয়, সব মেয়েদের বাইরে এসে অফিসারদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের প্রত্যেকের মাথার ঘোমটা তুলে দেখা হতে লাগল—সে পুরুষ কিনা!—অবশেষে শুধু সেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে, অস্ত্রগুলো নিয়ে পুলিসদের চলে যেতে হয়।

আজব খাঁ-রা বাড়ি ফিরে সব খবর শোনে। লুঠ-করে-আনা অস্ত্র, হানা দিয়ে ইংরেজরাও উদ্ধার করেছে;—এতে লজ্জা নেই, দুঃখ নেই,—শক্তির সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু তাদের মা এসে যখন বলেন, পুরুষদের মধ্যে তোদের লড়ালড়ি কাটাকাটি যা হবার হোক্, কিন্তু এ কী! মেয়েদের এমন অপমান! মুখের ঘোমটা তুলে বিদেশী লোক তোদের মায়ের মুখ দেখে;—

তোরা বেঁচে থাকতে! এত বড় অপমানের শোধ নিবি না তোরা,—আমার ছেলে হয়ে?—তখন দু ভাই প্রতিজ্ঞা করে, নিশ্চয় এর প্রতিশোধ নেব,—ইংরেজদের একটা মেয়েকে ধরে এনে তোমার কাছে দিচ্ছি এখনি।

তারা চলে আসে একেবারে কোহাট ক্যান্টনমেন্টে। কাঁটাতার-ঘেরা এলাকা। সব সময়ে বন্দুকধারী প্রহরী। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর,—সুযোগ বুঝে,—কুকুরের প্রকাণ্ড চামড়ায় শরীর ঢেকে, হামা দিয়ে দু ভাই এগিয়ে যায়। টহলদারী গার্ডের পিছন থেকে চাপা দিয়ে শাহজাদা তাকে ফেলে ধরে রাখে। অল্পদূরে বাংলোর বারান্দা। ইংরেজ মেয়ে বই পড়ছে। নিকটে মা বসে সেলাই করছেন। আজব খাঁ বারান্দায় উঠতেই মা চেঁচিয়ে ওঠেন। তখনি তাকে গুলি করে মলিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েই আজব খাঁ উধাও।

তারপর, বস্তি খেলের গ্রামে ফিরে মায়ের কাছে মলিকে এনে দেয়। তিনি খুশি,—অপমানের প্রতিশোধ হোল। ছেলেরাও কর্তব্য পালন করল। আফ্রিদি মেয়েদের অপমান,—ইংরেজদের এত বড় আস্পর্ধা।

কিন্তু বস্তি খেল্-এ মলিকে রাখা চলে না, ইংরেজদের সন্দেহ এখানে পড়বেই,—তাই অন্য গ্রামে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। অতিথির মর্যাদা দিয়ে তার আদর-যত্ন চলে।

ওদিকে দেশময় নারীহরণের খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতেও ভীষণ চাঞ্চল্য। একে সাহেব, তায় মিলিটারী অফিসার—মেজর, তাঁর স্ত্রী নিহত, আর মেয়ে অপহৃত!—একেবারে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে থেকে! পেশোয়ারের চীফ্ কমিশনার—স্যার জন্ ম্যাফে—তখনকার ফ্রন্টিয়ার্ টেরিটারীর সর্বময় কর্তা,—তিনি নিজে উঠে পড়ে লাগলেন মলির উদ্ধারের জন্যে। মহা ভাবনা——আফগানিস্তানে চালান না করে দেয়। ইংরেজদের বেতনভোগী ও বশীভূত আফ্রিদি সর্দারদের ডাক পড়ে। এক ইংরেজ মহিলারও সাহায্য পান। তাঁকে আমিও চিনতাম। এ রকম আশ্চর্য প্রকৃতির মেয়ে কখনও দেখিনি। পেশোয়ার হাসপাতালের তিনি নার্স-সিস্টার। সেখানকার এক ডাক্তার,—তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল,—ডাঃ ভারনন্ স্টার্ (Dr. Vernon Starr)—তাঁকে তিনি বিবাহ করেন। বছর দশেক আগে—১৯১৮ সালে—আফ্রিদি ও ইংরেজদের মধ্যে একটা গোলযোগের সময় একদল আফ্রিদি ডাক্তার স্টার্-এর বাড়ি আক্রমণ করে এবং তাঁর স্ত্রীর সম্মুখে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু, বলিহারি মিসেস্ স্টার-এর মনোবল ও সেবা-ব্রতে নিষ্ঠা। দু বছর পরেই তিনি আবার যোগ দেন হাসপাতালে নিজের কাজে। রোগীর অক্লান্ত সেবায় ডুবে থাকেন। আর, বেশির ভাগ রোগী কারা?—ঐ সব পেশোয়ারী, পাঠান-আফ্রিদি, এরাই! যাদের দলের লোক তাঁর স্বামীর হত্যার জন্যে দায়ী। এঁর সেবা-শুশ্রূষা দেখে তারাও অবাক হয়ে থাকে। ট্রাইবাল অঞ্চলে এমন কোন

গ্রাম নেই মনে হয়, যেখানে অন্ততঃ একটা লোক না পাওয়া যাবে—যে এঁর কাছে উপকৃত। বোধ করি, এরই ওপর ভরসা করে, দুঃসাহসে বুক বেঁধে, কতকগুলি বিশ্বস্ত আফ্রিদি সঙ্গী নিয়ে মিসেস্ স্টার্ অভিযানে বার হলেন মলির সন্ধানে। মাথায় আফ্রিদিদের মত পাগড়ি, পরনে খাঁকি বেশভূষা, ব্যাগ্-এ ভরা রিভলভার, পিস্তল নয়,—ওষুধপত্র! ইতিমধ্যে চরের সাহায্যে খবর আসে—আফ্রিদিদের টিরা অঞ্চলে—যার মধ্যে বন্দিত খেল্—তারই কোথাও মলি আছে। কিন্তু, সে-সব ভয়ংকর দুর্গ পাহাড়-ঘেরা অঞ্চল—সেখানে অচেনা ভিনগ্রামী ট্রাইবালদেরই প্রবেশ দুঃসাধ্য—বিদেশীদের তো কথাই নেই, সেখানে যাবেন কি করে? নানান্ চাঞ্চল্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি তবুও যান, তাঁর সঙ্গীদের সাহায্য নিয়ে; আজব খাঁ ও শাহজাদার দেখাও পান এবং অবশেষে মলিকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনেন। মলিকে ফেরত দেবার বিনিময়ে ইংরেজ সরকারের গ্রেপ্তার করা-বন্দিত খেলের সেই দুজন আফ্রিদিকে মুক্তি দিতে হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই এ-সব ঘটে যায়।

ব্যাপারটার কিন্তু এইখানেই শেষ হয় না। ইংরেজরা তারপর উঠে-পড়ে লেগে যায় আজব খাঁ ও শাহজাদাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু তাদের ধরে, সাধ্য কার? রেগেমেগে ইংরেজরা বন্দিত খেল্ ও অন্য যে-সব গ্রামে তারা আশ্রয় পেয়েছিল—সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। অর্থাৎ রামায়ণের সেই অগ্নি-কাণ্ডই! টিরা অঞ্চলের পাহাড়ের ওপর এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়িয়ে দেখিয়ে গেল—ইংরেজদের কতো বাহুবল! আফ্রিদি সর্দারদের কয়েকজনকে ডেকে তাদের জিরগা-সভা বসাল, মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হোল, আজব খাঁ, শাহজাদা আর তার সঙ্গীদের কেউ আশ্রয় দেবে না, দেখতে পেলে তাদের যেন ইংরেজদের হাতে তখনি ধরিয়ে দেওয়া হয়। একদিকে এই বীরত্ব প্রদর্শন, হুংকার—আর একদিকের মজার ব্যাপার বলি।

একদিন গুজব রটল, আজবরা ধরবার জন্যে এত জাল পাতা, এত কাণ্ড,—অথচ, পেশোয়ার শহরের বুকের ওপরেই তাদের ঘুরতে দেখা গেছে। অমনি, বাড়ি বাড়ি পুলিসের হানা শুরু, শহরের সব গেট্ বন্ধ, হুলস্থূল। কিন্তু, কোথায় কে? আবার কয়েকদিন পরে সেই একই গুজব,—এবার নাকি তারা চীফ্ কমিশনারের প্রাণ নেবার সুযোগ খুঁজছে। দেখা গেল, তাঁকে রক্ষা করার জন্যে অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিস পাহারা বসল। শুধু তাই নয়, বাড়ি ছেড়ে তাঁকে বড় একটা বাইরে আসতে দেখা যায় না। এমন কি তাঁর বাড়ির এলাকায় বা কাছাকাছি যে কয়েকটা বড় বড় গাছ ছিল, ডালপালা কেটে তাদের নেড়া করে দেওয়া হোল। কে জানে? গাছের ওপর কখন উঠে পাতার আড়াল থেকে রাইফেল চালিয়ে ঘরের মধ্যেই না গুলি করে। আফ্রিদিদের যা হাতের নিশানা,—বলা যায় না। এইভাবে কর্তৃপক্ষের আতঙ্কে কাটে। তারপর ক্রমে ভয় কমে। রটনা হয়, ওরা নিশ্চয় ভয় পেয়ে নিজেরা আফগানিস্তানে পালিয়েছে। যেন, সেই

রকম ভয় পাবারই ছেলে তারা! মজা কি জানেন, যখন চারদিকে এত সব ব্যাপার তাদের ধরবার জন্যে,—তারা দুইভাই কতোবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে, নানান রকম ছদ্মবেশ ধরে, কখনো বা রোগী সেজে! তাদের মুখ থেকেই আমার এই কাহিনী শোনা। পরে অবশ্য তারা সত্যিই আফগানিস্তানে যায়—অন্য মতলব এঁটে। বড় ভালো লাগতো সেই আফ্রিদি ভাই দুটিকে। ডাক্তার গল্প শেষ করে একটু চুপ করেন। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করেন, এই রকমই অসমসাহসী বীরজাতি এরা। নিজেদের মধ্যে একতা না থাকলেও একা একা গুপ্ত সংগ্রামে এরা অদ্বিতীয়। অমন বিশাল শক্তিশালী ধুরন্ধর বৃটিশরাজ, তারাও হিমসিম খেয়ে যায় ঐ দুই ভাইএর কাছে!

মোটর ছুটে চলে।

হঠাৎ ঘনঘটা করে মেঘ দেখা দেয়। দিগন্ত অন্ধকার হয়। ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামে। গাড়িতে বসে যেতে মনে স্ফূর্তি জাগে। এ যেন আফ্রিদি চরিত্রের প্রতিমূর্তি। এই কেমন শান্ত ছিল, হঠাৎ দুর্জয় প্রবল প্রতাপে রূপান্তরিত। আবার, অল্প পরেই ধূলিমুক্ত নির্মল প্রকৃতির শান্ত শোভা। তৃষাতুরা শুষ্ককণ্ঠ ধরিত্রী। সহসা বারিপাতে দেহ পরিতৃপ্ত। কিন্তু তাও ক্ষণিক মাত্র। দেখতে দেখতে বালুময় প্রান্তরের আর্দ্র রূপ আবার শুষ্ক কর্কশ হয়ে ওঠে। গাড়ির মধ্যেও হঠাৎ শীতের প্রাবল্য বোধ করি।

বন্ধুর বাবা বলেন, সিমলা পাহাড় অতো উঁচু, সেখানেও যেন এত শীত মনে হয়নি।

ডাক্তারবাবু বলেন, এই হোল এদেশের নিয়ম। একে নভেম্বর মাস,—আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, টেম্‌পারেচার তখনি অনেকখানি নেমে যায়।

রাত্রে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আহার। পেশোয়ারী রুটি। দেখতে যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি পাথরের মতন শক্ত। কিন্তু ভেতরে নরম তুলতুলে যেন মাখন। অতি সুস্বাদুও। আমাদেরই অনুরোধে এই রুটির ব্যবস্থা। ডাক্তার বলেন, প্রতি বছর আমার ওপর ফরমাশ থাকে,—ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন যখন যেখানে বসে,—যাই,—সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় এই রুটির বস্তা। এর মস্ত গুণ, যতোদিনই রাখুন, নষ্ট হবে না। খোলশটা তো শক্তই আছে, এর চেয়ে শক্ত আর কী হবে? আশ্চর্য হোল, ভেতরটারও কোন পরিবর্তন হয় না, ঠিক এমনি নরমই থাকে। কংগ্রেসের অধিবেশনে হাজির হলেই বন্ধুদের এক প্রশ্ন,—রোটি কই, ডাক্তার ঘোষ?

সেই পেশোয়ারী রুটি খাই আমরা পেশোয়ারে বসে।

রাত হয়ে যায় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। নিজেই মোটর করে কালীবাড়ি পৌঁছে দিতে চলেন। বলেন, শহরের রাতের চেহারাটাও একবার ঘুরে দেখে চলুন।

ঘুমন্তপুরী বটে। কোথাও কোন জনমানব নেই। শহরের সেই কোলাহল স্তব্ধ। দোকানপাট বন্ধ। কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। বাড়িগুলো ভূতের মত কালো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তার আলোগুলো, যেন অন্ধকারে পেঁচার চোখ জ্বলে!

ঘরে এসে শুয়ে পড়ি ভাবতে ভাবতে,—কাল আবার আফ্রিদিদের খাইবার পাশ্!

॥ ৭ ॥

১৩ই নভেম্বর, ১৯২৮ সাল। জীবনের এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকে। চলেছি খাইবার পাশ্ অভিমুখে। সকাল ৭টা-১৫তে পেশোয়ার থেকে ট্রেন ছাড়ে। দার্জিলিঙ্ পাহাড়ের মত খেলাঘরের ট্রেন নয়। ৫' ৬" গেইজ-এর বড় লাইনের ট্রেন। ৩৪ মাইল দূরে ল্যান্ডিকোটাল। সেই অবধি যাবে। তারপরে, আরও পাঁচ মাইল দূরে ল্যান্ডিখানা। ভারত সীমান্ত। আফগানিস্তান শুরু। খাইবারের রেল-লাইন পাতা ল্যান্ডিখানা পর্যন্ত। কিন্তু শেষের পাঁচমাইল ট্রেন চলাচল নেই।

ট্রেনে যাতায়াতে আপাততঃ বাধানিষেধ নেই। কেন না, 'পাশে'র ভিতর কোন স্টেশনে নেমে বাইরে যাওয়া চলে না,—কাঁটাতারে ঘেরা স্টেশন। সশস্ত্র প্রহরী। মোটর-পথে যাতায়াতে মিলিটারী অনুমতিপত্রের প্রয়োজন। অতএব, সে-হাঙ্গামা এড়িয়ে এই ট্রেন ধরা।

গাড়িতে বসে ভাবি, এ চললাম কোথায়? এ-যে ভারতের ভূগোল আর ইতিহাসের রোমাঞ্চকর সঙ্গমক্ষেত্র।

ভেসে ওঠে চোখের উপর ভারতবর্ষের মানচিত্র। প্রকৃতি যেন ভুবন-মনোমোহিনীরূপে ভারতমাতাকে বিভূষিত করেন। সুরক্ষিত রাখেন চতুঃ-সীমানা। প্রাকৃতিক আবেষ্টন,—অতল সমুদ্র অথবা উত্তুঙ্গ গিরিপ্রাকার। উত্তর-দিগন্তব্যাপী দেবতাত্মা হিমালয়। কাশ্মীরের উত্তরে কারাকোরাম শৃঙ্গ। আরও পশ্চিমে,—হিন্দুকুশ। তুষার-উষ্ণীষধারী গিরিপ্রহরী। কারাকোরামের শেষভাগে দক্ষিণমুখী নেমে আসে সফেদকোহ-সুলাইমান শৈলশ্রেণী। এঁকেবেঁকে নেমে যায় সেই আরব সাগরের দিকে। পাশ্চাত্ত্য দেশ ও মধ্য-এশিয়া থেকে যত বৈদেশিক আক্রমণের বন্যা আসে, তাদের প্রথম প্রতিবন্ধক হিন্দুকুশ। হিন্দুকুশ নামকরণের একটা প্রবাদ প্রচলিত। এককালে ভারত থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করে এই পথে চালান যেত। সমতলবাসী হিন্দু ক্রীতদাসের অনেকে এই দুর্গম পথে প্রাণ হারাত। তাই নাকি ঐ পাহাড়ের নাম হিন্দুকুশ,—হিন্দুহন্তারক। সেই হিন্দুকুশ পার হয়ে এগিয়ে এলে ভারতবর্ষের প্রকৃত সীমান্ত প্রহরী,—আজ ঐ অদূরে দেখা যায়,—সফেদকোহ-সুলাইমান রেঞ্জ। দুর্লঙ্ঘ্য পার্বত্যপ্রদেশ। তবুও, তারই ফাঁকে সর্পিল কয়েকটি গিরিবর্ত্ম। তার মধ্যে প্রধান,—খাইবার পাশ্, বোলান পাশ্ ও

আরও দক্ষিণে মাকরান সমুদ্রতট। কিন্তু খাইবার পাশ্-এর নামই সব চেয়ে বিখ্যাত। বহির্জগৎ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যুগ যুগ ব্যাপী যাতায়াত এই পথ ধরে। হয়ত, সেই কোন্ পুরাকালে এই পথ দিয়েও আসেন আর্যরা। আবার, সেই লক্ষ্মীর দুয়ার ভেদ করে ভারতের রত্নরাজির লোভে কত বহিরাগত অলক্ষ্মীরও অনুপ্রবেশ হয়,—এরই শোণিতচিহ্নিত শানি-রন্ধ্র দিয়ে। সেই কারণেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বার বার খাইবার পাশ্-এর নাম উল্লেখ। এই ছিদ্রপথ দিয়ে আসেন পারস্যরাজ দরেইওস্। আলেক্সান্দারের সৈন্যবাহিনীও। একের পর এক রাজ্যলোলুপ বিদেশী নরপতিরা। এলেন গজনীর সুলতান মামুদ। চেঙ্গিস্ খাঁরও প্রবেশ এরই নিকটস্থ আরেক গিরিপথ দিয়ে। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবরের যাতায়াতও এই খাইবার ধরে। নাদির শাহ্ ও আহমদ শাহ্ দুররাণীর আক্রমণ,—সে সবও এই খাইবার পাশ্ ভেদ করে। বৃটিশ আমলে প্রথম আফগান যুদ্ধে ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য খাইবার অধিকার করে, উত্তর ভারতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে। ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল পোলক কাবুল অভিযানে এই গিরিপথই ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধেও বৃটিশ সেনা আবার এই পাশ্ দখল করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গন্ডামাক সন্ধির ফলে আফ্রিদি ও অন্যান্য উপজাতি বৃটিশ আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু, তবুও এই কয় বছর আগে ১৯১৯ সালের মে মাসে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ হয়। আবার এই খাইবারের ল্যাণ্ডিকোটালে রক্তগঙ্গা বয়। সাধে কি আর প্রবাদ রটে, খাইবারের গিরিপথ,—সেখানে প্রতি প্রস্তরখণ্ড মানুষের রক্তরাগে রঞ্জিত।

স্বাধীনচেতা সীমান্তবাসী উপজাতির দল, কারও বশ্যতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এদেশে সামান্য মাত্র স্ফুলিঙ্গ কখন চকিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটায় কেউই জানে না। তাই তো লর্ড কার্জন একসময় লেখেন, No man who has read a page of Indian history will ever prophesy about the Frontier.

সেই প্রসিদ্ধ খাইবার পাশ্-এ চলেছি আজ ট্রেনে চেপে। যেন, ক্ষণিক স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির গহ্বর দর্শনে। এই সুদুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজদের পক্ষে রেল চালানো সম্ভব হয়,—উপজাতিগুলির সঙ্গে বহু চুক্তির পর। তাও এই সাম্প্রতিক কালে। তৃতীয় আফগান যুদ্ধের পর। ১৯২৫ সালে—অর্থাৎ মাত্র তিন বছর আগে পাশ্-এর মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলাচল। পাশ্-এর দৈর্ঘ্য ২৬½ মাইল। রেলপথ তৈরি করতে আড়াই কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় হয়। হবার কারণও থাকে। পাহাড় ফুঁড়ে এইটুকুর মধ্যে ৩৪টা টানেল—গিরিসুড়ঙ্গর সৃষ্টি। সুড়ঙ্গগুলির সমষ্টিগত দৈর্ঘ্য,—তিন মাইল। নদী, ঝর্ণা বা নালা অতিক্রম করার জন্যে নির্মাণ করতে হয় ৯২টি পুল বা Viaduct ও 'কালভার্ট'। শুধু তাই নয়। এই বড় ট্রেনকে পাহাড়ের গা বেয়ে তোলা—৩৫০০ ফুটেরও উপরে! বৃটিশ এঞ্জিনিয়ারদের এই রেলপথ-সৃষ্টি জগতে এক বিস্ময়কর শিল্প-কীর্তি।

অসীম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে বসি ট্রেনের জানলার ধারে। যাত্রীর ভিড় নেই। দুটি পেশোয়ারী যুবক,—সাহেবী পোশাক, ও একজন আফ্রিদি—মিলিটারী বেশভূষা, কোমরে রিভলভার। শহরের পশ্চিম দিক ঘুরে ট্রেন চলে। মাঠের মধ্যে আসে। চাষ-আবাদের চিহ্ন দেখি। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের শ্রেণী। তিন মাইল সমতলভূমি পার হয়ে ইস্‌লামিয়া কলেজ স্টেশন। যুবক দুটি নেমে যায়। আফ্রিদি সহযাত্রী এবার আলাপ করেন। কোথায় চলেছি, কোথা থেকে আসছি, জানতে চান। বলেন, এখানকার এই কলেজ এ-অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছাত্রদের জন্যে ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ট্রেন আবার চলতে থাকে। ডান দিকে রেল লাইনের সমান্তরালে বাঁধানো প্রশস্ত মোটরসড়ক। সহযাত্রী জানান, এ রাস্তা চলে গেছে একেবারে কাবুলে,—পেশোয়ার থেকে প্রায় ১৯০ মাইল দূরে। খাইবার পাশ্‌-এর মধ্যে যখন ঢুকবেন—এ পথকে প্রায়ই সঙ্গী পাবেন। আরও একটা পথ সেখানে মাঝে মাঝে দেখা দেবে—সেটা হোল পুরানো 'ক্যারাভান রুট'। ঐ পথ ধরে নিরাপত্তার জন্যে যাত্রীদল একসঙ্গে আসে সারি সারি—গাধা, বলদ, উটের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে। সেরকম যাত্রীদল—এদের বলা হয় কাফিলা—যদি পেয়ে যান—দেখবেন এক মাইল দু মাইল লম্বা যেন শোভাযাত্রা চলেছে। পাশ্‌-এর মধ্যে এই নতুন মোটরের রাস্তা আর ক্যারাভান রুট্‌—কখনো এক হয়ে যায়, আবার মোটরপথ হয়ত কোথাও আলাদা হয়ে একটু ঘুরে যায়।

মাঠের মধ্যে দু-একটা মাটির তৈরি কেল্লার মত দেখা যায়। একটা নদীর পুল আসে। পার হয়ে স্টেশন—কাচা গরুহি। পাহাড়ের শ্রেণী এগিয়ে এসেছে। যেন, ট্রেনের গতিরোধ করতে চায়। ট্রেনও সশব্দে তারই দিকে ছুটে চলে। সমতলভূমি এবার অসম হয়ে ক্রমে মাথা তুলতে থাকে। সম্মুখে পাহাড় জেগে ওঠে।

অদূরে একটা পাহাড়ের মাথায় দুর্গ দেখা যায়। বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, ওটা গ্রাম নাকি? প্রকাণ্ড তো! সহযাত্রী জানান, না,—ওটা জামরুদ ফোর্ট। ট্রেনটা ওর তলা দিয়ে যাবে। ঐ নামে ওখানে স্টেশনও। সেইখানে আমি নেমে যাব। ঐ ফোর্টের ইতিহাস জানেন নাকি? প্রায় একশো বছর আগে রণজিৎ সিং-এর আমলে শিখেরা যখন আফগানদের পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করে সেই সময় সর্দার হরি সিং-এর তৈরি ঐ দুর্গ। ১৮৩৭ সালে হরি সিং এখানে আফগানদের হাতে প্রাণও হারান।

ট্রেন চলে। তাকিয়ে থাকি পাহাড়ের মাথায় দুর্গের দিকে। মনে হয়, আমি যেন স্থির হয়ে বসে। সামনে ওগুলো পাহাড় নয়,—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, তারই মাথায় দোদুলহিল্লোলে এগিয়ে আসে যেন যুদ্ধসাজে এক রণতরী। আমার স্বপ্নের যেন রেশ টেনে সহযাত্রী বলেন, সামনে ঐ নদীটা আসছে—এইবার শুরু হবে ট্রাইবাল্‌ টেরিটরি,—আফ্রিদি এলাকা। এবার থেকে দেখতে পাবেন—

রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে কাঁটাতার—সীমানা-চিহ্ন স্তম্ভ। জামরুদ ছাড়াবার পর প্রকৃত পাশ্‌ শুরু হয়ে যায়। এই রেলপথ আর মোটরপথের নিরাপত্তার জন্যে বৃটিশরাজ আমাদের এক সর্দার—জামান খাঁ—তাঁকে ছমাস অন্তর তিন লক্ষ করে টাকা দেয়,—অন্য সব এখানকার সর্দারদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিতে। তাই তো এই সব পথ ফেলে দিয়ে রেল বা মোটর চলাচল সম্ভব হচ্ছে, রেলের লাইনও ঠিক আছে। তা ছাড়া, এই পথ সারাক্ষণ পাহারা দেবার দায়িত্ব ইংরেজরা আমাদেরই ওপর দিয়েছে—অবশ্য এর জন্যে টাকা দেয়। আমাদের বলা হয় খাস্‌সাদার। আমাদের অধিকাংশই আগে বৃটিশ সেনাবিভাগে ছিলাম। আমাদের সাহায্য না পেলে ইংরেজদের যত বড়ই সেনাদল বা অস্ত্রবল থাক্‌,—এ পথ নিরাপদ রাখার সাধ্যি নেই তাদের। কেন? তা বুঝতে পারবেন—পাশ্‌-এর মধ্যে ঢুকলেই,—চারপাশের পাহাড়ের ও পথের চেহারা দেখলেই,—এই নদী এসে গেল, ঐ দেখুন সব কাঁটাতার,—সীমানা-স্তম্ভও শুরু হোল—জামরুদ-এ এবার ঢুকছি,—লাইনের ধারে—মোটর-পথের পাশে—ঐ বিরাট একতলা চ্যাপ্টা-মাথা মাটির বাড়িটা নজর করছেন? ওটা ক্যারাভান সরাই—পান্থশালা—ক্যারাভানের—কাফিলাদের—রাত কাটানোর জায়গা—কতো লোকজন ঘুরছে, কতো উট বাঁধা রয়েছে—এ সব আপনাদের নতুন লাগছে নিশ্চয়?

স্টেশনে ট্রেন থামে। ভদ্রলোক নামবার আগে বলে যান,—আপনারা বিদেশী,—সাবধান করে দিই; লোকজন এবার থেকে কামরায় উঠবে, নামবে। একটু নজর রাখবেন। ট্রেনটাতে মাঝে মাঝে চুরি হয়।

বন্ধুর বাবা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের আর নেবে কি? সামান্য যা জিনিস সঙ্গে ছিল,—পেশোয়ারেই রেখে আসা হয়েছে।

সহযাত্রীর সতর্কবাণী আমার কিন্তু কানে বাজে।—এই বীরের জাত! তাদের রাজ্যেও চুরির উৎপাত! অথচ, এই তো ক'মাস আগে কেদারবদরীর তীর্থপথে কাটিয়ে এলাম। চারশো মাইলের উপর হাঁটাপথ। এক মাস ব্যাপী যাত্রা। দিনের পর দিন দরজাবিহীন চটিতে রাত কাটানো। সারি সারি যাত্রীর কম্বল-শয্যা পাতা। সবাই অচেনা, তবু মনে হয়, কতো চেনা। গাড়োয়ালবাসীর কাছে সবাই যাত্রী,—অতিথি। অচেনা মানুষের মধ্যে অজানা জায়গাতেও পরস্পরের মধ্যে কী অগাধ বিশ্বাস! চুরির ভয় কারও মনেও জাগে না, কেউ কোন কিছু ভুলে ফেলে গেলেও অপর কেউ স্পর্শও করে না।

জামরুদ ফোর্ট যেন রুক্ষমূর্তি নিয়ে তাকায়। ভাবি, ঠিকই তো, সেখানে তীর্থপথের শান্তি, এখানে যোদ্ধা জাতির অশান্তি। জামরুদ ফোর্ট প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু। পেশোয়ার থেকে মাইল আট দশ দূর।

জামরুদ ছেড়ে ট্রেন চলে। মোটরপথের সঙ্গে কাটাকাটি হয়। লেভেল ক্রসিং। পথের পাশে কয়েকটা উট দাঁড়িয়ে। পিঠে বোঝা। মুখের দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে উট-চালক। যেমন দাড়ি, তেমনি পাগড়ি, তেমনি ঝল্‌মলে পোশাক।

আরম্ভ হয় খাইবার পাশ্। পাহাড়ী নদী জাম নালার উপত্যকা ধরে ট্রেন চলে। মোটর ও ক্যারাভান পথও। চারপাশ থেকে পাহাড়গুলো যেন এগিয়ে এসে ধরতে চায়। এঁকেবেঁকে ট্রেন পালায়। পাহাড় ঘিরে ফেলে। নদীর ওপর পুল দিয়ে ট্রেন অপর পারে যায়। কোথাও গাছপালা দেখা যায় না। সব নেড়া পাহাড়। রুক্ষ শুষ্ক মরুপ্রায়। রসকষহীন, বিবর্ণ। হিমালয়ের সেই পরিচিত অরণ্যময় শ্যামল শোভার লেশমাত্র নেই,—যা দেখে চোখ জুড়ায়, মনে শান্তি আসে। এ যেন সর্বত্যাগী উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসীর দল। সিন্দুর-রাঙা ত্রিশূল তুলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তারই মধ্যে দিয়ে কোনমতে পথ করে ট্রেন চলে। এই কর্কশ নির্দয় রাজ্যে একমাত্র করুণার মূর্তি পাশের ঐ নদীর ধারা। তারই সমরেখায় রেলের লাইন পাতা। মোটর ও হাঁটাপথও।

সুমুখের পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। বাগ্ইয়ারি স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে আফ্রিদিরা ঘোরে। বুক ফুলিয়ে, মাথা তুলে, পিঠে রাইফেল বন্দুক নিয়ে। দুজন আমাদের কামরায় উঠে বসে। বিরাট লম্বাচওড়া চেহারা। বিশাল পাগড়ি। ট্রেন আবার চলতে থাকে। পাহাড়ের মাথায় দেখা যায় আর এক রেল স্টেশন। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে। ঐ ওখানে ট্রেন উঠবে নাকি? ঠিক তাই-ই। রেল লাইন নদীর সঙ্গ ছাড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে—একবার সামনে এগিয়ে, আবার উল্টোমুখে পিছন হটে খানিক পাহাড়ে ওঠে,—আবার এগিয়ে, আবার পেছিয়ে ক্রমশঃ উঠেই চলে পাহাড়ের গায়ে,—দেখতে দেখতে অনেকখানি। দার্জিলিঙ-এর তিন্ধরিয়া স্টেশনের নিকটে ছোট রেল লাইনের এই ধরনের reverses দেখা যায়। এখানে বড় রেল গাড়িকে ঐভাবেই তুলে নিয়ে চলে মাইলখানেকের ভিতর চার পাঁচশ' ফুট্। এ যেন পাহাড়ে ও রেল লাইনে মল্লযুদ্ধ। হাতি আর অজগর সাপের লড়াই। লোহার পাতের পাক দিয়ে পাহাড়কে বাঁধবার চেষ্টা।

ছোট্ট স্টেশন। চাঙাই নাম। সহযাত্রী দুজন নেমে যায়। নতুন জন তিনেক ওঠে। কেউ টিকিট কাটে বলে মনে হয় না। কাটবার কথাও হয় তো নয়। তাদের স্বাধীন মুলুক। ইংরেজদের যেন দয়া করেই রেল নিয়ে যেতে দেওয়া। খুশিমত ট্রেনে ওঠা-নামা,—এ অধিকার তো থাকবেই।

ট্রেন ছাড়ে। বহু নীচে দেখা যায় নদীর শীর্ণ কায়। বালুচরে সুনীল সর্পিল রেখা। পাহাড়ের গায়ে রেলের লাইন যেন স্লেটের বুকে হিজিবিজি লেখা।

খাইবার পাশ্-এ ঢোকার কিছু পরেই মাঝে মাঝে টানেল-এর ভিতর দিয়ে ট্রেনকে চলতে হয়। বেশ লাগে দেখতে। এই দেখছি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে,—চারিদিক সূর্যালোকে ঝলমল্ করছে, নীচে ঐ নদীর আঁকা-বাঁকা রেখা,—ওপারে ঐ একটা গিরিচূড়ার ত্রিকোণ আকৃতি,—ঐ দেখা যায় কালো কালো শিলাস্তূপ—যেন কোন্ প্রাচীন যুগের কঙ্কাল,—ঐ ওধার দিয়ে চলে কাবুল-

সড়ক,—সারি সারি উটের দল—লোমভরা দেহে সোনালী আভা। লম্বা মাথা ও ঘাড় দুলিয়ে কদম কদম চলে। পিঠে কারও বোঝার ভার। কারও বা সওয়ারী। কালো বোরকা-ঢাকা জানানা-যাত্রী। পাশে হাঁটে দীর্ঘদেহী পুরুষ। কাঁধে রাইফেল, বন্দুক। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। যেন যুগ থেকে যুগান্তরে। যেমন, নদীর ধারা যায় বয়ে, স্বরূপ থাকে একই। ছবির বই-এ দেখা চিরন্তন মরুযাত্রীর দল। এখন বই-এর পাতা ছেড়ে জীবন্ত হয়ে প্রকৃতই চলতে দেখি চোখের সামনে।

হঠাৎ ঘোর অন্ধকার। কে যেন দু চোখ চেপে ধরে। সব কিছু হারিয়ে যায়। কামরার ভিতর টিম্‌টিমে আলো ওঠে জ্বলে। যেন নিষুতি রাতে প্রদীপ হাতে কে যেন বলে,—এই তো আছি। টানেলে ট্রেন। ঘড়ঘড় গম্‌গম্‌ গম্ভীর আওয়াজ। কিছুক্ষণ। তারপর ক্ষীণ আলোর ইঙ্গিত। হঠাৎ আবার দিনের আলোয় ভরে ওঠে কামরা। বাইরেও সূর্যের সেই আলো। চারদিকে পাহাড়ের শ্রেণীও। কিন্তু পটের পরিবর্তন। হয়ত, নতুন পাহাড়, কিংবা পুরানো পাহাড়ের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নবতর রূপ। সে নদীও হয়ত কখনো হারিয়ে যায়। নবীন সাথী আর এক নদী এগিয়ে আসে। কাবুলের পথও হয়ত কোন্‌ পাহাড়ের পিছনে লুকায়। আবার আসে টানেল। আবার হয়ত দৃশ্যান্তর। এ যেন, চোখের সামনে পর্দার উপর নতুন নতুন স্লাইড্‌-এ ছায়াচিত্র দেখা।

এইভাবে আসা হয় সাগাই স্টেশনে। ২৬৮৮ ফুট উঁচুতে। পাহাড়ের উপর অধিত্যকা। নিকটেই নদী। আবার এক দুর্গ। দু-চারজন যাত্রীদের আবার ওঠা-নামা। জামরুদ্‌ থেকে দশ মাইল এসে এতক্ষণে রেলপথে, মোটরাস্তার ও ক্যারাভান্‌ রুট-এর আবার কাটাকাটি,—'লেভেল ক্রসিং'।

এইবার তিন রাস্তা পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে একই সমরেখায় নদী ধরে এগিয়ে যায়। কিন্তু কিছু পরেই নির্দয় পাহাড় কঠোর রূপ ধরে আবির্ভূত হয়। একটা বাঁক ঘুরতেই চুনাপাথরের অতি সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট—খাইবারের ভয়াবহ প্রসিদ্ধ গর্জ—gorge। আলি মসজিদ স্টেশন। প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঁচু। কেল্লার মত কয়েকটা ঘর। বড় একটা দুর্গ তো আছেই। অপর দিকে খাড়া পাহাড়ের পিছনে আরও উঁচু পাহাড়ের মাথা উঁকি মারে—৬৪০০ ফুট উঁচু টার্‌টারা শিখর। মাথায় তার তুষারপ্রলেপ। দেখেই যেন আরও শীত বোধ হয়।

পাহাড়ের গা কেটে ট্রেন লাইন নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। নীচে নদী,—দুপাশে খাড়া পাহাড়। দুদিক থেকে দুরন্ত পাহাড় কাছাকাছি এগিয়ে এসে মাথা ঠোকাঠুকির চেষ্টা করে। অসহায় পথগুলিকে যেন গলা টিপে ধরতে চায়। এইখানে স্পষ্ট প্রকট হয়ে ওঠে খাইবার পাশ্‌-এর দুর্ধর্ষ, দুর্গম, হিংস্র রূপ। পাহাড়ের গায়ে, মাথায় বিস্ফোটকের মত ট্রাইবালদের গুমটিঘর। কালো কালো ছোট ফোকর। কট্‌মট্‌ করে যেন তাকায়। সেই ঘরে বসে বা পাহাড়ের গায়ে কোন পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে কয়েকজন মাত্র অব্যর্থলক্ষ্য অস্ত্রধারী

ট্রাইবাল্ এই সংকীর্ণ পথে যাতায়াত বন্ধ করে দিতে পারে। নিচের পথ দিয়ে তাদের হাতের অস্ত্রের গুলি এড়িয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে, চলে যায় সাধ্য কার, যদি এই ট্রাইবাল্‌রা ক্ষেপে ওঠে।

খাড়া পাহাড়ের গলা ধরে ঝুলতে ঝুলতে মোটরপথ কোনক্রমে এগিয়ে চলে। ট্রেনপথের সে-ক্ষমতা থাকে না। কেবলি পাহাড় ফুঁড়ে টানেলের পর টানেল আসে। হঠাৎ এক-একবার 'গর্জ'-এর ভীষণ রূপ দেখা যায়।

অবশেষে ট্রেন হাঁফ ছাড়ে পর্বতের অধিত্যকায় পেঁছে। দুপাশের পাহাড় কিছু দূরে সরে দাঁড়ায়। জিন্‌তারা গ্রাম আসে। দুর্গের মত বাড়ি ঘর দেখা দেয়। আবার বন্দুকধারী আফ্রিদিদের ঘোরাঘুরি। ভয়াবহ পথ পেরিয়ে এসে আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

অনেকখানি সমতলে এগিয়ে ল্যাণ্ডিকোটালে ট্রেন হাজির হয় বেলা সাড়ে এগারোটায়। ল্যাণ্ডিকোটাল সাড়ে তিন হাজার ফুট-এরও বেশি উঁচুতে। খাটজাই শৈলশিরার কাঁধের উপর। পাশেই ইংরেজদের সেনানিবাস। বড় দুর্গও। স্টেশনও, মনে হয়, একটা ভাঙা পুরানো দুর্গের মধ্যে। এই ট্রেনই আবার পৌনে দুটোয় ফিরে যাবে। পেশোয়ার পেঁছুবে বেলা পাঁচটায়। হাতে দু ঘণ্টা এখন সময়। পরামর্শ হয়, আফগান-সীমান্তের দিকে খানিক হেঁটে গেলে কেমন হয়? স্টেশনের বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেই মিলিটারী পুলিসের আবির্ভাব। হুকুম হয়, স্টেশন-এলাকার বাইরে যেন না যাই। ল্যাণ্ডিখানা যাওয়ার অনুমতি? অসম্ভব। কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। নিষিদ্ধ এলাকা।

অগত্যা প্ল্যাটফর্মেই পায়চারি করি। অল্প পরে পুলিসের চেহারা কোথাও দেখি না। সেই সুযোগে আমরাও বেরিয়ে পড়ি বাইরে। উঁচু-নীচু বিবর্ণ প্রান্তর। কয়েকটা বাড়িঘর। কাঁটাতারের বেড়া। ওদিকে সেনাছাউনি। রাস্তা দিয়ে খানিক যেতেই কোট-প্যান্ট-পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বাঙালী ধরনে ধুতিকোপড় পরা আমরা। তাই দেখে থমকে দাঁড়ান। এগিয়ে এসে কথা শুরু করেন বাঙলা ভাষায়। অপরিচিতের মুখে, এই বিদেশে, বাঙলা কথা—কী মধুরই না শোনায়। কথাও বলেন যেন কতো দীর্ঘ দিনের পরিচয়, হঠাৎ অনেক কাল পরে দেখা। বলেন, চলুন আগে শশীবাবুর বাড়িতে। ল্যাণ্ডিখানা দেখবার ব্যবস্থা একমাত্র তাঁকে দিয়েই হতে পারে। শশীভূষণ দাস,—এঞ্জিনীয়ার। সরকারী কাজে এখানে আছেন। নিকটেই কোয়ার্টার্স। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। সকালেই কাজে বেরিয়ে গেছেন। ঐদিকেই এখন তাঁর কাজ চলেছে। ট্রলি করে অনায়াসে ঘুরিয়ে আনতে পারতেন। আজ রাতে যদি থাকি, কাল ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, থাকার উপায় নেই। আজ বিকেলে পেশোয়ারে ফিরে সন্ধ্যার ট্রেনে লাহোর রওনা হবার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। বন্ধুর বাবার কর্ম-ক্ষেত্রের ছুটি শিরে সংক্রান্তি।

বাড়িতে শশীবাবু নেই বটে, কিন্তু অন্দরমহলে মেয়েরা রয়েছেন। এরই মধ্যে সেখানে সাড়া পড়ে যায়। চা-বিস্কুট আসে। ভাত না খেয়ে ফেরা চলবে না, অন্তরাল থেকে তার হুকুমজারিও হয়।

কথা থাকে, খানিক ঘুরে এসে আহারান্তে ট্রেন ধরা হবে।

আরও দুজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে এইখানেই আলাপ। তাঁরাও এখানে কাজ করেন। ওভারসিয়ার।

দল বেঁধে হেঁটেই ল্যাণ্ডিখানার দিকে রওনা হই—যেটুকু যাওয়া যায়। ক্যারাভান্ রুট ধরে এগোনো। পাশেই এক ক্যারাভান্-সরাই। বিচিত্র সাজে কতো লোকজন ভেতরে ঘোরে।

পথ নেমে যায় এবার হুড়হুড় করে। পাহাড়ের গা বেয়ে। ট্রেনের লাইন পাতা। কিন্তু ট্রেন চলে না। এখানেও শুনি রেলপথে বহু টানেল। তার কারণ, পাহাড়ের এই কাঁধ থেকে পথ নেমে গেছে একটা পাহাড়ী নদীর যেন জটা ধরে। এখানেও সঙ্কীর্ণ গিরিখাত। তারই ধার দিয়ে পথ। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসে ঝরণার পর ঝরণা। মাইল খানেক যাবার পর মিছানি কাণ্ডা! দুদিকের পাহাড় একটু সরে গিয়ে খানিক খোলা জায়গা দেয়,—সমুখে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়,—গিরিখাত আরও নেমে গেছে—বহু নীচে—মাইল তিন-চার দূরে ল্যাণ্ডিখানা। ২,৫০০ ফুট উঁচুতে।

স্থানীয় বাঙালী সঙ্গীরা সেই দিকে একটা পাহাড় দেখিয়ে বলেন, ঐখানে ভারত-সীমান্ত। আফগানিস্তান শুরু। এই উপত্যকা চলে যায় ডাক্কা, জালালাবাদ, কাবুলের দিকে।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি, ভারতের এ কোন্ সুদূর প্রান্তে আজি দাঁড়িয়ে আছি!

শশীবাবুর বাড়িতে ফিরে বাঙালীর ভাত-ডাল তৈরি পাই। শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি নয়, এই দূর প্রবাসে আপন ঘরের আদর-যত্ন ঘরছাড়া মনকে বিমুগ্ধ করে।

দেখি, ভ্রাম্যমাণের জীবনেও সংসারের আনন্দ-ভালবাসা দেশ-বিদেশে পথের পাশেও বাসা বাঁধে।

নতুন-গড়া চণ্ডীগড়ে

আরিফদি মল্লুককে যাই ১৯২৮ সালে। সিমলা পাহাড় থেকে নেমে কালকার ট্রেন ধরি। আম্বালার পথে সে-ট্রেন হয়ত সেদিন ছোট্ট একটা স্টেশন পার হয়ে আসে,—নাম চন্ডীগড়। সে-নাম তখন নজরে পড়ে নি, পড়ার কোন কারণও ছিল না। সে-সময়ে তাই ভাবতেও পারি নি, সেই অখ্যাতনামা চন্ডীগড়ই স্বাধীন ভারতে পাঞ্জাবের প্রধান শহর হয়ে উঠবে, কালচক্রে দু-তিন বছর আমারও শীতকালীন নিভৃতবাসের সাময়িক আশ্রয় হবে।

আমার কাছে এ-স্থানটির আকর্ষণের কারণ থাকে। হিমালয়ের পাদদেশে শান্তসুন্দর পরিবেশ। হৃষীকেশের মতন এখানেও যেন গিরিরাজের রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে অপেক্ষায় থাকা,—কখন প্রাসাদের তোরণ উন্মুক্ত হয়, তুষার-আবরণ-মুক্ত হয়, হিমালয় আবার তাঁর কাছে যেতে ডাক দেন। সেই নতুন-গড়া চন্ডীগড়ের কিছু গল্প শোনাই।

এখানে, তক্ষশিলার মত, ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে ভারতের প্রচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাসের আবিষ্কার নয়। নবযুগে জাগ্রত স্বাধীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা নূতন সৃষ্টির মাঝে ফুটে উঠতে চায়। প্রথমে যে-বছর আসি, শহর তখনও সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি।

চন্ডীগড়ের সাবেক কালের ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রাম অদূরে একপাশে আত্মগোপন করে থাকে। দীনহীন ছিন্নবাস আদিবাসী গ্রাম্য বালিকার মতন। রাজবেশী পরদেশীর হঠাৎ সামনে পড়ে ভীতচকিত-চরণে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা। নতুন শহর পুরাতন নামের তিলকটুকু কপালে এঁকে রাজসিংহাসন পেতে জমকে বসার আয়োজন করে।

বনজঙ্গল-ভরা অসমতল বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখন তার আর সেই পূর্ব-পরিচয় নেই। চারিদিকে সমরেখায় টানা দীর্ঘ রাজপথ। এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের মিলন ঘটায়। তারই মাঝে মাঝে শহরের এক-একটি পল্লী। প্রতি পল্লীর নিজস্ব দোকানপাট বাজার, জল সরবরাহের ব্যবস্থা। বড় রাস্তা থেকে পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করার ছোট ছোট সুন্দর পীচ্ ঢালা পথ—যেন, দেহের শিরা-উপশিরা। কিন্তু, কোন পথই আঁকাবাঁকা নয়। সমান্তরাল রেখায় বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকে। মনে হয়, ছুরি দিয়ে নিখুঁতভাবে বরফি কাটা। জ্যামিতির প্রথায় আঁকা সমভাগে ভাগ করা বৃত্তাকার শহর। প্রতি পল্লীরও তাই বোধ করি নামকরণও 'সেক্টার',—বৃত্তকলা। নাম নয়,—সংখ্যা; সেক্টার ১, ২, ৩ ... ৮, ৯, ১০ ইত্যাদি।

বিভিন্ন সেক্টারের মধ্যে সাজানো সারি সারি বাড়ি। গায়ে গা ঠেকিয়ে অভদ্রের মতন ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। শ্রেণীবদ্ধ, সুশৃঙ্খল। প্রতি গৃহের

স্বতন্ত্র মুক্ত আঙ্গিনা। নতুন সাজানো বাগান। যেন, কুচকাওয়াজের জন্যে সাজসজ্জা করে দাঁড়িয়ে সৈনিকদল। বিযুক্ত, তবু সবাই মিলে এক। বাড়িগুলির চেহারাও প্রায় একই ধরন। ভাল করে চেনা না থাকলে বাড়ি ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। এ যেন মর্জিনার সেই চিকে চিহ্ন আঁকার আরব্য কাহিনীর পরিবেশ।

সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া জাতির জীবনে শ্রেণী-বিভাগ তুলে দেওয়ার আদর্শবাদ আছে, কিন্তু নতুন শ্রেণীভেদ নতুন আকারে আবার জাগে। সেক্টারে সেক্টারে তাই মর্যাদার তারতম্যও থাকে। কোন্ সেক্টারে কার বসবাস, শুনলেই ধরা যায়—গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে তার পদমর্যাদা কতোখানি উঁচু।

ছিমছাম অতি পরিচ্ছন্ন শহর। ছবির মতন।

আধুনিক কালের ফ্যাশান অনুযায়ী তৈরি। উপদেষ্টা,—জগৎপ্রসিদ্ধ ফরাসী আর্কিটেক্ট—Le Corbusier।

অতএব, অভিনব গঠনপদ্ধতিও। সরকারী ঘরবাড়ির—হাইকোর্ট,—সেক্রিটেরিয়ট্ প্রভৃতির আকৃতি অদ্ভুত। বিরাট অট্টালিকা, কিন্তু কোনটা বা দেখায় যেন ডক্-এ দাঁড়িয়ে বিশাল জাহাজ।

সুপ্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে সারি সারি বাড়ি। পাঁচিল-ঘেরা এলাকা। বড় রাস্তার উপর বাড়ি, কিন্তু রাস্তা থেকে প্রবেশপথ নেই। যেন সব বাড়ি অভিমান করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। বড় রাস্তার দিকে বাড়ির 'কিচেন্ গার্ডেন'। বাড়িতে ঢুকতে হয়, বড় রাস্তা থেকে সেক্টরের ছোট রাস্তা ধরে। সেইদিকে বাড়ির সুমুখ দিক, ফুলের বাগান, গেট্। ফলে, অনেক সময় বড় রাস্তায় বাড়ির কাছে পেঁাছেও আপন এলাকায় যেতে ঘুরে আসতে হয় অনেকখানি। একেই বলে মাথার পিছন দিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাক ধরা!

প্রতিবেশী এক সরকারী ইঞ্জিনিয়ারকে এই বিচিত্র প্ল্যানের কারণ জিজ্ঞাসা করি। শুনি, প্রশস্ত রাজপথ অবারিত যান চলাচলের জন্যেই তৈরি। প্রতি বাড়ির প্রবেশ পথ ঐদিকে থাকলে বাড়ির মধ্যে গাড়ি ঢোকা, বেরুনো, গেটের সামনে অপেক্ষমান মোটরের ভিড়,—বড় রাস্তায় গাড়ি যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করবে।

অভিনব হলেও যুক্তির প্রবলতা স্বীকার করতেই হয়।

ইটের তৈরি বাড়ি নয়। পাহাড়ে জায়গা, তাই পাথুরে বাড়িও। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে গাঁথনি, পাথরে পাথরে সংযোগ রাখে সিমেণ্ট ও চুনের পলস্তরা। পাথরগুলি ঘষে সমান-করা মসৃণ নয়। গা-গুলা এবড়োখেবড়ো, অসমান। কালচে বা পাঁশুটে রঙ। সিমেণ্টের জোড়গুলির সাদা বা গেরুয়া বরণ। পাথরের গায়ে জোড়-দেওয়ার সেই আঁকাবাঁকা রেখাগুলি দেখায় যেন বাড়ির দেওয়ালে নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা বিচিত্র রেখাচিত্র। মনোহর অঙ্গশোভা।

কিন্তু এখানেও আলোর পিছনে ছায়া থাকে।

ঘরগুলিতে হাল ফ্যাশনে প্রকাণ্ড কাঁচের জানলা। কোথাও গরাদ নেই।

ঘরগুলি আলো-বাতাসে ভরে থাকে। আব্রু রক্ষার জন্যে পর্দা ঝোলে। কিন্তু এক তলায় রাত্রে শুধু কাঁচের জানলায় ঘর বন্ধ রেখে এদেশে গৃহবাসী স্বস্তি বোধ করে না। দু-একটা চুরিরও অভিযোগ আসে।

শুনি, এ বিষয়ে বিদেশী আর্কিটেক্ট-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি নাকি শুনে মন্তব্য করেন, আরামে থাকবার জন্যেই ঘর তৈরির ব্যবস্থা। সেইমত প্ল্যানের পরামর্শ দেওয়াই আমার কাজ, দিয়েছিও তাই। নিরাপত্তা রক্ষা? সে তো গভর্ণমেন্টের করণীয়!

দোতলার ঘরে থাকি। দুপাশে কাঁচের জানলা,—দেওয়াল জুড়ে। সারাক্ষণই দূরে হিমালয় গিরিশ্রেণীর শোভা উপভোগ করি। শীতের দিন। রৌদ্রের তপ্ত মধুর প্রলেপ। সারা ঘরখানি মধুময় করে রাখে। পাশেই খোলা ছাদ। মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়াই। দূর দিগন্তে অবারিত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের গায়েই স্নানাগার। পাশেই ঢাকা-দেওয়া সুন্দর বারান্দা। পরম আনন্দে দিন কাটে। বাড়ির প্ল্যানের সুখ্যাতি করি।

পশ্চিমে শীতের দুরন্ত হাওয়া ছোটে। ঘরের ভিতর এসে বসি।

তখন নজর পড়ে, ঘরের দরজাগুলির নীচে চৌকাঠ নেই। মেঝে থেকে দু-তিন আঙুল ফাঁক। ভাবি, এই হয়ত আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রীতি।

কিন্তু, এদেশে সেই ফাঁক দিয়েই হু-হু করে বাতাস ঢোকে। যেন, কোন্ দৈত্য ওদিকে ছাদে উপুড় হয়ে শুয়ে সজোর ফুৎকার চালায়। শুধু তাই নয়। যত রাজ্যের ধুলোবালিও উড়ে আসে সারাদিন ধরে। দরজা বন্ধ রেখেও ঘরের ভিতর পরিষ্কার রাখা অসম্ভব। ঝাঁট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ধুলোবালিতে ছেয়ে যায়। ঐ সামান্য ছিদ্রপথের সুযোগ নিয়ে কতো অযাচিত অতিথির অনুপ্রবেশও ঘটে। বসে বসে তাও দেখি। সন্ধ্যাবেলা। আলো জ্বালিয়ে নিশ্চিন্তমনে ঘরে আরামে বসে। কন্‌কনে শীত। দরজা-জানলা বন্ধ। দরজায় নীচের সেই ফাঁকটুকু যেন শনির রন্ধ্র। সারি বেঁধে ঢোকে কীটপতঙ্গ। কতো বিভিন্ন আকার, বিচিত্র বর্ণ! ভাবি, সুন্দর ফুলের মধ্যে তো কীটের বাস!

ঘরের জিনিসপত্র শয্যা কীটপতঙ্গ ছেয়ে ফেলে।

মনে পড়ে, কৈলাস-মানসসরোবরের পথের কথা। তাঁবুর মধ্যে বাস। তিব্বতী খাম্পারা আসে, সভ্য জগতের অদ্ভুত মানুষ দেখার কৌতূহলে। অপরূপ তাদের বেশভূষা। নিঃসঙ্কোচে তাঁবুর মধ্যে ঢোকে। আমাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র তাঁবুর মধ্যে ছড়ানো। আপন খুশিমত এটা ওটা টানে, হাতে নেয়, অবাক হয়ে দেখে, পরস্পরে দুর্বোধ্য ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করে, ঝোলায় পুরতে যায়। সঙ্গী অনুভবানন্দ স্বামীজী অভিজ্ঞ ব্যক্তি। হাসি-মুখে ভাঙা ভাঙা তিব্বতী ভাষায় তাদের কি বলেন, হাত ধরে তাঁবুর বাইরে কোন রকমে ভুলিয়ে নিয়ে যান।

কিন্তু, পোকামাকড়ের ভাষা আমার অজানা। এদেশে তাদের এই অশোভন আচরণের কথা নিশ্চয় বিজ্ঞ corbusier-এরও জানা থাকে না।

কিন্তু, এ তো গেল বাড়ি-তৈরির ফ্যাশনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে অবোধ পোকা-মাকড়ের দল বেঁধে ঘরে ঢোকা। এই বাড়িতেই এক সুচতুর মানুষও কি ভাবে সপরিবারে প্রবেশ করে কিছুকাল কাটিয়ে যায়, পোকাগুলিকে দেখে সেই ঘটনা মনে আসে।

সরকারী কোন কাজে মাঝে মাঝে বড়দাদাকে চণ্ডীগড়ে যাতায়াত করতে হয়। সেই সূত্রেই এই বাড়ির ব্যবস্থা রাখা। একবার তখন এখানে কেউ নেই। পাঞ্জাবী এক কর্মচারী তত্ত্বাবধানে বাড়িটা রয়েছে। দোতলার ঘরগুলি চাবিবন্ধ। এক-তলার ঘর খোলা আছে। হঠাৎ একদিন 'ফট্‌ফটিয়া' ট্যাক্সি চড়ে এক ভদ্রবেশী ব্যক্তি এসে হাজির। সুশ্রী চেহারা। ফিট্‌ফাট বেশভূষা। সঙ্গে সাজগোজ করা এক মহিলা, বছর বারো বয়সের একটি মেয়েও। কর্মচারীর কাছে বড়দার সংবাদ নেন। এখানে নেই শুনে বলেন, তাই তো! আমার নাম অরুণ বোনার্জি। তাঁর ভাইপো হই। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি। আগে খবর দিতে পারি নি। এদের নিয়ে এখন উঠি কোথায়? ওপরের ঘর খোলা নেই? তা না থাক্, নীচের এই ঘরটাতেই আজকের মত চলে যাবে। কাল না হয় হোটেলে গিয়ে উঠব। এখানে হোটেল আছে তো?

কর্মচারী উভয় সংকটে পড়ে। অচেনা লোক। বড়দাদাও কিছু বলে যান নি। বাড়িতে কি করে থাকতে দেওয়া চলে? আবার তখনি মনে হয়, কি জানি, সত্যিই যদি আত্মীয় হয়! এমন চেহারা, বেশভূষা, কথাবার্তা! হওয়াই তো সম্ভব। হঠাৎ এসে পড়েছে খবর না দিয়ে। ঘরও খালি রয়েছে। তবু, থাকতে দিলাম না, সাহেব এসে শুনলে রাগ করারই কথা।

দোমনা হয়ে অগত্যা সেই রাত্রির জন্য থাকতে দিতে রাজী হয়। মালপত্র নামিয়ে নীচের ঘর তারা দখল করে। তারপর, যা ঘটবার তাই ঘটে। একদিনের জায়গায় দিনের পর দিন কাটে। চলে যাবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তাগাদা দিলে বলে, আসছে কাল যাবার ঠিক করছি। কলকাতার কোন খবর নেই তো? তবে আর ভাবনা কী?

সারাদিন তারা কী করে, কোথায় যায়,—কিছুই বোঝা যায় না। বাড়িতে বেশীক্ষণ কাটায় না। রান্নারও কোন আয়োজন করে না। করার মধ্যে টেলিফোন করে হরদমই। কোথায়, কে জানে!

অবশেষে বড়দাদার আসবার খবর আসে। তাঁর পেঁছানোর আগের দিন তারা ঘর ছাড়ে।

বড়দাদা এসে খবরটা শোনেন। নাম শুনে আশ্চর্য হন। ও-নামে আমাদের কেউ আত্মীয়-স্বজন নেই। কে এসে থেকে গেল এইভাবে? করছিলই বা কি

এখানে কদিন ?

প্রশ্নটার কিছু উত্তর পাওয়া যায় সেইদিনই বিকালবেলা। লেকের ধারে বড়দাদা বেড়াতে গেছেন। শহরের হোমরা-চোমরা অনেকেই এখানে সান্ধ্যভ্রমণে আসেন। কেউ মিনিস্টার, কেউ জজ্, কেউ বড় অফিসার। একে একে দেখা হয় বড়দাদার সঙ্গে। সবারই মুখে একই কথা,—এই যে! কবে এলেন? আজ সকালে? এখন থাকবেন কিছুদিন? ভাল কথা, আপনার 'নেফিউ'-এর সঙ্গে আলাপ হলো। বৌটি সুন্দর গান গায়, মেয়েটিও নাচে ভাল।

বড়দা হেসে তাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানান, কোথাকার কে? চিনিও না। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে চড়াও হয়েছিল বাড়িতে, আমি আজ আসছি শুনে কালই পালিয়েছে।

তাঁরা শুনে তখন হেসে ফেলেন, মন্তব্য করেন, তাই বলুন। ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হলো, আপনার বাড়িতে শুধু থেকেছে, আর আমাদের বাড়িতে গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছে!

তখন প্রকাশ পেল, প্রতিদিন তারা মিথ্যে পরিচয় দিয়ে টেলিফোন করে যেচে নিমন্ত্রণ নিয়েছে এক-একজনের বাড়িতে,—নাচ দেখাবে, গান শোনাবে বলে,—এমন কি গভর্ণমেণ্ট হাউস্-এ পর্যন্ত!

দিন চারেক পরে আরও খবর আসে। লোকটা নাকি এখান থেকে গিয়ে হোটেলে ওঠে। তারপর টাকা না দিয়ে কোথাও উধাও হয়েছে। পুলিসে খোঁজ করছে। বহু নামে তার পরিচয়। ওয়ারেন্টও ঝুলছে তার নামে কিছুকাল থেকেই। পুলিস কোনমতেই ধরতে পারছে না।

যে বাড়িতে আছি, তার নিকটেই চণ্ডীগড়ের লেক্। প্রাকৃতিক হ্রদ নয়। পাহাড়তলির নিম্নভূমি। পাহাড়ী নদীর জলধারা বয়ে যাবার পথ। সেই গতিপথ রুদ্ধ করে, আশপাশের ভূমি কেটে, বর্ষার জল জমিয়ে বিরাট জলাশয়। লম্বায় এক মাইলের কম নয়। পাথর দিয়ে বাঁধানো চারিধার। হ্রদ ঘিরে সুন্দর রাস্তা। বাঁধানো ফুটপাত। যানবাহন চলাচলের প্রশস্ত পথও। পথের ধারে বাগান। মৎসুমী ফুলের রঙের বাহার। হ্রদ ও রাস্তা তৈরির সব কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। বর্ষায় ধরে রাখা লাল মাটিগোলা জল। তাই ঘোলাটে রঙ। যেন, গৈরিক বসনে ঢাকা। অপর পারে ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। তারও পিছনে দূরে বিশাল হিমালয়ের গিরিপ্রাচীর। আকাশচুম্বী। দিগন্তবিস্তৃত।

ওপারে ছোট পাহাড়ের পায়ের কাছে গ্রাম। যেন, নিশ্চিন্ত আরামে মুখ গুঁজে প্রভুর পায়ের নিকটে শুয়ে পোষা কুকুরের ছানা। গ্রামের পিছনে টিলার উপর একটিমাত্র বাড়ি। সাদা ধব্‌ধবে রঙ। দিনের বেলায় রোদ লেগে আরও উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখায়। বহু দূর থেকেও ওদিকে তাকালেই বাড়িখানি সর্ব-প্রথম চোখে পড়ে। সমুদ্রতীরে আলোকস্তম্ভে যেন দীপ জ্বলে। আমার ঘর

থেকেও সারাক্ষণই বাড়িটি দেখতে পাই। রোজই ভাবি, চমৎকার বাড়ি। গৃহস্বামীর রুচিবোধের প্রশংসা করি।

*   *   *   *

একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে লেক ঘুরে সেই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলি। হ্রদের অপর দিক থেকে বোঝাই যায় নি, পাহাড় দেখতে নিকটে হলেও কতো দূরে। মাঝখানে বিস্তীর্ণ ক্ষেতের জমি। মনে হয়েছিল, ঐ তো পাহাড়, এই তো গ্রাম। এখনি পৌঁছে যাব। কিন্তু, মাঠ ক্ষেত পেরিয়ে পৌঁছুতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। সূর্য তখন পাটে নামেন। ভাবি, আজ আর পাহাড়ে ওঠা নয়, আর একদিন বেলাবেলি এসে উপরে ঘোরা যাবে। ফিরে চলি। মাঝপথে ক্ষেতের ধারে এক বৃদ্ধ গোছের লোক আসেন। খালি পা, ধূলো মাখা। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা। গায়ে মাথায় চাদর জড়ানো। দেখে ভাবি, ক্ষেতের কাজ সেরে গ্রামের কৃষক ঘরে ফেরে। বিদেশী লোক দেখে দাঁড়ায়। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসছি, হঠাৎ এদিকে আসার কারণ কি? জানাই, কোনই প্রয়োজন নেই। এমনি ঘুরতে ঘুরতে চলে আসা। পাহাড়টার ওপর ওঠবার ইচ্ছে ছিল। বেলা পড়ে গেছে, আজ আর তাই হোলো না, আবার একদিন আসা যাবে।

শুনে খুশী হয়। সাগ্রহে আমন্ত্রণ করে তাদের গ্রাম দেখে যাবার জন্যে। বলে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে ঘুরিয়ে আনব।

সোজা চলে আসবেন আমার বাড়িতে। ঐ তো আমার ঘর।

আঙুল দিয়ে দেখায়, পাহাড়ের গায়ে সেই অতি পরিচিত গৃহখানি।

বিস্ময়ে ও আনন্দে মন ভরে ওঠে। বলি, আপনারই বাড়ি ওটা? শহরে আমার ঘর থেকে রোজই চেয়ে চেয়ে দেখি, আর ভাবি, কি সুন্দর জায়গায় বাড়িটা!

শুনে তিনিও খুশী হন। বলেন, ছোট বাড়ি, এমন কিছু নয়।

প্রশ্ন করি, মাঠের মধ্যে দিয়ে আসছেন কোত্থেকে?

তখন জানতে পারি, এ অঞ্চলের অনেক জমি তাঁরই। এখন ক্ষেতে কাজ চলেছে। আখ কাটা হচ্ছে। লোকজন খাটছে। তারই দেখাশুনা করছিলেন।

চেহারা দেখে বেশ বুঝতে পারি, শুধু তদারক করাই নয়, নিজের হাতেও কাজকর্ম করেন। অথচ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। বেশভূষা দেখে বোঝবার উপায় নেই!

নিশ্চয় যেন একদিন তাঁর 'গরিবখানা'য় আসি, বার বার বলেন।

কয়দিন পরে চলেও আসি। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেই।

দেখে আনন্দিত হন। সাদর স্বাগত জানান। জিজ্ঞাসা করেন, বাড়িতেই বসবেন? না, আগে ঘুরে এসে তারপর বসা যাবে?

দুখানা লম্বা লাঠি আনেন। বলেন, পাহাড়ে ওঠানামা করতে হাতে রাখা ভাল।

জানাই, পাহাড়ী পথে চলতে আমারও তাই অভ্যেস।

দুজনে তখনি রওনা হই। ছোট ছোট পাহাড়। উঠতে সময় লাগে না, শ্রান্তি বোধও হয় না। চারিপাশে রাশীকৃত শিলাস্তূপ। কঠোর শুষ্ক, রুক্ষ রূপ। মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের ঝোপ। পাহাড়ী সরু পথ। উঁচু নীচু। কখনও ওঠা, কখনও নামা। পাহাড় হিসাবে কিছুই নয়। দূর থেকেই উঁচু দেখায়। তবু, সেই ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট হিমালয়ের আভাস মনে আনে। মনের গোপনে হিমালয়ে পথ চলার সুপ্ত আনন্দ যেন ঘুমঘোরে চোখ মেলে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেড়ানো শেষ হয়। চক্রাকারে ঘুরে এসে আবার তাঁর বাড়িতে পৌঁছুই। নীচে খান দুই-তিন ঘর। বারান্দা। বারান্দার কোণে সিঁড়ি। উপরে ছাদ। তারই একধারে বড় একখানি ঘর। চারদিকেই জানালা। একপাশে খাটিয়া পাতা। আর একদিকে টেবিল, দুখানা চেয়ার। ঘরে ঢুকেই জানালাগুলি খুলে দেন। বন্ধ চোখের পাতা যেন খুলে যায়। বাইরে চারিদিকের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনদিকে উঁচু-নীচু পাহাড়। সুমুখে নীচে গ্রামের ঘরবাড়ি। একপ্রান্তে দীঘি। বাঁধানো ঘাট। পাড়ে কয়েকটি বড় গাছের জটলা। তারপরই বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেতের স্নিগ্ধ প্রলেপ। মাঝে মাঝে পাকা আখের সোনালী আভা। আরও দূরে চণ্ডীগড়ের সেই বিশাল হ্রদ। ঘোলাটে জলে রোদ পড়ে। সেও যেন গলা সোনা। হ্রদের অপর পারে শহরের ঘর বাড়ি। যেন সেনাদলের বিরাট শিবির।

চারিদিক নীরব, নিস্পন্দ। যেন, পটে আঁকা ছবি। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

গৃহস্বামী টেবিলের উপর দোয়াত কলম ও কাগজ এনে রাখেন।

ভাবি, কাজে বসবেন নাকি? অথবা, হয়ত আমার নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য। এখনও তো পরস্পরের পরিচয় দেওয়া-নেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করি নি। মানুষে মানুষে হঠাৎ দেখা, একসঙ্গে আনন্দে ঘোরা,—এ পরিবেশে অন্য পরিচয় অবান্তর।

মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে আবার তখনি বেরিয়ে যান। অল্প পরেই ফিরে আসেন। দু গেলাস চা হাতে। নিশ্চিন্তভাবে এতক্ষণে চেয়ারে বসেন। বলেন, বেড়িয়ে এলেন, গরম চা—ভালই লাগবে। ধরুন। কেমন ঘরখানি দেখছেন? সারা দুনিয়া যেন এখান থেকে দেখা যায়। পৃথিবী ছাড়িয়ে কোথাও বাইরে বসে যেন দূরে থেকে দেখা। আপনাদের শহরের সেই থিয়েটার-বায়োস্কোপের হল্-এ বক্স-এ বসে যেন নাটক দেখা। থাকুন আপনি এখানে আরামে দু-চারদিন। আমার জানানাকে বলে এলাম ভোজন বানাতে। খেয়ে দেখবেন, আমাদের মুলুকের কেমন বজরার রোটি আর চানার শাক!

হেসে বলি, থাকবার কথা ভেবে তো আসি নি। একটু পরেই আমাকে ফিরতে হবে। তিনি তবুও থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। যেন কতোকালের পরিচয়, হঠাৎ অনেক দিন পরে দেখা—ছাড়তে চান না। বলি, বসুন, ব্যস্ত হবেন না। বাড়িখানি সত্যিই চমৎকার জায়গায়। আর, এ ঘর তো আলো ও হাওয়া মহল,

দেখাও যায় কতো দূরে পর্যন্ত। নতুন করা মনে হচ্ছে?

বলেন, এই তো বছর তিনেক হলো তৈরি, রিটায়ার করার পরই ফিরে এসে করা।

চাকরি করতেন নাকি?—আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি।

তখন তাঁর জীবনের ছোট্ট কাহিনী শুনি।

এই গ্রামেরই অধিবাসী। পৈতৃক জমিজমা। নিজেরও কিছু করা। লেখাপড়া শিখে অধ্যাপনার কাজ নেন। দূরে শহরে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। অবসর গ্রহণের পর গ্রামে ফিরে এখন স্থায়ীভাবেই এখানে বসবাস করছেন। মেয়েদের বিবাহ হয়েছে। একমাত্র ছেলে। বিদেশে চাকরি করে। মাস্টারী বটে,—হেসে বলেন, তবে পোস্ট অফিসে।

এখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকেন। নিজেই ক্ষেতখামারের দেখাশুনা করেন। নির্জনতা ভালবাসেন। তাই, এই নতুন বাড়ি করা,—গ্রামের বাইরেই, পাহাড়ের উপর।

জিজ্ঞাসা করি, কাগজ কলম বার করলেন, কাজে বসবেন নাকি?

সরল ভাবে তাকিয়ে হাসেন। বলেন, নাঃ, কাজ নয়। ওটা সাজিয়ে রাখা। চিরকালের অভ্যাস, কাগজ-কলম সামনে নিয়ে বসা। খালি টেবিল, কেমন যেন খাঁ খাঁ করে। তাই বসলেই, সাজিয়ে রাখি। ফুলদানিতে ফুল না থাকলে কি মানায়?

কথা শুনে মনে আনন্দ জাগে।

খানিকক্ষণ গল্প করে বিদায় চাই। ছাড়তে চান না। তবু আসতেই হয়। নীচে সিঁড়ির মুখে বারান্দার এক পাশে দেখি, তাঁর গৃহিণী উনুন জেলে রান্না করেন। আমাকে চলে আসতে দেখে আশ্চর্য হন। বুঝতে পারি, স্বামীকে প্রশ্ন করেন, রোটি শাক বানাচ্ছি, উনি যাচ্ছেন কোথায়?

দুঃখিত হয়ে জানাই, এবারের মত থাক্, পরে আবার ভাগ্যে থাকে তো এসে খাওয়া যাবে।

কিন্তু, রাজী হতেই হয় তখনি কর্তার সঙ্গে মাঠে আখের ক্ষেতে যেতে। সেখানে নতুন তাজা গুড় তৈরি হচ্ছে, অন্ততঃ তার স্বাদ নিতেই হবে।

প্রকাণ্ড আখের ক্ষেত। কোথাও বা স্তূপাকার করে আখ কেটে রাখা। এক পাশে আখ পিষে রস বার করা হচ্ছে। ক্ষেতের মাঝে খানিকটা খোলা জমি। সেখানে বড় বড় উনান। লোহার প্রকাণ্ড কড়া চাপানো। টগবগ করে রস ফোটে। গুড় ঘন পাক হয়। পাশেই মাটিতে চাটাই বিছানো। পাক করা গুড় শুকায়। যেন তাল তাল সোনা। বাতাস ভরা গুড়ের মিষ্ট সুবাস। অভিনব অভিজ্ঞতা। গৃহস্বামী গুড় তুলে চাখতে দেন। অনুরোধ করেন, আবার দু'তিন দিনের মধ্যেই আসুন। ওদিকের ক্ষেতের আখ কেটে নতুন জ্বাল শুরু হবে। এদেশের প্রথা, অতিথি কেউ এলে জ্বাল দেওয়া গুড়ের প্রথম

পাটালী তাঁরই হাত দিয়ে তৈরি করানো। এ-গড়ু খাইয়ে তৃপ্ত হলো না। আজ তো হঠাৎ এলেন, ব্যবস্থা করা নেই। আমরা পাটালী করি, বাদাম কিস্‌মিস্‌ মনেক্কা গড়ুে মিশিয়ে। সে পাটালী না খাওয়াতে পারলে ধারণাই দিতে পারব না,—কেমন গড়ু আমরা তৈরি করি।

ফেরবার সময় খালি হাতে ফিরতে দেন না। জোর করে কয়টা পাটালী বেঁধে হাতে দেন। শুধু তাই নয়, অনেকখানি পথও সঙ্গে এসে এগিয়ে দিয়ে যান।

আশ্চর্য! আমার নাম-পরিচয় একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি। কথায় কথায় শুধু জানতে পারেন, কলকাতার লোক। পরিব্রাজক। হিমালয় ভালবাসি।

তাঁর নাম? আমিও জানতে চাই নি। শুধু শুনি, সবারই কাছে 'মাস্টারজী' নামেই পরিচিত।

জীবনের দীর্ঘ পটভূমিতে সেই ক্ষণিকের পরিচয় স্মৃতি। সন্ধ্যাকাশে দিগন্তের প্রথম উজ্জ্বল তারাটির মতন হীরকখণ্ডের দ্যুতি ছড়ায়।

জগতে শুধু 'বোনাজি'ই নয়, 'মাস্টারজীও' থাকেন।

বিধিলিপি

নিয়তি কখন কোথায় কাকে টেনে নিয়ে যায় তা কী কেউ জানে ?

চণ্ডীগড়ে থাকতে একবার দাদা ও বৌদিদির সঙ্গী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ি হিসার শহরে।

পঞ্চনদের দেশ। অথচ, নদীবিহীন। বালি কাঁকর বিছানো রুক্ষ শুষ্ক মরুপ্রান্তরবর্তী। শহরের উপান্তেই রাজস্থানের সুবিস্তীর্ণ মরুভূমির শুরু। সেদিকে তাকালে অবাধ দৃষ্টি চলে যায় দূর দিগন্তে। ধু ধু করে সীমাহীন বালুকারাশি। মনে হয়, রক্তশূন্যা বিবর্ণা ধরিত্রী শুষ্ককণ্ঠা রোগিণীর মত একফোঁটা জলের আশায় আকাশের মুখপানে কাতর নয়নে তাকায়।

শুধু কি প্রকৃতিরই এই রূপ ? শহরের ঘরবাড়িও কেমন যেন ধূলিমলিন, সজ্জাবিহীন, বিরস, বিশুষ্ক। অধিবাসীরাও তেমনি। কাটখোট্টা কুস্তিগীরের মত লম্বাচওড়া দেহ। মাথায় বিপুল পাগড়ী।

শহরের ঘিঞ্জি বাজারের মধ্যে ঘুরি। হঠাৎ নজর পড়ে, অদূরে দাঁড়িয়ে এক বাঙালী ভদ্রলোক। উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদেরই দেখেন। এগিয়ে যাই। তিনিও পা বাড়িয়ে আসেন। সাগ্রহে আলাপ করেন। সম্প্রতি এখানে এসেছেন। তেল কোম্পানির কাজে বদলি হয়ে। বলেন, মশাই, বাঙালীর মুখ তো এখানে দেখিই না, তাই তাকিয়ে দেখেও আনন্দ পাচ্ছিলাম। উঠেছেন কোথায় ? আসুন না একদিন আমার ডেরায় সকলে মিলে। বাড়ির মেয়েরাও একটু গল্প করতে পেরে হাঁফ ছাড়বে। পরদিনই নিজে এসে নিয়ে যান। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, ছোট ছেলেমেয়ে ও বিধবা বৃদ্ধা মাতা।

বৌদিদির সঙ্গে তাঁর মা গল্প করেন। মনের দুঃখ জানিয়ে বলেন, দেখ দিকি মা, কোথায় এসে পড়েছি ! ঐ আমার একমাত্র সন্তান। মানুষ হলো। ভাল চাকরিও পেল। বিয়ে দিলাম। নিজেদের সংসার পাতলো। চলে গেল কাজের জায়গায় ব্যারাকপুরে। আমিও ঝাড়া হাত-পা হয়ে চলে যাই কাশীবাস করতে। সেখানে খাসা ছিলাম। নিত্যি গঙ্গাস্নান। বাবা বিশ্বনাথ দর্শন। বিকেলে ঘাটে বসে ভাগবত পাঠ, কীর্তন শোনার তৃপ্তি। জপতপ নিয়ে দিন কেটে যায় মনের আনন্দে, পরম শান্তিতে। বিশ্বনাথের চরণে প্রার্থনা জানাই, এমনি করেই যেন জীবনের বাকি দিনগুলো কাটে, জাহ্নবীর কোলে শুয়ে এ দেহ যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। বুড়ো বয়সে এমন কাশীবাস, কতো সৌভাগ্য ! ছুটি পেলে ছেলে মাঝে মাঝে এসে দেখাও করে যায়। বিধবার এর চেয়ে সুখ আর কী থাকবে, বল মা ! এমনি সময়ে—এই ক'মাস আগে—ছেলে জানাল, হঠাৎ বদলি হয়েছে হিসারে। আমাকেও সঙ্গে আনতে চায়। আমিও তখনি জানিয়ে দিই, মা-গঙ্গার কোল ছেড়ে আমি আবার যাব কোথায় ? শেষ জীবনে গঙ্গা পেতেই আমার কাশীবাস। তোমরা সুখে থাক। পার তো যাবার আগে

একবার দেখা করে যেও।

ছেলে জানালো, কাশী ঘুরে যাওয়ার এখন আর সময় কই? সেই হিসার থেকে কবে আবার আসতে পারব তাও জানি না। আমার যাবার দিন তুমি বরং কাউকে সঙ্গে নিয়ে মোগলসরাই স্টেশনে চলে এস, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও তো দেখা হবে। আবার কবে দেখতে পাব কী জানি।

সেই মত গেলাম মোগলসরাই স্টেশনে। ট্রেন এল। ছাড়লও। কিন্তু আমার আর কাশী ফেরা হলো না। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে উঠে বসেছি সেই ট্রেনেই। এখন কাশী ছেড়ে এ কোথায় এলাম, মা, দেখ দিকি। গঙ্গা তো দূরের কথা। একটা নদী পর্যন্ত নেই, শুনেছি আছে মুসলমান আমলের একটা কাটা খাল! অনেক খুঁজেও এতদিনে একটা তুলসীগাছের সন্ধান হলো না, মা।

বৌদিদি শুনে বলেন, তুলসীগাছ? চাই আপনার? ডাকবাংলোতে যেখানে আমরা রয়েছি,—সেখানেই তো আছে দেখেছি।

বৃদ্ধা উৎফুল্ল হন। ছেলেকে ডাকেন, ওরে। এই দ্যাখ, বৌমা বলছেন তুলসীগাছ এঁদের ডাকবাংলোর বাগানে রয়েছে। কালই গিয়ে নিয়ে আসিস, লক্ষ্মী বাবা! পুজোয় বসি, না পাই এক ফোঁটা গঙ্গাজল, না থাকে সামনে একটা তুলসীগাছ! কী ছিষ্টিছাড়া দেশেই না এসে পড়েছি!

বৃদ্ধার পুজোর ঘরে পরের দিনই টবে তুলসীগাছের অধিষ্ঠান হয়। গঙ্গাহীন মুল্লুকে বৃদ্ধার মন তবুও খানিক তৃপ্তি পায়।

বছর খানেক পরে। আবার এসেছি হিসারে। মনে পড়ে যায়, সেই ভদ্রলোকের কথা। হয়তো এখনও এখানেই রয়েছেন। সেই একই বাড়িতে কি? যাই না, গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে দেখি। বিদেশে প্রবাসী বাঙালি। দেখা হলে খুশীই হবেন। তাঁর মা কি আবার কাশীবাস করতে ফিরে গেলেন এদিনে?

বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিই। ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন। দেখে খুশী হন নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ কী বিষণ্ন ম্লান মুখ। মাথা কামানো! তবে কি,—

ভদ্রলোকই মৃদুকণ্ঠে জানান, মা চলে গেলেন এই ক'দিন আগে! হঠাৎই।

—আসুন, ভেতরে আসুন। জিজ্ঞাসা করি, কাশীতে ফিরে গেলেন কবে?

মায়ের পুজোর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সজল নয়নে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে বলেন, মায়ের অতো সাধের গঙ্গালাভ আর হলো কই। এখানেই দেহ রাখলেন। অসুখ-বিসুখ কিছুই প্রকাশ পায়নি। কিন্তু, কেন জানি না, ক'দিন থেকে অনবরতই বলছিলেন, এই গঙ্গাহীন দেশে আর কতো দিন থাকব রে,—কাশীতে এবার রেখে দিয়ে আয়। কেবলি 'কাশী' 'কাশী' মন করে।—দিন চারেকের ছুটির চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। সেদিন সকালে অফিসের কাজের কিছু তাড়া ছিল। স্নান করতে চলেছি এই এখান দিয়ে, দেখি, মা আসনে বসে ধ্যান করছেন। যেমন রোজ করতেন। একটু পরে স্নান সেরে ফিরছি, দেখি,

তিনি যেন গড় হয়ে প্রণাম করছেন, কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আড়ষ্ট ভাব।—'মা, অমন করে আছ কেন?'—বলে ঘরে ঢুকে এগিয়ে গেলাম কাছে। কিন্তু, সাড়া দেবেন কে? মা কখন অজান্তে চলে গেছেন।

ভদ্রলোকের শোককাতর কণ্ঠ মনে সমবেদনা জাগায়। একদৃষ্টে ঘরের পানে তাকিয়ে থাকি,—সেই পুজার আসন তেমনি আছে, সেই তুলসীগাছ তেমনি দাঁড়িয়ে,—তবু ঘরভরা বিরাট শূন্যতা।

ভাবি, ধর্মপ্রাণা বিধবা বৃদ্ধার অতো আশা নিয়ে কাশীবাস, গঙ্গালাভের অমন প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাঁরই কিনা মৃত্যু ঘটল কাশী থেকে দূরে গঙ্গাহীন দেশে!

আরও এক কাহিনী শোনাই।

কাশীতে এসে দিন কাটাচ্ছি। কলকাতা থেকে এক বন্ধুর চিঠি পাই, তাঁর দিদিও তখন কাশীবাস করছেন, আমার ঠিকানা তাঁকে জানিয়েছেন,—আমার সঙ্গে যাতে এসে দেখা করতে পারেন।

বন্ধুকে তখনি লিখি, এ কী তোমার অবিবেচনা! তোমার দিদি,—তিনি আসবেন কষ্ট করে আমার সঙ্গে দেখা করতে! আমি কি চলি-ফিরি না? পত্রপাঠ তাঁর ঠিকানা আমাকে জানাও।

ঠিকানা পেতেই চলে যাই তাঁর বাড়ির সন্ধানে। বাঙালীটোলার সেই প্রসিদ্ধ গলি। যেন গোলকধাঁধা। খুঁজে খুঁজে নম্বর দেখে বাসা বার করি। সদর দরজার কড়া নাড়ি। সেকেলে পুরনো তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। দীর্ঘ অবহেলায় জীর্ণ। তবে সম্প্রতি কিছু সংস্কারের চিহ্নও দেখা যায়। দোতলার বারান্দায় —'কে?' বলে দিদি বেরিয়ে আসেন। হঠাৎ আমাকে দেখে মুখে আনন্দের হাসি ফোটে। বলে ওঠেন, ওমা! তুমি? নিজেই এসে গেছ? দাঁড়াও, দাঁড়াও ভাই,—এখুনি দরজা খুলে দিই। ভেতরে ঢুকে ডান দিকের কোণে সিঁড়ি পাবে—ওপরে উঠে এস।

খড়াং করে তখনি দরজার পিছনের হুড়কো খুলে যায়। অথচ, সেখানে মানুষ নেই। এই হলো কাশীর পুরানো বাড়ির সদর দরজা খোলার সেকেলে সহজ প্রথা। হুড়কার সঙ্গে দড়ি বাঁধা, দোতলা থেকে টানলেই খুলে যায়।

ভেতরে ঢুকতেই উঠান। একপাশে প্রকাণ্ড শিবমন্দির। দেখেই বোঝা যায়, ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, অনেককাল পরে মেরামতের কাজ চলেছে।

দিদি আদর করে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান। খবরাখবর নেন। বলেন, তুমি একটুকু বসো ভাই, আমি এই এখখুনি আসছি।

বুঝতে পারি, দোকান থেকে খাবার আনতে যাবেন। কোনমতেই নিষেধ মানতে চান না। বলেন, আমার ঘরে কি ও সব কিছু থাকে? শুধুমুখে তুমি চলে যাবে? সে কি কখনো হয়? আমার ভায়ের বন্ধু তুমি।

বলি, আপনার হাতের তৈরি নাড়ু-টাড়ু যা আপনার ভাঁড়ারে আছে, তাই

হাতে দিন, আনন্দ করে খাব।

এ-প্রস্তাবে তাঁর মন ভরে না। কিন্তু, আমারও তাড়াতাড়ি ফেরবার তাগিদ থাকে। অতএব, কথা দিয়ে আসতে হয়, পরের দিনই আবার আসব। নিজের হাতে মালপো করে তিনি খাওয়াবেন,—এ না হলে তাঁর মনে তৃপ্তি হবে না।

যেতেই হয় আবার পরের দিন।

যাবা মাত্রই দিদি বলেন, তুমি কাল চলে যাওয়ার পরই এই বাড়ি যাঁব—ঐ ওদিকের ঘবে থাকেন—তিনি এসে বলেন, "আপনার ঘরে তো কখনও কোন লোকজনের গলা শুনি না, আজ যেন কে এসেছিলেন মনে হলো?" তোমার কথা বলতেই ভদ্রলোক বিশেষ দুঃখিত হযে বললেন, "সে কী! তিনি এসেছিলেন আমার বাড়িতে,—আর আমাকে একটু জানালেন না? আলাপ করতাম।" আজ আসবে তাঁকে জানিয়েছি—যাবার আগে তাঁর সঙ্গে একবার—

কথা শেষ হবার আগেই বাইরে বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে গলা শোনা যায়,—'মুখুজ্জে মশাই এসে গেলেন নাকি?'

অন্ধ ভদ্রলোকের তো প্রখর শ্রবণশক্তি। তখন বারান্দায় বেরিয়ে আসি। দেখি, ওদিকের ঘব থেকে এগিয়ে আসেন ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ গোছেব এক ব্যক্তি। সাহেবদের মত টক্‌টকে ফর্সা রঙ। গায়ে ফতুয়া। পরনে লুঙ্গি। হাতে লাঠি। অপর হাত বারান্দার দেওয়ালে। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে টলমল করে এগিয়ে আসেন! এ কী! অন্ধ যে!

সামনে গিয়ে তাঁর হাত ধরি। বলি, এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। আপনাব সঙ্গে দেখা না করে যেতাম না। আপনি কষ্ট করে নিজে আসছেন কেন? চলুন আপনার ঘরে।

প্রকাণ্ড একটা হলঘর। ঢুকে বলেন, ঐ ওদিকে কোন্‌খানে একটা চেয়ার আছে,—আপনি কষ্ট করে টেনে নিয়ে বসুন,—আমি বসছি চৌকিটাতে আমার বিছানার ওপর। আজ আমার কী আনন্দের দিন! আপনার চেহারা একবার দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল,—ভগবান চোখের দৃষ্টিটাই নিয়ে নিলেন,—অতি ঝাপ্‌সা সামান্যই একটু দেখা যায়,—তাতে লোকের চোখমুখও বোঝা যায় না। আপনাকে দেখবার এ-আকাঙ্ক্ষাটা কেন, শুনবেন?

এই ভাবেই আলাপ শুরু।

ভদ্রলোক বলেন, দেখুন আশ্চর্য! কোথায় কীভাবে মানুষের সঙ্গে যোগ যোগ হয়ে যায়। আপনারাও মুখুজ্জে, আমিও মুখুজ্জে। আপনাদের আদি নিবাস যে-গ্রামে, আমারও পূর্বপুরুষের বাস ছিল সেইখানে। আপনারা থাকেন ভবানীপুরে, আমাব বাবাও এসে অনেকদিন ছিলেন আপনাদের সেখানকার বাড়ির কাছেই। আপনারি বাবার সঙ্গে আমার বাবার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। বাবার কাছেই শুনেছি, ছেলেবেলায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁব কাছে যেতেন, আমি নাকি আপনার বাবার কোলে পিঠেও চড়েছি! বড় হয়েও দু'একবার তাঁকে দেখেছি বটে,

—কিন্তু তার পর আর তাঁকে দেখবার সুযোগই হয় নি,—আজ হঠাৎ কতো বছর পরে তাঁরই এক ছেলের সঙ্গে এখানে এভাবে দেখা,—আনন্দ হবে না ? কী বলেন ?—এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে দৃষ্টিহারা চোখে আমার দিকে মুখ ফেরান। মনের মধ্যে ডুবে কী যেন হারানো জিনিস হাতড়াতে থাকেন। একটু চুপ করে থেকে বলেন, মানুষের ভাগ্য কোথায় তাকে টেনে নিয়ে যায়, আবার কোন্‌খানে নিয়ে এসে ফেলে,—এখানে একা একা বসে তাই এখন ভাবি, মুখুজ্জে মশাই। এই আমার জীবনটাই দেখুন না,—সেই কবে দেশ ছেড়ে চলে যাই 'ফার্‌-ইস্ট'—মালয় দেশে। ব্যবসা শুরু করি সেইখানে। কপালজোরে—ম্লানমুখে হাসির রেখা টেনে মৃদুগলায় বলেন,—নিজের অধ্যবসায়, বুদ্ধি-সুদ্ধিও ছিল বইকি একটু—ব্যবসা ফেঁপে উঠল। ঘর বাড়ি সংসার সব পাতলাম। অঢেল টাকা রোজগার করেছি। খরচও করেছি দু হাতে। দেশে ক্বচিৎ কখনো আসতাম। আসব আর কেমন করে ? কীসের জন্যেই বা ? পোশাকে-পরিচ্ছদে আচারে-ব্যবহারে মনে-প্রাণে তখন পুরোদস্তুর সাহেব বনে গিয়েছি। ফি বছর চলে যাই বিলেতে প্যারিস-এ—সেই যেন আমার স্বদেশ। এ জীবনে ফুর্তি লুটেছি কম ?—

আবার কথা থামান। একটু চাপা ভারী গলায় বলেন, মুখুজ্জে মশাই, আপনার কাছে বলতে বাধা নেই,—না বললেও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়—এ জীবনে এমন কুকর্ম নেই যা করি নি। নিজের ধর্ম মানি নি, আচারবিচার মানি নি। সায়েবিপনায় একেবারে ডুবে ছিলাম। শুধু স্বপ্ন ছিল, বয়েস হলেই ছেলেদের হাতে কাজকর্মের ভার দিয়ে চলে যাব প্যারিস্‌-এ,—সেখানে সুন্দর একটি কটেজ্‌ বানাবো। তোফা আনন্দে জীবনের শেষ ক' বছর সেইখানেই কাটিয়ে দেব। সেই মত সব আয়োজনও করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ভেঙে গেল শরীর। দেহের ওপর অতো অত্যাচার,—কতো আর সয় ? চোখের রোগ দেখা দিল। মনেরও বল গেল। ক্রমে দৃষ্টিও গেল হারিয়ে। এ যেন বাইরে অন্ধ হয়ে ভেতরের দৃষ্টি গেল খুলে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বুপ-ঠাকুর্দার আমলের কাশীর এই সাবেক বাড়ির কথা। সেই ছেলেবেলায় যা আসতাম,—তারপর আর আসিই নি, খোঁজ-খবরও রাখি নি। অথচ এই বাড়িতেই চার পুরুষ থেকে,—আমার বাবা, ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা, তাঁরও বাবা—সবাই শেষ জীবনে এসে কাশীবাস করেছেন, এইখানেই দেহ রেখেছেন। আর সেই বাড়ির কথা ভুলে আমি চলেছিলাম প্যারিস-বাসের লোভে। সেই কারণেই হয়ত হারাতে হলো চোখের দৃষ্টি। এ যেন ভাগ্য চোখ বন্ধ করে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল এইখানে। ছেলেপিলেরা রইল পড়ে সেই বিদেশে। তা থাকুক তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে। আমি এখন সায়েবিয়ানার গঙ্গাযাত্রা করিয়ে নিজে গঙ্গালাভের আশায় বসে রয়েছি। বাড়ি মেরামত করাচ্ছি। খালি ঘর ভাড়া দিচ্ছি। ভাঙা মন্দিরটাও সারাচ্ছি। শিবের পুজো হয়ে গিয়েছিল বন্ধ, তারও আবার ব্যবস্থা করছি,—ভাল কথা,

কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ পূজারীর সন্ধান দিতে পারেন ? এখানে থাকবে, দেবসেবা করবে, প্রসাদ পেয়ে আমারও দিন কেটে যাবে। যাই বলেন, আছি কিন্তু মনের আনন্দে। নিত্যি গঙ্গাস্নান, বাবা বিশ্বনাথের মাথায় ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল চড়ানো,—নিজে না দেখলেও তাঁকে চেহারাটা একবার দেখিয়ে আসা,—এতেও মনের কম তৃপ্তি !

বলতে বলতে আবার আমার দিকে দৃষ্টিশূন্য চোখ ফিরিয়ে তাকান।

এইভাবেই সেদিন শুনি তাঁর জীবনকাহিনী।

এর মাসখানেক পরের কথা। দিদির কাছে গিয়ে জানতে পাই, ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেছেন। ছেলেরা এসেছিল। সমারোহের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি করেছে। তাঁর গঙ্গালাভের কামনা পূর্ণ হয়েছে।

শুনে ভাবি, যে-লোক সারাজীবন ধর্মে বিশ্বাস করলো না, ধর্মপথে রইল না,—তারই শেষ পর্যন্ত হলো কিনা গঙ্গাপ্রাপ্তি, সফল কাশীবাস। আর সেই হিসারের ধর্মপ্রাণা বিধবা বৃদ্ধা মহিলা ?

একেই কি বলে বিধিলিপি,—নিয়তির লীলাখেলা,—প্রারব্ধের ফলাফল ?

বিষাদে হরিষ

'আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আকস্মিকভাবে দুঃখের সঞ্চার',—তাকেই বলে হরিষে বিষাদ। কিন্তু, বিপরীতও যে ঘটে তারই এই কাহিনী।

হিমালয়ের নিভৃতিতে দিন কাটানোর আকাঙ্ক্ষা। পাহাড়ের উপর ছোট শহর। এক প্রান্তে বনের ধারে এক দেশী সাহেবের মনোরম বাংলো। ছাদের লাল টালিগুলি সবুজ গাছপালার মধ্যে দূর থেকে দেখায় যেন বনের মাঝে অজস্র রোডোডেনড্রন ফুলের বাহার।

একতলা বাড়ি। অনেকগুলি ঘর। কিন্তু, গৃহস্বামী থাকেন একা। তাই কয়েকটা ঘর ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করেন। সন্ধান পেয়ে আমিও গিয়ে উঠি।

নিভৃত নির্জন পরিবেশ। জনকোলাহলশূন্য। ভালই লাগে। গৃহস্বামী সাহেবীভাবাপন্ন। অমায়িক ভদ্রব্যক্তি। মিতভাষী। ধীর নম্র আচরণ। বলেন, বয়েস হলো, রিটায়ার করেছি, এখন একাই চুপচাপ দিন কাটাই। পরিবারবর্গ আছেন দূরদেশে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে। কখনো-সখনো আসেন এখানে। বেয়ারা, মালী আছে, আমার অসুবিধে নেই। অন্য আরও চারজন যাঁরা আছেন, তাঁরাও একান্তে যে যার ঘরে থাকেন। আপনিও আপনার ঘরে থাকবেন। কোনই অসুবিধে হবে না।

অপর সেই চারজন বাসিন্দার সঙ্গেও পরে আলাপ হয়। আপন আপন স্বতন্ত্র ঘরে চারজনের বাস। তিনজন পুরুষ। অপরটি প্রৌঢ়া মহিলা। সবারই কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শরীর। অথচ, গেরুয়াবাস। পুরুষদের পরনে গেরুয়া ঢলঢলে লম্বা পাঞ্জাবি-পায়জামা। দুজনের মাথা, দাড়িগোঁফ সব পরিষ্কার কামানো,—বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মত। অপরজনের বাবরি চুল, কোঁকড়ানো দাড়িগোঁফ, লম্বা ছিপ্‌ছিপে দেহ, টানা চোখ, টিকালো নাক,—যেন, জীবন্ত যীশুখৃষ্ট। মহিলাটিরও পরনে গেরুয়া শাড়ি। তিনি থাকেন আমার পাশের ঘরেই। দরজা খুললেই দেখতে পাওয়া যায়, মেঝেতে বিছানো প্রকাণ্ড বাঘছাল,—আস্ত মুণ্ডসমেত। শুনি, সেই হলো তাঁর সাধনার আসন। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কয়েকজন ভারতীয় প্রসিদ্ধ সাধক ও মহাপুরুষের ছবি।

বুঝতে পারি, এটি একটি বিচিত্র আশ্রম। যে যার আপন মতো থাকেন। কোন হৈ-চৈ সাড়াশব্দ নেই। সবারই ঘর প্রায় সারাক্ষণই বন্ধ। রুদ্ধ ঘরে সারা দিনরাত কি করেন কিছুই বোঝা যায় না। ক্বচিৎ বাইরে এলে সামান্য আলাপে যেটুকু বুঝতে পারি, আমার কাছে তাই-ই যথেষ্ট। সবাই লোক ভাল, মিষ্ট ব্যবহারও।

আমিও থাকি আমার নির্দিষ্ট ঘরে। আপন মনে, নিজ ভাবে। ভাবি, ওঁরাও হয়ত আমার সম্পর্কে কতো কী ভাবেন, কি জানি!

তবে আমার কথা আমিই জানি। সারাদিন মৌন থাকলেও আমার মনের

তৃষ্ণা মেটে। কিন্তু সারাদিন নির্জীব হয়ে বসে থাকলে পায়ের ক্ষুধা মেটে না, —হিমালয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাসের এই এক অস্বস্তি। তাই সারাক্ষণই আমার ঘরে বসে কাটানো চলে না। ভোরবেলা ও বিকালে—দুবার বাইরে আসি। বাড়ির সুমুখেই বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। সাজানো বাগান। ফুল ফোটে নানা রঙের। বড় বড় গাছের ছায়াও। কতো রকম পাখির ডাক।—সেই বাগানে দুবেলা পায়চারি করি। মনে আনন্দ পাই, দেহেরও সঞ্চালন হয়। প্রশান্ত তপোবনের অপার শান্তি মর্মে মর্মে অনুভব করি।

এমনই নৈসর্গিক পরিবেশে বর্ণনীয় ঘটনাটি ঘটে।

বিকালে বেড়ানোর সময় প্রায়ই এক সঙ্গী জোটে। তাতে অসঙ্গতার শান্তি ভাঙে। কিন্তু, এড়াবারও উপায় পাই না। সাহেবী গৃহস্বামীর বিরাট এক কুকুর। অ্যালশেসিয়ান্। উজ্জ্বল সোনালী রঙ্। রাঙা লক্‌লকে জিব্। দেখলেই মনে হয়, জার্মান নেকড়ে বাঘের বংশধরই বটে।

প্রথম দিনেই চিনে নিয়েছে। তাই রক্ষা। ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু আমার একমনে বেড়ানোর বিঘ্ন ঘটায়।

বাগানের একপাশে প্রকাণ্ড এক চেস্ট্‌নাট্ গাছ। তারই ছড়ানো শাখার ছায়া-তলে দুটি সবুজ বেঞ্চ পাতা। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী বিকালে এসে সেখানে একাকী বসেন। সেদিন কুকুরের সঙ্গ থেকে আমার অব্যাহতি। কিন্তু পূর্ণ মুক্তি নয়। কুকুরের পরিবর্তে তার মনিবের কবলে পড়ি। কুকুর ছুটে যায় তার মনিবের কাছে, তাঁরই সঙ্গে খেলা করে। মনিবও উৎসাহ সহকারে আমাকে দেখাতে থাকেন কতো রকম সুশিক্ষা দিয়েছেন আপন কুকুরটিকে। ইংরেজীতে যখন যা আদেশ করেন, কুকুরও তখনি ঠিক তাই-ই করে। ওঠে, বসে, শোয়, লাফায়, সামনের দু পা তুলে দাঁড়ায়, আকাশপানে ছুঁড়ে-দেওয়া-বল লাফিয়ে উঠে অনায়াসে মুখে লুফে নেয়,—আরও কতো কী। চতুষ্পদ পশুর কৃতিত্ব দেখে আমাকেও বাহবা দিতে হয়। বলি, চমৎকার শিক্ষা দিয়ে একে মানুষ করে তুলেছেন, দেখি! মনে ভাবি, প্রকৃত শিক্ষার কতোই না প্রভাব। শিক্ষায় জানোয়ারও মানুষ হয়, আবার শিক্ষার অভাবে মানুষও জানোয়ার হয়।

অতি ভোরে ওঠা আমার দীর্ঘকালের অভ্যাস। বাড়ির আর সব দরজাই তখনো বন্ধ।

একা বেড়াই আপন মনে। ধীরে ধীরে সকালের আলো ফোটে। পাখিরা জাগে। কতো রকম সুর তুলে গান ধরে। হিমালয়ের স্নিগ্ধ মৃদু ভোরের হাওয়া গাছের পাতায় পাতায় শিহরণ জাগায়। রঙিন ফুলের পাপড়ি থেকে রাতের শিশিরবিন্দু মুক্তার মত ঝরে পড়ে। ধীরে ধীরে ঘাসের উপর পা ফেলি। যেন কার্পেটে পা পড়ে। অন্তরে অনন্ত শান্তির অপূর্ব অনুভূতি।

সেদিনও সকালে তেমনি আনন্দসাগরে মন ভেসে বেড়ায়।

একটা ব্ল্যাক-বার্ড পাখি গাছের ডালে বসে মধুর সুরে গান ধরে। চিকন কালো রঙ। লম্বা লেজ। হলদে ঠোঁট। শিস্ দেয় একটানা সুরে। কেঁপে কেঁপে স্বর ওঠে। বনতলেও সে কাঁপন জাগায়। জানি না, এরা কোকিলের স্বজাতি কিনা। হিমালয়ের সাত-আট হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত এদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সকালে সন্ধ্যায় প্রায়ই শোনা যায়। আনন্দ-পুলকিত স্তব্ধ মৌন গিরিরাজের এরাই যেন হৃদ্‌স্পন্দন।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখি। কালো রঙ-এরও কি রূপের মহিমা! পাখিটা বুঝি বুঝতে পারে। লজ্জাভরে উড়ে গিয়ে আর এক গাছের ডালে বসে। ক্ষণিক পরে ঘাসের উপর কি যেন দেখে মাটিতে নামে। ঝরা পাতার মধ্যে তার খাদ্য খোঁজে। আবার উড়ে গিয়ে আর এক গাছের ডালে বসে। হঠাৎ আবার গান ধরে। আকাশে মাথা তুলে। মনের আনন্দে। আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে নেমে আসে ঘাসের উপর। আবার তখনি উড়ে যায় আর এক ডালে। চকিতে যাওয়া আসা,—কিন্তু বাতাসে সুরের তরঙ্গ তুলতেই থাকে। সেই অনাবিল আনন্দের উচ্ছ্বাস আমারও মনে আনন্দের তুফান তোলে। বিশ্বস্রষ্টার কী অপূর্ব সৃষ্টি!

অকস্মাৎ একটা শব্দ শুনে পিছন ফিরি। দেখি, অসময়ে বাড়ির সদর দরজা খুলে কুকুরটা লাফিয়ে বেরিয়ে আসে। বাগানের এক পাশে ছুটে যায়। প্রাকৃতিক নিত্যকর্ম সারে।

ভাবি, কী ভদ্র, সুসভ্য, শিক্ষিত সারমেয়! শিক্ষার কি গুণ! ছাড়া পেয়েও যেখানে-সেখানে কাজ সারে না। এমন সাজানো সুন্দর বাগান নোংরা করা কি চলে?

পাখির গান আবার আমার মন টানে।

কিন্তু কুকুর এসে বিঘ্ন জাগায়। পাখি উড়ে যায় দূরের গাছে। সেই-খানেই আসর জমায়। যেন দূরে সরে অভিমানভরে বলে, থাক তুমি তোমার নতুন সঙ্গী নিয়ে!

হঠাৎ দেখি, কুকুর তড়িৎ বেগে ছুটে যায় মাঠের সেই প্রান্তে। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

কিন্তু, তখনি যা দেখি তাতে আঁতকে উঠি। দূরে মাঠের উপর কুকুরটা কালোপানা কি যেন ধরে,—মুখ দিয়ে পা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়তে ব্যস্ত হয়।

তখনি বুঝতে পারি, অমন পাখিটার প্রাণ গেল। এতখানি ছুটে গিয়ে ঐ শয়তানের কবল থেকে আর বাঁচানো অসম্ভব। বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। চোখ ফেটে জল নামে। সেই প্রাকৃতিক শোভা,—এখন যেন দেখি, শ্মশানভূমি।

হায় রে ভগবান্! এই অল্প আগেই তোমার অপার সৌন্দর্য-সৃষ্টি মন

মুগ্ধ করে রেখেছিল, এখন এ কী নিদারুণ নিষ্ঠুর দৃশ্যের অবতারণা করলে? বুঝি না বিধাতা তোমার এই ভাঙা-গড়ার, জন্ম-মৃত্যুর খেলা।

হঠাৎ-ই বাড়ির বাইরে মালীর আবির্ভাব হয়। তখনি চেঁচিয়ে তাকে ডাকি, শীগ্‌গির ছুটে যাও—ঐ দেখ তোমার কুকুরের কীর্তি!—অমন পাখিটাকে মেরে ফেললে!

সমস্ত রাগ যেন এখন মালীটারই উপর গিয়ে পড়ে।

মালী ছুটে যায়। দূর থেকে কুকুরটার নাম ধরে ডাকতে থাকে। সে মুখ তুলেও তাকায় না, আপন কুকর্মে উন্মত্ত। পাথর তুলে মালী ভয় দেখিয়ে এগিয়ে যায়। এতক্ষণে কুকুর শিকার ছেড়ে সরে যায়। লক্‌লকে জিব্ বার করে একটু দূরে পাশে দাঁড়ায়,—মাটিতে ঘাসে কি শুঁকতে থাকে। ভাবি, হয়ত রক্তাক্ত মুখই মোছে।

তার ফেলে-আসা নিস্পন্দ শিকারের নিকটে মালী যায়। আমিও এক পা এক পা করে সেই দিকেই অজানিত ভাবেই এগিয়ে চলি। ভাবতেও শিউরে উঠি, এই একটু আগেই দেখা সেই উজ্জ্বল শ্যামবরণ সুরেলা-কণ্ঠ সুন্দর প্রাণবন্ত পাখিটা,—এখন দেখব রক্ত-রাঙা প্রাণহীন মাংসপিণ্ড!

তবুও, অজানা কীসের আকর্ষণে পা এগিয়ে চলে। বীভৎসতারও বুঝি চুম্বকশক্তি থাকে!

মালীর মুখ এতক্ষণে আমার চোখে পড়ে। আশ্চর্য হই! মুখে-চোখে তার হাসির রেখা, কৌতুক প্রকাশ পায়। ভাবি, ব্যাটা কি অমানুষ? এমন শান্ত সকালে—এই তপোবনের ভিতর—অমন করুণ দৃশ্য দেখেও মনে ব্যথা পায় না,—হাসে? সগর্বে ভাবে বুঝি তার সোহাগের কুকুরের শিকার ধরার অব্যর্থ দক্ষতার কথা! আমার বিক্ষুব্ধ মন জ্বলে ওঠে। এগিয়ে চলি শাণিত বাক্যে ধমক দেবার উদ্দেশ্যে।

সে লোকটা হাসতেই থাকে।

নিকটে পেঁছে দৃশ্য দেখে আমারও বিষাদক্ষুব্ধ মনে হ[illegible] তুফান ছোটে। বুকের পাষাণভার নিমেষে নেমে যায়। মালীর সঙ্গে আমিও উচ্ছ্বসিত হাসিতে যোগ দিই।

মালীর পায়ের কাছে—একপাটি পুরানো ছেঁড়া নোংরা কালো জুতো!

পাখিটাও এতক্ষণে আবার হঠাৎ ডেকে ওঠে ডালের উপর থেকে। যেন হেসেই ওঠে। হয়ত বলে, ভগবানের বিচার করবে তুমি! জানো না যা, ভাবতেও যেও না তা। মনে পড়ে যায়, অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ বিষ্ণু শর্মার প্রসিদ্ধ বাচন:

> শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা সঃ কিং নাশ্নাদুপানহম্।
> কুকুরকে রাজা সাজালেও পাদুকাচর্বণ ছাড়ে কই!